উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি

মাসি[illegible]

শ্রীশ্রীশচন্দ্র[illegible] ।

[illegible], ১২৯৮ ।

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি
১ম বর্ষ
১২৯৮

[illegible]য়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা ।

২২ নং রামকান্ত মিস্ত্রির লেন, উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি
কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ।

[illegible]য়-সাহিত্য-পরিষৎ
নং ......
তা ......
কলিকাতা

কলিকাতা

২নং নবাবদি ওস্তাগরের লেন, "ইংরাজি-সংস্কৃত যন্ত্রে"
সম্পাদকের আদেশে শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত ।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র ।

প্রথম খণ্ড উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধির সূচী।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	অসমুদ্রোত্থিত রত্ন। (শ্রীযুক্ত নৃসিংহমুরারি পাঁজা বি, এ)	১। ৪৫। ১১৭। ১৮৬। ২৩৩
২।	আমি কে? (শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ সেন)	৮৫
৩।	আমাদের উদ্দেশ্য কি? (সম্পাদক)	২০৫
৪।	উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি। (শ্রীযুক্ত হরিদাস সাঁই, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সামন্ত)	২৭। ১৬৫
৫।	উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ ও সম্মতি আইন। (জনৈক স্বসমাজ-হিতৈষী উগ্রক্ষত্রিয়)	১০
৬।	উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ ও সম্মতি আইন প্রতিবাদ। (জনৈক উগ্রক্ষত্রিয়)	৫৭
৭।	উগ্রক্ষত্রিয় প্রেস কোম্পানি লিমিটেড্। (শ্রীযুক্ত হরিদাস সাঁই)	১৯৯
৮।	কে বড়? (শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ সেন)	১৫২
৯।	কবিতা। (শ্রীযুক্ত শ্রীপতি কবিরত্ন, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ সেন)	৭৪। ১৯৫। ২৪৩
১০।	জন্মভূমির বিবাহ। (কেনচিৎ উগ্রক্ষত্রিয়েণ) ...	১৯৩
১১।	তড়িৎ। (শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস এম্, এ) ...	১২
১২।	তুমি কে? (সম্পাদক)	৩০
১৩।	তুমি কে প্রতিবাদ। (জনৈক গৌরদাসানুদাস) ...	১৫৫
১৪।	দণ্ড। (শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর রায়)	৮৭
১৫।	নেপোলিয়নের শেষ জীবনী। (শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল গোস্বামী)	২৩৭
১৬।	প্রতিবাদের প্রতিবাদ। (জনৈক স্বসমাজ-হিতৈষী উগ্রক্ষত্রিয়)	২২৪
১৭।	প্রেরিত পত্র। (শ্রীযুক্ত—, শ্রীমতী—, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র হাজরা, কেনচিৎ উগ্রক্ষত্রিয়েণ, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সামন্ত, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত র, স, গ, শ্রীমুষলরাম মুদ্গরাচার্য্য)	২০১। ২৬৬। ৩২৭
১৮।	বর্ণাশ্রম-বিবেক। (জনৈক পূজ্যপাদ পরমহংস)	৪৯। ১১৮। ১৪৮। ১৮৮। ২৩৪
১৯।	বর্ত্তমান সমাজ ও নীতিশিক্ষা। (সম্পাদক)	৩০১
২০।	বর্দ্ধমান রাজকলেজ। (শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কোঙার বি, এল)	২৪৫
২১।	বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী। (শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ)	৭৭। ১০৯। ১৪১। ২১১। ২৭৬।
২২।	বাল্যবিবাহ। (শ্রীযুক্ত হরিদাস সাঁই)	১২৬। ২৫৬
২৩।	বাল্যবিবাহ প্রতিবাদ। (শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ)	৩০৯
২৪।	বাঙ্গালির শিক্ষা। (শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র হুই বি, এ) ...	২২৯
২৫।	বিজয়ার আলিঙ্গন। (শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ সেন) ...	২
২৬।	বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব। (সম্পাদক)	১৫৬

	বিষয়।	পৃষ্ঠা
২৭।	বিধবা বিবাহ বিচার। (শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃষীকেশ ব্যাকরণসরস্বতী)	২২৪
২৮।	বিবাহে পণ গ্রহণ বা পুত্র কন্যা বিক্রয়। (সম্পাদক) ...	১৭৩
২৯।	বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কৃত জাতিমালা ও উগ্রক্ষত্রিয়। (শ্রীযুক্ত হরিদাস সাঁই)	২৬৯
৩০।	ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী। (শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রনাথ বাকুচি)	২৫৬
৩১।	রত্নখনি। (সম্পাদক)	৭০। ১৩১। ২৪৯। ৩২২
৩২।	রাজা ও প্রজা। (শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর রায়)	২২১। ২৭৪
৩৩।	সতরঞ্চ-বিজ্ঞান। (শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সামন্ত)	৩৩। ৯০। ১৩৫। ১৬৮। ২৬৪
৩৪।	সৎসঙ্গ। (সম্পাদক)	২৩
৩৫।	সমাজ সংস্কার (সম্পাদক)	৩৭
৩৬।	সম্পাদকের নিবেদন। (সম্পাদক) ...	১
৩৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ। (সম্পাদক)	৩৪। ৯৫। ১৩৮। ১৭১। ৩৩৯
৩৮।	সাধক সঙ্গীত। (সম্পাদক)	৪৬। ১২১
৩৯।	সৃষ্টি ও প্রলয় রহস্য। (শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় এম, এ)	৫৩
৪০।	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। (সম্পাদক)	৩৩৪
৪১।	হিন্দুপত্নী। (শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র হুই বি, এ)	২৯৩
৪২।	হিন্দুসমাজ ও জাতিভেদ। (শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র হুই বি, এ)	৬০
৪৩।	হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্তন ও পুনর্গঠন। (শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল গোস্বামী)	৩২৫

উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি।

প্রথম খণ্ড।

সম্পাদকের নিবেদন।

যাঁহার ইচ্ছায় অবিরাম গতিতে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ক্রমে কাল চক্র বিঘূর্ণিত হইতেছে; যাঁহার আদেশে রবি-শশী অহর্নিশি গগণমণ্ডলে স্ব স্ব কার্য্যে তৎপর রহিয়াছে; যাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে কোটিপতি ভিখারীর এবং দীন দরিদ্র নরপতির বেশ ধারণ করিতেছে; পঞ্চ মহাভূত যাঁহার আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে; যাঁহার অঙ্গুলি সঞ্চালন মাত্রে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উত্থান-পতন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে; ত্রিগুণাত্মিকা মায়া যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া সৃজন-পালন-লয় ক্রিয়া সমাধান করিতেছে; যে বাজীকরের হস্তে জীব সকল ক্রীড়া পুত্তলের ন্যায় নৃত্য করিতেছে,—হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, জন্মিতেছে, মরিতেছে, সেই দেবাদিদেব মহাদেবের ইচ্ছা ও কৃপাতেই "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" অসীম সাহিত্য-কাননে একটি ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া প্রিয় পাঠকবর্গের চক্ষুগোচর হইতে চলিল। ভগবানের কৃপায় আমরা যে অঙ্গীকারানুযায়ী ভগবদাদেশ প্রতিপালনে সক্ষম হইলাম ইহাতেই আমাদিগের পরম আনন্দ।

পাঠকবর্গ বলিতে পারেন "একখানা নগন্য কাগজ প্রকাশ করিয়া এত আনন্দ প্রকাশের কারণ কি?" তদুত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা স্বয়ং কৃতী পুরুষ নহি; সুতরাং কৃতিত্ব-জনিত আনন্দ প্রকাশ করিতেছি না। কৃতী হইলেও কৃতিত্বের দাবী রাখিতাম না; আমাদের বিবেচনায় কাহারও রাখা উচিত নহে। কারণ মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের দাস। প্রভু ঈশ্বর তাঁহার বিশ্ব-কার্য্য পরিচালনের জন্য যাহাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন, সে তাহাই সম্পাদন করিতেছে মাত্র। ইহাতে মানবের কৃতিত্ব কোথা হইতে আইসে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমরা বুঝি—"সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। আপনার কার্য্য আপনি কর মা লোকে বলে করি আমি।" আমরা মায়ের ক্ষুদ্রতম দাস, তাই ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছা ও আদেশে আমরা আজ তাঁহার একটী আদেশ পালন করিতে পারিলাম বলিয়া আমাদের এত আনন্দ। প্রভুর আদেশ পালনে কৃতকার্য্য হইলে [illegible] আনন্দের উদ্রেক না হয়?

এখন কথা হইতে পারে "এই প্রকাণ্ড সাহিত্য উদ্যানে অসংখ্য অসংখ্য, বৃহৎ বৃহৎ ফল-পুষ্পশালী বৃক্ষরাজি সদৃশ পুস্তক পুস্তিকা, পত্র পত্রিকা বিদ্যমান থাকিতে ক্ষুদ্র এরণ্ডো-পম "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধির" উদ্ভবের প্রয়োজনীয়তা কি? এবং উহা দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্যই বা সাধিত হইবে?" প্রিয় পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে তাহা-রই উত্তর প্রদান করিতেছি। "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" প্রকাশের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই অনুষ্ঠান পত্রে প্রকাশ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আর আমরা নূতন কথা না বলিয়া অনুষ্ঠান পত্রে যাহা বলিয়াছি এখানে তাহা-রই কিঞ্চিৎ বিস্তার ক্রমে উল্লেখ করিলাম।

অভাবই উন্নতির মূল। অভাব হইতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। আকাঙ্ক্ষাই আন্দোলন-আলোচনার জননী। আন্দোলন-আলো-চনায় কার্য্যকারিণী বৃত্তি উত্তেজিতা হয়। কার্য্যকারিণী বৃত্তি উত্তেজিতা হইলেই প্রকৃত কার্য্য হইতে কাল বিলম্ব ঘটে না। কার্য্যে কৃতকার্য্যতাই সিদ্ধি, ইহারই নামান্তর উন্নতি। সর্ব্বদেশীয় ঐতিহাসিক ও দার্শ-নিক তত্ত্ব আলোচনা করিলে উল্লিখিত নিয়-মের ব্যভিচার দৃষ্ট হইবে না।

আত্মপরিচয় হইতেই অভাব বোধ জন্মে। আত্মপরিচয়েই আপনার অস্তিত্বের উপাদান—স্বভাব নির্ণীত হয়। ধাতু, প্রকৃতি, ধর্ম্ম, স্বভাবের নামান্তর মাত্র। যেখানে দেখিবে যত আন্দোলন-আলোচনা, সেই খানেই দেখিবে তত অভাব। অভাবের মূলেই আত্মপরিচয়। উনবিংশ শতাব্দীর বল্লতর আন্দোলন-আলোচনার মূলেই ঘো... ...ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রকৃত আন্দোলন-আলোচনা ব্যতীত উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। অতএব উন্নতি চাইতে গেলেই আন্দোলন-আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। বক্তৃতা ও পত্রিকা প্রচার এই দ্বিবিধ উপায় দ্বারা আন্দোলন-আলোচনা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ফলের স্থায়িত্ব গুণে শেষোক্ত উপায়েই আন্দোলন-আলোচনায় সমধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দু সমাজের নানাবিধ অভাব বশতই আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর বাগ্মী ও পত্রিকাদি নয়নগোচর করিয়া থাকি। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, এই সকল বাগ্মী ও পত্রিকা দ্বারা হিন্দু সমাজ অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং হইতেছে।

কিয়দ্দিবস হইতে আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ মধ্যে আন্দোলন-আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হই-তেছে যে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ স্বীয় সামাজিক উপাদানের অভাব উপলব্ধি করিতে পারি-য়াছেন। সেই জন্যই আত্মপরিচয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই আকাঙ্ক্ষার ফলই আন্দোলন-আলোচনা। আবার সেই আন্দোলন আলোচনার ফলেই "উগ্র-ক্ষত্রিয় বিবরণের" সৃষ্টি।

উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ যখন দীর্ঘনিদ্রার পর গাত্রোত্থান করিয়াছেন এবং জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপরিচয় গ্রহণে ইচ্ছুক হই-য়াছেন এবং সামাজিক উপাদানের অভাব বোধ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃতির বশে বাধ্য হইয়া আন্দোলন-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই আন্দোলন-আলো-চনায় যদি ব্যভিচার ঘটে তবে উন্নতি সুদূর পরাহত হইবে এখন ইহার সদুপায় কি?

বহুদিন হইতেই আমাদের মনে জাতীয় সমাজের উপাদান নির্ণয়ের বাসনার উদয় এবং তৎসঙ্গেই উহার অভাব উপলব্ধি হয়। সেই হেতু একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া নিদ্রিত জাতীয় সমাজকে উদ্বোধিত করণের বাঞ্ছা জন্মে। কিন্তু ক্ষুদ্রের ক্ষীণ চীৎকার সমাজের কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিবে কি না এই সন্দেহ হওয়ায় এবং অর্থের অনাটন বশতঃ মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল। এক্ষণে সময়ের গুণে জাতীয় সমাজ স্বয়ং জাগরিত হইয়াই আত্মপরিচয় গ্রহণে উদ্বিগ্ন এবং অভাব বোধের সহিত অভাব পরিপূরণে—উন্নতিকরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয় আন্দোলন-আলোচনার জন্য জাতীয় সমাজ একখানি মাসিক পত্র প্রকাশের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। সেই জন্য সময় বুঝিয়া আমাদের বহুদিনের বাঞ্ছিত "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" আজ সমাজ সমক্ষে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। ইহাই হইল "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" প্রকাশের প্রয়ো-জনীয়তা, উদ্দেশ্যের কথা পরে বলিতেছি।

উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধির প্রথম এবং প্রধান কার্য্য জাতীয় স্বভাব নির্ণয় অর্থাৎ উগ্রক্ষত্রিয় জাতির প্রকৃত ইতিহাস—ইহার উৎপত্তি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বৃত্তি ইত্যাদি অর্থাৎ যে সকল উপাদানের অস্তিত্বে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ, সেই সকলের প্রকৃত তত্ত্ব সংগ্রহ। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক। আজি কালি আমরা আত্ম-পরিচয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং উদাসীন। কিন্তু পরের পরিচয় গ্রহণে বড়ই উৎসুক এবং তদ্বিষয়ে অনেকাংশে কৃতকার্য্যও বটে। পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের কেশ কণ্ডূয়ণ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই, কিন্তু মিল-মেকলের, শেলী-কীটের ছাপ্পান্ন পুরুষের তালিকা আমাদের রসনাগ্রে বিরাজ করিতেছে। নিজ পল্লির চারিদিকে কোন্ কোন্ গ্রাম জানি না, কিন্তু লণ্ডন-প্যারিস-নিউইয়র্ক নগরের প্রতি গলির খবর জান-পুরুষের ন্যায় জানাইতে পারি। নিজ জাতির আচার-ব্যবহার-উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন তত্ত্বই রাখি না, অথচ ইংরেজ-ফরাসী, চীন-জাপানী দিগের সকল ইতিবৃত্তই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখি-য়াছি। পরিবার ও প্রতিবেশীদিগের সুখ দুঃখের দিকে ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করি না। কিন্তু কামস্কাট্‌কা বা সুদূর আইস্‌ল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ হইলে চক্ষের জলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া ফেলি এবং সর্ব্বাগ্রেই চাঁদার খাতায় সহী করিয়া বসি। নিজের চরিত্র হয়ত পশু অপেক্ষাও অধম, সেদিকে এক বারও লক্ষ্য করি না, অথচ পরের ছিদ্র অন্বেষণে জীবনকে যেন উৎসর্গ করিয়াই রাখিয়াছি। কত বলিব এইরূপ কি ভাল কি মন্দ যে বিষয়েই হউক না কেন আমরা নিজের ভাবনা কিছুই ভাবি না বা ভাবিতে চেষ্টা করি না। এইটীও আমাদের অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। "আমি কে" ইহা যদি আমি না জানি, তবে আমি আত্ম-সম্ভ্রম রক্ষা করিব কেমনে? ইংরেজদের মধ্যে একটা কথা চলিত আছে যে "If you wish to be wise know thyself" অর্থাৎ যদি জ্ঞানী হইতে চাও আত্মপরিচয় গ্রহণে সচেষ্ট হও। আজ হিন্দু সমাজের এত দুর্দ্দশা কেন? অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে অধি-কাংশ হিন্দুই আত্মপরিচয় জ্ঞান বিহীন। আধুনিক হিন্দু নামধারী হিন্দু... ...নিত তাহারা ব্যাস বাল্মীকি, অত্রি অঙ্গিরা, মনু

যাজ্ঞবল্ক্য, জনক বশিষ্ঠের বংশধর, তাহা হইলে তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্ররাজি বিদ্যমান থাকিতে তাহারা ডার্ব্বিন স্পেনসার, মিল মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে বিড়ম্বিত করিবে কেন? তাহারা যদি জানিত সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল-বেদান্ত প্রভৃতি ষড়দর্শন পৃথিবীর, সার সম্পত্তি, তাহা হইলে তাহারা পাশ্চাত্য দর্শন পড়িয়া বাজে জ্ঞান লাভ করতঃ আপনাকে উন্নত মনে করিবে কেন? তাহারা যদি ভাবিত কি ধনৈশ্বর্য্যে, কি জ্ঞান বিজ্ঞানে, কি বুদ্ধি বিদ্যায়, কি দয়া দাক্ষিণ্যে সকল বিষয়েই হিন্দুজাতি জগতের আদর্শ ছিল এবং সেই আদর্শ অনুকরণ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সভ্যপদ বাচ্য হইয়াছে; তাহা হইলে তাহারা আপনাদের অমূল্য আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া, বিজাতির সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে অনুকরণ করিতে যাইবে কেন?—সিংহের সন্তান হইয়া শৃগালের পদলেহন করতঃ চরিতার্থ হইবে কেন? এবং আপনাদিগকে বিজাতীয়ের নিকট সর্ব্ব বিষয়ে অধমাধম বিবেচনা করিবে কেন? তাই বলিতেছিলাম আত্মপরিচয়ে অনভিজ্ঞ হওয়াতেই আমাদের আত্মমর্য্যাদা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে—আর বিজাতীয়ের কাছে পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে।

আমাদের মত এই যে, ভারতের প্রত্যেক জাতি যদি অনধিকার চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব জাতীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহে সচেষ্ট হয় এবং পূর্ব্ব পুরুষের আচরিত আচার ব্যবহারানুসারে চরিত্র গঠনে নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ প্রকৃত অনুষ্ঠান পরায়ণ হয়, তাহা হইলে ভারতের উন্নতির আশা এক দিন করা যাইতে পারে। অনেকে হয়ত বলিবেন আত্মচিন্তায় নিযুক্ত থাকা সংকীর্ণ হৃদয়ের কার্য্য, পরের ভাবনা যে না ভাবে সে আবার মানুষ কিসে? তদুত্তরে আমরা আধুনিক বৈদিক ভাষাতেই বলি "Man take care of thyself, God will take care of the world," অর্থাৎ তুমি নিজের ভাবনা ভাব, ঈশ্বর অপরের ভাবনা ভাবিবেন। সে যাহা হউক আমাদের শক্তি অতি ক্ষুদ্র। নিজের পরিচয় জানিতেই হয়ত ক্ষমতায় কুলাইবে না, তখন পরের পরিচয় জানিবার চর্চ্চা করিব কি করিয়া? তবে নিজের ভাবনা অগ্রে ভাবিয়া যদি সময় পাই আর শক্তিতে কুলায় তখন পরের ভাবনা ভাবিব। এই জন্য সঙ্কল্প করিয়াছি আমরা সাধ্যানুসারে অগ্রে আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহে সচেষ্ট হইব।

অতীত বৃত্তান্ত যেরূপ সন্দেহ, অসত্য ও কিম্বদন্তী জালে জড়িত তাহাতে প্রায় সকল জাতিরই ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সম্বন্ধে কোনই লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না; যাহা কিছু যায় তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করাও কঠিন। তবে কথায় বলে "যত্নেন কিম সাধ্যম্" অর্থাৎ যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই। আমরা যত দূর পারি চেষ্টা, অর্থ, শ্রম বিনিময়ে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহে বদ্ধপরিকর হইব। ধারাবাহিক কোন ইতিহাস সংগৃহীত হইবে বলিয়া সাহস করিতে পারি না। তবে ইহাতে কি কিম্বদন্তীমূলক, কি শাস্ত্রীয়, কি ঐতিহাসিক বিবরণ যিনি যাহা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন এবং আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিব

সে সমস্তই যত্নের সহিত মুদ্রিত হইবে। ফল কথা ভবিষ্যতে যাহাতে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির এক খানি সম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হইতে পারে, "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" তদুপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কার। অর্থাৎ সমাজে যে সকল দোষ প্রবেশ করায় ইহার অবনতি ঘটিয়াছে, সেই সকল দোষ প্রদর্শন এবং তৎসঙ্গে উহার পরিহারার্থ সমাজের কার্য্যকারিণী বৃত্তির উত্তেজনা করন এবং অশাস্ত্রীয় অনৈক্য দূর করিয়া একতা সংসাধন পূর্ব্বক উহাকে পরিপুষ্ট করনের চেষ্টা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটী বড়ই গুরুতর, এমন কি এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও ভয় হয়। কারণ সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছেন সমাজ-সংস্কারের নাম করিলেই তাঁহারা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া লাফাইয়া উঠেন এবং প্রস্তাবকারীর চৌদ্দ পুরুষের পিণ্ডান্ত না করিয়া ছাড়েন না। সমাজের দোষ গুণ যাহা আছে তাহা লইয়াই ইহারা চলিতে চাহেন, ইহারা কোন প্রকার সংস্কারই চাহেন না। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা সংস্কারের কথা শুনিবা মাত্রেই বগল বাজাইতে থাকেন, এবং বর্ত্তমান সমাজে যাহা কিছু আছে তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ধরণে সমাজ সংগঠন করিতে বড়ই লালায়িত হন। বর্ত্তমান সময়ে এই দুই দলের কোলাহলে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ স্থলে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় ক্ষীণ কণ্ঠের কিছু বলিতে যাওয়া ঘোরতর বিড়ম্বনার কার্য্য তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু উপায় কি? আমরা বুঝি আমরা বিদ্বান্ নহি, কিন্তু বিদ্বানের আসন পরিগ্রহ করিয়াছি। আমরা বুঝি আমরা সমাজের প্রতিনিধি নহি, কিন্তু প্রতিনিধির ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। আমরা বুঝি আমরা নিজের হিতই ভাবি না, কিন্তু সমাজ হিতৈষীর গুরুভার স্কন্ধে করিয়া বসিয়াছি। আমাদের গাঁয়ে কেউ মানুক বা নাই মানুক, আমরা বেকুবী করিয়াই হউক আর সাকুবী করিয়াই হউক যখন আপনি মোড়ল সাজিয়াছি, তখন মোড়লের মত দুটা কথাত বলিতে হইবে! তাই আমরা কিরূপ সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী উভয় দলের নিকট তাহার একটা লম্বাচৌড়া কৈফিয়ত দিতেছি।

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে হিন্দুসমাজ কতকগুলি ব্যাধি কর্ত্তৃক বড়ই আক্রান্ত হইয়াছে। আমাদের এমতে যাঁহারা দ্বিমত করেন, তাঁহাদের মত মনুষ্যের মতামত কোন মতেই গ্রাহ্য নহে, যেহেতু তাঁহারা সত্যের অপলাপকারী। বুদ্ধিমান বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাদের কথার সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

যে সকল ব্যাধি হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছে শীঘ্র তাহার প্রতিকার না করিলে সমাজের কোন মতেই মঙ্গল নাই। কারণ ঐ সকল ব্যাধি সমাজ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। বাহিরে কাঠাম খাড়া আছে, কিন্তু ভিতরে অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এমত অবস্থায় উহার চিকিৎসা না করিলে চলে উহার অস্তিত্ব লইয়াই টানাটানি বাধিবে। তার পর কথা হইতেছে সমাজ, সংস্কারের তিক্ত ঔষধ গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না

বলিয়া আমরা না হয় ঔষধির পরিবর্ত্তে সুপথ্য-কুপথ্য দিয়া একরূপ যবস্থব করিয়া রাখিলাম কিন্তু তাহাতে আর চলিতেছে কৈ? যখন বাঙ্গালা টাকা প্রচলিত ছিল তখন আমার ছেলের টাকা দেই বা না দেই সে আমার ইচ্ছাধীন ছিল। কিন্তু ইংরাজী টাকার আমলে ছেলে কাঁন্দিবে বলিলে চলিতেছে কৈ? ছেলে কাঁদুক আর হাসুক টাকা দিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম আর বিনা চিকিৎসায় সমাজকে রাখিতে পারিতেছি না। যদি আমরা স্বয়ং চিকিৎসা না করি, আমাদের রাজা ইংরেজ আমাদের সমাজের চিকিৎসা করিবেন; করিবেন কি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে ফল দাঁড়াইবে কি? না ইংরেজ রাজ ভাল করিতে যাইবেন সমাজ শরীরের দাদ, কিন্তু ঔষধের তীব্রতাগুণে হইয়া বসিবে কুড়ি। তাহার প্রমাণ আমরা যদি অঋতুমতী স্ত্রী সহবাস সম্বন্ধে সাবধান হইতাম তাহা হইলে কি গবর্ণমেণ্ট "সম্মতি আইন" পাশ করিয়া আমাদের পবিত্র গর্ভাধান ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিতেন? না হিন্দু অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল? ইহারই নাম কি দাদ ভাল করিতে কুড়ি করিয়া দেওয়া নহে। তাই বলিতেছিলাম ইংরেজী তীব্র ঔষধ প্রযুক্ত হইবার পূর্ব্বে অগ্রেই আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নচেৎ আমাদের বিড়ম্বনার একশেষ হইবে।

আমাদের মতে যে সকল দোষ সমাজ হইতে অপনীত হইলে সমাজের প্রকৃত হিত সাধিত হয় সেই দিকেই সমাজ সংস্কারক মহাশয়দিগের দৃষ্টি পতিত হওয়া আবশ্যক এবং তাহার আমূল সংশোধন হওয়াও কর্ত্তব্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজ কালকার বিচারজ্ঞান-হীন সংস্কারক মহাশয়েরা সে দিকে হস্তক্ষেপ না করিয়া মনুতে কলম বসাইতে উদ্যত হইয়া হিতে বিপরীত করিয়া তুলিতেছেন। যাহা সহস্র সহস্র বর্ষ হইতে সমাজ কর্ত্তৃক আদরের সহিত প্রতিপালিত হইয়া একরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে গণ্য হইয়াছে যাহা সমাজস্থ প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে, সেই সকল বিধির পরিবর্ত্তন করা সহজ নহে এবং মঙ্গলজনকও নহে। সে বিষয়ে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের অগাধ বুদ্ধি এবং যোগবল লভ্য জ্ঞানের ফল স্বরূপ শাস্ত্রে যে সকল সুনিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, সেই সকল বিষয় বর্জ্জিত বা রূপান্তরিত করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে প্রয়াস পাওয়া শ্রেয়স্কর নহে। মহাজ্ঞানী-পরম কারুণিক-নিরপেক্ষ ঋষিগণ হিংসাবৃত্তি পরিচালিত বা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই। সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল সাধনোদ্দেশেই শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে সুতরাং তাহা পক্ষপাতশূন্য হিত-সাধক ও ভ্রমপ্রমাদ পরিবর্জ্জিত। শাস্ত্রের প্রত্যেক বাক্যের মূলেই তর্ক ও বিজ্ঞান মীমাংসিত যুক্তি, পরীক্ষিত প্রমাণ ও মহান সত্য নিহিত রহিয়াছে। উপযুক্ত জ্ঞানাভাব নিবন্ধন অনেকে শাস্ত্রের গুঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া শাস্ত্রীয় শ্লোকের বিকৃত অর্থ করতঃ উহার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন না, নিজেও ভুল বুঝেন আবার অপর কেও ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করেন। বিকৃত বুদ্ধি অনধিকারী ব্যক্তির বা কতকগুলি ধর্ম্ম-দ্রোহী স্বার্থপরায়ণ পণ্ডিতের নীচ স্বার্থসিদ্ধির

অনুকূল ব্যাখ্যাতেই এবং অপরিণামদর্শী ক্রূর কর্ম্মাদিগের ক্রূর কর্ম্মের ফল স্বরূপ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের দোষেই সময়ে সময়ে শাস্ত্রের প্রতি আমাদের ভক্তির হ্রাস হইয়া যায়। কিন্তু যখন মনে হয় শাস্ত্র নিরপেক্ষ, স্বার্থশূন্য, সমদর্শী, পরম দয়ালু, অলৌকিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন, ত্রিকালজ্ঞ, দেবারাধ্য মুনি ঋষিদিগের বহুকালার্জ্জিত ও বহু কষ্ট লভ্য যোগবল সম্ভূত অসীম জ্ঞানের সুধাময় ফল, তখন শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয় এবং বিকৃত ব্যাখ্যাকারী-দিগের প্রতি অনধিকার চর্চ্চাহেতু ও স্বার্থান্ধ ব্যক্তিবর্গের উপর নীচ স্বার্থবৃত্তি পরিচালনের জন্য বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে।

শাস্ত্রীয় বাক্যের প্রতি আমাদের অবিশ্বাস নাই সেই জন্য মনু প্রমুখ ঋষিদিগের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত নহি। সমাজ মধ্যে যে সকল কুরীতি প্রচলিত হইয়া সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতেছে, যাহার সহিত ধর্ম্মের কিছু মাত্র সংস্রব নাই, যদ্দারা অধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রশ্রয় পাইতেছে, যে সকল কারণে সমাজ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া জীবন্মৃতবৎ হইয়াছে এবং যদ্দারা ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত ও নীতির মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে আমরা সেই সকল ব্যাধির প্রতিকার করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে বলি। তাহা না করিলে হিন্দুসমাজ যে নানা রকমে ছারে খারে যাইবে তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি।

যে সকল কথা বিশাল হিন্দু সমাজের সম্বন্ধে বলা গেল ঠিক ঐ কথাগুলি আমাদের ক্ষুদ্র উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ সম্বন্ধেও খাটে। আমাদের সমাজের মধ্যেও যে কতকগুলি কুরীতি রূপ রোগ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বিজ্ঞ স্বজাতীয় মহোদয়গণ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং রোগ যন্ত্রণা বিশেষতঃ ইংরেজ রাজের তীব্র ঔষধের কথা ভাবিয়া আত্ম-সম্ভ্রম ও প্রাণ উভয়ই রক্ষা করিবার জন্য আমাদের পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হওয়া উচিত। "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" যখন সমাজের সেবক পদে নিযুক্ত হইল তখন সে পরমাত্মীয় বৈদ্যের ন্যায় অতি সতর্কতার সহিত সমাজ শরীরের রোগ নির্ণয় করিবে এবং উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা দান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজ যেরূপ অসংযত হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আমাদের মতে জোর করিয়া কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া সমাজকে সংযত করিতে গেলে বা দুই চারিটা পার্লামেণ্টারি ধরণে বক্তৃতা দিলে কোন ফলই দর্শিবে না। অতি সন্তর্পণে সমাজের দোষ প্রদর্শন করিয়া উহা নিরসনের জন্য পরম বন্ধুর ন্যায় ধীরে ধীরে সদুপদেশ প্রদান করিতে হইবে। তাহা হইলে সমাজ স্বয়ংই চেতন হইয়া সৎপরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হইবেন আমরা এরূপ আশা করিতে পারি। যাহারা আমাদের প্রস্তাবে সন্দিহান হইয়া অধীর হইয়া উঠিবেন তাহাদিগকে আমরা করযোড়ে বলি "Time and Patience change mulberry leaf to satin" অর্থাৎ সময় এবং সহিষ্ণুতার গুণে তুঁত পাতাও সাটীনের আকার ধারণ করে। এইটী যেন তাঁহারা মনে রাখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করেন। "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধির" দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বড়ই গুরুতর। এ বিষয়ে

"উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" বিজ্ঞ সমাজপতিগণের সহায়তা প্রার্থনা করে।

উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য এবং সাধারণ পাঠকবর্গের নিমিত্ত ইহাতে অন্যান্য মাসিক পত্রের ন্যায় রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, জীবন চরিত, কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রীতিমত প্রকাশিত হইবে। পুস্তকাদির সমালোচনা, সাময়িক সংবাদ, পদ্য এবং জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যোদ্দীপক নূতন ও পুরাতন সঙ্গীত ইত্যাদিও প্রতিনিধির কলেবরে স্থান লাভ করিবে। ইহাই ইহার তৃতীয় উদ্দেশ্য।

উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির" মুখপত্র স্বরূপ হইবে। সমাজ সম্বন্ধে সমিতিতে যাহা আলোচিত হইবে প্রতিনিধি সে সকল বিষয় সমাজ মধ্যে প্রচার করিবে; সমিতিকে যদি কেহ আক্রমণ করে প্রতিনিধি তখন সমিতিকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে; সমিতি কুপথে গেলে তাহাকে সৎপরামর্শ দিয়া প্রতিনিধি সুপথে আনিবার চেষ্টা করিবে; সমিতির ভ্রম হইলে প্রতিনিধি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবে। এক কথায় প্রতিনিধি জাতীয় সমিতির উপদেষ্টা ও ভৃত্যের কার্য্য করিবে। ইহাই প্রতিনিধির চতুর্থ উদ্দেশ্য।

"উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের অযথা মতে পরিচালিত হইয়া সংবাদপত্র কুলে কালী প্রদান করিবে না। প্রতিনিধির স্বপক্ষে বিপক্ষে যে কোন ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত বাদ প্রতিবাদ আসিবে প্রতিনিধি স্বীয় কলেবরে তাহাদের স্থান দিয়া উদারতা দেখাইতে ত্রুটি করিবে না। উগ্রক্ষত্রিয় মাত্রেরই স্বার্থরক্ষা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে।

"উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইল। এক্ষণে মাননীয় স্বজাতীয়বর্গ সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া ইহার লালন পালনের ভার লইলে আমরা আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব। "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" সাহিত্য উদ্যানে পরিবর্দ্ধিত হওতঃ কালে ফলশালী বৃক্ষ স্বরূপ হইয়া সাধারণের সম্পত্তি হইবে। সকলই ইহার ফলভোগ করিবার অধিকারী; আমরা ইহার মালিমাত্র। ইহার মূলে জল সিঞ্চন ও সার প্রদান, ইহার পরিপাটী করন এবং ইহাকে আপৎ বিপদ হইতে রক্ষা করাই আমাদের কার্য্য। আমাদের যত্নগুণে রক্ষিত হইয়া ইহাতে যে ফল ফলিবে আমরা তাহা মস্তকে করিয়া প্রিয় পাঠক পাঠিকার দ্বারে দ্বারে পঁহুছিয়া দিব। সময়ে যদি ইহার মূলে জল সিঞ্চিত হয়, এবং সতত ইহার গোড়ায় সার দেওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই ইহাতে মধুর ফল ধরিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা যদিও পাকা মালি নহি বটে, কিন্তু যখন বীজবপন করিয়া অনেক পরিশ্রমে উহার অঙ্কুর বাহির করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি, তখন ভরসা করি এই সাহিত্য উদ্যানের অপরাপর সুশিক্ষিত মালির উপদেশ অনুসরণ করিয়া উহাতে সুফল ধরাইতে সক্ষম হইব।

আমাদের অন্তরের বাসনা নিজ ব্যয়ে মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি বৃক্ষকে পরিবর্দ্ধিত করি এবং ইহার ফল স্বজাতীয় পাঠক পাঠিকার দ্বারে দ্বারে মাথায় করিয়া বহন করিয়া দিয়া চরিতার্থ হই। কিন্তু ভগবান আমাদের সেরূপ অবস্থায় রাখেন নাই। আমরা অতি দরিদ্র। আমাদের প্রাণপণে খাটিবার শক্তি আছে কিন্তু মাল-মসলা সংগ্রহের উপযুক্ত অর্থ নাই। আর প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার দ্বারে দ্বারে ফলের ডালি পঁহুছিয়া দিবার যে মজুরীর দরকার সে মজুরী দিতেও আমরা অপারগ। তাই প্রিয় পাঠক পাঠিকাবর্গের চরণে আমাদের বিনীত নিবেদন যাঁহারা ঘরে বসিয়া উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি বৃক্ষের ফলভোগ করিতে বাসনা করেন—জাতীয় সাধারণেরই করা একান্ত কর্ত্তব্য—তাঁহারা যেন এই অঙ্কুর দর্শন মাত্রেই ভিক্ষা স্বরূপ স্ব স্ব মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন। কারণ তাঁহাদেরই অনুগ্রহ নিগ্রহের উপর এই নবাঙ্কুরের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

অসমুদ্রোত্থিত রত্ন।

সদুপদেশ অসমুদ্র সম্ভূত অমূল্য রত্ন। আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রকে সদুপদেশ রত্নের সমুদ্র বিশেষ বলা যাইতে পারে। আমরা সেই শাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়া রত্নোদ্ধার করত এবং অন্যান্য জাতির নীতি ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে জ্ঞান গর্ভ উপদেশাবলী স্বরূপ রত্নরাজি সঙ্কলন করিয়া উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধির গ্রাহকবর্গকে উপহার প্রদান করিব।

১

যেষাং সদ্‌গুরুকর্ণধারভজনং প্রজ্ঞা বহিত্রাগমো-
হভ্যাসশ্চানুগুণো মরুৎ প্রতিদিনং শব্দা
গমাম্ভোহনিধৌ।
পারং যত্নবশাদপাব্য নিতরাং রত্নানি
লভ্যানি তৈ,
র্দূরান্তীরগতৈস্তু দর্শনভিয়া সীদদ্ভিরাপ্যানি
কিং॥

ব্যাখ্যা—সাগর পার হইতে হইলে ভাল কর্ণধার চাই, সুদৃঢ় পোত চাই, অনুকূল বায়ু চাই, নিরন্তর সাগ্রহে অগ্রসর হওয়া চাই—তবে একদিন পারে উপনীত হইয়া অভীষ্ট ধন রত্নাদি লাভ করা যায়। এখন শব্দাগমাম্ভোনিধি অর্থাৎ শাস্ত্রার্ণব পার হইতে হইলে কি কি চাই? প্রথমে সদ্‌গুরুরূপ কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ করা চাই, নচেৎ যদি কর্ণধার অনভিজ্ঞ হন তবে আর পারের আশা নাই। তার পর চাই প্রজ্ঞারূপ তরী। প্রকৃষ্ট জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলে। যেমন সচ্ছিদ্র পোত লইয়া সাগর পার হওয়া যায় না, সেইরূপ সামান্য জ্ঞানে শাস্ত্রাম্বুধি পার হওয়া কখনই সম্ভবে না। তৎপরে প্রতিদিন অভ্যাস চাই—আর সেই অভ্যাসই অনুকূল মরুৎ। তারপর নিরতিশয় যত্ন সহকারে পরপারে গিয়া রত্ন লাভ করিবে। আর যদি সাগরের কূলে যাইয়া অপার জলধি দেখিয়া ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হও তবে আর তুমি কিরূপে পারেই বা যাইবে আর কিরূপেই বা ফললাভ করিবে?

২

আচার্য্যাৎ পাদমাদত্তে,
পাদং সব্রহ্মচারিভিঃ।
কালেন পাদমাদত্তে,
পাদং শিষ্যঃ স্বমেধয়া।

অর্থাৎ—একপাদ গুরুর নিকট হইতে লাভ হয়—গুরু এক পোয়া বিদ্যার অধিক দিতে পারেন না। একপাদ সমপাঠীদের

কাছে লাভ হয়। তাহাদের কাছে অভ্যাসনীয় বিষয়ের চর্চ্চা হইলে এক পোয়া লাভ হয়। তার পর এক পোয়া লাভ হয়, কালেতে অর্থাৎ প্রবীণ হইয়া অধ্যাপনাদি করিলে হয়। ইংরাজিতে প্রবাদ আছে If you want to learn a subject, set to work to teach it অর্থাৎ কোন বিষয় যদি শিখিবার বাসনা থাকে তবে অন্যকে তাহা শিখাও। আর এক পোয়া বিদ্যা লাভ হয় শিষ্যের নিজের মেধা দ্বারা। শিষ্যের যদি মেধা অর্থাৎ ধারণাবতী বুদ্ধি না থাকে তাহা হইলে তাহার বিদ্যা একপাদ হীন হইবেই হইবে।

৩

অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥

অর্থ—অজ্ঞ লোক অপেক্ষা গ্রন্থাধ্যায়ী শ্রেষ্ঠ, গ্রন্থাধ্যায়ী ব্যক্তি অপেক্ষা ধারণাশীল ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, ধারণাশীল ব্যক্তি অপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি অপেক্ষা ব্যবসায়ী ব্যক্তি অর্থাৎ জ্ঞানানুসারে কার্য্য করেন এরূপ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ।

৪

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

অর্থ—জন্মে শূদ্র, সংস্কারে দ্বিজ, বেদাভ্যাসে বিপ্র আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়।

৫

শূদ্রঃ ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়া জাত মেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে কার্য্যগুণে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে; আর ব্রাহ্মণ কর্ম্মদোষে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে।

শ্রীনৃসিংহ মুরারি পাঁজা।

উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ ও সম্মতি আইন।

বড়ই সুসময়ে উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি প্রকাশিত হইতে চলিয়াছে। স্বজাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধির উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রতিনিধির ব্রত বড়ই গুরুতর। ভগবান প্রতিনিধির উদ্দেশ্য সফল করুন।

আজ কাল উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত হইতেছেন, সুতরাং সমাজেরও হিত কামনা করিতেছেন। আজ ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে সমাজের এ অবস্থা ছিল না। লেখা পড়ার চর্চ্চা তখন খুব কমই ছিল। সে দিন হইলে "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" সমাজে স্থান পাইত কিনা সন্দেহ। এখন "প্রতিনিধির" মত পত্রিকার জন্ম হইবার সুসময় হইয়াছে এবং "প্রতিনিধি" প্রকৃত প্রতিনিধির কাজ করিতে পারিলে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের যে সমূহ কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ কর্ত্তৃক উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধির আদর সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

সংবাদ ও সমায়িক পত্র লোক শিক্ষার পক্ষে সমাস্ত উপায় নহে। কি সাহিত্য কি বিজ্ঞান, কি নীতি কি সমাজ, কি কৃষি কি শিল্প, কি শিক্ষা কি ব্যবসায় সর্ব্ব প্রকার বিষয়ের সমাবেশ ও আলোচনা যাহাতে থাকে তাহা কি অবহেলা না অনাদরের বিষয়?

এখন আমি "প্রতিনিধির" প্রথম সংখ্যাতেই একটি গুরুতর বিষয়ের সংবাদ প্রচার করিতে মানস করিতেছি। "প্রতিনিধি"-এ সংবাদ বহন করিলে সহজেই সমাজ মধ্যে উহা প্রচারিত হইবে। সংবাদ অপর কিছু নহে কেবল সম্মতি দানের বয়স বিষয়ক যে আইন খানি সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেই আইনের খবর মাত্র।

গত ৬ই চৈত্র তারিখে বড় লাটের সভায় এই আইন পাশ হইয়াছে। সুতরাং ভারতের সকল জাতির, সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের লোকই এ আইনের অধীন।

আইনের মর্ম্ম এই দ্বাদশ বর্ষের ন্যূন-বয়স্কা স্ত্রীতে কেহ উপগত হইলে তাহাকে বলাৎকার অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। আর এ অপরাধের দণ্ড এক দিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস হইতে অন্য দিকে দশ বর্ষব্যাপী কারাবাস পর্য্যন্ত। সঙ্গে অর্থদণ্ডের এবং দ্বিতীয় বার অপরাধে বেত্রাঘাতেরও ব্যবস্থা আছে।

আইন খানি কিছু একেবারে নূতন হইল বা এরূপ কোন আইন পূর্ব্বে ছিল না এমন নহে। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের (অর্থাৎ ১৮৬০ সালের ৪৫ আইনের) ৩৭৫ ধারায় বিধি ছিল যে দশ বর্ষের ন্যূন-বয়স্কা স্ত্রীতে অভিগমন করিলে উক্ত অপরাধ হইত। এক্ষণে দশের পরিবর্ত্তে দ্বাদশ হইয়াছে এই মাত্র।

এই দুই বৎসর বয়োবৃদ্ধির নিয়ম হওয়াতে বা হইবার আশঙ্কাতে দেশ মধ্যে যে কি হুলস্থুল ব্যাপার ঘটিয়াছিল বা আজও ঘটিতেছে তাহা মফস্বলবাসীরা যত না জানেন সহরবাসীরা তাহা বিলক্ষণ জানেন, সে ব্যাপারের সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে এক কথা আমি এই বলিতে পারি যে, আমাদের (উগ্রক্ষত্রিয়) সমাজে গর্ভাধান ক্রিয়া অন্যূন অধুনা ছিল না। যাহা ছিল তাহা "মেয়েলি" রকমের, শাস্ত্রীয় বিধানের কোন অঙ্গই তাহাতে পরিগৃহীত হইত না *। সুতরাং আইনে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে উক্ত ক্রিয়ার ব্যাঘাৎ হইল এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। তবে আমাদের আচার ব্যবহারে ইংরেজ কেন হস্তক্ষেপ করিবেন এ কথা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইতে পারে, কিন্তু সে বিচারেও আজ আমি প্রবৃত্ত হইব না। আমার শুদ্ধ উদ্দেশ্য স্বজাতীয় সকলকে উক্ত আইনের কথা জানাইয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া মাত্র।

আমরা হিন্দু, সুতরাং রাজাকে আমরা দেববৎ ভক্তি করিয়া থাকি। অধিক কি, রাজদর্শন আমাদের পুণ্যজনক কার্য্য, সেই

* যদি কোন স্থানে বা কোন পরিবারে শাস্ত্রানুসারে গর্ভাধান ক্রিয়া অদ্যাপি আচরিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সে সংবাদ যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন বড়ই অনুগৃহীত হইব।

রাজাদেশ পালন করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য, এখন এই আইন মত কাজ করা সকলেরই উচিত।

আমাদের সমাজের যে সকল ব্যক্তি বার বৎসর অতীত না হইলে কন্যার বিবাহ ইচ্ছাপূর্ব্বক দিবেন না অথবা নানা কারণে তাহা দিয়া উঠিতে পারিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে আইন লঙ্ঘনের কোন ভয়ই থাকিবে না। তাঁহারা আইনের কোন ধারই ধারিবেন না।

আইনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাল্য বিবাহ উঠে নাই, একথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই সত্য, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিদের নাকি এ ধারণা কোন কোন লোক করাইয়া দিয়াছেন তাই একথাটা তুলিলাম মাত্র। যাঁহার যে বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে বাসনা হইবে তিনি সেই বয়সেই কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন—সে পক্ষে আইন কোন ব্যাঘাৎ ঘটাইবে না। কিন্তু এই শ্রেণীভুক্ত লোকেদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ তাঁহাদের রমণীগণকে সর্ব্বদাই বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। নচেৎ একটু শৈথিল্য হইলেই মহা বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের কর্ত্তব্য বধূর দ্বিরাগমন কাল যথাসময়ে অবধারিত করেন। আর অন্য দিকে যদি বা কোন ব্যপদেশে জামাতাকে অকালে আহ্বান করিতে হয় তাহা হইলে যেন এখনকার মত স্ত্রীসহবাস না ঘটিয়া উঠে, সেই দিকে বিশেষতঃ বাটীর গৃহিণীদিগকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সব সতর্কতা লইলে কোন পক্ষেরই কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এজন্য আমার একান্ত অনুরোধ যে আমাদের সমাজপতিরা এখন হইতে এসব বিষয়ে একটা সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেন অথবা "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি" একবার এ সময় সজাগ হইয়া এ বিষয়ের বিহিত ব্যবস্থা করেন।

জনৈক স্বসমাজ হিতৈষী
উগ্রক্ষত্রিয়।

তড়িৎ।

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লেখা যে অতি দুরূহ ব্যাপার তাহা সকলেই স্বীকার করেন। প্রাচীনকালে আমাদিগের দেশে বিজ্ঞান বিষয়ে কতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ এখন আমরা পাই না। কেবল মাত্র এই জানিতে পারা যায় যে জ্যোতিষ বিদ্যায় পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ অসাধারণ ছিলেন কিন্তু পদার্থবিদ্যা (Physical Science) বিষয়ে কোন আলোচনা ছিল কিনা তাহাও আমরা অবগত নহি। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান বিষয়ে কোন প্রবন্ধ লিখিতে গেলে প্রধান বিপদ শব্দের অভাব। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে এখন আমরা অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত হইতেছি কিন্তু যে সকল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আমাদের আয়ত্ব হইয়াছে সে সমুদয় বিদেশী ভাষায় লিখিত। বঙ্গ ভাষায় সেই সকল তত্ত্বের অতি সামান্য অংশও প্রকাশ করিতে গেলে শব্দের অভাবজনিত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যে সকল কথা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সমুদয়ের প্রতি পংক্তিতে আছে, তাহাদেরও বাঙ্গালা অনুবাদ পাওয়া যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে এই অভাব অপেক্ষাকৃত গুরুতর ছিল। কিন্তু কতিপয় শিক্ষিত লোকের যত্নে সে অভাব অতি সামান্য পরিমাণেই মোচন হইয়াছে। সুতরাং এই প্রবন্ধে শব্দের অভাব প্রযুক্ত দোষ অনিবার্য্য। সেই জন্য স্থানে স্থানে বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করা হইল। যে সকল বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালা শব্দ আমরা অবগত নহি, পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে (এমন শব্দ) যদি কেহ অবগত থাকেন আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা জগৎ শাসিত ও চালিত হইতেছে এবং ইহার অতি মহৎ ও গুরুতর কার্য্য হইতে অতি সামান্য কার্য্য পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে তড়িৎ একটী মহতী শক্তি। এই মহতী তড়িৎশক্তি যে সেই সর্ব্বশক্তির আকর আদ্যাশক্তিরই এক অংশ তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি এই সকল আংশিক শক্তির প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া সেই পরমারাধ্যা আদ্যাশক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শী। আমরা অদ্য সেই মহাশক্তির এক সামান্য অংশ যে তড়িৎশক্তি তাহার বিষয়ে মনুষ্যের জ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহারই আলোচনা করিব।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা তড়িৎ বিষয়ে বিদ্যুৎ বা বজ্রপাত এই প্রাকৃতিক কার্য্যটীর বিষয় জানিতেন তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তাঁহারা বজ্রকে ইন্দ্রের অকাট্য অস্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক যদি ইন্দ্রকে মেঘের রাজা বলা যায় তবে বজ্রকে তাহার অকাট্য অস্ত্র বলাই সঙ্গত, কারণ বজ্রের যে মহাশক্তির পরিচয় তাঁহারা পাইয়াছিলেন ও আমরা পাইতেছি তাহা যে অকাট্য ও অনিবার্য্য তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত তাঁহারা তড়িৎ বিষয়ে যে আর কি জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

খৃষ্টের জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক দেশীয় পণ্ডিত থেলস্ প্রথম আবিষ্কার করেন যে অ্যাম্বর নামক পদার্থের সহিত রেশমী বস্ত্রের সংঘর্ষণ করিলে উক্ত অ্যাম্বর অতি হাল্‌কা দ্রব্য সকলকে আকর্ষণ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়। ইংরেজিতে তড়িৎকে Electricity বলে। এই শব্দটীও গ্রীক দেশীয় শব্দ Electron হইতে উৎপন্ন। ইহার প্রায় ৬ শতাব্দী পরে রোম দেশীয় প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত প্লিনী লিখেন যে "যখন অঙ্গুলির ঘর্ষণ দ্বারা তাপ উৎপন্ন হয় তখন সেই অঙ্গুলি পূর্ব্বোল্লিখিত আকর্ষণী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

ইহা ব্যতীত প্রাচীনকালে ইউরোপে তড়িৎ সম্বন্ধে অন্য কোন জ্ঞান ছিল না। তৎপরে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের চিকিৎসক ডাক্তার গিলবার্ট আবিষ্কার করেন যে ঘর্ষণ দ্বারা আকর্ষণী শক্তি লাভ করার ক্ষমতা যে কেবল অ্যাম্বর নামক পদার্থেই নিবদ্ধ এমত নহে, কাঁচ, গন্ধকগালা প্রভৃতি অন্যান্য কতিপয় দ্রব্যেরও অধিক বা অল্প পরিমাণে এই ক্ষমতা আছে। এই আবিষ্কার হইতেই তড়িৎ বিজ্ঞানের উৎপত্তি। প্রথমতঃ ইহার উন্নতি অতি অল্প অল্প পরি-

মাণে হইতে থাকে। সমস্ত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে তড়িৎ বিজ্ঞানের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিজ্ঞানের উন্নতির প্রথম সূত্রপাত হয়। প্রথমতঃ সংঘর্ষণ জনিত তড়িৎ লইয়াই আলোচনা হয় এবং সেই মতের উপর নির্ভর করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রামসডেন, উইন্‌কলার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ তড়িৎ উৎপাদনকারী নানা প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এবং ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগে হোলটস্ আর্মষ্ট্রং প্রভৃতি পণ্ডিতগণও নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কার করেন কিন্তু তখনও তাঁহারা উন্নতির প্রধান সোপানে পদ স্থাপন করিতে পারেন নাই। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রফেসর গালভিনি এক আশ্চর্য্য আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারই তড়িৎ বিজ্ঞানের উন্নতির মূল বলিতে হইবে। এই আবিষ্কারই বৈজ্ঞানিকদিগের মনে এক অপূর্ব্ব উৎসাহের উদ্রেক করিয়া দেয়। এবং ইহা হইতেই তাঁহারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যথার্থ সত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন এবং তড়িৎ সম্বন্ধে নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া ইহা দ্বারা মনুষ্যের অশেষবিধ উপকার সাধন করেন। একদিকে যেমন এই আবিষ্কার হইতে তড়িতের অদ্ভুত শক্তি সকল ক্রমশ প্রকাশিত হইয়াছে আবার অপরদিকে এই আবিষ্কারের ইতিহাসও অতি আমোদপ্রদ। কথিত আছে যে একদিন একটী ঘরের বারান্দায় লৌহ নির্ম্মিত রেলিংএর সঙ্গে একটী তাম্র নির্ম্মিত হুকের গায়ে একটী মৃত ভেক ঝুলিতেছিল। এমন সময়ে গ্যালভিনি সেই খানে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি দেখিলেন যে যখনই ঐ মৃত ভেকটী লৌহনির্ম্মিত রেলিং স্পর্শ করিতেছে তখনই ভেকটী সজোরে জীবিত ভেকের ন্যায় নড়িতেছে। এই কার্য্য দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, মৃত ভেকটী বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রভাবে নড়িতেছে এবং পরে তিনি সেই মত প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মতে সংঘর্ষণই তড়িতের মূল কারণ। কিন্তু এই সময়ে ভল্টা নামক অন্য একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অবিষ্কার করেন যে রাসায়নিক কার্য্যই তড়িতের উৎপত্তির কারণ। সুতরাং দুই দলে বিষম তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল এবং ইহা দ্বারা তড়িৎ বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিল। একদিকে যেমন ইউরোপে এইরূপ তড়িতের যথার্থ প্রকৃতি নিরূপণের জন্য ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল, তড়িৎ উৎপত্তির নানারূপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে লাগিল অপর দিকে আমেরিকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফ্রাঙ্কলিন তড়িতের মধ্যে ও মেঘের বিদ্যুতের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহাই নিরূপণ করিতে তাঁহার অসাধারণ মানসিক শক্তিকে পরিচালন করিতে লাগিলেন। তিনি বিদ্যুতের ও তড়িতের অনেক সাদৃশ্য প্রমাণ করিবার পর মনে করিলেন যে, যন্ত্র হইতে উৎপন্ন তড়িতের দ্বারা আমরা যে কার্য্য করিতে পারি, মেঘ হইতে উৎপন্ন তড়িতের দ্বারা যদি সেই কার্য্য সম্পাদন হয়, তবে অবশ্যই তাহারা এক পদার্থ হইবে। যন্ত্রোৎপন্ন তড়িৎ হইতে আমরা এই এক কার্য্য দেখিতে পাই যে যখন তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া যন্ত্রের স্থান বিশেষে একত্রীকৃত হয় তখন সেই স্থানে অঙ্গুলি লইয়া গেলে তাহাহইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটী শব্দ হয় (এ সকল কার্য্য আমরা পরে বিস্তারিত

লিখিব)। যদি এইরূপ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ মেঘ হইতে পাওয়া যায় তাহা হইলেই জানা গেল যে তড়িৎ ও বিদ্যুৎ একই পদার্থ। এই মনে করিয়া ফ্রাঙ্কলিন লৌহ নির্ম্মিত অগ্রভাগ বিশিষ্ট এক খানি ঘুড়ী শূন্যে উড্ডীন করিলেন এবং সূতার এক প্রান্তে একটী বাক্সের লৌহ নির্ম্মিত চাবি সংযুক্ত করিয়া রাখিলেন। ঘুড়ী খানি মেঘের মধ্যে উড়িতে লাগিল এবং তিনি অপর প্রান্ত সংলগ্ন সেই চাবিটীর নিকট নিজের অঙ্গুলি রাখিলেন। কিছু কাল এই রূপে থাকিয়া তিনি কোন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ না পাইয়া হতাশ হইয়া উক্ত পরীক্ষা (Experiment) পরিত্যাগ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে জগদীশ্বরের কৃপায় বৃষ্টি হইয়া সেই ঘুড়ী সংলগ্ন সূতা ভিজিয়া গেল আর অমনি নিম্ন প্রান্তস্থ চাবী হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। এই পরীক্ষার পর হইতে বিদ্যুৎ ও তড়িৎ যে একই পদার্থ তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। ফ্রাঙ্কলিন এই পরীক্ষায় (Experiment) কৃতকার্য্য হইয়া যে কি আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত। তিনি নিজের পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে "এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া আমার এত আনন্দ হইয়াছিল যে আমি কিছুতেই আমার আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই"। এই রূপে তড়িৎ ও বিদ্যুৎ একই পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এবং এই জন্য আমরা Electricity শব্দকে বিদ্যুৎ বলিয়া অনুবাদ করিতে সাহসী হইয়াছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতদিগের এই বহু আয়াস অর্জ্জিত ও যত্ন সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার তাঁহাদের উনবিংশ শতাব্দির অতি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীগণের হস্তে পতিত হইল এবং উত্তরাধিকারীগণেরা তাঁহাদিগের অসাধারণ অধ্যবসায় ও অলৌকিক বুদ্ধি নৈপুণ্য প্রভাবে তাঁহাদিগের হস্তগত ধন রাশির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তাহার চতুর্গুণ বৃদ্ধি সাধন করিলেন। এই উনবিংশ শতাব্দিতে ফ্যারেডে (Faraday) প্রমুখ পরীক্ষাবিদ্যা বিশারদ (Experimentalists) পণ্ডিতগণ স্বীয় অধ্যবসায় ও অসাধারণ মানসিক শক্তি প্রভাবে নূতন সত্য আবিষ্কার করিতে লাগিলেন এবং ম্যাক্সওয়েল (Maxwell) ও সর্ উইলিয়ম (Sir William Thomson) প্রভৃতি বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্র-নিপুণ পণ্ডিতেরা সেই সকল সত্যের নূতন নূতন শক্তি প্রকাশ করিয়া আবিষ্কৃত সত্যের সূক্ষ্মতা পদে পদে প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ এই উনবিংশ শতাব্দীতে তড়িৎবিজ্ঞানের যে অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে তাহার বিষয় ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয় এবং এই আবিষ্কারকদিগের অমানুষিক শক্তি দেখিলে তাহাদিগকে সাধারণ মনুষ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায় না। যে তড়িৎ এক সময়ে কেবল মেঘে নিবদ্ধ ছিল তাহা এখন প্রত্যেক পরমাণুতে দেখা যাইতেছে। এবং তাহা এখন আকাশমার্গ হইতে অবতারিত হইয়া মানবের অশেষবিধ উপকার সাধন ও এমন কি ভৃত্যের কার্য্য পর্য্যন্তও সম্পন্ন করিতেছে। এই অসাধারণ উন্নতি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে সময়ে তড়িৎ এমন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে যাহা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপ মনুষ্যের আয়ত্বের বহির্ভূত। সংক্ষেপতঃ তড়িতের ইতিবৃত্ত এই পর্য্যন্ত শেষ করা হইল। এখন ইহার

কার্য্য, প্রকৃতি, গুণ প্রভৃতির বিষয় কিছু আলোচনা করা যাউক। তড়িৎ বিজ্ঞানের ইতিহাস অপেক্ষা তড়িৎ বিজ্ঞানটাই অধিকতর জ্ঞাতব্য তজ্জন্য ইতিহাস সম্বন্ধে এই দুই চারিটী কথা লিখিয়াই ক্ষান্ত হওয়া গেল।

তড়িতের অসাধারণ ক্ষমতা এক্ষণে বিজ্ঞান বলে আবিষ্কৃত হইয়া মনুষ্যের অশেষবিধ উপকার করিতেছে। এবং ইহার কার্য্য যে অতি বিস্তৃত এমন কি যে সমস্ত স্বাভাবিক রাসায়নিক ক্রিয়া সর্ব্বদা চলিতেছে, সে সমুদয়ের মধ্যেও ইহার কার্য্য হইতেছে তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল জ্ঞান কতিপয় পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সাধারণ লোক বা শুদ্ধ দেশীয় ভাষায় পণ্ডিত লোকদিগের পক্ষে তড়িৎ অদ্যাপিও মেঘেই আবদ্ধ আছে। তাঁহারা অদ্যাপিও তড়িৎ বলিলে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে যে অগ্নিরেখা দেখিতে ও মেঘ গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায় তাহাই বুঝেন। তারের সংবাদ যে তড়িৎ প্রভাবে হয় তাহা অধিকাংশ লোক বুঝে না। ইংরাজীতে যাহাকে Electricity বলে তাহা যে মেঘের বিদ্যুৎ ইহাও অতি অল্প লোকে জানে। তবে বিদ্যুৎ বা বজ্রপাত বলিয়া যে প্রাকৃতিক কার্য্য সর্ব্বদা ঘটে তাহা সকলেই দেখিয়াছে। সুতরাং তড়িৎ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে প্রথমতঃ এই সর্ব্বজনবিদিত প্রাকৃতিক ব্যাপারে তড়িতের কার্য্য বর্ণনা করাই প্রশস্ত। কিন্তু এই প্রাকৃতিক ব্যাপার বর্ণনা করিতে গেলে ও তাহা বুঝাইতে হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত ঘর্ষণোৎপন্ন তড়িৎ (Frictional Electricity) সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে গালা, কাঁচ প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য যখন পশমী বা রেসমী কাপড়ের সহিত ঘর্ষণ করা যায় তখন তাহারা অতি লঘু দ্রব্যগুলিকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। অতি সহজ পরীক্ষা দ্বারা ইহা অতি সুন্দর রূপে দর্শান যাইতে পারে। যথা, একখণ্ড অতি ক্ষুদ্র কর্ক (কাষ্ঠ বিশেষ) যদি সূত্র দ্বারা ঝুলান যায় এবং একটী একখণ্ড উষ্ণ কাঁচদণ্ড রেশমের সহিত ঘর্ষিত করিয়া উক্ত কর্কখণ্ডের নিকট লইয়া যাওয়া যায়, তবে ঐ কর্কখণ্ড উক্ত কাঁদদণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ কাঁচদণ্ডের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া পরে বিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ইহার পর যদি ঐ কাঁচদণ্ড পুনরায় ঐ কর্কখণ্ডের নিকটে লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে উহা কাঁচদণ্ড হইতে দূরে বিকৃষ্ট হইবে। কিন্তু যদি একখণ্ড গালা পশমী কাপড়ে (যথা ফ্লানেল) ঘর্ষিত করা যায় এবং উহা পূর্ব্বোক্ত কর্কখণ্ডের নিকট লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ কর্কখণ্ড গালাদণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে দুই স্থলেই তড়িৎ উৎপাদিত হইয়াছে, কিন্তু এই দুই তড়িৎ এক নহে। কারণ একই দ্রব্যের এই দুই (আকর্ষণী ও বিকর্ষণী) বিপরীত শক্তি থাকা অসম্ভব। অতএব তড়িৎ দুই প্রকার। এই দুই প্রকার তড়িতের নানাবিধ নাম দেওয়া হইয়াছে। যথা, কাঁচজ ও লাক্ষাজ, পর অপর ইত্যাদি। আমরা প্রথম বিধকে প্রধান তড়িৎ (Positive Electricity) এবং দ্বিতীয় বিধকে অপ্রধান তড়িৎ (Negative Electricity) কহিব। এক্ষণে দেখা যাউক এই দুইবিধ তড়িতের পরস্পরের প্রতি কি প্রকার সম্বন্ধ। যদি একখণ্ড কাঁচদণ্ড রেশমী কাপড়ের সহিত সংঘর্ষণের পর সূত্র দ্বারা

ঝুলান যায়, এবং তৎপরে উপরি উক্ত রূপে ঘর্ষিত আর একখণ্ড কাঁচদণ্ড যদি তাহার নিকট লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করিবে, কিন্তু যদি এক খণ্ড গালা ফ্লানেলের সহিত ঘর্ষিত করিয়া ঐ লম্বমান (Hanging) কাঁচদণ্ডের নিকট লইয়া যাওয়া যায় তবে তাহারা পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে। এই অতি সহজ ও সামান্য পরীক্ষা হইতেই নিরূপিত হইতেছে যে, প্রধান তড়িৎ প্রধান তড়িৎকে বিকর্ষণ করে কিন্তু অপ্রধান তড়িৎকে আকর্ষণ করে। যদি একখণ্ড গালা ফ্লানেলের সহিত সংঘর্ষণের পর সূত্র দ্বারা ঝুলান এবং ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত কাঁচদণ্ড ও গালাদণ্ড ইহার নিকট লইয়া যাওয়া যায় তবে প্রথমে আকর্ষণ পরে বিকর্ষণ দৃষ্ট হয়। অতএব অপ্রধান তড়িৎ প্রধানকে আকর্ষণ ও অপ্রধানকে বিকর্ষণ করে। ইহা হইতে এই সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে সদৃশ তড়িৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ ও অসদৃশ তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

কাঁচ ও গালা প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যের এক অংশে তড়িৎ সঞ্চার হইলে তাহা অপর অংশে পরিচালিত হয় না, এইজন্য ইহাদিগকে অপরিচালক (Non-conductor) বলে এবং ধাতু প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যের এই পরিচালিকাশক্তি আছে বলিয়া তাহাদিগকে পরিচালক বলে। এই সকল দ্রব্যের এক অংশে তড়িৎ সঞ্চার হইবামাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

এ পর্য্যন্ত তড়িতের যথার্থ প্রকৃতি কি সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। বাস্তবিক তড়িতের যথার্থ প্রকৃতি অদ্যাপিও নিরূপিত হয় নাই। এ বিষয়ে অনেক প্রকার মত বাহির হইয়াছে, সে সব বিষয় পরে আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণকার মত একটী মত সম্বন্ধে কিছু লিখিলেই আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। সে মতটী এই ;—সমস্ত পদার্থেই পূর্ব্বোল্লিখিত দুই প্রকার তড়িত সমপরিমাণে বিদ্যমান আছে এবং এই দুই তড়িত বিপরীত গুণসম্পন্ন হওয়ায় একের গুণ অন্যে নষ্ট করে। সুতরাং সচরাচর আমরা কোন দ্রব্যে তড়িতের কার্য্য দেখিতে পাই না। কিন্তু যদি পূর্ব্বোল্লিখিত সংঘর্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারা তড়িৎ উৎপাদিত করিয়া অপর কোন একটী পরিচালক দ্রব্য তাহার নিকট লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে উক্ত তড়িত ঐ দ্রব্যস্থ অসদৃশ তড়িৎকে আকর্ষণ করে এবং সদৃশ তড়িৎকে বিকর্ষণ করে। তখন এই দ্রব্যে উভয়বিধ তড়িতেরই সঞ্চার দেখা যায়। এক্ষণে যদি ঐ দ্রব্য কোন পরিচালক দ্বারা পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সদৃশ তড়িৎ পূর্ব্বোল্লিখিত তড়িৎ দ্বারা বিকৃষ্ট হইয়া পরিচালকের শক্তির গুণে পৃথিবীতে নীত হয় এবং অসদৃশ তড়িত আকৃষ্ট হইয়া ঐ দ্রব্যেতেই অবস্থান করে। এইরূপে ঐ দ্রব্যে ক্রমশঃ অসদৃশ তড়িত সঞ্চিত হয় এবং তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমে এই আকর্ষণ এত প্রবল হইয়া উঠে যে তড়িতদ্বয় বায়ুর প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া পরস্পর মিলিত হয়। যখনই এইরূপে পরস্পরের সম্মিলন কার্য্য সম্পন্ন হয় তখনই একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং একটী শব্দ শুনা যায়। কিন্তু যদি ঐ দ্রব্যটি সূক্ষ্ম অগ্রবিশিষ্ট (Pointed) হয় তাহা হইলে

ইহাতে অসদৃশ তড়িত সঞ্চারিত হইয়া সঞ্চিত হইতে পারে না ; সঞ্চারিত হইবামাত্র পূর্ব্বোল্লিখিত যন্ত্র উৎপাদিত তড়িতের সহিত মিলিত হয় এবং তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট বা শব্দ শ্রুত হয় না। যদি অন্ধকার গৃহে এই কার্য্য সম্পন্ন হয় তবে একটি আলোক মাত্র দৃষ্ট হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সূক্ষ্ম অগ্রবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা তড়িতের আকস্মিক ও সবেগ সম্মিলন নিবারিত হইয়া ক্রমশঃ মিলন সম্পাদিত হয়। যখন এই দুইবিধ প্রণালীর কোন একটি দ্বারা তড়িতের মিলন সাধিত হয়, তখনই যন্ত্রেরও ঐ তড়িৎ কিয়ৎ পরিমাণে তিরোহিত হইয়া যায়। যদি প্রথমোক্ত প্রণালীতে মিলন হয় তবে একটী কি দুইটী স্ফুলিঙ্গ উৎপাদিত হইবার পরই ঐ দ্রব্যের তড়িৎ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় এবং উহা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এবং যন্ত্রের তড়িৎও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। আর যদি দ্বিতীয় প্রণালীতে মিলন হয় তবে কিছুকাল এই কার্য্য চলিলে পর তড়িতের তিরোভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই উপায়ে সম্পূর্ণ তিরোভাব পাওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ। ঘর্ষণোৎপন্ন তড়িৎ সম্বন্ধে এই কয়েকটী কথা জানিলেই বিদ্যুৎ ও বজ্রের বিষয় বুঝা যাইতে পারে। অতএব এক্ষণে সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ইতিপূর্ব্বেই সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করা হইয়াছে যে বিদ্যুৎ ও তড়িৎ একই পদার্থ। ফ্রাঙ্কলিন কি অদ্ভুত উপায় দ্বারা এই সাদৃশ্য প্রমাণ করিয়াছিলেন তাহাও বলা হইয়াছে। সংঘর্ষণ যন্ত্রোৎপন্ন অতি সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আর সমস্ত নভোমণ্ডল বিস্তৃত অগ্নিরেখা যাহার প্রভাবে নিমেষ মধ্যে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হয়, এবং যাহা সময়ে সময়ে বৃহৎ অট্টালিকা, অত্যুচ্চ বৃক্ষ, সমূহ এবং গগণভেদী পর্ব্বতশৃঙ্গ পর্য্যন্ত বিচূর্ণ ও দগ্ধীভূত করিতে পারে এবং সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অনুগামী সামান্য শব্দ আর কর্ণ বিদারক অতি গম্ভীর মেঘ গর্জ্জন যাহাতে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত ও কম্পিত হইয়া থাকে, ইহারা যে একই পদার্থ ইহা বিশ্বাস করা অতি কঠিন ব্যাপার বটে। কিন্তু বিজ্ঞান প্রভাবে ইহাদের সাদৃশ্য এমন নিশ্চিত রূপে নিরূপিত হইয়াছে যে তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

আকাশের বিদ্যুৎরেখা ও বজ্রনাদের বিষয় সকলেই জানে, কিন্তু এই বিদ্যুৎ রেখার বিভিন্ন প্রকার আকার সকলে অবগত নহে। বিদ্যুৎ প্রধানতঃ চারি প্রকার দৃষ্ট হয়। (১) কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে অতি সূক্ষ্ম অগ্নিরেখা কল্পনাতীত সবেগ গতিতে আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। (২) কখন কখনও দেখা যায় যে সৌদামিনী এই অগ্নিরেখা আকৃতি পরিত্যাগ করিয়া এবং অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট অবয়ব গ্রহণ না করিয়াই সমস্ত গগণমণ্ডল আলোকিত করে। (৩) কখন কখন ইহাও দৃষ্ট হয় যে বিজলী নিজে ভূমণ্ডলের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া কেবল অতি উচ্চ বারিদমালাকে আলোকিত করে। (৪) আবার কখনও সর্ব্বাপেক্ষা এই অতি বিস্ময়কর আকৃতি দেখা যায় যে মণ্ডলাকার অগ্নিরাশি গগণমার্গ হইতে অপেক্ষাকৃত মন্দ গতিতে পৃথিবীতে পতিত হইয়া কখনও বা ঊর্দ্ধে উল্লম্ফন করে, কখনও বা শত সহস্র কামান গর্জ্জনের ন্যায় গভীর শব্দ করিয়া বিস্ফারিত হয়। প্রধানতঃ তড়িতের এই চারি প্রকার আকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপে এই ব্যাপার চতুষ্টয় সংঘটিত হইয়া থাকে। কোথা হইতে এই তড়িৎ উৎপন্ন হয় এবং কেনই বা এই তড়িৎ এই সকল আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করে। এ সব বিষয় চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই মনে হয় যে কোথা হইতে এই তড়িৎ আইসে। এ বিষয়ে অনেক মত প্রকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার কোনটীই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক কারণ বলিয়া বোধ হয় না। সকলেই অবগত আছেন যে পৃথিবী হইতে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সর্ব্বদাই বাষ্প উৎপন্ন হইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইতেছে। কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বলেন যে, এই বাষ্পোদ্গমই মেঘের তড়িতের কারণ। পৃথিবীর অধিকাংশ জলেই লবণ মিশ্রিত আছে, যখন সেই জল হইতে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তখন সেই বাষ্পকণা সকল প্রধান তড়িৎ (Positive Electricity) পূর্ণ হয়। এবং এইরূপে তড়িৎ পূর্ণ হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। যখন এই সকল বাষ্পকণা মিলিত হইয়া মেঘ আকার ধারণ করে তখন তাহার প্রত্যেক কণায় প্রচুর পরিমাণে প্রধান তড়িৎ সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই রূপে প্রধান তড়িৎপূর্ণ মেঘের সৃজন হয়। পৃথিবীর তড়িতের সহিত তুলনা করিতে গেলে এই মেঘের তড়িৎ প্রধান ও পৃথিবীর তড়িৎ অপ্রধান। তজ্জন্য যখন কোয়াসা হয় তখন কোয়াসার জলবিন্দু সকল পৃথিবীর সহিত সংসৃষ্ট হওয়ায় পৃথিবীর অপ্রধান তড়িৎ (Negative Electricity) পূর্ণ হয়। যখন এই কোয়াসা ঊর্দ্ধে উঠিয়া মেঘাকার ধারণ করে তখনও উহাতে পৃথিবী হইতে প্রাপ্ত অপ্রধান তড়িৎ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং কোয়াসা হইতে মেঘ অপ্রধান তড়িৎ পূর্ণ হয়। এইরূপে শূন্যমার্গে প্রধান ও অপ্রধান তড়িৎপূর্ণ মেঘরাশির সঞ্চার হইয়া থাকে।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন যে অতি উচ্চ প্রদেশে তুষারকণা ও জলবিন্দু উভয়ই বর্ত্তমান আছে, এই দুইএর ঘর্ষণে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তুষারকণা-প্রধান তড়িৎবিশিষ্ট জলবিন্দু অপ্রধান তড়িৎপূর্ণ হয়। উৎপত্তির কারণ যাহাই বা হউক ইহা অতি স্পষ্ট কথা যে আকাশে উভয়বিধ (কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই প্রধান) তড়িৎপূর্ণ মেঘরাশি বিহার করিতেছে। যখন এই দুইপ্রকার তড়িৎপূর্ণ মেঘরাশি পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয় তখনই উভয়বিধ তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং উভয়ে সম্মিলিত হইয়া বিদ্যুৎ ও মেঘ গর্জ্জন উৎপন্ন করিয়া থাকে। বিদ্যুৎ উৎপন্ন ও মেঘ গর্জ্জন এক সময়েই ঘটিয়া থাকে কিন্তু আলোক অপেক্ষা শব্দের গতি অনেক মন্দ বলিয়া আমরা বিদ্যুৎরেখা দেখিবার কিছুক্ষণ পরে মেঘ গর্জ্জন শুনিতে পাই। পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্ব্বিধ বিদ্যুতের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার বিদ্যুতের ক্রিয়া উপরি উক্ত প্রণালীতে ঘটিয়া থাকে। ইহাদের কার্য্য আকাশমার্গেই নিবদ্ধ থাকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় না। পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে যে তড়িৎ দ্বয়ের সম্মিলন দুই প্রকারে হইয়া থাকে। যখন এই সম্মিলন ক্রিয়া ক্রমশঃ সম্পন্ন হয় তখন শব্দ ও তীক্ষ্ণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তিরোহিত হইয়া কেবল আলোক মাত্র দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার বিদ্যুৎ এই ক্রমশঃ সম্মিলন সম্ভূত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার বিদ্যুতালোকের সঙ্গে কোন শব্দ শুনা যায় না। কেহ কেহ বলেন

যে এই বিদ্যুতের ক্রিয়া এত উচ্চে ঘটিয়া থাকে যে ইহার শব্দ মনুষ্যের কর্ণকুহর পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বে শূন্যে বিলীন হইয়া যায়।

প্রথম প্রকার বিদ্যুতের কার্য্য পৃথিবী ও মেঘের মধ্যে হইয়া থাকে। এবং এই প্রকার বিদ্যুতেই সময়ে সময়ে পৃথিবীস্থ প্রাণী ও বৃক্ষাদির বিনাশ সাধিত হয়। ইহা অগ্নিরেখার আকার ধারণ করিয়া কখন আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত কখন বা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু ইহার গতি সরল রেখা ক্রমে প্রায়ই সম্পন্ন হয় না, কখন নানারূপ বক্র গতি অবলম্বন করে, কখন বা অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া থাকে। তড়িৎ সম্মিলন নিবন্ধন ঘনীভূত বায়ুর প্রতিবন্ধকই এই বক্র গতির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপে এই প্রথম প্রকারের বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং কি জন্য ইহা দ্বারা সময় সময় অনিষ্ট সংঘটিত হয়। যখন তড়িৎপূর্ণ মেঘ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হয় তখন মেঘের তড়িৎ পৃথিবীস্থ অসদৃশ তড়িৎকে আকর্ষণ এবং সদৃশ তড়িৎকে দূরে বিকর্ষণ করে। যখন এই মেঘস্থ ও পৃথিবীস্থ বিসদৃশ তড়িতের আকর্ষণ প্রবল হইয়া উভয়ের মধ্যস্থ বায়ুরাশির প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া উভয়ে মিলিত হয়, তখনই বিদ্যুল্লেখা ও ভীষণ মেঘগর্জ্জন হইয়া থাকে। এই বিদ্যুল্লেখা ও মেঘ গর্জ্জনকেই চলিত ভাষায় বজ্রপাত বলে। বজ্রপাত বাস্তবিকই কোন দ্রব্যের পতন নহে, কিন্তু দুই তড়িতের পরস্পর সম্মিলন ও তজ্জনিত অগ্নিরেখা ও শব্দ মাত্র। অনেক স্থলেই দেখা যায় উপর হইতে নিম্নদিকে এই বিদ্যুল্লেখা অবতরণ করিতেছে। কিন্তু কখন কখনও ইহাও দেখা গিয়াছে যে পৃথিবী হইতে শূন্যমার্গে বিদ্যুৎ রেখা উঠিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে যখন মেঘের বিদ্যুৎ প্রধান (Positive) ও পৃথিবীর বিদ্যুৎ অপ্রধান (Negative) হয় তখন উপর হইতে সৌদামিনী অবতরণ করেন, কিন্তু যখন ইহার বিপরীত অবস্থা সংঘটন হয় তখনই তাহার গতি অধো হইতে ঊর্দ্ধমুখে হইয়া থাকে। এক্ষণে কিরূপে এই ঘটনা দ্বারা মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীগণের বিনাশ সংসাধিত হয় তাহাই বিবেচ্য! এই বিনাশ কার্য্য দুই প্রণালীতে সম্পন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ যেস্থানে বজ্রপাত হয় সেই স্থানে থাকিলে দ্বিতীয়তঃ তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিলে। যদি কোন প্রাণী যে স্থানে বজ্রপাত হয় সেই স্থানে থাকে তবে তাহার শরীরের ও মেঘের অসদৃশ তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করার পর যখন মিলিত হয় তখন সেই মিলনের ভীষণ বেগে তাহার শরীরগ্রন্থি সকল ভয়ঙ্কর আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং মিলনোৎপন্ন অগ্নিতে তাহার শরীর পুড়িয়া যায়। এই উভয়বিধ কারণে কিন্তু বস্তুতঃ প্রথমোক্ত কারণে তাহার মৃত্যু ঘটে। আর যদি কোন প্রাণী বজ্রপাতের নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকে তবে প্রথমতঃ তাহার শরীরে মেঘস্থ তড়িতের অসদৃশ তড়িৎ সঞ্চিত হয় কিন্তু যখন বজ্রপাত হয় তখন পতন স্থান ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান অকস্মাৎ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং নিকটস্থ প্রাণীও এই আকস্মিক স্বাভাবিক অবস্থা (Neutral state) প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থান্তর প্রাপ্তির সময় শরীর

মধ্যে বিশেষতঃ হৃদয়ের মধ্যভাগে একটী আঘাত অনুভূত হয়। যদি এই আঘাত অতিশয় গুরুতর হয় তবেই মৃত্যু ঘটে তাহা না হইলে কিয়ৎক্ষণ অচেতন হইয়া থাকে পরে পুনরায় জীবিত হয়।

তড়িতের আকর্ষণ বিকর্ষণ উভয় তড়িতের দূরত্ব এবং দ্রব্যের পরিচালিকা শক্তি অনুসারে হইয়া থাকে। যদি দূরত্ব দ্বিগুণিত হয় তবে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ এক চতুর্থাংশ হইবে। দূরত্বের বৃদ্ধি ও হ্রাসের বর্গ অনুসারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে বজ্রপাত কালে যখন মেঘের ও পৃথিবীর তড়িতের মধ্যে আকর্ষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখন উচ্চ বস্তু সকল মেঘের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় উচ্চ বস্তু ও মেঘের তড়িতের আকর্ষণই প্রবলতর হয়, তজ্জন্য অধিকাংশ স্থলেই উচ্চ অট্টালিকা বৃক্ষ অথবা নৌকার মাস্তুলের উপর বজ্রপাত হইয়া থাকে। বৃক্ষে পরিচালিকা শক্তি বিদ্যমান আছে বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বৃক্ষে বজ্রপাত হওয়ারই বেশী সম্ভব। এই জন্য যখন মেঘ গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ দেখা যায় তখন বৃক্ষের নিচে কিছুতেই যাওয়া উচিত নহে। ধাতুর পরিচালিকা শক্তি আছে বলিয়া ধাতুতে অনেক সময় বজ্রপাত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক এই বজ্রপাত জনিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিজ্ঞান কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে বড় বড় অট্টালিকা প্রভৃতির সঙ্গে একটা অতি উচ্চ লৌহদণ্ড লম্বমান থাকে। এই লৌহদণ্ডের অগ্রভাগ অতি সূক্ষ্ম ও উহা সমস্ত অট্টালিকা হইতে অধিক উচ্চে স্থিত এবং উহার নিম্নভাগ ভূগর্ভে নিহিত। অনেকেই হয়ত জানেন যে এই লৌহদণ্ডের দ্বারা অট্টালিকা বজ্রপাত হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু কি উপায়ে উহা অট্টালিকা রক্ষা করে তাহা বোধ হয় সকলে অবগত নহেন।

সংক্ষেপতঃ উহার কার্য্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ উহা মেঘের তড়িতের সহিত পৃথিবীর তড়িতের ক্রমশঃ সম্মিলন দ্বারা বজ্রপাত নিবারণ করে। দ্বিতীয়তঃ যখন বজ্রপাত হয় তখন উহা অট্টালিকার উপর পতিত না হইয়া ঐ লৌহদণ্ডের উপরই পতিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যখন কোন সূক্ষ্ম অগ্র বিশিষ্ট পরিচালক (Conductor) যন্ত্রোৎপন্ন তড়িতের নিকট লইয়া যাওয়া যায়, তখন যদি ঐ পরিচালক পৃথিবীর সহিত অপর পরিচালক দ্বারা সংলগ্ন থাকে, তবে ঐ পরিচালকস্থ অসদৃশ তড়িৎ যন্ত্রস্থ তড়িৎ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইবামাত্র তাহার সহিত মিলিত হয়। এখানেও ঠিক তাহাই ঘটে। উল্লিখিত লৌহদণ্ড সূক্ষ্ম অগ্রবিশিষ্ট হওয়াতে যে মাত্র মেঘের তড়িৎ কর্ত্তৃক পৃথিবীর তড়িৎ আকৃষ্ট হয় অমনি উহা লৌহদণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া মেঘের তড়িতের সহিত মিলিত হইয়া যায়। সুতরাং এই মিলন কার্য্য ক্রমশঃ সম্পন্ন হইয়া মেঘের স্বাভাবিক অবস্থা (Neutral state) উৎপাদন এবং বজ্রপাত নিবারণ করে। এইরূপে উহা পৃথিবীতে বিসদৃশ তড়িৎ সঞ্চয় নিবারণ করে ও মেঘের তড়িৎকে নষ্ট করিয়া ফেলে। আর যখন বজ্রপাত হয় তখন এই লৌহদণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বলিয়া উহাতেই পতিত হয় এবং গৃহ রক্ষা পায়। এ সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক এই যে লৌহদণ্ডের নিম্নভাগ কূপে বা

আর্দ্র ভূমিতে নিহিত হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য পৃথিবীর সহিত সম্পূর্ণ সংস্রব (Connection) না হওয়ায় পৃথিবীর তড়িৎ উর্দ্ধে পরিচালন করিবার শক্তি হ্রাস হয়। অধিকাংশ স্থলেই এই লৌহদণ্ডের অগ্রভাগ ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ তাম্র নির্ম্মিত। কারণ তাম্র লৌহ অপেক্ষা উত্তম পরিচালক। কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ দ্বারাও এই কার্য্য কিয়ৎ পরিমাণে সম্পন্ন হইয়া থাকে অনেকেই বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন যে অনেক গৃহে লৌহ দণ্ডের পরিবর্ত্তে মনসা প্রভৃতি কণ্টকীবৃক্ষ গৃহের সর্ব্বোচ্চ স্থানে রাখা হয়। এই কণ্টক দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত প্রকার মেঘের তড়িৎ নষ্ট (Neutralired) ও পৃথিবীতে তড়িৎ সঞ্চয় নিবারিত হইয়া যায়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে অনন্ত শক্তির শক্তিকণা মাত্র বিদ্যুৎ আকার ধারণ করিয়া মনুষ্যের ভীতি উৎপাদন ও সংহার সাধন করিতে সক্ষম হইতেছে, তাহারই শক্তিকণা আবার মনুষ্য হৃদয়ে বিজ্ঞানশক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কেমন সহজ প্রতিকার বিধান করিতেছে। এই সকল চিন্তা করিয়া দেখিলে সেই বিশ্বপাতার অতুল কৌশলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। কে বলে বিজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোপ হইতেছে, বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহার মহিমা শত সহস্র গুণে প্রকটিত হইতেছে। বিজ্ঞান তাঁহার অশেষ বিধ নূতন নূতন সৃষ্টি কৌশল আবিষ্কার করিয়া তাঁহার মহিমা জগতে ঘোষণা করিতেছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার কার্য্য দর্শন করিবার চক্ষু অতি অল্প লোকেরই আছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত মেঘগর্জ্জন বিষয়ে কিছুই বলি নাই। যখনই আকাশে বিদ্যুল্লেখা দৃষ্ট হয় তখনই মেঘগর্জ্জন শ্রুত হয়। এই মেঘগর্জ্জনের কারণ কি? অনেকেই অবগত আছেন যে বায়ুর আলোড়নই শব্দের প্রধান কারণ। অতি মনোমুগ্ধকর বিহঙ্গ সঙ্গীত হইতে কর্ণবিদারক মেঘগর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত শব্দই বায়ুর আলোড়ন দ্বারা আমাদের কর্ণকুহরে নীত হয়। যখন শূন্য মার্গে দুই অসদৃশ তড়িৎশক্তি সবেগে মিলিত হয় তখনই সন্নিহিত বায়ুরাশি আন্দোলিত হইয়া এই ভীষণ শব্দ উৎপাদন করে। এই শব্দকেই বজ্রনাদ বা মেঘগর্জ্জন বলে।

এ পর্য্যন্ত যে সকল বৈদ্যুতিক নৈসর্গিক ক্রিয়া বর্ণিত হইল তাহা সর্ব্বস্থানেই ঘটিয়া থাকে এবং তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও কতিপয় বৈদ্যুতিক ক্রিয়া স্থান বিশেষে দৃষ্ট হয়। উভয় মেরুর নিকট নাবিকেরা কখন কখন অতি বিচিত্র আকার আলোকচ্ছটা দেখিয়াছে ইহার আকার অতি মনোহর এবং ইহা সমস্ত মেরু-প্রদেশ আলোকিত করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে মেধস্থ প্রধান তড়িৎ ও পৃথিবীস্থ অপ্রধান তড়িতের সম্মিলনে এই অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই ক্রিয়ার প্রকৃত কারণ বিষয়ে আরও অনেক মত প্রকাশিত হইতেছে।

কখন কখন নাবিকগণ জাহাজের মাস্তলের অগ্রভাগে আলোক দেখিতে পায়। অতি প্রাচীনকালে এই আলোক ভবিষ্যৎ মঙ্গল বা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া নিরূপিত হইত। এক্ষণে বিজ্ঞান বলে জানা গিয়াছে যে আকাশের ও পৃথিবীর তড়িৎ সম্মিলনই ইহার কারণ। আকাশের তড়িত পৃথিবীর অসদৃশ তড়িৎকে আকর্ষণ করে এবং উহা পরিচালক দ্বারা মাস্তলের অগ্রভাগে নীত হয় ও মাস্তলের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম বলিয়া ক্রমশঃ মিলিত হইয়া এই আলোক উৎপন্ন করে।

তড়িতের বিষয় অদ্য এই খানেই শেষ করা হইল। অধুনা তড়িৎ বিজ্ঞানের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা অতি সহজ ব্যাপার নহে। কিরূপে তড়িৎ আমাদের শব্দ বাহক হইয়া মনোরথ গতিতে দূর হইতে দূরান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিরূপে তড়িৎ প্রভাবে আমরা দূরস্থ বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে সক্ষম হইতেছি, কিরূপে তড়িৎ দ্বারা অর্থশালী ব্যক্তিদিগের গৃহ হইতে তমোরাজি দূরে বিতাড়িত হইতেছে, কিরূপে তড়িৎ শক্তিতে মনুষ্য নানাবিধ রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে, কিরূপে ইহা দ্বারা বিজ্ঞান ও শিল্পের অশেষবিধ উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহা বিশদ রূপে বর্ণনা করা বহু আয়াসসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ এবং ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়াও অতি দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক আমাদের যতদূর সাধ্য ক্রমান্বয়ে এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া সামান্য সামান্য বিষয়গুলি পাঠকবর্গের গোচর করিতে চেষ্টা করিব। এবারে এই খানেই প্রবন্ধ শেষ হইল।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিশ্বাস।

সৎসঙ্গ।

"কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গা দারোহতি সতাংশিরঃ।
তথা সৎসন্নিধানেন মূর্খযাতি প্রবীণতাম্॥"

পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়া অশেষবিধ সুখে সুখী করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে কতকগুলি প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; তদ্দ্বারা আমরা অশেষবিধ সুখ সম্ভোগে অধিকারী হই। উক্তবিধ প্রবৃত্তি সমূহের মধ্যে আসঙ্গলিপ্সা একটী। সঙ্গ করিবার প্রবৃত্তিকেই আসঙ্গলিপ্সা কহে। আমরা এই ভূমণ্ডলে এরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সৃষ্ট হইয়াছি যে অন্যদীয় সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই সংসারাধিবাসের উপযুক্ত হইতে পারি না। যদি আমাদের আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তিটি না থাকিত, তাহা হইলে এই সংসার এরূপ সুখের স্থান হইত না। নয়নাভিরাম-শ্যামল-বিটপী-পূর্ণ-পরম-স্বাস্থ্যকরী পল্লী, লোচনানন্দকর-সৌধশ্রেণী-বিরাজিতা-সুরথ্যা-সমন্বিতা-সুবিশাল নগরী, প্রিয় পরিজন সমন্বিত সংসারের একমাত্র সুখের আলয় স্বরূপ গৃহস্থাশ্রম, জ্ঞানরাশি-সম্পন্ন সুবুদ্ধি পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধক-মানবজাতীর জীবন স্বরূপ-পরমোপকারী জাতীয় সমাজ ইত্যাদি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না। এই সর্ব্ব সুখের নিদান স্বরূপ বিশ্বসংসার, সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি বন্য পশু কর্ত্তৃক উষিত মহারণ্য রূপে পরিণত হইত।

মানব প্রকৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীনকালে সকলে

সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভাল বাসিত না। ইহার কারণ তাহাদের আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তিটী আদৌ ছিল না অথবা অতি অল্প পরিমাণে ছিল। সেই জন্য তাহারা তৎকালে পশুত্ব বন্ধন চ্ছেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। যতই তাহারা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিয়াছে, ততই তাহারা পশুত্ব বন্ধন চ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়া উন্নতি সোপানে অধিরোহণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

আমরা জন্ম গ্রহণ করতঃ পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পরিবারবর্গের মধ্যে পরম সুখে বাস করিতে থাকি। যদি আমাদের আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তিটী না থাকিত এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ফুরণ না হইত, তাহা হইলে আমরা কার্য্যক্ষম হইবামাত্র প্রিয় পরিজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র যাইয়া বাস করিতে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিতাম না। তাহা হইলে এই সুখের পারিবারিক বসতি কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইত না। আমাদের উক্ত বৃত্তিটী এমনি প্রবল যে, আমরা কেবল এক এক পরিবার এক এক স্থানে বাস করিয়া পরিতুষ্ট হইতে পারি না। অপরাপর প্রতিবেশীমণ্ডলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে সুখানুভব করি। এই বৃত্তিটী সকলের প্রবল থাকায় গ্রাম, নগর ও জাতীয় সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে।

যেমন মহারণ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুক্কুর, মৃগ, মহিষ, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি বিবিধ স্বভাবের বিবিধ জন্তু বাস করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বিশ্বসংসারে বিবিধ চরিত্রের বিবিধ প্রকার লোক বসবাস করিতেছে। এই সর্ব্ব প্রকার লোকের সহিত আমাদের আচার ব্যবহার ঠিক রাখিয়া প্রণয়ের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কদাপি সম্ভবে না। করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে এই বিষম অনর্থ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য দেশভেদে, জাতিভেদে এরূপ ভাবে শ্রেণী নির্বিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমরা এক এক শ্রেণীস্থ লোক এক এক দেশে বাস করিয়া পরমসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। আমরা এক সমাজস্থ থাকিয়া এক দেশে বা এক নগরে অথবা এক গ্রামে যে সমস্ত ভ্রাতৃ বন্ধু বাস করি তাহাদের মধ্যেই সকলে সমান প্রকৃতির লোক নহে। কেহ বা সৎ কেহ বা অসৎ।

এক্ষণে ইহাই বক্তব্য যে সদসৎ নির্ব্বাচন করিয়া অসৎকে দুর্গন্ধ ন্যাকারবৎ পরিত্যাগ এবং সৎকে সুবাস চন্দনের ন্যায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেহ বা বুদ্ধি দোষে অসৎসঙ্গ লাভ করিয়া দুর্লভ মানবজন্মের অপব্যবহার করতঃ পাপ হ্রদে নিমগ্ন হয়; কেহ বা বুদ্ধি গুণে সৎসঙ্গ করিয়া স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করতঃ পবিত্র মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ বুদ্ধির গুণাগুণেই সদসৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সৎ নির্ব্বাচন করা একান্ত বিধেয়। কারণ দোষ গুণ বিচার করিবার পূর্ব্বেই যদি কাহার সঙ্গ লাভ করা যায়, আর যদি ভাগ্য দোষে সে ব্যক্তি প্রকৃত সাধু না হয়, তাহা হইলে চন্দন তরু ভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয়ে যেরূপ ফল ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ অসাধু সঙ্গজনিত দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া এ পবিত্র জীবনে জলাঞ্জলি দিয়া পশুবৎ জীবনযাপন করিতে হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে সৎ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য, পরে তাহার সঙ্গ লাভ বিধেয়।

প্রকৃত সৎ মনুষ্য মিলা ভার; আর যদিও মিলে তাহা নির্ব্বাচন করা আরও কঠিন। যেমন বিবিধ প্রকার মণি মুক্তার মধ্য হইতে প্রকৃত জ্যোতির্ম্ময় মণি চিনিয়া লওয়া সকলের কার্য্য নহে, সেইরূপ সংসারের যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইতে প্রকৃত সাধু বাছিয়া লওয়াও সকলের পক্ষে বড় সহজ নহে। প্রকৃত সাধু ব্যক্তি চিনিয়া লইতে হইলে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক। সৎ নির্ব্বাচন করিতে হইলে সতের লক্ষণ অবগত হওয়া উচিত। সংসারে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যিনি বাহিরে অতিশয় ভদ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর কুটীলতা কালিমায় কলঙ্কিত। এমন লোকের সঙ্গলাভ করিলে যে বিষময় ফলভোগ করিতে হয়, তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব নির্ব্বাস কিংশুকের ন্যায় লোকের বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিয়া ভুলিতে নাই। সর্ব্বাগ্রে লোকের অন্তর পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

প্রকৃত সাধু কাহাকে বলে?

১। যাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দেখিবামাত্র অন্তরে ভক্তির উদয় হয়, যাঁহার মিষ্ট কথা শ্রবণ করিলে শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় এবং শত্রুও যাঁহাকে প্রিয়স্বদ বলিয়া থাকে, তিনিই প্রকৃত সাধু।

২। সৎ লোকে যাঁহাকে প্রশংসা করে, অসৎ লোকে যাঁহাকে নিন্দা করে, যিনি সদ্ব্যয়ে দাতা, অসদ্ব্যয়ে কৃপণ এবং নিত্য ব্যয়ে মিতব্যয়ী, তিনিই প্রকৃত সাধু।

৩। যিনি নিরাকাঙ্ক্ষ, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা যাঁহার সহচর, মান অপমান উভয়ই যাঁহার সমান এবং গাম্ভীর্য্য, বিনয় ও শিষ্টাচার যাঁহার অঙ্গের ভূষণ, তিনিই প্রকৃত সাধু।

৪। পরোপকার যাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত, স্বদেশের হিত সাধনে যিনি সচেষ্ট, বিষম বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যাঁহার রসনা সদুপদেশ প্রদানে অবিরক্ত, যাঁহার আত্ম পর প্রভেদ নাই, তিনিই প্রকৃত সাধু।

৫। যিনি ন্যায়ের দাস, অন্যায়ের চির শত্রু, বিচারে নিরপেক্ষ এবং পরমেশ্বরের সুনিয়মের পক্ষপাতী, তিনিই প্রকৃত সাধু।

৬। যিনি ষড়রিপু জয় করিতে পারিয়াছেন, যিনি পরনিন্দা, আত্মপ্রশংসা, কটুবাক্য প্রয়োগ, অনর্থক অপরের মনে বেদনা প্রদান প্রভৃতি অসৎ কার্য্যে রত নহেন ও আত্মপ্রসাদ যাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য ধন, তিনিই প্রকৃত সাধু।

৭। সত্য যাঁহার পরম ধন, অসত্যে যাঁহার বিষ্ঠা জ্ঞান, উদারতা যাঁহার স্বাভাবিক গুণ, এবং দ্বেষ, হিংসা যাঁহার হৃদয় মন্দিরে স্থান পায় না, তিনিই প্রকৃত সাধু।

৮। যিনি গুরুজনে ভক্তি মান, পরিবারদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান, পুত্রাদিতে স্নেহবান, অনাথে দয়াবান, এবং পিতা মাতাকে দেব জ্ঞান ও ভৃত্যবর্গের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সাধু।

৯। যিনি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, ক্ষুধাতুরকে অন্ন দান করিয়া থাকেন এবং পাপীকে পাপ পথ হইতে ধর্ম্ম পথে আনিবার চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃত সাধু।

১০। যিনি জাতীয় ধর্ম্ম প্রতিপালনে কৃতসঙ্কল্প এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মের মহিমা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করিতে সক্ষম, পরস্ত্রীকে যাঁহার মাতৃসম জ্ঞান, ধর্ম্মই যাঁহার পরম বন্ধু, অধর্ম্মে যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণা, যিনি সৎকার্য্যে উৎসাহ, অসৎ কার্য্যে বাধা প্রদান, বিদ্যা ও চরিত্রের

যথোচিত গৌরব এবং সর্ব্ব জীবে সমান দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং যিনি সংসার জলধির একমাত্র কাণ্ডারী, বিপন্নের বিপদ্বন্ধু, অনাথের নাথ করুণাসিন্ধু ভগবানের চরণ-কমল অহরহ ধ্যান করিয়া ও তাঁহার পরম শুভকর সুনিয়ম সমুদয় পালন করিয়া সন্তোষ রূপ মহামণি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত সাধু।

এরূপ সাধু চরিত্রের লোক জগতে দুর্লভ। এবম্প্রকার সাধুসহবাস ও স্বর্গবাস উভয়ই সমান, কোনই প্রভেদ নাই। তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, সাধুসঙ্গ জীবদ্দশায় ঘটে, স্বর্গবাস পরলোকান্তে হইয়া থাকে। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে এই দুঃখময় মর্ত্ত্য জগতে যদি প্রকৃত সুখপ্রদ কিছু থাকে তবে তাহা "সৎসঙ্গ"। কোন মহাত্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"এই সংসার রূপ বিষবৃক্ষে দুইটী অমৃতময় ফল আছে; একটী কাব্যশাস্ত্রের আলাপ অপরটী সাধুসঙ্গ।" সাধুসঙ্গের গুণ অতি চমৎকার। পরশমণি অপেক্ষাও সাধুর মহিমা অধিক। যেহেতু পরশমণি লৌহকে কাঞ্চন করিতে পারে কিন্তু পরশমণি করিতে পারে না। আর সাধু পাপীকে পুণ্যবান করিতে পারে এবং সাধুও করিতে পারে। যেমন ঘৃণিত কীট পুষ্প সংসর্গে দেব মস্তকে স্থান প্রাপ্ত হয়, যেমন চন্দন কাষ্ঠের সমীপবর্ত্তী অন্যান্য কাষ্ঠও উক্ত চন্দন কাষ্ঠ বিলোড়িত বায়ু সংস্পর্শে চন্দন বৃক্ষের গুণ ধারণ করে, সেই রূপ সৎসঙ্গ গুণে অনেক কদাচারী পাশব প্রকৃতি মূর্খ লোকও সৎপথে আসিয়া থাকে। দুরাচার জগাই মাধাই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

অনেকে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালীকেই "মহৎ" পদবাচ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এক সাধু পুরুষ ব্যতীত কাহাকেও মহৎ বলা যাইতে পারে না। অসৎকে সৎ, মূর্খকে জ্ঞানী, হিংস্রককে দয়ালু, পক্ষপাতীকে, ন্যায়পরায়ণ, অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক, নাস্তিককে আস্তিক এক কথায় পশুকে মানব করিবার ক্ষমতা বা মহিমা যদি কাহার থাকে, তবে তাহা সাধুপুরুষ ব্যতীত আর কাহার নাই। এক মহাত্মা গাইয়াছেন;—

"মহতের আশ্রয় নিলে, প্রাপ্তি মিলে,
আপন বর্ণ ধরায় তারে। মহতের এমনি
সঙ্গ, মাল পতঙ্গ, যদি কুম্‌রে পোকায় ধরে।
করে তারে আপন বরণ, মনের মতন,
না হলে কভু কি ছাড়ে।"

বাস্তবিক মহতের আশ্রয় বা সাধুসঙ্গ ব্যতীত জগতে প্রকৃত সুখের বিষয় আর কি আছে? অগ্নি সংস্পর্শে অঙ্গারের ন্যায় সাধুসহবাসে আত্মার মলিনতা বিনষ্ট হয়।

সৎসঙ্গ অমূল্য ধন। পার্থিব অনিত্য ধনে অহং জ্ঞান জন্মাইয়া মানবকে নরকের পথে লইয়া যায়। এই ধন লাভ করিলে অহঙ্কারী হওয়া দূরে থাকুক পরন্তু বিনয়ী ও নম্র হইতে হয়, উদারতা অঙ্গের ভূষণ হইয়া উঠে এবং মুক্তির পথ অবলম্বনে অধিকারী হওয়া যায়। সৎসঙ্গ লাভ সবাকার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না এবং সৎসঙ্গ জনিত বিমল সুখ উপভোগ করাও সকলের কার্য্য নহে। যিনি বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হইলেই আপনাকে পরম সুখী বোধ করেন, যিনি অসৎ কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া আপনাকে বদান্য ভাবেন, যিনি অধর্ম্ম উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে উপায়ক্ষম বলিয়া পরিচয় দেন, যিনি সতীর সতীত্ব নাশ ও দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়া আপনাকে যশস্বী ও বীর বলিয়া ঘোষণা করেন, বস্তুতঃ যিনি কুপ্রবৃত্তি সমূহের বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে ক্ষণিক সুখের অধিকারী হইতে বাঞ্ছা করিয়া থাকেন—অমৃতমাখা বিষের লাড়ু ভক্ষণ করিবার সাধ করেন, পবিত্র সৎসঙ্গ সুখ উপভোগ করা তাঁহার কার্য্য নহে। যিনি অকিঞ্চিৎকর বিষয় বাসনায় অনাসক্ত থাকিয়া ধর্ম্ম লাভার্থে চরমধন ভগবানের চরণ-কমল ধ্যান করিতে অনুরক্ত এবং পরোপকার, দয়া, বিনয়, ভদ্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত, তিনিই পবিত্র সৎসঙ্গ রূপ অমৃতাস্বাদনের উপযুক্ত পাত্র। সৎসঙ্গ রূপ স্পর্শমণি লাভ করিতে সক্ষম হইলে জগতে এমন কিছু সুখের সামগ্রী নাই যাহা আশা করা যাইতে না পারে।

সৎসঙ্গ লাভের একটী সহজ উপায় এই,—আমরা যদি নিজে সদ্‌গুণে বিভূষিত হইবার চেষ্টা করি তাহা হইলে সংসারের যাবতীয় সাধু ব্যক্তি আমাদের সঙ্গ লাভে ব্যস্ত হইয়া আমাদের সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবে। কারণ মদ্যপান আরম্ভ করিলে সুরাপায়ীবর্গ স্বতঃই তাহার নিকট উপস্থিত হয়, হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে নামামৃত পানার্থী বৈষ্ণবগণ আপনা হইতেই তথায় উপনীত হয়, অন্ন বিতরণে উদ্যত হইলে ক্ষুধাতুর কাঙ্গালীদিগকে ডাকিতে হয় না, বিনাহ্বানেই তাহাদিগকে ঘরে বসিয়া পাওয়া যায়। অতএব ঘরে বসিয়া সততা-রূপ ফাঁদ পাত, অনেক সাধু সৎসঙ্গ রূপ লোভে অন্ধ হইয়া ফাঁদে আসিয়া পড়িবে।

উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি।

জগতের লোক মাত্রেই যেমন একদিকে আত্মপ্রশংসা শুনিতে ভাল বাসে, সেইরূপ অন্য দিকে নিজের নিন্দা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু যদি সকলে নিন্দা শ্রবণে অধীর না হইয়া স্থির চিত্তে সেই নিন্দার দোষগুণ বিচার করিয়া আত্ম দোষ ক্ষালনে যত্নবান হয়, তাহা হইলে জগতের অধিকতর মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে। আমার যদি কোন দোষ থাকে আর সেই দোষ যদি কেহ উদ্‌ঘোষণ করে, তবে তাহার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, তাহাকে আমার হিতৈষী বলিয়াই মানা উচিত। কিন্তু তাহা মানি কৈ? মানি না বলিয়াই আত্মদোষ সংশোধন করিতে পারি না। পারিলে কিন্তু বড়ই মঙ্গল।

সম্প্রতি কিছুদিন হইতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বঙ্গদেশস্থ জাতি নিচয়ের ইতিহাস রচিত হইবার জন্য প্রত্যেক জাতির উৎপত্তি এবং প্রাচীন ও আধুনিক আচার ব্যবহারানুমত বিবরণ সংগৃহীত হইতেছে। তদুপলক্ষে আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় জাতি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও একান্ত অসঙ্গত। যদি সংগৃহীত বিবরণের কিয়দংশও সত্য হইত তাহা হইলে আমরা তাহাকে নিন্দা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা উগ্র-

ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে নিন্দা নহে সম্পূর্ণ পরিবাদ। পরিবাদ হইলেও উহাই আমাদের ভাবী মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। আর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন উক্ত পরিবাদ পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত পক্ষে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আমাদের পরম হিতৈষীর কার্য্যই করিয়াছেন। আজ যে আমরা জাতীয় উন্নতিকল্পে সমিতি সংস্থাপন এবং পুস্তক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আন্দোলন-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার মূল মাননীয় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট। কারণ আজ যদি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আমাদের জাতি সম্বন্ধে ঐরূপ ভ্রমাত্মক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ না করিতেন তবে আমাদের আশু-জাগরিত সমাজের নিদ্রা ভাঙ্গিতে আরও বহুদিন লাগিত কি না কে বলিতে পারে?

যাহা হউক ক্রোধে বা ঘৃণায় আমরা বিবরণীর সেই অযথা উক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারি নাই। রাজার মন হইতে ভ্রম দূর করিবার জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত বিবরণীর প্রতিবাদ এবং স্থায়ী রূপে জাতীয় হিত সাধনের জন্য একটী সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সেই সমিতির নামই "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি"। উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধির প্রিয় পাঠকবর্গকে আমরা আজ সেই সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব।

বিগত ১২৯৫ সালের ১৫ই আশ্বিন শুভদিনে "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির" জন্ম। জন্ম দিন হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমিতির চারিটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথম অধিবেশন ১২৯৫ সালের ১৬ই ফাল্গুন আর দ্বিতীয় অধিবেশন ২৬শে চৈত্র তারিখে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় সি,আই,ই, মহোদয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় অধিবেশনে ৬১ জন স্বজাতীয় সভ্য জাতীয় উন্নতিকল্পে সমিতির হস্তে প্রদান করিবার জন্য প্রায় ১০০০ মুদ্রা স্বাক্ষর করেন। আর তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনের ক্রিয়া বর্দ্ধমান নগরীতে সম্পন্ন হয়। ১২৯৬ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ এবং ১২৯৭ সালের ২৬শে ভাদ্র তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনের দিন। যদিও প্রথম অধিবেশনে ৯ জন মাত্র কিন্তু দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় ৩০০ শত এবং তৃতীয় অধিবেশনে নানাস্থান হইতে অন্যূন সহস্রাধিক সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। চতুর্থ অধিবেশনে কয়েকটী লোকের হঠকারিতায় যদিও সভার কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় নাই তত্রাচ আমরা সমিতির অপর ৩টী অধিবেশনের কার্য্য দেখিয়া অনুমান করিতে পারি যে, সমিতি ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক স্বজাতীয়বর্গের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে।

উগ্রক্ষত্রিয় মাত্রেই "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির" সভ্য। কিন্তু সমিতির কোন কার্য্য করিতে গেলে সকলকে সকল সময়ে আহ্বান করিয়া এবং সকলের মতামত গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা একরূপ অসম্ভব। সেইজন্য অপরাপর সভা সমিতির ন্যায় আমাদেরও সমিতির সর্ব্বসম্মতি ক্রমে একটী কার্য্যকরী সভা সংগঠিত হইয়াছে। যে সকল সভ্য লইয়া সভা সংগঠিত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সভাপতি।

১। শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল চৌধুরী
বি, এ, বি, এল।

সহকারী সভাপতি।

২। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়।
সি, আই, ই।

৩। শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন তা।
সভ্য।

৪। শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহ মুরারি পাঁজা
বি, এ।

৫। শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবিহারী সামন্ত
(ডেপুটী সুপারিণ্টেনডেণ্ট, আলিপুর লক হাঁসপাতাল)

৬। শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস সাঁই (এক, এ)।

৭। শ্রীযুক্ত বাবু নিকুঞ্জ বিহারী চৌধুরী
(সেরেস্তাদার বর্দ্ধমান জজ আদালত)।

৮। শ্রীযুক্ত বাবু বনয়ারি লাল হাটী
বি, এ, বি, এল।

৯। শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস চৌধুরী
(প্লিডার)।

১০। শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর যশ।

১১। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী।

১২। শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চৌধুরী
এল, এম, এস্।

১৩। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত কোঙার
বি, এ, বি, এল।

১৪। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়
বি, এ, বি, এল।

১৫। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপদ চৌধুরী
বি, এ, বি, এল।

১৬। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামসুন্দর চৌধুরী
বি, এ, বি, এল।

১৭। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত দত্ত
বি, এ।

১৮। শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র হুই
বি, এ।

১৯। শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যনারায়ণ দত্ত।

২০। শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহমুরারী পাঁজা।
২১। শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবিহারী সামন্ত।
সম্পাদক।

উল্লিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া কার্য্যকরী সভা সংগঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহারও এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সাত জন সভ্যের মতামতে সমিতির যে কোন কার্য্য হইতে পারিবে।

সমিতির চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে উপযুক্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক "উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণ" নামে এক খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত ও জাতীয় সাধারণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। স্বজাতির অকপট হিতৈষী শ্রীযুক্ত হরাধন তা মহাশয়ের অর্থব্যয়েই এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব তিনি আমাদের সকলেরই আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে আমাদের জাতি সম্বন্ধে যে ভ্রমপূর্ণ বিবরণী সংগৃহীত হইয়াছিল উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণে সে সকল ভ্রম সম্পূর্ণ রূপে খণ্ডিত হইয়াছে। সমিতি কর্ত্তৃক জাতীয় সাধারণের উপকার ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে অনেক বিষয়েরই আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বিবাহে পণ প্রথা নিবারণ বা ব্যয় সংক্ষেপ এবং সমাজমধ্যে শিক্ষা বিস্তার এই দুইটী বিষয়ে সমিতি যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে সমিতি জাতীয় সাধারণের অগণিত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা ভগবানের নিকট উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির দীর্ঘ জীবন ও মঙ্গল কামনা করি।

উপসংহারে আমরা সমিতির অকপট হিতৈষী ও জীবনস্বরূপ পরম উৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবিহারী সামন্ত মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া অদ্যকার মত লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম।

শ্রীহরিদাস সাঁই।

তুমি কে?

ভাই! তুমি অনুক্ষণ ভ্রান্তির বশে "আমি আমার" শব্দে জগৎ তোলপাড় করিয়া তুলিতেছ কেন? আমি ব্রাহ্মণ আমি কুলীন, আমি রাজা আমি ধনী, আমি বলবান আমি সুশ্রী, আমি দয়ালু আমি দাতা, আমি বিদ্বান আমি বুদ্ধিমান, আমি জ্ঞানী আমি মানী, আমি পরোপকারী আমি ন্যায়বাদী, আমি ধার্ম্মিক আমি পণ্ডিত ইত্যাকারে কতই "আমি"র শ্রাদ্ধ করিতেছ। আর আমার বাড়ী আমার ঘর, আমার রাজ্য আমার প্রজা, আমার স্ত্রী আমার পুত্র, আমার ঝি আমার জামাই, আমার ধন আমার দৌলত, আমার দাস আমার দাসী, আমার হাতী আমার ঘোড়া ইত্যাদি রকমের কত পদার্থই "আমার" বলিয়া দাবী করিতেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কখনও স্থির চিত্তে ভাবিয়াছ কি "তুমি কে?" যদি "তুমি কে" ইহা সাব্যস্ত করিতে পার তখন 'আমার' বলিয়া সকল পদার্থেই অধিকার পাইবে। নচেৎ নিয়ত "আমি আমার" করা "পাগলামী" নয় কি?

আমরা দর্শন শাস্ত্র ও লৌকিক বিচারের দ্বারা বুঝাইব তুমি কেহ নহ। তুমি যে নিয়ত "আমি আমার" করিয়া মর সে কেবল উন্মত্তের প্রলাপ মাত্র। দার্শনিকেরা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে বিচার করিয়া দুইটী মতে উপনীত হইয়াছেন। এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলেন এই পরিদৃশ্য মান জগৎ কিছুই নহে কেবল বাজীকরের বাজী মাত্র। আমরা ভ্রান্তিবশতঃ আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, মানুষ, গরু গাছ, পাথর ইত্যাদি বিভিন্নাকারের বস্তু দর্শন করিয়া থাকি। প্রকৃত পক্ষে ও সব কিছুই নহে, এক চিন্ময় বিভু সত্য, আর সব মিথ্যা। দার্শনিকের এই মতকে মায়াবাদ বলে। এই মায়াবাদী দার্শনিকেরা স্বীয় অকাট্য যুক্তি বলে ইহা বুঝাইতে পারেন, কিন্তু এই মায়াবাদ কেহ বুঝিতে পারে কিনা সন্দেহ; স্বয়ং মায়াবাদীরাও পারেন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক মায়াবাদানুসারে বিচার করিতে গেলে তুমিও নাই, তোমার কোন পদার্থও নাই। এক কথাতেই সকল গোল ফুরাইয়া গেল। তারপর দার্শনিকদিগের দ্বিতীয় মত "প্রকৃতবাদ"। প্রকৃতবাদীরা বলেন সৃষ্ট জগৎ—যাহা আমরা দেখিতেছি, এবং ইহার মধ্যে গাছ, পাথর, মানুষ, গরু, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাকার যে প্রভেদ রহিয়াছে তাহা সবই সত্য কিন্তু সকলই অনিত্য। আজ আছে, কাল নাই, সকলই পরিবর্ত্তনশীল। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি ইহাতে আমাদের কোনই ভ্রান্তি নাই, তবে ইহাই আমাদের ভ্রম যে—"যে আমরা চিরকাল থাকিব এবং আমাদের যাহা তাহাও চিরকাল থাকিবে।" দার্শনিকের এইমত সর্ব্বসাধারণে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। এমতে বিচার করিতে গেলেও তোমার "আমি আমার" করা শোভা পায় না। কেন পায় না বলিতেছি।

পদতল হইতে কেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এই যে একটা লম্বা চৌড়া দেহবিশিষ্ট

মনুষ্য যেটা হাঁসিতেছে কাঁদিতেছে, চলিতেছে বলিতেছে বোধ হয় এই টাকে তুমি "আমি" বলিয়া দাবী কর। আচ্ছা এই মানুষটাকে বিশ্লেষণ কর দেখি কি দাঁড়ায়? মানুষকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা কারণ-শরীর লিঙ্গ-শরীর ও স্থূল শরীর। এই তিনের সমবায়ে মানুষ। তোমার চক্ষুর গোচরীভূত রক্তমাংশ অস্থি শিরা, নখ কেশ দ্বারা জড়িত পদার্থের নামই স্থূল শরীর বা মানব দেহ। এখন বল দেখি এইদেহের মধ্যে তুমি কি? রক্ত না মাংশ, অস্থি না শিরা, নখ না কেশ? স্থূল কথায় হস্ত না পদ, বক্ষ না উদর, মস্তক না গ্রীবা, চক্ষু না কর্ণ, কি তুমি? অবশ্য ইহার তুমি কিছুই নহ। যখন প্রত্যেক অংশের কিছুই তুমি নহ তখন সম্পূর্ণ দেহও তুমি নহ। দেহ সম্বন্ধে তোমার দাবী ফুরাইল। তারপর লিঙ্গ শরীর—দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং তজ্জাত সদসৎ বৃত্তির সমষ্টিকে লিঙ্গ শরীর বলে। কোন কোন মতে ইহাকে আত্মাও বলিয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ ইহার মধ্যেও তুমি কিছু নহ। শেষ রহিল কারণ শরীর, তিনিই পরমাত্মা বা ঈশ্বর। অবশ্য তুমি পরমাত্মা বা ঈশ্বর নহ। তিনি এক ও অনন্ত এবং অবিভাজ্য কিন্তু সংসারে মেলা "তুমি" রহিয়াছ। যেদিন তুমি তোমাকেও "আমি" বলিবে আমাকেও "আমি" বলিবে, বা আমাকেও "তুমি" বলিবে তোমাকেও "তুমি" বলিবে সেইদিন যদি তুমি "তুমি" হইতে পার, নচেৎ তুমি কেহ নহ। দার্শনিকের বিচারে যখন তুমি কেহ হইলে না তখন তোমার বলিয়া কোন পদার্থও নাই। মাথাই নাই তার মাথার ব্যথা কোথা হইতে আসিবে। এখন বল দেখি তুমি যে "আমি আমার" কর, সে তোমার বায়ুরোগের পরিচয় নহে কি? এত গেল পণ্ডিতের বিচার, সকলে কিছু এ বিচারের যুক্তি, তর্ক মীমাংসা বুঝিতে পারে না। এইজন্য আমরা মোটামুটি লৌকিক বিচার দ্বারাই বুঝাইব তুমি কেহ নহ।

মানিয়া লইলাম পরমাত্মা, আত্মা ও দেহের সমবায়ে যে মানুষ—পদতল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত বিশাল দেহ বিশিষ্ট যে মানুষ তাহাই তুমি। এখন ভাবিয়া দেখ তুমি স্বয়ং সৃষ্ট হও নাই এবং তুমি জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক বিশিষ্ট মানুষ হইয়াও জন্মাও নাই। পিতৃ বীর্য্য ও মাতৃ শোণিতই তোমার এই বিশাল দেহের প্রধান উপাদান। সেই বীর্য্য-শোণিতও তোমার পিতা মাতার ভক্ষিত আহার হইতে উৎপন্ন। আবার তোমার সেই পিতা মাতার খাদ্যও স্বয়ং সৃষ্ট নহে। কোন ক্ষুদ্র বীজ, ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সংযোগ সাহায্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া খাদ্য রূপে পরিণত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই পঞ্চ মহাভূত ও বীজের স্রষ্টা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহ নহে। অতএব তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে ঈশ্বর তোমারও সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি ছাড়া জগতে আর যাহা আছে সকলের সৃষ্টিকর্ত্তাই তিনি। সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায়ানুসারে যে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সে অভিপ্রায় কি তাহা মানববুদ্ধির অতীত। তবেই বুঝা গেল, তুমি, আমি, কীট পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম সকলই আমরা তাঁহার অভিপ্রায় সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছি। বিশ্বপতি বিশ্বকার্য্য পরিচালনের জন্য যখন আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তখন

আমাদের স্বতন্ত্র কোন কার্য্যই নাই এবং আমরা কোন কার্য্যের কর্ত্তাও নহি। তিনি প্রভু, আমরা ভৃত্য। তিনি যাহা আদেশ করিতেছেন আমরা তাহাই পালন করিতেছি। তাঁহার আদেশ যিনি প্রকৃত পক্ষে পালন করিতেছেন তিনিই পুরস্কার স্বরূপ বিমল সুখ ভোগের অধিকারী হইতেছেন, আর যিনি তাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়া অবাধ্য ভৃত্যের ন্যায় পরিচয় দিতেছেন, তিনিই দণ্ড স্বরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। অশিতি লক্ষ যোনী ভ্রমণ ও জন্ম মৃত্যু আর কিছুই নহে কেবল পারদর্শিতানুসারে বাহাল বরখাস্ত মাত্র। এক্ষণে মনে কর বিশ্বপতির বিশাল বিশ্বরাজ্য পরিচালনের নিমিত্ত যেমন অপর সকলে সৃষ্ট হইয়াছে সেইরূপ তুমিও একজন সৃষ্ট হইয়াছ। তবে বুঝা গেল তুমি স্বাধীন কেহ নহ, তুমি এক জন অপরাপর ভৃত্যের ন্যায় ভৃত্য মাত্র।

তোমার বলিষ্ট দেহ, অপরূপ রূপ, স্ত্রী পুত্র, কন্যা, ধনৈশ্বর্য্য, বিস্তৃত রাজ্য, অগণিত দাস দাসী, প্রভৃতি যে সকল সম্পত্তি তোমার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ ইহার কোনটাই তোমার নিজের সৃষ্ট নহে ইহা পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে। তোমার জন্যও কিছু সৃষ্টি কর্ত্তা ইহা সৃজন করেন নাই; তোমাকেও যেমন তিনি তাঁহার অভিপ্রায় সাধনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার অধীনে যে সকল সম্পত্তি রক্ষিত হইয়াছে তাহাও তোমার জন্য নহে তাঁহারাই অভিপ্রায়ের নিমিত্ত তিনি সৃজন করিয়া তোমার জেম্মায় রাখিয়াছেন মাত্র। তাহার প্রমাণ তুমিই যখন তাহার ইঙ্গিত মাত্রে ক্ষণে ক্ষণে বাহাল বরখাস্ত হইতেছ—জন্মিতেছ মরিতেছ - তোমার দেহ সম্বন্ধেই তোমার যখন অনুমাত্র স্বাধীনতা নাই তখন তোমার জেম্মায় যে সকল সম্পত্তি রহিয়াছে তাহা তোমার "আমার" বলিয়া দাবী করাই ভ্রম। এক কথায় তোমাকে তিনি এক জন ভাণ্ডারী করিয়া এই বিশ্ব রাজ্যের একটী ক্ষুদ্র ভাণ্ডারের ভার দিয়াছেন। তুমি ভাণ্ডার স্থিত ঐ সকল ধন নিজের বলিয়া বিবেচনা করত নিজের ভোগে লাগাইও না, বিশ্বপতির অভিপ্রায়ানুসারে উহার সদ্ব্যবহার করিতে থাক। কোন কোন ধনীর ভাণ্ডারীকে আমরা কর্ত্তা সাজিতে দেখিয়াছি। তাহারাও প্রভুর সম্পত্তিকে আমার আমার করিয়া মরে। তাহাদের বিষয় মনে হইলে যেমন হাঁসি পায়, তেমনি বিশ্বপতির একটী ক্ষুদ্রতম ভাণ্ডারী তোমার মুখেও "আমি আমার" শুনিলে সেইরূপ হাঁসি পাইয়া থাকে ভাই! তাই বলিতেছিলাম, তুমি যে সদা সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রকাশ করিয়া বেড়াও, "আমি হেন" "আমি তেন" করিয়া ধরাকে সরাখানার মত দেখ কিন্তু একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া বল দেখি তুমি কে?

সতরঞ্চ-বিজ্ঞান।

আধুনিক সমাজে প্রচলিত ক্রীড়ার মধ্যে সতরঞ্চ ক্রীড়া (দাবা খেলা) বড়ই আমোদপ্রদ এবং কৌতুকজনক। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনারও বিশেষ সুবিধা। বিলাতের বিখ্যাত বিখ্যাত পত্রিকায় সতরঞ্চ-বিজ্ঞানের আলোচনা হইয়া থাকে। আমরাও উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধির পাঠকবর্গের নিকট মধ্যে মধ্যে সতরঞ্চ-বিজ্ঞান-রহস্য প্রকাশ করিব। এবারে নিম্নে একটী প্রতিজ্ঞা (Problem) দেওয়া গেল। পাঠকবর্গ ঐ প্রতিজ্ঞাটী পূরণ করিয়া স্ব স্ব কৌতূহল নিবারণ করিবেন।

১ম প্রতিজ্ঞা।

কালর দিক।

							সাদা ঘোড়া
	সাদা নৌকা						
		কাল বড়ে	কাল বড়ে	সাদা গজ			
		কাল রাজা		কাল বড়ে	সাদা নৌকা		
কাল বড়ে			সাদা ঘোড়া				
সাদা বড়ে			সাদা বড়ে				
					সাদা রাজা		

সাদার দিক।

সাদা প্রথম চালিয়া কালকে চতুর্থ চেলে মাত করিবে।

শ্রীকুমুদবিহারী সামন্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

অর্জ্জুন পুত্র চিত্রাঙ্গদা নন্দন বভ্রুবাহনের রাজ্য মণিপুরের পরিচয় হিন্দু পাঠকগণকে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। সেই মণিপুর রাজ্য আজ ইংরেজ রাজের অধীন। অতি প্রাচীন কাল হইতে মণিপুর স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে মণিপুর আজ সে স্বাধীনতা-রত্ন ভ্রষ্ট। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি বাহাদুরের দুই মহারাণীর গর্ভে ৮টী সন্তান জন্মে। তিনি হিন্দু রীত্যানুসারে প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ তনয় সুরচন্দ্রকে সিংহাসন প্রদান করিয়া দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র কুলচন্দ্রকে যুবরাজ পদে, কুলচন্দ্রের কনিষ্ঠ টিকেন্দ্রজিতকে প্রধান সৈনাপত্যে এবং অন্যান্য সন্তানগণকে মর্য্যাদানুসারে একটী রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। সুরচন্দ্র রাজ্য পালনে অযোগ্য এই ছল করিয়া সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের সহায়তায় কুলচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করেন। সুরচন্দ্র কোন মতে প্রাণ লইয়া কলিকাতা আসিয়া আপনার মর্ম্মব্যথা লাট ল্যানসডাউনকে জানান। ল্যানসডাউন অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া আসামের চিফ্ কমিশনর বাহাদুরের প্রতি কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার হুকুম দেন। চিফ্ কমিশনর কুইনটন সাহেব আর ২।৪ জন বড় বড় সাহেবের সহিত ৪৫০ শত গুর্খা সৈন্য লইয়া মণিপুর রাজ্যে গমন করেন। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিত কুইনটন সাহেবের অসদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দেন এবং সেই যুদ্ধে স্বয়ং জয়লাভ করত কুইনটন প্রমুখ সাহেবদিগকে বন্দী করেন এবং প্রাণ সংহার করিয়া ফেলেন। ব্রিটিস সিংহ এই সম্বাদ পাইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত মণিপুর আক্রমণ এবং কয়েকটী সামান্য যুদ্ধের পরই উক্ত রাজ্যদখল করিয়াছেন। রাজপুত্রেরা মণিপুর হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে কুলচন্দ্র ধৃত হইয়া বিচারে আনীত হইয়াছেন। টিকেন্দ্রজিত আজও ধরা পড়েন নাই। মণিপুরের ভাগ্যে এখন কি ঘটিবে কিছুই বলা যায় না। কুলচন্দ্রের আবেদন পত্রে প্রকাশ, বৃটিশরাজ মণিপুররাজের প্রতি বড়ই নৃশংস ব্যবহার করিয়াছেন। দেবতা ও দেবালয় ধ্বংস, বালকবালিকা ও স্ত্রীলোকদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইয়াছে। ইহা যদি সত্য হয় তবে সভ্য বৃটিশরাজের পক্ষে বড়ই কলঙ্কের কথা।

পীজসাহেব নামক পার্লামেন্টের জনৈক সভ্য ভারতের অহিফেন বিক্রয়ে সবিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঔষধ ব্যতীত আর কোন কারণে গবর্ণমেণ্ট অহিফেন বিক্রয় করিতে পারিবেন না। পীজ সাহেবের উদ্দেশ্য সফল হইবে কি?

বিগত ২৮শে চৈত্র হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈঁচি গ্রামে একটী পতি পরায়ণা যুবতী স্বামীর মৃত্যুর অষ্টাহ পরে পরিধেয় বস্ত্রে উত্তম রূপে শরীর আবৃত করিয়া দগ্ধ শিখায় অঞ্চল ধরাইয়া দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাকেই প্রকৃত সতীদাহ বলে। এরূপ সতী সাধ্বীদিগের আইনে কি করিবে?

দেশীয় শিল্পাদির উন্নতিকল্পে দেশীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ একটী যৌথকারবার খুলিবার উদ্যোগ হইতেছে। কোম্পানীর মূলধন হইবে ৫ লক্ষ টাকা। ৫ টাকা করিয়া এই মূলধন লক্ষ অংশে বিভক্ত হইবে। আর অংশীদারদিগের ক্ষতিপূরণের জন্য একটী জামিন তহবিল থাকিবে। ইহার মূলধন হইবে লক্ষ টাকা অনেক বড় লোকে এই জামিন তহবিলে টাকা দিয়াছেন। দেশের অনেক গণ্যমান্য বড়লোক এই ব্যবসায়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি উদ্যোগীগণের মনোভীষ্ট পূর্ণ হউক।

রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত রেল হইবার কথা হইতেছে। মাটির কার্য্য একরূপ পূর্ব্বেই অনেকটা শেষ হইয়াছে বোধ হয় এবারে রেলটা হইলেও হইতে পারে।

ধর্ম্ম লইয়া চারি দিকেই হুলস্থূল ব্যাপার। সেদিন কাশীধামে মিউনিসিপালিটি জলের কলের পাইপ বসাইবার জন্য হিন্দুর দেব মন্দির ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ ধর্ম্মনাশ ভয়ে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়ে এবং যাহারা মন্দির ভগ্ন কার্য্যে উদ্যোগী হইয়াছিল তাহাদের সকলকেই, বিশেষরূপে প্রহার দেয়। লুট দরাজেও নাকি ত্রুটি হয় নাই। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে এইরূপই হইবার কথা। কিন্তু ব্রিটিশ রাজের রাজ্যে কি আর ধর্ম্ম রক্ষা হইবার উপায় আছে। যাহারা বিপক্ষদিগের হস্ত হইতে দেব মন্দির রক্ষার জন্য লড়িয়াছিল তাহারা এখন রাজ বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং অনেকেই দীর্ঘকারাবাস বা দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া আমরা অবাক হইয়াছি।

গোরা সৈন্যেরা শিকারে বাহির হইয়া কত সময় কত অনর্থ ঘটায়, আজ কাল সেই অনর্থ সংঘটনের পরিমাণটা বড়ই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহারা পশু পক্ষী শিকার করিতে যাইয়া অনেক সময় মানুষ শিকার করিয়া বসে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের শিকারে বাহির হওয়া সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন;—যাহারা শিকারে যাইবে, তাহাদের সচ্চরিত্র ও বন্দুক ব্যবহারে অভ্যস্থ হওয়া প্রয়োজন; ৩ জনের কমে বাহিরে যাইতে পারিবে না, এবং তাহাদের এক জনকে দেশী ভাষা এরূপ জানা আবশ্যক যে, সে যেন গ্রামবাসীদের সহিত দেশী ভাষায় আলাপ করিতে পারে; রাত্রিতে গুলি ছুড়িতে পারিবে না; ৩ দিনের জন্য শিকার করিতে গেলেই যে স্থানে শিকারে যাইবে, তথাকার মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাদের নাম ও পদ জ্ঞাপন করিতে হইবে; কোন গ্রামে, ঘরে, মন্দিরে, মস্‌জিদে বা ঘেরাও স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবে না অথবা গ্রামের সীমানায় ৫ শত গজের মধ্যে গুলি ছুড়িতে পারিবে না; কোন শস্য ক্ষেত্রে ও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত স্থানে প্রবেশ বা বন্দুক ছুড়িতে পারিবে না; গ্রামের লোকেরা যে সকল পক্ষী বা পশুকে পবিত্র বলিয়া মনে করে, তাহাদিগের উপর গুলি চালাইতে পারিবে না;—কোন্ জেলায় কোন্ পশু ও কোন্ পক্ষীকে পবিত্র বলিয়া মনে করা হয়, সৈন্যদিগকে তাহা বলিয়া দেওয়া হইবে; এবং কোন্ কোন্ স্থানে সৈন্যেরা শিকার করিতে পারিবে, মাজিষ্ট্রেট-

দের নিকট হইতে তাহা সৈন্যদলের অধিনায়কদিগকে জানিয়া রাখিতে হইবে। যদি কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করে; তবে তাহাকে গুরুতর শাস্তিবিধান করা হইবে; এবং যদি কোন দলের লোকেরা বার বার এই নিয়ম ভঙ্গ করে, তবে সেই দলকে এক বৎসরের জন্য শিকারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে। নিয়মগুলি উত্তম বটে কিন্তু এখন গোরাচাঁদেরা নিয়ম মানিয়া চলিলেই মঙ্গল।

লক্ষ্ণৌ নগরে বর্ত্তমান মাসে এক রাত্রিতে ৫ হাজারের অধিক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রজাপতির বোধ হয় সে রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই?

পাতিয়ালার মহারাজা ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সীমলা শৈলে এক গ্রীষ্মাবাস নির্ম্মাণ করাইতেছেন। কলির রাজাদের প্রজা রক্ষার পরিবর্ত্তে আত্ম রক্ষার দিকে নজর বেশী।

মুক্তি ফৌজের অধিনায়ক জেনারেল বুথ "ডার্কেষ্ট ইংলণ্ড" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত উহা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে বিলাতে কেমন বিদ্যার আদর। আমাদের দেশে বহি লিখিলে গ্রন্থকারকে জমি জমা বিক্রয় করিয়া ছাপাখানার ঋণ শোধ করিতে হয়।

হাঙ্গেরিতে একটী ৩ বৎসরের ছেলেকে একটী ঈগল পক্ষী ছোঁ মারিয়া লইয়া গিয়াছে। ঈগলটী গড়ুরের বংশধর নাকি?

সেণ্টপিটর্সবর্গের এক সুন্দরী বড়ই এক মজাদার ফ্যাসন বাহির করিয়াছেন। তাঁহার গাড়ির গাড়োয়ানের পোষাকের পৃষ্ঠে এক প্রকাণ্ড আয়না বসাইয়াছেন; যখন তিনি গাড়ি চাপিয়া বাহির হন, তখন নিজের রূপ দেখিতে দেখিতে যান। সুন্দরী কি মনে ভাবিয়াছেন রূপই জগতের সার-সম্পত্তি?

মণিপুর যুদ্ধের নিমিত্ত জলপাইগুড়ি হইতে ৫।৬ শত বলদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে খরিদ হয় এবং রেলে পাঠাইতে বিস্তর খরচ পড়িয়া যায়। কিন্তু এই বলদের মধ্যে মোট ২০টী কার্য্যক্ষম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে অধিকাংশই মরিয়া গিয়াছে ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের দ্বারায় কাজ কিন্তু এক কড়ারও হয় নাই। টাকার শ্রাদ্ধ আর কাকে বলে?

অধিক পরিমাণে অহিফেণ সেবন করিয়া মৃতপ্রায় হইলে, সেই পরিমাণ মুলতানি হিঙ্গ খাইলে ভেদ বমি হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তি বাঁচিয়া যায়।

রংপুরের ওলাউঠাগ্রস্ত গরীব প্রজাদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। অর্থের সদ্ব্যয় এইরূপেই করিতে হয়। সকল জমিদারেরই রাজা-বাহাদুরের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

ঝিলমের টালাগঞ্জ এবং ছাকওয়াল নামক স্থানে পঙ্গপাল পড়িয়া সমুদয় শস্য নষ্ট করিয়াছে। ইহাদের অত্যাচারে কয়েকটি পরিবার এতাদৃশ অবস্থায় পতিত হইয়াছে যে পেটের জ্বালায় তাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। ইহাকেই বলে বিধির মার।

আমেরিকার হড্‌সন নদির উপর একটী প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণ হইতেছে। ইহার উপর দশটা রেল পথ ও চারিটা মানুষ চলিবার পথ হইবে। এতবড় সেতু নাকি পৃথিবীতে কুত্রাপি নাই। আমেরিকার সকলই অদ্ভুত কাণ্ড!

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

প্রথম খণ্ড।

সমাজসংস্কার।

পঙ্গুর অদ্রিলঙ্ঘনের বাসনা, বামনের চন্দ্রস্পর্শাভিলাষ, উড়ুপসহায়ে জলধি উত্তরণের উদ্যম, যেরূপ অসম্ভব; মৎসদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিহীন ক্ষুদ্র প্রাণীর, এই সমাজসংস্কার রূপ গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করাও, তদ্রূপ বা ততোধিক অসম্ভব। তবে ভরসা এই, যে, শতযোজন বিস্তীর্ণ জলধি বন্ধনরূপ বিশাল কার্য্যের জন্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-বিড়ালের গাত্র সংলগ্ন ক্ষুদ্র বালুকাকণারও আবশ্যকতা পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র সাদরে স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন আমার ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত, সমাজের হিতসাধক, বাক্যগুলি যে মহানুভব সহৃদয় কৃতবিদ্যগণ ধর্ম্মের মহিমা ও সত্যের গৌরব রক্ষার্থে গ্রহণ করিবেন, বোধ হয় এরূপ ভরসা করা আমার পক্ষে দুঃসাহসিকের কার্য্য নহে।

আমার এই প্রস্তাব আমার নিকটে অভ্রান্ত হইলেও সকলের অনুমোদিত না হইতে পারে। আমি কোন জাতি বা বংশ বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ প্রস্তাব করিতেছিনা। সমগ্র হিন্দুসমাজের হিতসাধনোদ্দেশেই শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে করিতেছি। ইহা যদি কাহারও অনুমোদিত না হয়, তিনি ন্যায় সঙ্গত প্রতিবাদ করিয়া ভ্রম দর্শাইলে বাধিত হইব। আমার এই প্রস্তাবে যদি কাহারও হৃদয়ে আঘাত লাগে, তবে তিনি কবিবর ভারত চন্দ্রের "নীচ যদি উচ্চভাসে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" অথবা পাশ্চাত্য কবিকেশরী মিল্টনের "Let the dog bark at the moon" নীতি অবলম্বন করিলেও আমার দুঃখের কোন কারণ নাই। তবে নিবেদন যেন সত্য ও ধর্ম্মের অবমাননা না হয়।

কেহ বলিতে পারেন "বাপু হে তুমি খুঁয়েতাঁতী, তোমার তসরে হাত দিবার অধিকার কি?" তদুত্তরে আমার নিবেদন; তসর যদি ঘনত্ব বিষয়ে ধীবরের "পশমবস্ত্রকে" লজ্জা প্রদান করে, তবে খুঁয়েতাঁতীর তাহাতে হাত দিবার অধিকার থাকুক বা না থাকুক, নির্ম্মাতাকে ব্যবসায়ের সম্ভ্রম রক্ষার্থে সতর্ক করিয়া দিবার অধিকার আছে। তবে খুঁয়েতাঁতীর কথা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য

কার তনয় নির্ম্মাতার ইচ্ছাধীন। যখন আমি হিন্দুসমাজভুক্ত, যখন আমাকে সমাজের সুখ দুঃখের, নিন্দা প্রশংসার অংশ গ্রহণ করিতে হয়, তখন সমাজের দোষ গুণ আলোচনা করিবার আমার যথেষ্ট অধিকার আছে। আমি সমাজ কর্ত্তৃক রক্ষিত, প্রতিপালিত, সুতরাং উপকৃত। সেই সমাজের হিত সাধন জন্য দোষ প্রদর্শন না করা ধর্ম্মানুসারে ঘোর অকৃতজ্ঞতার কার্য্য। নিজ দেহের বা পরিবারস্থ কাহারও কোনরূপ ব্যাধি হইলে, তাহার প্রতীকারে সচেষ্ট না হইলে যেমন হত্যাপরাধ জনিত পাপভাগী হইতে হয়, সেইরূপ সমাজরূপ বিশাল দেহ বা পরিবারের দোষরূপ ব্যাধির প্রতীকার চেষ্টায় উদাসীন থাকিলেও কেন না উক্তবিধ পাপের ফলভোগ করিতে হইবে? বিশেষতঃ বেদ স্বরূপ মহাভারতে স্পষ্টই লিখিত আছে ;—

"শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি। সর্ব্বথা সর্ব্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ॥"

অপি চ কোন বৃক্ষে বৃক্ষনাশক বিষাক্ত দ্রব্য প্রবিষ্ট হইলে, ঐ বৃক্ষের ধ্বংসের সহিত যেমন উহার ক্ষুদ্রতম শাখাস্থিত পত্রেরও ধ্বংস অনিবার্য্য, সেইরূপ সমাজ বৃক্ষে কুব্যবহার দোষরূপ বিষ প্রযুক্ত হইলে, ঐ সমাজ বৃক্ষের একটী বংশরূপ শাখায় জাতপত্র-সদৃশ আমারও পতন অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্ম এবং স্বার্থ—যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, ইহাতে আলোচনা করিবার আমার অধিকার থাকা কর্ত্তব্য। আমি সেই কর্ত্তব্য বলেই ধর্ম্মের অনুশাসন ক্রমে এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তবে আমার পরামর্শ গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা স্বাধীনীয় সমাজপতিবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছে।

মূল প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মানব জীবনের উদ্দেশ্য, সমাজ সংস্থাপনের আবশ্যকতা এবং সামাজিক নিয়ম পালনের উপকারিতা সম্বন্ধীয় গুটিকত অত্যাবশ্যকীয় কথা অপরিহার্য্য বিবেচনায় আলোচনা করা যাইতেছে।

বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের কোন্ গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা চিন্তামণি ব্যতীত আর কাহারও চিন্তার বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু, যে অভিপ্রায়েই জগৎ সৃষ্ট হউক না কেন, যখন ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, তখন অবশ্যই ইহার লয় হইবে। সৃষ্টি প্রলয় রহস্য পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পরাপ্রকৃতি (যাহাকে বৈষ্ণবেরা রাধিকা ও বৈদান্তিকেরা ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন) হইতে সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ হইয়া ক্রমান্বয়ে মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, (বেদান্ত যাহাকে অবিদ্যা বলে) আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ক্ষিতিরূপে পরিণত হইয়া অবশেষে সৃষ্টির অষ্টম প্রকৃতিতে আমরা উপনীত হইয়াছি। তৃণ হইতে জীব জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রাণী মনুষ্য এই অষ্টম প্রকৃতির অন্তর্গত। মনুষ্য হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সকলেই কর্ম্মশীল। সুতরাং সকলেই জন্ম মৃত্যুর অধীন। সদসৎ কর্ম্মগুণে জীব সকল উর্দ্ধ বা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গভেদে জীবের দুইটী গন্তব্যস্থান আছে। প্রবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিলে অসৎ কার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া সকলকেই

ধ্বংস মুখে পতিত হইতে হয়। ইহাকেই লয় কহে। ইহারই নামান্তর অনন্ত নরক বা দুঃখ। আর নিবৃত্তি মার্গ প্রস্থিত হইলে সৎকর্ম্মাবলম্বী হইয়া দেবতাদিরূপে পরিণত হওতঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরে লীন হইতে পারা যায়। ঈশ্বরে লীন হইলেই জীবের কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হয়। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইলেই আর জন্ম মরণাদির অধীন হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। ইহারই নামান্তর অনন্তসুখ। এই সুখলাভ করিবার জন্যই মনুষ্য সকল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লালায়িত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। এই পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠতম জীব। মোক্ষ এবং লয় ইহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে।

সৎকার্য্যের পরিণাম মোক্ষ, আর অসৎ কার্য্যের পরিণাম লয়, ইহা আর্য্য ঋষিগণ তপস্যাবলে বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য পরমকারুণিক উদার-হৃদয় ঋষিগণ তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য নানা প্রকার হিতকর নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মোক্ষ বা অনন্ত সুখের কারণ ধর্ম্ম, আর লয় বা অনন্ত দুঃখের হেতু অধর্ম্ম, ইহা আর্য্য-ঋষিগণ যেমন বুঝিতেন, এমন আর কোন জাতিই বুঝিতে পারেন নাই। তাই মনু বলিয়াছেন—

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যৎ তু গচ্ছতি॥

সেই জন্যই হিন্দুর আচার ব্যবহার এমন কি হিন্দুর আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্যই ধর্ম্ম সংসৃষ্ট এবং এতদ্দ্বারা অনুশাসিত। আর্য্য ঋষিরা ধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের ভক্তিরূপ সর্ব্বোচ্চ শাখায় অবস্থিত মোক্ষফল দৃষ্টি করিয়া উহার প্রাপ্তির জন্য নানারূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। মোক্ষফলার্থী হইয়া উহাতে নামা উঠার নামই কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ। ধর্ম্ম বৃক্ষে উঠিতে হইলে কোন্ কোন্ সদ্‌গুণের প্রয়োজন, আর্য্য-ঋষিরা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন ;—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম-লক্ষণম্॥"

যিনি এই দশবিধ গুণে অলংকৃত হইবেন ; তিনিই ধার্ম্মিক এবং তিনিই ভক্তি-প্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র। ভক্তি প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ তাহার করতল-গত। ইহাতে জাতি-ভেদ, পুং-স্ত্রী-ভেদ কিছুই অপেক্ষা করে না। যিনিই ভক্তিলাভ করিতে পারিবেন, তিনিই মোক্ষ বা অনন্তসুখ প্রাপ্ত হইবেন। ঈশ্বর, রামাবতারে স্বয়ং বলিয়াছেন ;—

"পুংস্ত্বে স্ত্রীত্বে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ। ন কারণং মদ্ভজনে ভক্তিরেব হি কারণম্॥ স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্যাপি তির্য্যগ্‌যোনিগতস্য বা। ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে॥ ভক্তৌ সঞ্জাতমাত্রায়াং মহত্তত্ত্বানুভবস্তথা। মমানুভবসিদ্ধস্য মুক্তিস্তত্রৈব জন্মনি॥

স্নাতস্মাৎ কারণং ভক্তির্মোক্ষস্যেতি সুনিশ্চিতম্।”

অর্থাৎ, স্ত্রীজাতি বা পুরুষ, সজ্জাতি বা অসজ্জাতি, প্রসিদ্ধনামা বা অপ্রসিদ্ধনামা, উত্তমাশ্রমাবলম্বী বা অধমাশ্রমাবলম্বী যাহা হউক, ভক্তি থাকিলেই আমার ভজনে অধিকারী হইতে পারে। হে শুভ-লক্ষণে! স্ত্রী পুরুষ বা তির্য্যাগ্ যোনি গত যে কোন ব্যক্তির ভক্তি সাধন সম্পন্ন হইলে—আমাতে প্রেমভক্তি উৎপন্ন হইলেই,আমার তত্ত্ব-নিরূপণ হয়। আমার তত্ত্ব অনুভব করিলেই, এই জন্মেই তাহারা মুক্তি পাইতে পারে। সেই হেতু ভক্তিই মুক্তির প্রথম কারণ নিশ্চয় জানিবে।

ধর্ম্মের লক্ষণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; এখন ভক্তি কাহাকে বলে তাহাই দেখা যাউক। পূজনীয় বঙ্কিম বাবু নানাশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া ভক্তি সম্বন্ধে যে সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই; “যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বর-মুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্য সাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলে। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে।” ইহাতে আমরা এই বুঝিলাম মানবের যতগুলি বৃত্তি আছে, সেই সমুদয় বৃত্তিগুলি যখন স্বরূপে পরিণত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখী হইলেই ভক্তির উদয় হয়। ভক্তি একটী স্বতন্ত্র বৃত্তি নহে। তাহা হইলেই স্পষ্ট বুঝাগেল ধর্ম্ম লক্ষণে ভূষিত হইয়া চিত্তবৃত্তি উন্নত করিলেই ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্তি পাইলেই মোক্ষ বা প্রকৃত সুখে অধিকারী হইতে আর বাকী থাকে না। এই সুখই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। এই মূল-নীতি অবলম্বন করিয়াই আর্য্য-সমাজ গঠিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া মানবগণ যাহাতে লয়প্রাপ্ত না হয়, সেই অভিপ্রায়েই মোক্ষপ্রদ ধর্ম্মানুমোদিত নানাবিধ সুনিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক আর্য্য-মনীষিরা মানব-সমাজ গঠন করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই সামাজিক নিয়ম পালন করিলেই উহার পুরস্কার স্বরূপ নির্ম্মল সুখ প্রাপ্ত হইব, অন্যথা করিলে সমাজ অথবা প্রকৃতির নিকট দণ্ড-স্বরূপ দুঃখভোগ করিব। প্রাচীন ভারত যত্নের সহিত সমুদয় সামাজিক নিয়ম পালন করিতেন বলিয়া উন্নতির চরম-সীমায় উঠিতে পারিয়াছিলেন।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন “সেই উন্নত ভারতের অধঃপতন হইল কি সে?” শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলেই আমরা এসমস্যার সুন্দর উত্তর পাইব। শাস্ত্রানুসারে ভারতের অধঃপতনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকি যে, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন জনিত সামাজিক পাপের ক্ষালনের পরিবর্ত্তে প্রশ্রয় দেওয়াতেই ভারতবাসীর অধঃপতনের কারণ হইয়াছে। সেই সামাজিক পাপকে আমরা ত্রিবিধ বলিয়া মনে করি।

১ম। শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভ্রান্ত দেশাচারের অনুবর্ত্তন।

২য়। নির্গুণের দণ্ডের পরিবর্ত্তে আদর।

৩য়। গুণবানের অনাদর।

প্রধানতঃ এই ত্রিবিধপাপ সমাজ-মধ্যে প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুসমাজকে ছারে খারে দিয়াছে। উদাহরণদ্বারা এই বিষয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় এই যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনুষ্য দৃষ্ট হইতেছে, প্রাচীনকালে ইহারা সকলেই একজাতি ছিল। পরে সামাজিক সুশৃঙ্খলার জন্য গুণ ও কার্য্যভেদে চারিবর্ণে বিভক্ত হয়। মহাভারতে আছে;—

“একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির। কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥”

গুণ ও কর্ম্মানুসারেই যে চারিবর্ণ বিভক্ত হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ--গীতাতেও তাহা বলিয়াছেন;—

“চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।”

গুণের তারতম্যানুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত হয়। যাহারা সকল গুণের আধার ছিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে;—“যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহত্যাগ করেন, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সংসার মধ্যে যিনি সত্যকথা কহেন, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং হিংসিত হইয়াও হিংসা না করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায় নিরত ও শুচি এবং কাম ক্রোধ যাহার বশীভূত, তাহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সর্ব্ব ধর্ম্মে বিচরণকারী যে মনস্বী পুরুষ লোকমাত্রকেই আত্ম-সদৃশ জ্ঞান করে, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন যাজন, ও যথা-শক্তি দান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যে দ্বিজ-পুঙ্গব ব্রহ্মচারী হইয়া বেদ সমস্ত অধ্যয়ন করেন, এবং স্বাধ্যায়ে অপ্রমত্ত থাকেন, তাহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। স্বাধ্যায়, দম, সারল্য ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এই কয়েকটী ব্রাহ্মণের শাশ্বত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।” এত গুণ না থাকিলেই কি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, না সেই জাতিই সমাজে পূজাপ্রাপ্ত হইতে পারে? এইরূপ গুণানুসারেই পর পর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ বলিলে শিরোমণি মহাশয়ের মদখোর, ভ্রষ্টাচার, মূর্খ, পৈতাধারী পুত্রকে বুঝাইত না। তখন পিতা পিতামহের দোহাই দিয়া বা তৈল প্রথা-বলম্বনে সংগৃহীত ভোটাধিক্য বশতঃ নীচ জাতীয় চর্ম্মকারের বা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন অর্থশালী জমিদারপুত্রের মিউনিসিপ্যাল কমিশনর হইবার ন্যায় ব্রাহ্মণ হওয়া যাইত না। গুণ না থাকিলে এবং ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম না করিলে, ব্রাহ্মণ সন্তানকেও জাতিচ্যুত হইতে হইত। মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অজাগর পর্ব্বাধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত আছে, “শূদ্রবংশজ হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয় এরূপ নহে; যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক

ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মণ, এবং যে কোন ব্যক্তিতে তাহা লক্ষিত হয় না তাহারাই শূদ্র।" বৃদ্ধ গৌতম সংহিতাতেও লিখিত আছে ;—

ক্ষান্তং দান্তং জিত-ক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্। তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥ অগ্নিহোত্র-ব্রত-পরান্ স্বধ্যায়-নিরতান্ শুচীন্। উপবাস-রতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ ॥ ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণ-কারকাঃ। চণ্ডাল-মপি চিত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

ক্ষমাশীল, দাতা, অক্রোধী, আত্মজয়ী এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। অবশিষ্ট সকলেই শূদ্র। যিনি যজ্ঞকারী, ব্রতপরায়ণ, বেদাধ্যয়নে নিরত, শুচি, উপবাস রত ও বদান্য, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করেন। হে রাজন! জাতি পূজ্য নহে; গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও যদি চিত্তস্থ হয়, দেবতারা তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

পুনশ্চ, মহাভারতে ঋষিপ্রবর মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন ;— "পাতিত্যজনক-কুক্রিয়াসক্ত দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্র-সদৃশ হয়; আর যে শূদ্র সত্য দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহারে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রাচীন কালে গুণ থাকিলেই শূদ্রাদিও ব্রাহ্মণ, এবং গুণ বর্জ্জিত হইলে ব্রাহ্মণাদিও শূদ্রে পরিণত হইত। মুনি-পুঙ্গব আপস্তম্ব বলিয়াছেন ; "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধর্ম্মাচরণদ্বারা পর পর বা একবারে অধম জাতিতে ভুক্ত এবং শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ক্রিয়াবান হইলে পর পর বা একেবারে উচ্চ জাতিত্বপ্রাপ্ত হইতে পারে।" প্রাচীন কালে গুণের এতই আদর ছিল। তখন বর্ত্তমান কালের ন্যায় পৈতা দেখিয়া ব্রাহ্মণ চিনিতে হইত না। শরীরে ব্রহ্মতেজ দেখিয়াই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানা যাইত। ব্রাহ্মণদিগের এত গুণ ছিল বলিয়াই দেবতারাও তাঁহাদিগকে ভয় করিতেন ; এত গুণ ছিল বলিয়াই ভগবান্ স্বয়ং ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ যে কেবল এই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন এমত নহে, তাঁহারা শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের মহিমা রক্ষার্থে যত্ন-পূর্ব্বক সেই সকল বিধি প্রতিপালন করিয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের ন্যায় তাঁহাদের স্বার্থবোধ ছিলনা বলিয়াই তাঁহারা এই সমুদয় কঠোর নিয়ম পালন করিতে সক্ষম হইতেন। উদাহরণ স্বরূপ বিশ্বামিত্র, কাক্ষিবান, কবষ ঐলুষ ঋষি এবং বামদেবের বিবরণ বলিলেই যথেষ্ট হইবে। বিশ্বামিত্র ও কাক্ষিবান ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়াও তপস্যা বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বেদে কবষ ঐলুষ ঋষির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ; ইনি শূদ্র কুলোদ্ভব হইয়াও ক্ষমতা বলে ব্রাহ্মণ হন, এবং বেদের কতকগুলি সূক্তও রচনা করেন। অপর দিকে বামদেব ব্রাহ্মণ সন্তান। যে সে ব্রাহ্মণের সন্তান নহেন, সমাজ মধ্যে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের

কুলগুরু ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ বিশিষ্ঠদেবের সন্তান। আচার-ভ্রষ্ট হওয়ায় ইহার শূদ্রত্ব প্রাপ্তি দূরে থাকুক; চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা শাস্ত্রীয় নিয়ম পালনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে। ধন্য আর্য্য-ঋষিগণ। তোমাদের হৃদয়ের এতবল না থাকিলে, তোমরা দেবারাধ্য হইবে কেন?

যাঁহারা নিঃস্বার্থ, তাহাদের হৃদয়ের বল অধিক। তাহারাই নিজের দোষ স্বীকার করিয়া দণ্ড গ্রহণ করতঃ ধর্ম্মের মহিমা রক্ষা করিতে সক্ষম। আর যাহারা স্বার্থ-পরায়ণ; সুতরাং দুর্ব্বল-হৃদয়, তাহারাই স্বীয় পাপ গোপন করিতে চেষ্টিত হইয়া দণ্ড গ্রহণ করিতে কাতর হয়, এবং ধূর্ত্ততা প্রযুক্ত শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য নষ্ট করে। এইরূপ দুর্ব্বল-হৃদয় ক্রূরকর্ম্মাদিগের দ্বারাই হিন্দু-শাস্ত্র প্রক্ষিপ্ত দোষে কলুষিত হইয়াছে ও সমাজ অধঃপতনের অতল তলে নিমগ্ন প্রায় হইয়াছে। এইরূপ কুলাঙ্গারদিগের কর্ম্মহানি-জনিত আচরণেই সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। যখনই সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার্থ নিরাকার ঈশ্বর দয়ার পরবশ হইয়া সাকার অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন ;—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

হে অর্জ্জুন! যখনই যখনই ধর্ম্মের পরাজয় ও অধর্ম্মের জয় হয়, তখনই আমি অবতার গ্রহণ করিয়া থাকি। সাধুদিগকে পরিত্রাণ ও অসাধুদিগকে বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

ধর্ম্মের মহিমা রক্ষার্থে মানবকে নীতি শিক্ষা দিয়া চরিত্র বিষয়ে উন্নত করিবার জন্যই আদর্শ মানবরূপে ভগবানের অবতারের প্রয়োজন। বর্ত্তমান অবস্থায় যেরূপ ধর্ম্মহানি জনিত সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সেই আদর্শ পুরুষের চরিত্র সমালোচনা করিয়া তদনুসারে চরিত্র সংগঠন করতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি করিতে না পারিলে এই অধঃপতিত ভারতের পুনরুদ্ধারের আর কোন উপায় নাই।

হিন্দু-সমাজ কতকগুলি ব্যাধি কর্ত্তৃক বড়ই আক্রান্ত হইয়াছে। শীঘ্র উহার প্রতিকার আবশ্যক। যে সকল দোষ সমাজ হইতে অপনীত হইলে, সমাজের প্রকৃত হিত সাধিত হয়, সেই দিকেই সমাজ-সংস্কারক মহাশয়দিগের দৃষ্টি-পতিত হওয়া আবশ্যক। এবং তাঁহার আমূল সংশোধন হওয়াও উচিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আজকালকার বিচারজ্ঞানহীন সংস্কারক মহাশয়েরা সে দিকে হস্তক্ষেপ না করিয়া মনুতে কলম বসাইতে উদ্যত হইয়া হিতে বিপরীত করিয়া তুলিতেছেন। যাহা সহস্র সহস্র বর্ষ হইতে সমাজ কর্ত্তৃক আদরের সহিত প্রতিপালিত হইয়া একরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, যাহা সমাজস্থ প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে

দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে, সেই সকল বিধির পরিবর্ত্তন করা সহজ নহে এবং মঙ্গল জনক ও নহে। সে বিষয়ে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের অগাধ বুদ্ধি এবং যোগবল লভ্য জ্ঞানের ফল স্বরূপ শাস্ত্রে যে সকল সুনিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, সেই সকল বিষয় বর্জ্জিত বা রূপান্তর করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে প্রয়াস পাওয়া শ্রেয়স্কর নহে। মহাজ্ঞানী পরম কারুণিক নিরপেক্ষ ঋষিগণ হিংসা বৃত্তি পরিচালিত বা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই। সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল সাধনোদ্দেশেই শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। সুতরাং, তাহা পক্ষপাতশূন্য, হিতসাধক ও ভ্রমপ্রমাদপরিবর্জ্জিত। শাস্ত্রের প্রত্যেক বাক্যের মূলেই, তর্ক ও বিজ্ঞান মীমাংসিত, যুক্তি পরীক্ষিত প্রমাণ ও মহান্ সত্য নিহিত রহিয়াছে। উপযুক্ত জ্ঞানাভাব নিবন্ধন অনেকে শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া শাস্ত্রীয় শ্লোকের বিকৃত অর্থ করতঃ উহার সার বস্তু উপলব্ধি করিতে পারেন না। নিজেও ভুল বুঝেন, অপরকেও ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করেন। বিকৃত বুদ্ধি অনধিকারী ব্যক্তির বা কতকগুলি ধর্ম্মদ্রোহী স্বার্থপরায়ণ পণ্ডিতের নীচ স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূল ব্যাখ্যাতেই এবং অপরিণামদর্শী ক্রূরকর্ম্মাদিগের ক্রূর কর্ম্মের ফল স্বরূপ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের দোষেই সময়ে সময়ে শাস্ত্রের প্রতি আমাদের ভক্তির হ্রাস হইয়া যায়। কিন্তু যখন মনে হয় শাস্ত্র নিরপেক্ষ স্বার্থশূন্য সমদর্শী পরম দয়ালু অলৌকিক জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ দেবারাধ্য মুনি ঋষিদিগের বহুকালার্জ্জিত এবং বহু কষ্টলভ্য যোগবল সম্ভূত অসীম জ্ঞানের সুধাময় ফল, তখন শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় এবং বিকৃত ব্যাখ্যাকারীদিগের প্রতি অনধিকার চর্চ্চা হেতু ও স্বার্থান্ধ ব্যক্তিবর্গের উপর নীচ স্বার্থ বৃত্তি পরিচালনের জন্য বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় বাক্যের প্রতি আমাদের অবিশ্বাস নাই। সেই জন্য মনু প্রমুখ ঋষিদিগের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে পরামর্শ দিই না। সমাজ মধ্যে যে সকল কুরীতি প্রচলিত হইয়া সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতেছে, যাহার সহিত ধর্ম্মের কিছু মাত্র সংস্রব নাই, যদ্দ্বারা অধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রশ্রয় পাইতেছে, এবং যদ্দ্বারা ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত ও নীতির মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে, আমরা সেই সকল ব্যাধির প্রতিকার করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে বলি।

আমাদের যদি কিছু মাত্র লজ্জা ও আত্ম-সম্ভ্রমবোধ থাকে, তাহা হইলে সম্মতি আইনের বিষয় চিন্তা করিয়া সমাজের দোষ অপনোদন করিবার জন্য সকলের প্রাণপণে চেষ্টা করা একান্ত বিধেয়। সম্মতি আইনের ব্যাপারেও যদি আমাদের চৈতন্যের উদয় না হয়, তবে আমাদের ন্যায় বাক্-সর্ব্বস্ব, অসার জীব জগতে আর আছে কিনা সন্দেহ। সমাজে নানাবিধ দোষ থাকিলে ও আমরা নিম্ন লিখিত কয়েকটীকে সমধিক গুরুতর দোষ বলিয়া মনে করি।

১। বিবাহে পণ গ্রহণ বা পুত্রকন্যা বিক্রয়।

২। রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীকে এক ঘরে শয়ন করিতে দেওয়া।

৩। বংশগত গুরুপুরোহিতগ্রহণ প্রথা।

৪। স্ত্রী সত্বে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ।

৫। সন্তান সন্ততি বর্ত্তমানে স্ত্রীবিয়োগ হইলে পুনরায় বিবাহ।

৬। ক্রিয়াকাণ্ডহীন ভ্রষ্টাচার ব্যক্তির উত্তরাধিকার।

৭। বংশগত কৌলিন্যপ্রথা

৮। এক এক জাতির মধ্যে নানাবিধ সাম্প্রদায়িক বিভাগ।

আগামী বার হইতে আমরা প্রত্যেকটীর দোষ গুণ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ক্রমশঃ।

অসমুদ্রোত্থিত রত্ন।

৬

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভোঽয়ং গুরুর্দ্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

অর্থ—শিষ্যের অর্থ অপহারক গুরু জগতে অনেক, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহারী গুরু জগতে দুর্লভ।

৭

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ, প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিজীবিষু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ॥

অর্থাৎ মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতি জড় পদার্থ হইতে কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী শ্রেষ্ঠ; কীট পতঙ্গ প্রাণী হইতে তুরঙ্গ মাতঙ্গ প্রভৃতি বুদ্ধিশালী জীব শ্রেষ্ঠ; তুরঙ্গ মাতঙ্গ অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ; মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণ হইতে বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ; বিদ্বান্ অপেক্ষা উদ্যোগী পুরুষ শ্রেষ্ঠ; উদ্যোগী পুরুষ অপেক্ষা ক্রিয়াশীল শ্রেষ্ঠ; এবং ক্রিয়াশীল অপেক্ষা ব্রহ্মবাদী শ্রেষ্ঠ।

৮

বক্তারো বহবঃ সন্তি প্রিয়াপথ্যস্যভাষিণঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য শ্রোতা বক্তা চ দুর্ল্লভঃ॥

অর্থ—মিষ্ট অথচ অহিতকারী কথা বলিতে অনেকে আছেন; কিন্তু মিষ্ট অথচ হিতকারী কথা শুনিতে বা শুনাইতে পারে এরূপ লোক জগতে অতি বিরল।

৯

নৈ সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধাঃ
ন তে বৃদ্ধা যে ন বদন্তি ধর্ম্মং।
না সৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনাভ্যুপেতম্॥

অর্থ—সে সভা সভাই নহে যেখানে বৃদ্ধের সমাগম হয় না; তাঁহারা বৃদ্ধই নন যাঁহারা ধর্ম্ম কথা বলেন না; সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয় যাহাতে সত্য নাই; আর তাহা সত্যই নহে যাহা কপটতাপূর্ণ।

১০

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যথা ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্য-মেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসা-বৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

অর্থ—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ত্রিবিধ বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন। যে বুদ্ধির দ্বারা জীব ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, কর্ত্তব্য কি, অকর্ত্তব্য কি, আর অশুভ কার্য্য কি, শুভ কার্য্যই বা কি বুঝিতে পারে, এবং কিরূপে তাহার বন্ধন এবং মোক্ষ হয় তাহা ঠিক করিতে পারে; সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। যে বুদ্ধিতে মানব কার্য্যাকার্য্যে এবং ধর্ম্মাধর্ম্মে সন্দিগ্ধ চিত্ত হয় অর্থাৎ কোন্ কর্ম্মে অধর্ম্ম হয় কোন্ কর্ম্মে ধর্ম্ম হয়, কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য কোন্ কার্য্য অকর্ত্তব্য এবিষয়ে স্থির নিশ্চয় হইতে পারে না, সেই বুদ্ধিকে রাজসী বুদ্ধি কহে। আর যে বুদ্ধিতে মানুষ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বুঝে এবং সকল বিষয়েই বিপরীত অর্থ ঘটাইয়া বসে সেই বুদ্ধিকে তামসী বুদ্ধি বলা যায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীনৃসিংহমুরারি পাঁজা।

সাধক-সঙ্গীত।

পাঁচ ফুলে সাজি না সাজাইলে বাহার খুলে না; পাঁচ-রঙ্গে চিত্র না করিলে চিত্র-সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় না; পাঁচ রসের বস্তু আহার না করিলে, সে আহারে তৃপ্তি জন্মে না। সেইরূপ কি সাপ্তাহিক, কি মাসিক, কোন পত্রিকা চালাইতে গেলে, তাহাতেও পাঁচ রকমের জিনিস না থাকিলে পাঠক-বর্গের মনোরঞ্জন হয় না। বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতির কঠোর-তত্ত্ব পাঠ করিয়া যখন পাঠকের মনে অবসাদ উপস্থিত হয়, তখন দুটো সুললিত-পদ্য কি এক আধটা সুমধুর-সঙ্গীত যদি পাঠকের নয়ন-পথে আইসে, তাহা হইলে পূর্ব্বাবসাদ ঘুচিয়া মনে কিছু শান্তির উদয় হইতে পারে। মাসিক-পত্রিকার আলোচ্য বিষয়গুলি চিন্তা-পূর্ণ ও শিক্ষা-প্রদ হওয়া প্রয়োজন। সেই-জন্য মানস করিয়াছি, উগ্রক্ষত্রিয়--প্রতি-নিধির পাঠকবর্গকে আমরা মধ্যে মধ্যে জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি উদ্দীপক সুমধুর-সঙ্গীত সঙ্ক-লন করিয়া উপহার দিব। এরূপ সঙ্গীত সঙ্কলনে বোধ হয় পাঠকের মনে বিরক্তি জন্মিবে না। মনে শান্তি দিতে জগতে সঙ্গীতের তুল্য আর কোন পদার্থই নাই। শত শত কবিতায় মনে যে ভাবের উদয় না হয়, একটী সঙ্গীতেই সে ভাবের উদয় হইয়া থাকে। তাই প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া-ছেন "গানাৎ পরতরো নহি।" পাশ্চাত্য কবিকেশরী সেকস্‌পিয়র বলিয়াছেন, "গানে যাহার মনমুগ্ধ না হয়, সে নরহত্যা করিতে পারে।" বাস্তবিক সংসারে যদি স্ত্রীলোক ও সঙ্গীত না থাকিত, তাহা হইলে সংসার জীর্ণ অরণ্যরূপে পরিণত হইয়া যাইত তাহার আর সন্দেহ নাই। বনের পশু, ক্রূরতম কাল-ভুজঙ্গ, ইহারাও সঙ্গীত শ্রবণে যখন মুগ্ধ হইয়া যায়, তখন সঙ্গীতের আলোচনায় আমাদের সহৃদয় পাঠকবৃন্দের মনে যে অপ্রীতির উদয় হইবেনা তাহাও কি আবার বলিতে হইবে?

কষ্ট কল্পনাদ্বারা নূতন গান রচনা করিয়া আমরা পাঠককে জ্বালাতন করিব না। রাম-প্রসাদ, দাশরথি, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক ও বিখ্যাত গায়কদিগের এবং গত ও বর্ত্তমান অপরাপর রচয়িতাগণের ও বাউল সম্প্রদায়ের যে সকল জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যোদ্দীপক মনো-মুগ্ধকর সঙ্গীত রচিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে, আমরা তাহাই সঙ্কলন করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। একই চন্দ্র নিত্য দর্শনে মনে বিরক্তির ভাব উৎপাদন করে না, স্ত্রী ও সন্তানের মুখ-কমল মুহুর্মুহু সন্দর্শন করি-লেও তৃপ্তি-বোধ হয় না; পরন্তু দর্শন লালসা ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হয়; সেইরূপ একই সুমধুর-সঙ্গীতও যদি পুনঃ পুনঃ আলোচিত হয়, তাহাতেও মনে বিরক্তির ভাব জন্মে না; যখনই শ্রবণ করা যায়, তখনই মনে নব-ভাবের উদয় হইয়া থাকে। প্রখর রবিতাপে তাপিত হইলে, যখন পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন সুশীতল জল-পানে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, এমন আর কিছু-তেই জন্মেনা। সেইরূপ সংসারের অশা-ন্তিতে মন যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন সঙ্গীত মনে যেরূপ শান্তি-প্রদান করিতে পারে, আর কিছুতেই তেমন পারে না। শুনিয়াছি সঙ্গীতে পুত্র-শোক নিবারণ করে।

রামপ্রসাদ, কললাকান্ত, দেওয়ান মহাশয় প্রভৃতি বিখ্যাত গায়কগণ কেবল মাত্র সঙ্গীতের আলোচনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। যতদিন জগতে সঙ্গীতের চর্চ্চা থাকিবে ততদিন "সাধক" বলিয়া তাহাদের নাম জগতে ঘোষিত হইবে। তাঁহাদের কৃত সঙ্গীত প্রচারই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে বলিয়া অমরা এই প্রবন্ধের নাম "সাধক-সঙ্গীত" রাখিলাম।

১

রাগিণী—মূলতান।

তাল—একতালা।

পদে প্রণাম জননি!
সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়িনী, সর্ব্বঘটে স্থিতি বাক্‌বাদিনী।
শ্বেত-সরোজিনী জিনি নিরঞ্জিনী,
শ্বেত-বরণী শ্বেত-পদ্ম বিরাজিনী,
পদে পদ দিয়ে, ত্রিভঙ্গহইয়ে, দাঁড়াও ব্রহ্মাণি॥
নীল-বসন অঙ্গ স্থিতি, দেবী-সরস্বতী,
বিংশতি শশি নখরে;
কজ্জলে পুরিত, লোচন শোভিত,
কণ্ঠে দুলিত মুক্তাহারে;—
ব্রজে যেমন বলরামের রূপ দেখিতে,
তেমনি রূপ মায়ের মোহন চূড়া মাথে,
কতশোভা করে, (ভারতী মাকে) বীণাযন্ত্রকরে,
নৃত্য-গীত-বাদিনী॥
চতুর্ব্বর্ণে বর্ণে, কার সাধ্য বর্ণে,
বর্ণময়ী ত্বং বর্ণরূপা;
স্মৃতি শ্রুতিমূল, তুমিই সর্ব্বমূল,
তুমি যারে কর কৃপা;—
বাল্মীকি আদি মহাকবি বেদব্যাস,
তোমারি কৃপায় কবিত্ব প্রকাশ,
পুরাও অভিলাষ, (মা দাসের) দাশরথিরদাস,
কৃষ্ণধনের এই বাণী॥

২

বাউলের সুর।

হরি হরি বল ও মন রসনা।
তোমায় বুঝালেও ত বোঝ না॥
হরি দীনের বন্ধু, হরি করুণাসিন্ধু,
বিপদ অন্ধকারে হরি পূর্ণ ইন্দু;—
হরি ক্ষুধার-ক্ষীর, পিপাসার নীর,
হরির নাইক তুলনা।
হরি নামটী সুধাময়, নামে পাপ তাপ দূর হয়,
নামে জন্মে ভক্তি জীবন্মুক্তি
আপনি হয় উদয়;—
নামে পাষাণে বীজ অঙ্কুর হয়
রয়না ভব যাতনা॥
নামে মজেছে যার মন, অনুরাগে তার ভজন,
নামে রূপে এক করে সে করে দরশন;—
তখন উথলে তার সুখের সিন্ধু
ঘুচে যায় ভয় ভাবনা।
পরিব্রাজক বলে, বৃথা রহিলে ভুলে,
তুমি কখন হরি বল্‌বে তোমার দিন বয়ে গেলে
তোমার হোক্ বা না হোক্ আর কোন কাম
হরি নামটী ভুলনা॥

৩

রাগিণী—ভৈরবী।

তাল—আড়া।

জাল পেতে জেলে রয়েছে বসে।
তারা আমার কি হবে মা শেষে॥
অগাধ সলিলে মীনচয়,
জাল পেতেছে জেলে ভুবনময়,
যখন যারে মনে হয়,
অমনি এসে ধরে মা কেশে।
পলাবার পথ নাই মা জালে,
পলাব কি আমায় ধরেছে কালে,
রাম প্রসাদ বলে মাকে ডাকিরে
শমন দমন করুক এসে॥

৪

রাগিণী—বিভাস।

তাল—আড়া।

শান্তি নিকেতন ছাড়ি শান্তি কোথায় পাবে বল।
সংসারে শান্তির আশা মরীচিকায় যথা জল॥
কভু সুখ পারাবার, কভু হয় হাহাকার,
জীবন যৌবন ধন সকলি অতি চঞ্চল।
আজি পুত্রের আলিঙ্গন, কালি তারে বিসর্জ্জন
আজি প্রিয় প্রেমালাপ;
কাল বিলাপ কেবল;—
সংসারের এই দশা, কোথায় শান্তির আশা,
শান্তি সুখ চাহ যদি, সে আনন্দ ধামে চল॥

৫

রাগিণী—ভৈরবী।

তাল—একতালা।

জাননা রে মন পরম কারণ কালী কখন মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি,
দনুজ দলয়ে নাশয়ে ভয়।
ব্রজ পুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন,
করয়ে সৃজন পালন লয়।
তারা আপনার মনে আপনি বাঁধা
এ ঘোর ভব যাতনা সয়॥
যে রূপে যে জনা, করয়ে সাধনা,
সে রূপে তাহার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে
কমল মাঝারে হও উদয়॥

ক্রমশঃ

বর্ণাশ্রম-বিবেক।

(জনৈক পূজ্যপাদ পরমহংসের বিবৃতি)

ভূমিকা।

আজকাল আর্য্য-জাতির সনাতন-ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইয়াছেন, এবং অনেক স্থানেই "হিন্দু-ধর্ম্ম-রক্ষিণী-সভা" "ব্রাহ্মণ-রক্ষিণী-সভা" "হরি-সভা" প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম-সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকল সভাতেই আর্য্য-শাস্ত্রের মনঃ কল্পিত ব্যাখ্যা হইতেছে। আমি অনেক সভায় গিয়া বক্তাদের বাক্‌চাতুরী শ্রবণ করিয়াছি; সর্ব্বত্রেই যেন বক্তাগণ কপট বেশধারী হইয়া

কেবল স্বার্থ-সিদ্ধিরই পন্থায় ফিরিতেছেন। কোন স্থানেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মকথা, বিশুদ্ধ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা বা বিশুদ্ধ ধার্ম্মিক বক্তা শুনিতে বা দেখিতে পাই নাই।

হিন্দু-শাস্ত্রে যতপ্রকার ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে তৎসমুদায়ই এক এক বর্ণ বা আশ্রমকে অবলম্বন করিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু আজকালকার শাস্ত্রব্যাখ্যা যেন হাটে দ্রব্য বিক্রয় করা হইয়াছে; হাটে জিনিষ আনিলে যেমন খরিদদারের জাতি-ধর্ম্ম জানিবার প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা এখন বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে প্রদত্ত হইতেছে। ইহাতে অধিকার অনধিকারের কোন বিচারই নাই; কিন্তু আর্য্য-ধর্ম্ম সে প্রকৃতির নয়; আর্য্য-ধর্ম্মের শিক্ষক—পিতা, মাতা, গুরু-পুরোহিত বা আচার্য্য ইঁহারাই হইয়া থাকেন। আজকাল কিন্তু সে নিয়ম নাই; আজকাল শূদ্র নাই, ম্লেচ্ছ নাই, সকলেই আর্য্য-ধর্ম্মের শিক্ষক ও ব্যাখ্যাতা হইয়াছেন। ইহাতে আর্য্য-ধর্ম্মের কতদূর যে হীনাবস্থা এবং দুর্গতি হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গকে আর আয়াস স্বীকার করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

যে আর্য্য-জাতির ব্রাহ্মণ হইতে ৩৬ বৎসর ব্যয়িত হইত, আজ সেই সেই ব্রাহ্মণ হইতে ১৷৷০ দেড় ঘণ্টাও লাগে না। ইহা অপেক্ষা আর্য্য-জাতির হীনদশার ও অবনতির আর কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব? প্রকৃত ব্রাহ্মণ কি আর দেখিতে পাওয়া যায়? যে সকল ব্রাহ্মণ ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, পূর্ব্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা, রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ-পুরাণ, বিংশতি ধর্ম্মসংহিতা, কাব্য-অলঙ্কার, ব্যাকরণ-সূত্র এবং এতাবৎ সমুদয় শাস্ত্রের ভাষ্য রচয়িতা, সে সকল ব্রাহ্মণের জ্ঞান-গভীরতার একবার পরিমাণ করিয়া দেখুন। এই সকল ভূ-পূজ্য ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ-লাভে মহাবীর্য্য-শালী ক্ষত্রিয় নরপতি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হইতেন। আজ সে সকল ব্রাহ্মণ কোথায়? আরও জিজ্ঞাসা করি, এই সকল ব্রাহ্মণ কি হাটে বাজারে শাস্ত্রকথা শুনিয়া ২।৫ দিনের মধ্যে কৃতবিদ্য এবং সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন?

যে শাস্ত্রোক্ত সংস্কার প্রভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণত্রয়ের মধ্যে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্রের আজ এইরূপ হীনদশা দেখিলে কোন্ ভারতভক্ত মানবের হৃদয় দুঃখে অধীর না হয়? আজ কপটীদের হাতে শাস্ত্রব্যাখ্যার ভার ন্যস্তহওয়ায় শাস্ত্রের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে এবং হিন্দু-জাতিও অধঃপাতে গিয়াছে। আর যতদিন শাস্ত্র লইয়া এইরূপ কপটাচার চলিবে, ততদিন ভারতের আর কল্যাণ নাই।

আর্য্য-শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, মনুষ্যের ব্রাহ্মণাদি জাতি নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণাদি বর্ণ গুণ-কর্ম্মাধীন। ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করিলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্বলাভ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণও আর ব্রাহ্মণ থাকেন না। এইরূপ অপরাপর বর্ণ সম্বন্ধেও বুঝিবে।

যে প্রকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র-জাতি শাস্ত্রানুসারে গঠিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত শাস্ত্র ও তৎসমুদায়ের ব্যাখ্যা সভ্যসমাজে আমরা ক্রমশঃ বিবৃত করিব। আশা করি বিদ্বান্-ব্যক্তিরা মনোযোগ-পূর্ব্বক এই সমস্ত তত্ত্ব-কথা পাঠ করিবেন এবং যাহাতে প্রকৃত ব্রাহ্মণাদি-জাতি ভারতে পুনর্জ্জীবিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টাবান্ হইবেন।

সূচনা।

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং
সর্ব্বসাক্ষি-সনাতনম্।
বর্ণাশ্রম-বিবেকাখ্যা
সংহিতেয়ং প্রচক্ষ্যতে॥

দেবগুরু বৃহস্পতি একদিন সীতাবিয়োগ-বিধুর রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলে, রাম তাঁহাকে যথোচিত সৎকার ও সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক কহিলেন—এই সংসারারণ্যে আসিয়া বিদ্যারূপা সীতার বিয়োগে আমি নিরতিশয় আকুল হইয়াছি। আপনি দেবাধিদেব ইন্দ্রের গুরু। আপনার সাধন ও সিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে। অতএব যাহাতে বিদ্যা-সীতা লাভ হয়, সেই উপায় আমাকে বিস্তারিত বলুন।

বৃহস্পতি কহিলেন—হে রাম, সুখ-লাভের উপায় একমাত্র ধর্ম্ম। আর অহিংসাই ধর্ম্ম, আত্মপীড়নই পাপ, স্বাধীনতার নামই মুক্তি এবং অভিলষিত ভোজন পানই স্বর্গসুখ। এতদ্ভিন্ন বৈদিক লোকেরা যে স্বর্গ মোক্ষের কথা বলিয়াছেন সে সর্ব্বৈব মিথ্যা। এ বিষয়ে আমার নিকট যথার্থ শাস্ত্র শ্রবণ কর। এই বলিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন;—

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়া চ ফলদায়িকা॥ ১॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকম্।
বুদ্ধি-পৌরুষ হীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥ ২॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হন্যতে॥ ৩॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামপি পিতৃণাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥ ৪॥
স্বর্গে স্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থিতানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥ ৫॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥ ৬॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ ধনিনির্গতঃ।
কথং ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥ ৭॥
তস্মাজ্জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।

মৃতানাঞ্চ প্রেতকর্ম্ম নন্বন্যৎ
বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশা-
চরাঃ।
জর্ফরিতুর্ফরীত্যাদি-পণ্ডিতানাং বচঃ
শ্রুতম্ ॥ ৯ ॥
অশ্বস্যাত্র শিশ্নস্তু পত্নিগ্রাহ্যং প্রকী-
র্ত্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তৎবৎ পরঞ্চৈব গৃহ্যযাতং
প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০ ॥
মাংসানাং খাদনং তদ্বৎ নিশাচর-
সমীরিতম্ ॥ ১১ ॥
ত্যজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং
দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীন্ বিহায়তি সিতোত্তমতণ্ডু-
লাঢ্যান্।
কো নাম ভো তুষকণোপহিতান্
হিতার্থী ॥ ১২ ॥

অর্থাৎ স্বর্গও নাই, মোক্ষও নাই, স্বর্গ মোক্ষের ভোক্তা আত্মাও নাই; বর্ণাশ্রমাধিকারীগণের ক্রিয়াও নিস্ফল; অগ্নিহোত্র কর্ম্ম এবং সাম, ঋক্, যজুঃ তিন বেদ, ত্রিদণ্ডধারণ, ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্রক ধারণ, ইত্যাদি কেবল বলবুদ্ধিহীন মনুষ্যের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপে বেদকর্ত্তাদের দ্বারা বিহিত হইয়াছে। জ্যোতিষ্টোম আদি যজ্ঞে নিহত পশুর যদি স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তবে যজমান আপনার বৃদ্ধপিতাকে যজ্ঞে হনন করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করেন না কেন?; শ্রাদ্ধান্ন যদি মৃতব্যক্তির তৃপ্তির হেতু হয়, তাহা হইলে বিদেশগামী পিতামাতার পাথেয়ের বন্দোবস্ত করা কেন? এখানে অন্নবস্ত্রাদি দান করিলে যদি স্বর্গস্থিত পিতামাতার তৃপ্তিলাভ হয়, তাহা হইলে প্রাসাদোপরিস্থিত পিতামাতার তৃপ্তির জন্য রন্ধনশালায় অন্নদান করা হয় না কেন? যতদিন জীবিত আছ, ততদিন সুখে জীবন যাপন কর। গৃহে যদি অর্থ না থাকে, তাহা হইলে ঋণ করিয়া ঘৃতপান করিবে। আর চিতায় দগ্ধ যে দেহ তাহার আবার মর্ত্তে পুনরাগমন সম্ভব কোথায়? দেহ হইতে আত্মা যদি পৃথক্ হইয়া স্বর্গে গমন করিত তাহা হইলে মর্ত্তে পরিত্যক্ত বন্ধুদের স্নেহে আকুল হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করে না কেন? এই যে যাগ যজ্ঞাদি এ সমস্ত ব্রাহ্মণেরা আপনাদের সুখের জন্য বিধান করিয়াছেন; মৃতব্যক্তিদের উদ্দেশে যে প্রেতক্রিয়া অর্থাৎ ষোড়শদানাদি সে সমুদয় কেবল ব্রাহ্মণদের জীবনোপায়মাত্র, উহাতে অন্য কোন ফল নাই। বেদের কর্ত্তা তিন জন—অর্থাৎ ভণ্ড, ধূর্ত্ত আর নিশাচর; জর্ফরিতুর্ফরি প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্র কেবল পণ্ডিত লোকের কথামাত্র। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের শিশ্ন যজমানের পত্নী ধারণ করিবে ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই অর্থে ভণ্ডেরা গৃহ্যসূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অশ্ববলি, নরবলি, ছাগবলি প্রভৃতির যে বিধান তাহা মাংস ভোজী নিশাচরেরা তৈয়ার করিয়াছে; মূর্খেরা বিষয় সঙ্গ জন্য সুখকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছে; তাহারা বলে যে, যতপ্রকার বিষয় সুখ আছে তাহাতে কোন না কোন প্রকারের দুঃখ মিশ্রিত আছে; যে ব্যক্তি

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হয় সে উত্তম তণ্ডুলে তুষ আছে বলিয়া কি তাহা ত্যাগ করে? না পক্ষী, পশুপাল, মূষিক শস্য নষ্ট করে বলিয়া কি মানুষ শস্য বপন করিবে না? না ভিক্ষুক আসিয়া উৎপাৎ করে বলিয়া কি কেহ ঘর দ্বার করিবে না, না স্ত্রীর রোগাদি হয় বলিয়া কেহ বিবাহ করিবে না?

রামচন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে চন্দ্রমণিবিদ্যাধর নামে এক ব্রাহ্মণ তথায় উপনীত হইলেন। তৎক্ষণাৎ বৃহস্পতি রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে লম্বশাটপটাবৃত, তুমি কি কিছু ধর্ম্মতত্ত্ব জান? ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির এইরূপ অশিষ্টজনোচিত কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন—আপনি কে? ভূ-পূজ্য ব্রাহ্মণকে দর্শন করতঃ প্রণামাদি না করিয়া অকারণে কটূক্তি করিতেছেন। বৃহস্পতি ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন—যদি তুমি ব্রাহ্মণ তবে তোমার কটূক্তিতক্তের ভেদাস্বাদন হয় কেন? ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দা স্তুতি, মান অপমান, লাভালাভ, জীবন মরণাদি সবই সমান। তুমি একটু কথাতেই এত ব্যাকুল হইলে? আর তুমি যে ব্রাহ্মণ তাহার প্রমাণ কি?

ক্রমশঃ

সৃষ্টি ও প্রলয় রহস্য।

এই মহাজগতে বাস করিয়া সকলেই দেখিতে পান, কত গ্রাম রাজ্য মহারাজ্য এই মহাপৃথিবীমণ্ডলের সহিত অনন্ত শূন্যপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আবার দেখা যায় এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল হইতেও কত বৃহত্তর গ্রহ উপগ্রহ কোন অলক্ষ্য নীতির মর্য্যাদা বিন্দুমাত্র অতিক্রম না করিয়া স্ব কক্ষায় প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, সকলের শাস্তা স্বরূপ বৃহত্তম সূর্য্যপিণ্ড উহাদের ভ্রমণ চক্রের কেন্দ্রস্থানে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। যাঁহার অপ্রতিহত চিন্তাশক্তি অন্ততঃ একদিন আপনার ক্ষুদ্র দৃষ্টির পরিচায়ক নিজ ক্ষুদ্র কক্ষ ছাড়িয়া আপনার ক্ষুদ্র অভিমানের ক্ষুদ্রাবলম্বন নিজ পরিবার দেশ বা রাজ্যের ভাবনা তুচ্ছ করিয়া সুন্দর শূন্যপথে একবার প্রসারিত হইয়াছে, যিনি অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির অনন্ত ক্রিয়াশক্তি দেখিয়া কোন দিন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃই একটী প্রশ্ন উত্থিত হয়।

আজ যাহা দেখিতেছি, কাল যাহা দেখিয়াছি, আবার কাল তাহার কিছুই দেখিব না; আজকার মহাসাম্রাজ্য কাল সাগরগর্ভে পরিণত হইবে। আজ যেখানে অকূলস্পর্শ সমুদ্র, কয়েকদিন পরে কে জানে সেখানে কত হিমাদ্রি শিখর সৃষ্টি হইবে। আজ পর্য্যন্ত মনুষ্যের দৃষ্টি যাহা দেখিয়াছে, তাহা এইরূপ নাশধর্ম্মী—মৃত্যুধর্ম্মী—পরিবর্ত্তন ধর্ম্মী। এই প্রকাণ্ড বিশ্বসৃষ্টির এই সকল নাশময়

পদার্থের সমষ্টি মাত্র—অনন্ত কোটী নাশ লইয়াইত এই জগতের জীবন। ক্ষুদ্রে যে অক্ষয় সত্য দেখিলাম, মহতে কি সে নীতির ব্যতিক্রম দেখিব? এই কথা মনে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটী মহাপ্রশ্ন উত্থিত হয়। এ সৌর জগতের কি নাশ হইবে? আমি তুমি নই সে ত দুই দিনের কথা, আমি তুমি লইয়া যে এই মনুষ্য সংসার ইহাও নয়, কত দিন বা ইহার সৃষ্টি হইয়াছে এবং কতদিন বা ইহার ভবিষ্যৎ জীবন আশা করা যাইতে পারে? আর তোমার কল্পনার চরম সীমা এই পৃথিবীও নয়, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী হইতে বৃহত্তর—কত শত গুণে বৃহত্তর মহা বিশ্ব—এই সৌর জগৎ কি নষ্ট হইবে? এই প্রশ্নের সহিত আর একটী প্রশ্নের নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন "নাশঃ কারণলয়ঃ" তাই বলি নাশের সহিত উৎপত্তির বা উৎপত্তিকারণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এখন যাহা নষ্ট হইতে দেখিলাম কোন কালে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, এটী মনুষ্য মাত্রেরই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস।

পদার্থ মাত্রের সাধারণ ধর্ম্মের দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে সহজে মনে হয় যে, এ মহাজগতের একদিন উৎপত্তি হইয়াছিল, আবার একদিন ইহার নাশ হইবে, এই টুকু জানিলেই মানুষের জ্ঞানপিপাসা মিটে না; উৎপত্তি ও নাশ পদার্থ মাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম, ইহাতে আর জানিবার কি আছে? কি করিয়া জগতের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে বা কি অবস্থা ছিল, যে দিন ইহার সৃষ্টি ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার পরে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া এভাবে দাঁড়াইয়াছে? এ মহাজগতের ধ্বংসই বা কিরূপে হইবে? এই বিষম প্রশ্নগুলি সকল সন্দেহের সার কথা, এই সন্দেহগুলি না মিটিলে জ্ঞানপিপাসা তৃপ্তির আশা কোথায়?

আজ কেবল যে আমাদের মনে এই প্রশ্ন হইতেছে এমত নয়, যতদিন পৃথিবীতে সভ্য মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যতবার মানুষ বিতণ্ডা পূর্ণ তুচ্ছ পারিবারিক কথা দূরে রাখিয়া বিশাল বিশ্বসৃষ্টির কথা একবার ভাবিয়াছে, ততবার তাহার মনে এই মহা সমস্যা গুলি স্বতঃই উপস্থিত হইয়াছে। আবার দূর অতীত ইতিহাস হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ কর, এ মহা সমস্যা গুলির কতরূপ বিভিন্ন মীমাংসা পাইবে। সকলে নিজ জিন জ্ঞান ও শিক্ষা অনুসারে ইহার সত্য নিরূপণ করিয়াছেন। নিজ নিজ জ্ঞানের গুরুত্বানুসারে প্রশ্নের গুরুত্ব হইয়াছিল, শুদ্ধ কবির কল্পনায় মনের সন্দেহ মিটে নাই।

ভারতবর্ষে আর্য্য-ঋষি বলিয়া এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, যাহার কথা শুনিয়া শিক্ষিত তুমি একটু মুচকি হাসি হাসিবে—বলিবে তাহারা ত অসভ্য। এখানে তোমার বিশ্বাসের কথা হইতেছে না, আমারা বলিতেছি তাঁহারা এই প্রশ্ন না হউক জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ কতকগুলি প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন। সে প্রশ্নের ভাষা এবং ততোধিক দুরূহ উত্তর সে সকল তুমিও বুঝিবে না, আমিও বুঝি না, তবে সে কথায় কাজ কি? তুমি বুঝ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জড়ভূত চিরকালই আছে। তোমার জিজ্ঞাস্য, তদন্তর্গত শক্তির কিরূপ ভাবে সংযোগ বিয়োগে জগৎ বর্ত্তমান অবস্থাতে পরিণত হইল। তোমার

যাহা জিজ্ঞাস্য আর্য্য মনিষীগণ তাহা বুঝিবার জন্য ইচ্ছা করেন নাই, তাঁহারা জগতের কারণস্বরূপ নির্ণয়ে মহাব্যস্ত, কোন অনাদি অক্ষয় পদার্থের বিকারে প্রথমে বুদ্ধির বিকাশ হইল, তাহার আর একটু বিকারে অভিমান সৃষ্টি হইল তাহার পর অবশেষে এই সূক্ষ্মভূতের অবস্থা হইল তাহাই তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য। তাই বলি তাঁহাদের কথা তোমরা বুঝিবে না আর তোমাদের কথাও তাঁহারা বুঝিতে চান নাই। অতএব আইস জ্ঞান-প্রভাবিত জগৎগুরুগণকে নমস্কার করিয়া আমাদের কাজ আমরা করি। ছোট মুখে বড় কথা সাজে না।

জড় ভূতের সৃষ্টি হইতে ভৌতিক জগতের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রণালী বুঝাই আমাদের লক্ষ্য। যদি বিশ্বাসের কথা হইত তাহা হইলে কল্পনার জোরে স্বপ্নের ঘোরে যাহা মনে লাগিত, তাহাই বিশ্বাস করিলে চলিত—যদি বিলাতের অমুক বড় লোক বলিয়াছেন; এই ভাবিয়া অবিচার্য্য সত্য বোধ হইত তাহা হইলে এখনই প্রবন্ধের উপসংহার করিলে চলিত। ইহাত মানুষের মনের ঘোর সন্দেহের কথা; সকল সন্দেহের মীমাংসায় যেমন প্রমাণ প্রয়োগ চাহি, এসকল প্রশ্নের মীমাংসায় অন্ততঃ সেইরূপ প্রমাণ না হইলে কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়? যাঁহাদের চিন্তা শক্তির যাহায্য লইয়া—যাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া—এই সৃষ্টি তত্ত্বের কথা বলিতে যাইব, তাঁহারা সভ্য ইউরোপ সমাজে অতি প্রধান ব্যক্তি। তাঁহাদের এক জনের নাম ক্যাণ্ট (Immanuel Kant) জর্ম্মনীর একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, আর একজনের নাম লাপলাস (Laplace) ফ্রান্সের একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ। যখন ইহাঁদের কথা লইয়া কথা বলিতে হইবে তখন ইহাঁদের একটু পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন। ক্যাণ্ট তাঁহার সমসাময়িক দার্শনিকগণ হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোচনা যে ভাবে অনুপ্রাণিত, ক্যাণ্টের হৃদয়ে সে ভাবের অভাব ছিল না। কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে ক্ষেত্রের অভাবে সে ভাবের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে নাই। কএক বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানের সত্য নির্ণীত হইত শুদ্ধ চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে স্থাপিত তর্কের বলে; ক্রমে সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞান বলিলে যাহা বুঝাইত, এখন তাহা হইতে অনেক ভিন্ন বুঝায়। আজ বৈজ্ঞানিক বোঝেন বিজ্ঞানালোচনার মহাপ্রাণ "Fact is the test of truth" প্রত্যক্ষ সিদ্ধ প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন তত্ত্ব স্থির হয় না এই মূল মন্ত্র। এখন একজন বৈজ্ঞানিককে কোন তথ্য জিজ্ঞাসা কর তিনি পরীক্ষা না করিয়া অথবা একটী দুইটী পরীক্ষা মাত্র করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না; অসংখ্য ভিন্ন উপায়ের দ্বারা কোন তত্ত্ব স্থির করিতে পারিলে তবে তাহা ব্যক্ত করিবেন। আমরা এমন বলিতেছি না যে এক্ষণে যাঁহারা ইউরোপের জ্ঞান চর্চ্চায় অগ্রণী, তাঁহারা সকলেই এই কথা স্মরণ করিয়া সকল সময় কার্য্য করেন। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ যে যত্ন পরিশ্রম ও সতর্কতার সহিত

বিজ্ঞানের একটা কথা বলিয়া থাকেন তাহা যদি ইউরোপের সকলের থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ভাষা শিক্ষার ব্যাগ্রতায় অসংখ্য হিন্দুশাস্ত্র গোগ্রাসে উদরস্থ করিয়া কতকগুলি মহাপুরুষ নূতন নূতন Theory আবিষ্কার করিতেন না। আমরা বলিতেছিলাম যে ক্যাণ্ট বিজ্ঞানের কল্পনাজগতে অতি শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি কল্পনা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ নির্ণয় বড় ভাল বাসিতেন। সে সময়ে এইভাবে বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নাই যে অভীষ্টানুরূপ উপায়ে তর্কের সকল কথা স্থির করিবেন, তাই শব্দ সাহায্যে অনেক কথা ঠিক করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এখনকার দিনে—যখন প্রত্যক্ষ দর্শনাবলম্বন না করিয়া কোন সত্য নির্ণয় করিলে তাহা অগ্রাহ্য হয়, তখন মহামনা ক্যাণ্টের কথা অগ্রাহ্য হইতে পারে। কিন্তু ক্যাণ্ট শব্দ কল্পনার সাহায্যে যাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন, লাপলাসের অসাধারণ প্রতিভা তাহারই সমর্থন করিয়াছে। একদিকে ক্যাণ্টের বিশ্বব্যাপিনী কল্পনা অপরদিকে লাপলাসের অতিমানুষী গণিত প্রতিভা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে আজ আমরা তাহারই মোটামুটি কএকটী কথা বলিব।

বিজ্ঞানের অভিমান প্রত্যক্ষ নির্ণয় (observation) দ্বারা মীমাংসিত বিষয় লইয়া। যেখানে বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ নির্ণয় করিতে পারিলেন না সেই খানেই সন্দেহবাদ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র মানবদেহ পরিমিত বুদ্ধি লইয়া এমন কোন্ বৈজ্ঞানিক আছেন, যিনি বলিতে পারেন, কে জানে কত কোটী কল্প অতীত হইল যে সৌর জগতের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সৃষ্টি প্রক্রিয়া মনুষ্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ নির্ণয় সাধ্য? সুদূর ভবিষ্যতে যাহার ধ্বংস হইবে সন্দেহ করা যাইতে পারে, তাহার কোন কথাও observation দ্বারা স্থির হইবে? তবু বিজ্ঞান জগতের শীর্ষ স্থানীয় লাপলাসের নাম করিয়া যেখানে প্রত্যক্ষ নির্ণয় অসম্ভব এমন বিষয় বুঝাইবার প্রয়াস কেন?

ভূত ও ভবিষ্যত বর্ত্তমানে অনুভূত। আজ তুমি যাহা দেখিতেছ সুদূর ভূতগর্ভে তাহা বীজ ভাবে ছিল—সুদূর ভবিষ্যতে তাহারই একটু বিকৃত অবস্থা মাত্র দেখিবে। আজ বাঙ্গালী অধঃপতিত জাতি, কিন্তু আজ হইতে সাত শত বৎসর পূর্ব্বে যখন বক্তিয়ার বঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন তখন এই অধঃপাতের সূত্র বাঙ্গালী রাজা বাঙ্গালী মন্ত্রীর ব্যবহারে বোঝা যায় নাই কি? কিম্বা আজ হিমালয় শৃঙ্গে কএক খণ্ড জলচর জীবের অস্থিপঞ্জর দেখিতে পাইলে মনে হয় না কি—যে কত উচ্চ হিমালয় পর্ব্বতও এক দিন জলমগ্ন ছিল? তাই বলি বৈজ্ঞানিক বর্ত্তমানে অতীতের ও ভবিষ্যতের প্রতি অঙ্ক স্পষ্ট দেখিতে পান, এবং ইহাকেই তাঁহারা প্রত্যক্ষ নির্ণয় বাদ বলেন।

এইখানে আর একটী কথা বলিতে হইল—অনেকের বিশ্বাস আছে in the begining God created the heaven and earth জগৎস্রষ্টা এক দিনে পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া অবসর লইয়াছেন। একথা আমরা বিশ্বাস করিতে

পারি না, কোন জ্ঞানীলোক ইহাতে বিশ্বাস করেন কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও শৈবী শক্তিত্রয়ের এক সময়ে আবির্ভাব হইয়াছে, একদাই ক্রিয়া হইয়া থাকে এবং এক সময়ে সকলের ক্রিয়া কারণে লীন হইবে। হিন্দুরা নিত্য সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ে বিশ্বাস করিতেন আমরা তাহারই কথা উল্লেখ করিতেছি! আমরা আরও বলি নিত্য প্রলয় ও সৃষ্টি কল্পান্ত প্রলয় ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অনুরূপ ক্রিয়া মাত্র। যখন দেখি একটী শত কোটি যোজন বিস্তীর্ণ বাষ্প পিণ্ড (Nebulousmass) আকাশ পথে ঘুরিতে ঘুরিতে নিরন্তর তাপ মোক্ষণের ফলে, কএক দিন পরে একটী প্রকাণ্ড জড়পিণ্ডে পরিণত হইল—হয় ত আমাদের পৃথিবীর ন্যায় তাহাতে নূতন জীবের সৃষ্টি হইল কেমন রাজ্য রাজা প্রজা হইল—তখন কি মনে হয়? বোধ হয় আমাদের এই পৃথিবী, আমাদের এই সৌর জগৎ উহারই অনুরূপ কোন ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। প্রত্যক্ষ নির্ণয় বাদী বৈজ্ঞানিক বাষ্পপিণ্ডকে (Nebulousmass) স্থূল জড়পিণ্ডে পরিণত হইবার চেষ্টা দেখিয়াছেন, তাই অনুমানে সৌরজগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

শ্রীমোহিনীমোহন রায়।

উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ ও সম্মতি আইন।

(প্রতিবাদ)

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধির প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় "জনৈক স্বসমাজ হিতৈষী উগ্রক্ষত্রিয়" "উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ ও সম্মতি আইন" শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার ২।৪টী কথা বলিবার আছে, প্রতিনিধি তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিলে চরিতার্থ হইব।

সমাজ হিতৈষী (?) মহাশয় লিখিয়াছেন, "আজকাল উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত হইতেছে * * * * * * ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে সমাজের এ অবস্থা ছিলনা * * লেখা পড়ার চর্চ্চা তখন খুবই কম ছিল" ইত্যাদি। লেখকের মনোগত ভাব ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় শিক্ষিত অর্থে বর্ত্তমান ইংরেজী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং লেখাপড়া অর্থে ইংরেজী লেখাপড়া বলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কেবল উগ্রক্ষত্রিয় জাতিকে লক্ষ্য করিয়া ও কথা বলিবার বিশেষ কারণ বা আবশ্যকতা ছিলনা, ভারতবর্ষের সকল জাতি সম্বন্ধেই কথা গুলি সত্য। অথবা যদি কোন বিশেষ স্থান উদ্দেশ করিয়া লেখক মহাশয় এ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা

হইলেও আমি তাঁহাকে দোষ দিতে পারিনা। কিন্তু তদ্বিপরীতে যদি সাধারণ অর্থে "হিতৈষী" মহাশয় ঐ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে, অথবা তিনি সমগ্র উগ্রক্ষত্রিয়-জাতির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। বহুকাল হইতে বর্দ্ধমান জেলাতেই অধিকাংশ উগ্রক্ষত্রিয়ের বাস, এমন কি বর্দ্ধমান উগ্রক্ষত্রিয় জাতির জেলা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। লেখক মহাশয় যদি কিছু কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিতেন তাহা হইলে জানিতে পারিতেন যে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে অনেকেই তখনকার প্রচলিত পার্শী ও বাঙ্গলা ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন।

সম্মতি আইন সম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের অভিপ্রায় স্পষ্টই বুঝাগেল যে, নূতন আইনে তাঁহার মতে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। যে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ হুলস্থূল ব্যাপার ঘটাইবার কোন কারণ ছিলনা বা নাই। পরিবর্ত্তন এই যে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৫ ধারায় ১০ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে অভিগমন করিলে বলাৎবারের অপরাধ হইত, এখন দশের পরিবর্ত্তে বার দশ হইয়াছে এই মাত্র। আইনটাত বরাবরই আছে, তবে পূর্ব্বে বাল্যা স্ত্রী ১০ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই সহবাসে সম্মতি দিতে পারিত এখন ১২ বৎসর না হইলে দিতে পারিবে না। বোধ হয় লেখক মহাশয়ের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে পূর্ব্বে যখন বাল্যা স্ত্রী ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আপন স্বামীর সহিত, অথবা তাহার স্বামী পত্নীর ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার সহিত সহবাস না করিয়া থাকিতে পারিত তখন নূতন আইনানুসারে না হয় আর দুই বৎসর অপেক্ষা করিবে। এজন্য এত হুলস্থূল কেন? আহা মরি লেখক মহাশয়ের কি কল্পনা শক্তি! কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান! কি অদ্ভুত সমাজ হিতৈষিতা! এই সামান্য ২ বৎসর বয়োবৃদ্ধির পরিবর্ত্তনে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইল তাহা কি লেখক মহাশয়কে আবার নূতন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে? বুঝাইতে পারি, কিন্তু লোকে পাছে নির্লজ্জ বলে এই ভয়। আইন কর্ত্তারা যখন দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৫ ধারাতে ১০ বৎসর বয়সের পর সম্মতির বিধি করিয়াছিলেন তখন অবশ্যই তাঁহারা সাতপাঁচ ভাবিয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ঐ বিধি করিয়াছিলেন, অবশ্যই বলিতে হইবে, যে অন্ধের মত যাহা মনে আসিয়াছিল তাহাই একটী লিখিয়া ফেলেন নাই। এই ভাবিলেই লেখক মহাশয় বুঝিতে পারিতেন যে, আইনের এই সামান্য পরিবর্ত্তনটী এত ভয়ের কারণ কেন এবং কিজন্যই বা লোকে এত হুলস্থূল করিতেছেন বা করিয়াছেন।

এই গেল সহবাস সম্মতি প্রসঙ্গের একদিক। প্রসঙ্গের অপর দিক সম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের জ্ঞান ও বিশ্বাস এই যে "উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে গর্ভাধান ক্রিয়া অন্যূন অধুনা ছিল না; যাহা ছিল তাহা "মেয়েলি" রকমের; শাস্ত্রীয় বিধানের কোন অঙ্গই তাহাতে পরিগৃহীত হইত না; সুতরাং আইনে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে উক্ত ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইল এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।" লেখক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি এই জ্ঞান তাঁহার কোথা হইতে জন্মিল।

লেখক মহাশয় কি কোন গবর্ণমেণ্ট আফিসে কাজ করেন? তাহা হইলে একদিন এ কথা বলা একরূপ সম্ভবপর—নুন খাইলেই গুণ গাইতে হয়। অথবা কি লেখক মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজে গতিবিধি আছে? যাহাই হউক কোন একটা বিষয়ের মতামত প্রকাশ করিতে হইলে—একটা সমাজের সাধারণ কোন প্রসঙ্গ সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে বিষয়টা ভালরূপে অনুসন্ধান করা উচিত। লেখক মহাশয় কি তাহা করিয়াছিলেন? বোধ হয় না। করিলে সহজেই জানিতে পারিতেন যে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির গর্ভাধান-ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা তিনি লিখিয়াছেন তাহা ভ্রমসঙ্কুল। অবশ্যই স্বীকার করি যে কোন কোন স্থানে কোন কোন জাতির মধ্যে ক্রিয়াটা যতদূর ঘটার সহিত সাধারণের জ্ঞাতসারে প্রকাশ্যভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে এ জাতিতে সেরূপ নহে। কিন্তু তাহা জাতিভেদে নহে, স্থানভেদে। ব্রাহ্মণজাতির মধ্যেও সকল স্থানে একরূপ ঘটার সহিত গর্ভাধান ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এরূপ নহে। কিন্তু তা বলিয়াই যে সকল স্থানের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ক্রিয়াটা নাই তাহা বলা যাইতে পারে না। বর্দ্ধমান জেলার কোন কোন স্থানে ক্রিয়াটা প্রায়ই ঘটার সহিত সম্পাদিত হয় না; সেই জন্যই ক্রিয়াটা এই জাতির মধ্যে তত প্রকাশ্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া যে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে ক্রিয়াটা নাই একথা কোনরূপেই বলা যাইতে পারে না। লেখক মহাশয় প্রকাশ্যভাবে ঘটার সহিত ক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় না বলিয়াই "মেয়েলি" রকমের বলিয়াছেন। "মেয়েলি" বলায় আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু "শাস্ত্রীয় বিধানের কোন অঙ্গই তাহাতে পরিগৃহীত হয় না" ইহাতেই আমার আপত্তি। "মেয়েলি" অর্থে তিনি কি বুঝিয়াছেন? যদি এই অর্থে বলিয়া থাকেন যে স্ত্রীলোকেরাই তাহার যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, পুরুষেরা তাহাতে বিশেষ সংস্রব রাখেন না, তাহাহইলে আমার বক্তব্য এই যে দশক্রিয়ার মধ্যে অন্যান্য কয়েকটী ক্রিয়াতেও পুরুষেরা বিশেষ সংস্রব রাখেন না। কিন্তু তা বলিয়াই যে দশক্রিয়ার মধ্যে অন্যান্য ক্রিয়াতেও শাস্ত্রীয় বিধানের কোন অঙ্গই পরিগৃহীত হয় না এরূপ বলা নিতান্ত ভ্রম।

উপসংহারে সমাজহিতৈষী মহাশয় সমাজের হিতার্থে এক উপদেশ দিয়াছেন। নূতন আইন যাহাতে কাহারও পক্ষে ক্ষতিকর হইতে না পারে তাহার উপায় বলিয়া দিয়া সমাজকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। যতদিন এই আইন চলিত থাকিবে সমাজ অবশ্যই তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার পক্ষে উপায়টা বাহির করিয়া সমাজে প্রকাশ করা যতদূর সহজ, সমাজের পক্ষে সেই অনুসারে কার্য্য করা ততদূর সহজ নহে। আবার হয় ত গৃহিণীরা এই সুপরামর্শের কথা শুনিলে কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন "এই সমাজহিতৈষী সুরসিক পুরুষটী কে?"

হিন্দুসমাজ ও জাতিভেদ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দু-সমাজে যে প্রবল বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে তাহা বোধ হয় আপামর সাধারণ সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন; যে হিন্দু-সমাজ সাতশত বৎসর বক্ষে দাসত্ব-শিলা ধারণ করিয়া অজাগরের ন্যায় নিদ্রাভিভূত ছিল, তাহার আজ মোহনিদ্রা কি জানি কোন্ মহামন্ত্রে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নিদ্রিতাবস্থায় যে সুখ স্বপ্ন দেখিতে ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে, জাগ্রত হইয়া সে দাসত্ব দুখকে সুখ বলিয়া অনুভব করিতে পারিতেছেনা; শত সহস্র বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রনা উপলব্ধি করিতেছে ও দেখিতেছে যে এজগৎ নিদ্রা যাইবার স্থান নয়। 'জাগরিত হও' 'কার্য্য কর' এই মহামন্ত্র এখানে সর্ব্বদা বিঘোষিত হইতেছে, তুমি বধির হইয়া ঐ মহামন্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে যদি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ না কর তবে এখানে তোমার অস্তিত্ব থাকা বড় কঠিন হইয়া উঠিবে। মনুষ্য মধ্যে যে উন্নতি স্রোত প্রবল বেগে বহমান হইতেছে, সমাজ, তুমি যদি বদ্ধ পরিকর হইয়া ঐ উন্নতি স্রোতের সহিত সমবেগে ছুটিতে না পার, তাহাহইলে তোমার দশা অতীব শোচনীয় হইবে, তুমি গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে না। অপিচ তোমাকে স্রোতের তলভাগে পতিত থাকিয়া কর্দ্দমিত হইতে হইবে। অবশেষে তোমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইবার সম্ভাবনা।

জগতের এই কঠোর সত্য বহুদিবস পরে হিন্দুসমাজ আজকাল একটু একটু উপলব্ধি করিতেছে এবং সেই অনুভবের ফল সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। এখন সমাজ পূর্ব্বের জড়ভাব ত্যাগ করিয়াছে এবং গতিশীল হইয়া উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। এদৃশ্য যে আশাপ্রদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উন্নতি সোপানে অধিরোহণ করাইবার উপযুক্ত রূপ নেতার বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহারা অবস্থানুযায়ী সমাজকে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিরদিকে অগ্রসর করাইবে। বেশী ঝাড়াবাড়ি করিলে তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবেনা; বরং সে চেষ্টায় বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। কারণ "Progress without order hastens to destruction" অর্থাৎ ধ্বংশই বিশৃঙ্খল উন্নতির পরিণাম। বর্ত্তমান সময়ে সমাজপতিগণের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের ঘাত প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ বিধ্বস্ত হইতেছে; ইউরোপীয় নীতি-শাস্ত্র ও সমাজতত্ত্বের সহিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুনীতির ভয়ঙ্কর বিরোধ উপস্থিত হইতেছে, ইহার ফল কি ইহবে বলা যায় না। স্বভাবের নিয়ম ও আধুনিক বিবর্ত্তনবাদীদিগের মত "যোগ্যতম সংরক্ষণ" (Survival of the Fittest)। হিন্দুসমাজ যেরূপ উপাদানে

গঠিত ও যেরূপ ধর্ম্ম ও নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত, যেরূপ ধর্ম্মভাব ইহার ভিতর ওত প্রোত ভাবে মিশ্রিত এবং এ সমাজ যেরূপ দূরদর্শী স্বার্থশূন্য পরমজ্ঞানী ঋষিদিগের প্রণীত শাস্ত্রদ্বারা অনুশাসিত তাহাতে যে ইহার ধ্বংস সহজে হইবে এমন কেহ অনুভব করিতে পারেন না। শুনিতে পাই একদিন "সোণার লঙ্কাও" নর বানরের দ্বারা ছারখার হইয়াছিল, তদ্দ্বারা এমন আশঙ্কাও মনে হইতে পারে বুঝি লোক সাধারণের পূজনীয় সকল সমাজের আদর্শ স্বরূপ হিন্দু-সমাজ জনকতক বিজাতীয় রাজপুরুষ ও কএকজন স্বধর্ম্মদ্রোহী কুঙ্গারের দ্বারা ছারখার হইল। কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও মনে করা উচিত যে, যে "সোণারলঙ্কা". নরবানরের দ্বারা ছারখার হইয়াছিল তাহা শেষে কুকর্ম্মচারী পিশাচ সদৃশ রাক্ষসগণের লীলাভূমিতে পরিণত হওয়ায় ধর্ম্ম সে স্থানে তিষ্টিতে পারে নাই; তাহাতেই তাহার ধ্বংস অচিরে সাধিত হইয়াছিল কিন্তু হিন্দু-সমাজের এখনও সে অবস্থা হয় নাই, এখনও এ সমাজ কেবল মাত্র নর-পিশাচের দ্বারা পরিচালিত নয়, ধর্ম্মভাব এখনও ইহার মজ্জায় মজ্জায় রহিয়াছে। যদিও এহেন পবিত্র হিন্দুসমাজে নানা প্রকার পাপাচার ও কুসংস্কার চলিয়া যাইতেছে, তথাপি সেই সকল দূষণীয় আচার ব্যবহার এখনও ধর্ম্মের আবরণে আবরিত থাকায় তবে সমাজ মধ্যে স্থান পাইতেছে। ইহাতেই বুঝা যায় জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ ধর্ম্মভাব অবস্থিতি করিতেছে। এখনও Hypocricy pays its homage to relegion পাপ ধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করিতেছে। পরম কারুণিক বিশ্বপতির বিপুল ধর্ম্ম রাজ্যে পাপ কখনও কি প্রশ্রয় পাইবে? না পাপের জয় ও ধর্ম্মের পরাজয় হইবে? কখনই না—"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি।"

যাহা হউক এতদ্দ্বারা আমরা বলিতেছি না যে, আপাততঃ হিন্দু-সমাজে যে সকল রীতি-নীতি আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে তাহা সবই অতি উৎকৃষ্ট আর অপর সমাজে যাহা কিছু আছে তাহা সবই নিকৃষ্ট; আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য পক্ষাপক্ষ শূন্য হইয়া নিজ সমাজের কুপ্রথা বর্জ্জন করা ও অপর সমাজের সুপ্রথা গ্রহণ করা, তাহা হইলেই সমাজের উন্নতি অগৌণে সংসাধিত হইতে থাকিবে।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজের যেন আচার ব্যবহারে রাজার হস্তক্ষেপ দেখিয়া অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে বুঝি হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম লোপ হইল ও হিন্দু-সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। ভাবিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা করা ভ্রম। সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম সৃষ্টির আদি-হইতে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে, কত উৎপাত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে, স্বদেশে ও বিদেশে ইহার উপর কত আক্রমণ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহার বিশেষ কি ক্ষতি হইয়াছে? সংসার বিরাগী বুদ্ধদেব হইতে কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত চৈতন্য-দেব পর্য্যন্ত যে সমাজকে একাকার (Homogeneous) করিতে পারেন নাই, তাহা কি দুই দশজন অদূরদর্শী ম্লেচ্ছের দ্বারা সাধিত হয়? যদি কেহ গগনস্পর্শী হিমাচলের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহাকে বিচালিত করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে ইহার ফল কি হইবে? হিমাচল কি বিচালিত হইবে না ঐ লোষ্ট্র হিমাদ্রির

অঙ্গস্পর্শে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূপতিত হইবে। যে ধর্ম্ম সত্য ও সনাতন তাহা কি কখন ক্ষুদ্রশক্তি মানবের দ্বারা বিচালিত হয়? হিন্দু-ধর্ম্মও উক্ত প্রকার বিপ্লব ও উৎপীড়ন সহ করিয়া চিরকাল অটল অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিবে; অতএব হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

তবে যে আপাততঃ হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজ নানাকারণে বিক্ষোভিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু শান্তরক্ষ প্রশান্ত মহাসাগর যদি প্রবল ব্যাতায় আলোড়িত ও বিক্ষোভিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গ রাশিদ্বারা স্বকীয় মহান্‌ভাব প্রকাশ না করে, তবে কে তাহাকে মহাসাগর বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে? প্রশান্ত মহাসাগর সদৃশ হিন্দু-সমাজও যদি সময়ে সময়ে আলোড়িত না হয় তাহা হইলে সকলে ইহার মহান্‌ভাব অনুভব করিতে পারিবে কেন?

সাত শত বর্ষ ধরিয়া হিন্দু-সমাজ বিজাতীয় সমাজের সহিত সংঘর্ষণে যে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না এবং সকল সময়ে এ সমাজের সকল প্রথাই যে অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকিবে তাহাও বোধ হয় না। যাহা সাধারণতঃ সত্য ও সুন্দর তাহাই সকল সময়ে সকলদেশে সকল সমাজেই চলিতে পারে ও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। শীতকালে গরম শীতবস্ত্রেরই প্রয়োজন, তখন আর গ্রীষ্মোপযোগী সরুকাপড় ব্যবহার করিলে চলিবে না, আবার যখন গ্রীষ্মকাল আসিবে, তখন শীতকালের রেসমী, পসমী প্রভৃতি গরম পোষাক ব্যবহার করিতে পারিবে না; তখন গ্রীষ্মোপযোগী বস্ত্রেরই আবশ্যক কিন্তু কি গ্রীষ্ম, কি শীত, কি হেমন্ত, কি বসন্ত, সকল সময়েই সভ্য মানব সমাজে বস্ত্রের প্রয়োজন তাহার আর পরিবর্ত্তন করিলে চলে না। সেইরূপ যে প্রথা সাধারণ সত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত ও ধর্ম্মানুমোদিত তাহা চিরকালই থাকিবে, তাহা পরিবর্ত্তনে সমাজের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না, কিন্তু যাহা সাময়িক তাহা অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। তুমি পরিবর্ত্তন না কর স্বভাব তোমাকে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিবে, অতএব আপনা হইতেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা না হইয়া যদি দেশ মধ্যে সমাজ মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সমভাবে প্রশ্রয় পায়—সমাজ যদি পাপীর দণ্ডবিধানে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে সমাজের ধ্বংস মুখে পতিত হইবার আর বেশী বিলম্ব হইবে না। এ সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় একটী কবিতা আছে;—

"ছেদশ্চন্দন চূত চম্পকবনে রক্ষা শাকোটকে,
হিংসাহংস ময়ূর কোকিল কুলে কাকে চ নিত্যাদরঃ॥
মাতঙ্গেন খরক্রয় সমতুলা কর্পূর কার্পাসয়ো
রেষাযত্র বিচারনাগুণিগণে দেশায় তস্মৈনমঃ॥

অর্থ—যে দেশে চন্দন চূত ও চম্পক বৃক্ষ ছেদন করিয়া সজিনা গাছ রক্ষা করে, যেখানে হংস ময়ুর ও কোকিল হিংসা করে ও কাককে নিত্য আদর করে, যেখানে হস্তী দিয়া গাধা ক্রয় করে এবং কর্পূর ও কাপাসের সমান মূল্য দেয়, যে দেশে গুণি

গণের প্রতি এইরূপ বিচার সে দেশের চরণে প্রণাম।"

এই বৈচিত্র পরিপূর্ণ (Heterogeneous) অথচ সাগরসদৃশ মহান হিন্দু-সমাজ ইউরোপীয় সমাজের ন্যায় একবর্ণক (Homogeneous) নহে। এই সমাজের কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে হিন্দুসমাজ কি উপাদানে গঠিত। এ প্রবন্ধে আমরা হিন্দু-সমাজের একটী প্রধানতম উপাদান—জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কি রাজনৈতিক কি সামাজিক যে কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ উঠিলে সাধারণতঃ জনসমাজে ভিন্নভিন্ন দুই সম্প্রদায়ের লোক অগ্রসর হইয়া মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সকল দেশেই এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধমতাবলম্বী দুই দল লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরূপ দুই সম্প্রদায় উন্নতিশীল বা উদার নৈতিক (Whig) এবং রক্ষণশীল (Tory) বলিয়া অভিহিত হইত। আজ উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহারাই Liberal and Conservative নামে কথিত হইয়া থাকেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাঁরাই ইংলণ্ডীয় সমাজের পরিচালক। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে ইংলণ্ডীয় সমাজের অনুকরণ ফলেই হউক অথবা স্বাভাবিক নিয়ম বশতই হউক এইরূপ দুই সম্প্রদায় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে Ultra Liberal অত্যুদারনৈতিক ও Ultra Conservative অতি রক্ষণশীল নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। রক্ষণশীল সম্প্রদায় বলে যে সমাজে যে সকল প্রথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে তাহার পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে বরং যাহাতে ঐ সকল প্রথা সমাজ মধ্যে বহুলভাবে প্রচার হয় তাহার সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত এবং মিছামিছি দুই চারি জন হুজুগে লোকের হুজুগে পড়িয়া সমাজের চিরন্তন প্রথাগুলি পরিত্যাগ করা কোন ক্রমে উচিত নহে। তবে তাহারা যে একেবারে উন্নতি চাহে না এমত নহে, যাহা আছে তাহা পূর্ণভাবে বজায় রাখিতে হইবে, তদুপরে তাহারই উপর উন্নতি করিতে হইবে। উন্নতিশীল বা উদারনৈতিক দল চাহে সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতনভাবে গঠন করিতে। যাহা সাবেক আছে তাহা বদলাইতে হইবে বা একেবারে দূরীকৃত করিতে হইবে তবে সমাজের মঙ্গল। আর আমাদের দেশের অতি রক্ষণশীল দল হিন্দু সমাজের যে কোন প্রথা—উহা সুপ্রথাই হউক আর কুপ্রথাই হউক, প্রকৃত শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুমোদিত হউক বা না হউক—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া উহার সংরক্ষণের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া গলাবাজীতে আকাশ পাতাল ফাটাইয়া ফেলিবেন এবং যাহা কিছু বিদেশী তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক তাহা দেখিলেই উহা ম্লেচ্ছোচিত ও ঘৃণাজনক বলিয়া নাসিকার অগ্রভাগ কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিবেন। যদি কেহ হিন্দু সমাজের "হাঁচিটিক্‌টিকি বাধা" হইতে যাগযজ্ঞাদি পর্য্যন্ত সকল আচার ব্যবহার গুলি মানিয়া না চলেন অমনি এ সম্প্রদায় বলিয়া উঠিবেন "দেশ উৎসন্ন গেল" "ইংরাজী পড়িয়া সকল নষ্ট হইল"। উন্নতিশীল বা সংস্কারক সম্প্রদায় বলিবেন হিন্দুসমা-

জের সকল আচার ব্যবহারই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সমাজের অবনতি বিধায়ক এবং সকলগুলিই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে হইবে তবে সমাজের উন্নতি হইবে। বিদেশী প্রথা সমাজ মধ্যে প্রচলন করিতে হইবে তাহা না হইলে কোন ভাবী মঙ্গলের আশা নাই এবং এ অধঃপতিত হিন্দুজাতির উন্নতি সুদূরপরাহত। লিখিতে লজ্জা হয়, সংস্কারক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক জন কৃতবিদ্য লোক বলিতেন (বৎসর কএক হইল তিনি পরলোকগত হইয়াছেন এবং এখানে তাঁহার নাম উল্লেখ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই) যে গোমাংস ভক্ষণ না করিলে হিন্দু-জাতির আর উদ্ধারের আশা নাই—এই প্রকার বিসদৃশ ঘৃণা উদ্দীপক ব্যবহার প্রচলনের জন্য সতত ব্যস্ত থাকিতেন এবং তাহাই লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিতেন। আপাততঃ উপরোক্ত দুই সম্প্রদায়ের পরস্পর বিবাদে হিন্দু-সমাজে ভয়ঙ্কর বিপ্লব হইবার উপক্রম হইয়াছে। যাহা হউক উভয় সম্প্রদায় হইতেই সমাজের কিছু না কিছু উপকার সাধিত হইয়া থাকে। একদল সমাজকে উন্নতির দিকে অযথারূপে অগ্রসর হইতে দেয় না এবং অপর দল সমাজকে স্থিতিশীল বা জড়ভাবাপন্ন না করিয়া গতি-বিশিষ্ট করে।

এখন আমরা পক্ষাপক্ষ শূন্য হইয়া দেখিবার চেষ্টা করিব হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা হিন্দু-সমাজের ইষ্ট-সাধক কি না? এই প্রথা কতদূর বিজ্ঞান, দর্শন বা ধর্ম্মসঙ্গত তাহা দেখিবার পূর্ব্বে এই বহুবিধ-জাতি, সম্প্রদায়, কর্ম্ম, উপধর্ম্ম পরিপূর্ণ সুবিশাল আর্য্য-ভূমিতে কখন এই জাতিভেদ প্রথা প্রথমে সমাজ মধ্যে প্রচলন হয় তৎকালীন অবস্থা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। দেখিতে হইবে এই প্রথা তখন সমাজকে অবনতির দিকে কি উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইয়াছিল এবং ইহার দ্বারা সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সাংসারিক বা পারলৌকিক, আধিভৌতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছিল কি না? দেশের প্রকৃত ইতিহাস হইতে ঐ সকল বিষয়ের সম্যক জ্ঞানলাভ হইতে পারে কিন্তু তৎসময়ের প্রকৃত ইতিহাস বা প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার, কেননা হিন্দু-রাজত্বের প্রথম অবস্থার প্রকৃত ইতিহাস অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বা একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা এখানে ইতিহাস অর্থে ইংরেজ প্রভৃতি জাতি যে অর্থ বোধ করেন তাহাই ধরিতেছি, তাহা না হইলে অনেক হিন্দু বলিতে পারেন, "হিন্দু-রাজত্বের ইতিহাস কি নাই? আমাদের পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি কি প্রকৃত ইতিহাস পদবাচ্য নহে?" তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া বলিব যে, প্রকৃত ইতিহাস তাহাই, হিন্দুর সাহিত্যই হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস। আমরা যে অমূল্য রত্নের আকর স্বরূপ সংস্কৃত সাহিত্য, কাব্য, পুরাণাদি পাইয়াছি, যদি আমরা সেই অমূল্য রত্নরাশি তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব প্রাচীন ভারতের প্রকৃত অবস্থাই প্রকৃত ইতিহাস—জাতি বিশেষের সাহিত্য কাব্যাদিই সেই জাতির ও সেই সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা সূচক প্রকৃত ইতিহাস। কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ রাজ পরিবর্ত্তনাদির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সময় নিরূপণ, কোন জাতি

বা সমাজের প্রকৃত ইতিহাস নহে এবং যে সকল মহাত্মারা জগতে তাঁহাদের অসাধারণ ধীশক্তি ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন কেবল তাহাদেরই ইতিবৃত্ত এই সমস্ত জগতের প্রকৃত ইতিহাস। এসম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত চিন্তাশীল লেখক কারলাইল বলিয়াছেন—"All things that we see accomplished in the world are properly the outer material result, the practical realisation and embodiment of thought that dwelt in great men—The soul of the world's history was the history of these." *

অর্থাৎ জগতে যে সকল মহৎকার্য্য সাধিত হইতে দেখা যায় সে সমুদয়ই মহাত্মাদিগের হৃদয়ের চিন্তা-প্রসূত। প্রথমতঃ সেই সকল চিন্তা ও ভাব তাঁহাদিগের হৃদয়ে উদিত হয় পরে কার্য্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে। এই সকল মহৎকার্য্যের ইতিহাসই জগতের ইতিহাসের মূল।

অতএব সেই অনন্ত রত্নের আকর সংস্কৃত সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, "সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্যশ্যামলা" প্রকৃতির প্রিয়ভূমি আর্য্যাবর্ত্তের কোথাও পঞ্চনদের তীরে ঋষিগণ সামবেদ গানে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছেন, কোথাও সংসার ত্যাগী মুমুক্ষু যোগীগণ হিমাচলের নিম্ন উপত্যকায়, গিরিকন্দরে বা নিবিড় অরণ্য মধ্যে যোগাসনে বসিয়া পরব্রহ্মের রূপ ধ্যান করিতেছেন, কোথাও ঋষিকুমারেরা যজ্ঞের সমিধ কুশাদি সংগ্রহ করিতেছেন, কোথাও বেদাধ্যায়ী ছাত্রগণ অনন্যমনে গুরুমুখে শাস্ত্র উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, গুরুগণও অপত্য নির্ব্বিশেষে ছাত্রদিগকে নানাবিধ শাস্ত্রকথা শ্রবণ করাইতেছেন। এবম্প্রকারে ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বিঘ্ন অনাসক্ত চিত্তে জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন। অন্যদিকে প্রভূত শৌর্য্য-বীর্য্যশালী ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছেন এবং বৈশ্যগণ ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিবৃত্তি দ্বারা রাজ্যের প্রভূত অর্থ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছেন এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা শুশ্রূষা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। সময়ে সময়ে হিন্দু-নৃপতিগণের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহাদি জনিত অশান্তি উপস্থিত হইলেও সাধারণতঃ সমাজ মধ্যে শান্তি ও ধর্ম্মভাব বহুলরূপে বিরাজমান ছিল। প্রজা মধ্যে মিথ্যা ব্যবহার দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বড় উত্তেজনা হইতে পাইত না। ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ রাজ্য শাসন করিতেন বটে কিন্তু পরিণামদর্শী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সমাজ শাসন করিতেন। স্বার্থশূন্য মহর্ষিদিগের শাসনই প্রধানতঃ রাজ্য মধ্যে সততঃ শান্তি বিরাজ করিত। এ অধঃপতিত সময়ে মহাভারতাদি গ্রন্থ লিখিত ইতিবৃত্তগুলি কবিকল্পিত বলিয়াই বোধ হয়, হায়, আর কবে সে দিন আসিবে! কবে আবার আর্য্য গৌরব রবি

* Carlyle's—Hero-Worship Lec. I.

ভারত-গগণে পুনঃ উদিত হইবে। পূর্ব্ব গৌরব এখন কেবল স্মৃতির বিষয়ীভূত। উহা স্মরণে উদিত হইলে যুগপৎ সুখদুঃখের আবির্ভাব হইয়া অন্তঃকরণকে আলোড়িত করে। যাহা হউক তদ্‌পরে মন্বাদি শাস্ত্রকারদিগের সময় হিন্দু-সমাজে উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ বর্ণ সংস্রবে নানাবিধ জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহারা ভিন্ন ২ বৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য করিয়া আপনাদের ব্যবসায়ের এতদূর উন্নতি করিয়াছিল যে তৎসময়ে অন্যান্য কোন সমাজ ইহার প্রতিকক্ষ হইতে পারে নাই; এত যে উন্নতি হইয়াছিল ইহার প্রধান কারণ জাতিভেদ প্রথা। আর প্রভূত বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে সামান্য নিরক্ষর ইতর শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে যে অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়—এত বিভিন্নতার ভিতর কেমন এক অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অন্যতম কারণ জাতিভেদ প্রথা। ইউরোপীয় প্রভৃতি সমাজে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের মধ্যে এরূপ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে দুই চারিজন নরদেব দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে নর পিশাচের বড় অপ্রতুল নাই। ইংরেজ লেখকদিগের গ্রন্থে এ বিষয়ের প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি সংসার বিরাগী ব্রাহ্মণগণ নিরাপদে নিষ্কাম ধর্ম্মালোচনা না করিয়া, যদি তাঁহারা মানসিক বৃত্তিগুলিকে সমধিক রূপে অনুশীলন না করিয়া, যদি তাঁহারা পারলৌকিক সুখকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য না করিয়া কেবল ইহকালের সুখ-সমৃদ্ধিতে মন সন্নিবেশ করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে আমরা জগতে কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি, ব্যাস, বাল্মীকি বা ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের ন্যায় কয়জন লোক দেখিতে পাইতাম? বা বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায়, মহাভারতাদি মহাকাব্যের ন্যায়, পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতাদি ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায়, শকুন্তলা আদি নাটকের ন্যায়, সাংখ্যাদি দর্শন শাস্ত্রের ন্যায়, সুশ্রুতাদি চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় কয়খানা শাস্ত্র, মহাকাব্য, পুরাণ, ধর্ম্মগ্রন্থ, দর্শন নাটক দেখিতে পাইতাম? যে সুসভ্য ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের আজ পাশ্চাত্য জগতে এত মান (তাঁহারা যদিও পদার্থবিজ্ঞানে কতকটা উন্নতি করিয়াছেন) তথাপি আর্য্যঋষিগণের অনেক পশ্চাতে এখনও পড়িয়া রহিয়াছেন। যে সমাজে ঐ সকল মহাত্মাদিগের জন্ম সেই সমাজেই জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। অতএব এই প্রথা সমাজের অবনতির কারণ নয় বরং উন্নতি বিধায়ক এবং ইহা উন্নতিশীল সমাজের স্বতঃ বিকাশ মাত্র, প্রকৃতির বৈচিত্রই ইহার সৌন্দর্য্য Beauty is Unity amongst variety। এক বর্ণ হইতে ক্রমশঃ বহু বর্ণ উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এ প্রবন্ধে জাতিভেদ প্রথার পুঙ্খানুপুঙ্খ দোষ গুণ বিচার করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইব না কারণ এ সমন্ধে অনেক মতামত পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে, তবে এখন দেখিতে হইবে এই জাতিভেদ প্রথা ব্রাহ্মণগণ স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া ও আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন জন্য সমাজ মধ্যে প্রচলন করিয়াছিলেন, না অন্য কোন কারণে ইহা সমাজ মধ্যে প্রচলিত হইয়া

ছিল। এই কথাটা বুঝিবার জন্য আমরা অপাততঃ বিলাতের এক জন প্রধান পণ্ডিতের মতামত প্রকটিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। আমাদের দেশে অনেকেই বিলাতি বিষয়ের বড়ই পক্ষপাতী, কোন বিষয়ে যদি একটু বিলাতের গন্ধমাত্র থাকে অমনি তাঁহারা বিমোহিত হইয়া পড়েন। এ দেশে যে জিনিস দেখিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করি বা কখন পদ দলিত করিয়া ফেলিয়া দেই, সেই দ্রব্য যদি একবার মাত্র বিলাতের বায়ু স্পর্শ করে, অমনি তাহার অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়; অমনি আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া বক্ষে ধারণ করি। সেই জন্য এই জাতিভেদ প্রথা যাহাকে আমাদের মধ্যে অনেকেই অসভ্যোচিত ও সমাজের বিশেষ হানিকর কল্পিয়া মনে করেন এবং যাহাতে ইহা হিন্দুসমাজে আর স্থান না পায় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তাঁহাদের জন্য বিলাতের প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর সাহেবের মত উদ্ধৃত করিতেছি। "প্রথমে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে মানব সমাজের অঙ্কুর অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়; এই অবস্থায় তাহাদিগের মধ্যে পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির ভেদাভেদ ভিন্ন অন্য কোন রকম কার্য্য বা শক্তির বিভিন্নতা ছিলনা, সকলই একাকার ছিল তদ্‌পরে ঐ অবস্থার একটু বিকাশ হইলে বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে ভেদাভেদ হইল। এবং কিছুদিন পরে পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি সেই পরিবারের শাসন কর্ত্তা ও ধর্ম্মোপদেষ্টা পুরোহিত রূপে গৃহীত হইল এবং তৎকাল হইতেই ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির বীজ উপ্ত হইল। * * * * প্রথমে এই প্রভুত্ব ও পৌরহিত্য একাঙ্গী ভাব ছিল এবং পরে বংশপরম্পরায় রাজা ও তৎবংশীয় ব্যক্তিগণ পৌরহিত্য পদ অধিকার করিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে কেবল মাত্র রাজশক্তি তাহাদের হস্তে ন্যস্ত রহিল ও পুরোহিত সম্প্রদায় আলাহিদা সৃজিত হইল—সর্ব্বশেষে সম্পূর্ণ বিকাশ অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্বতঃই সৃজিত হইয়া আসিতেছে। (১)

(১) As we see in existing barbarous tribes society, in its first and lowest form, is a homogeneous aggregation of individuals, having like powers and functions. The only marked difference of function being that which accompanies the Sex. Very early, however, in the process of social evolution, we find an incipient differentiation between the governed and govering. * * * For many generations the king continues to be the chief priest and the priesthood to be menmbers of the royal race. * * * * * Simultaneously there has been going on a second differentiation of a more familiar kind that, namely, by which the mass of community has been segregated into distinct class and orders of works. * * *

এই প্রকারেই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণের ও তাহাদের সম্মিলনে নানাবিধ সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহাই পাশ্চাত্য জগতের বিবর্ত্তন বাদিদিগের মত—একাকার হইতে বৈচিত্র এবং তাহাই জগতের সৌন্দর্য্য। সমাজের সম্পূর্ণরূপ উন্নতির অবস্থাতে সমাজ মধ্যে গুণানুসারে, স্বভাবানুসারে বা বৃত্তি অনুসারে নানাপ্রকার সম্প্রদায়, জাতি ও বর্ণের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আমাদের শাস্ত্রোক্ত বর্ণভেদের উৎপত্তি এমতের বিরোধী নহে; কারণ আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে; সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আপন মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মতে ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম ও জগৎ একই পদার্থ। জগৎ শরীর ও জগদীশ্বর ইহার আত্মা-স্বরূপ। জগৎ ও জগদীশ্বর একই পদার্থের বিভিন্নরূপ মাত্র। আর মনুষ্য, পশু, পক্ষী জীবাদি ও বিভিন্নজাতি, সম্প্রদায় বর্ণাদি এই জগৎ-শরীরের স্বতঃ বিকাশমাত্র। এখন দেখা গেল যে এই জাতিভেদ প্রথা শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণগণ আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিবার জন্য সমাজ মধ্যে প্রচলন করেন নাই ও ইহার দ্বারা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে না। তবে এই প্রথার মধ্যে যে সকল দোষ ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে পরিহার পূর্ব্বক ইহার গুণের পক্ষপাতী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। জনকতক পাদরী বা আচার ভ্রষ্ট বিধর্ম্মীর কথায় অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া একেবারে কোন স্বজাতীয় আচার ব্যবহারের উপর খড়্গহস্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

হয়তঃ কেহ কেহ বলিবেন যে জাতিভেদ প্রথায় মনের উন্নতভাব সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পায়না বরং উহাদিগকে সংকীর্ণ করিয়া থাকে, যেহেতু শূদ্র সদাচারী ও সৎস্বভাবাপন্ন হইলেও একজন ব্রাহ্মণ তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করেন। একথা যাঁহারা বলেন, হয়ত তাঁহারা সত্যের আপলাপ করেন, না হয় তাঁহারা হিন্দু-সমাজের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত নহেন। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ একজন সদাচারী নীচ জাতীয় শূদ্রকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন এবং বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

So that begining with a barbarous tribe, almost if not quite homogeneous in the function of its members, the progress has been and is still towards an economic aggregation of the human race, growing ever more *heterogeneous* in respect of the separate functions assumed by the local sections of each nation, the separate functions assumed by the many kinds of makers and traders in each town and the separate functions assumed by the workers united in producing each commodity."——

Herbert Spencer's "First Principles"—p.p. 343—347.

যে জাতির শাস্ত্রে দেখা যায় ঈশ্বরাবতার অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র একজন সামান্য হীন-জাতীয় চণ্ডালকে তাহার অকপট ভক্তির জন্য বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, সেই জাতি যে গুণের পক্ষপাতী নয় তাহা বলা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কাজ। আরও যদি কেহ আপনার জাতির বা সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে চেষ্টিত হন তাহা হইলে তাহার মন যে সংকীর্ণ হইবে এমন কখন হইতে পারে না। আপনার পুত্র কলত্রাদিকে ভাল বাসিলে যে অপরকে ভাল বাসিতে পারিবে না. ইহাও সম্ভব নয় বরং ইহাতে মনের উন্নত ভাব সকল সংকীর্ণ না করিয়া তাহাদের বিকাশের সূচনা করিয়া দেয়। ইংরাজীতেও বলিয়া থাকে "Charity begins at home." মানবের কর্ত্তব্য প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ কর্ত্তব্যকর্ম্ম আপনার শরীর ও আত্মার প্রতি, দ্বিতীয়তঃ আত্মীয় স্বজন সমাজ ও দেশ, অবশেষে সমস্ত জগতের প্রতি, তৃতীয়তঃ জগদীশ্বরের প্রতি। এই তিন শ্রেণীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে ইহার মধ্যে যদি একটী অনুষ্ঠিত হয় ও অপরগুলি অনাচরিত থাকে তাহা হইলে কোনটিই সম্পূর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব জাতি-বিশেষের উন্নতি চেষ্টা মনের উদার ভাব সংকীর্ণ করে না। আরও আপন বাটীতে জীর্ণপরিধানাবৃতা, বুভুক্ষা পীড়িতা, মুষ্টিমেয় উদরান্নের জন্য লালায়িতা, মৃতপ্রায় স্নেহময়ী জননীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যদি হঠাৎ রাতারাতি ম্যাটসিনি বা গ্যারিবল্ডী হইতে ইচ্ছা করি এবং জন্মভূমীর দুঃখে কাতর হইয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করি, তাহা হইলে কি আমাকে লোকে বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করিবে না? অতএব হিন্দুমাত্রেরই অগ্রে আপন আপন জাতি বা বর্ণের উন্নতি চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুজাতির ও হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হইবে এবং আপন জাতিরও বিশেষ উপকার করা হইবে।

জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধাবলম্বীগণ এই প্রথার বিরুদ্ধে একটী প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, যদিও স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ও বৃত্তি অনুযায়ী জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে তথাপি এই প্রথা বংশগত হইয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। একজন ব্রাহ্মণ নিরক্ষর কুকর্ম্মশালী হইলেও সমাজে পূজ্য এবং যদি নীচ-জাতীয় একজন শূদ্র সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণবিভূষিত হয়, তাহা হইলেও সে সমাজের চক্ষে হেয় ও নগণ্য। একথা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। হিন্দু-সমাজের এখনও সেরূপ শোচনীয় অবস্থা হয় নাই, যদ্দ্বারা হিন্দুগণ কদাচারী ব্রাহ্মণের দোষ সকল গুণ বলিয়া গ্রহণ করে বা সেই সকলের প্রশ্রয় দেয় বা আন্তরিক অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা না করে। ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ সদাচারী শূদ্র হউক আর ব্রাহ্মণই হউক তাহার পূজা সকল দেশে সকল সমাজে হইয়া থাকে। বংশ পরম্পরায় উচ্চ শ্রেণীতে সাধারণতঃ ভদ্র ও সদাচারী লোকের জন্ম হইয়া থাকে বলিয়াই হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণ তনয় ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হইয়া থাকেন। তাহা না করিয়া যদি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণকে শূদ্র ও শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করিয়া

লওয়া হয়, তাহা হইলে সমাজের মধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। আবার এই হিন্দু-শাস্ত্রই বলিয়াছে ;—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ
দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্ম
জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

অর্থাৎ—জন্মে শূদ্র, সংস্কারে দ্বিজ, বেদাভ্যাসে বিপ্র ও ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। অতএব হিন্দু-সমাজ বা হিন্দু-শাস্ত্র কেবল যে জাত্যনুসারে লোকের পূজা করিয়া থাকে এমন নয় গুণেরও বিশেষ পক্ষপাতী।

কএক বৎসর হইতে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ একটু সজাগ হইয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে—ইহা সুলক্ষণ। এক্ষণে স্বজাতীয় শিক্ষিত মহোদয়দিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, তাঁহারা অতিশয় সতর্কতা ও বিশেষ উদ্যমের সহিত আপন জাতির মধ্যে যে সকল দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা পরিহার ও জাতীয় উন্নতি বিধায়ক শিক্ষার বহু-প্রচলন করিয়া নিজ সমাজের উন্নতি সাধন করেন। এরূপ চেষ্টা না করিলে সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইবে। নিজের উদ্যম ভিন্ন কখন কার্য্য সিদ্ধ হয় না ; পরের মুখাপেক্ষী হওয়া ঘৃণার কথা ও কাপুরুষের কর্ম্ম। আত্মোন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইলে জগদীশ্বর সহায় হইয়া থাকেন। Heaven helps those who helps themselves.

শ্রীনিবারণচন্দ্র হুই।

রত্ন-খনি।

১

অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর; অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর।

২

তুমি কাহারও ভয়ের কারণ হইওনা, তুমিও কাহা হইতে ভয় পাইবে না।

৩

ফুলে আর ফলে যত প্রভেদ, সত্য কথা বলা আর সত্য আচরণ করায় তত প্রভেদ।

৪

মানগাছের গোঁড়ায় ছাই দিলে উহা বর্দ্ধিত হয়। তুমিও যদি বর্দ্ধিত হইতে চাও তোমার মানে বিনয় সংযোগ করিও।

৫

স্থূল শরীর রক্ষার্থ যেমন নির্ম্মল পানীয়, পরিষ্কৃত বায়ু এবং পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি সূক্ষ্ম দেহকে (মন) রক্ষা করিবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞান, অবিচলিত ঈশ্বর বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমের আবশ্যক।

৬

চন্দ্র স্বয়ং কলঙ্কী বটে কিন্তু সে জগতকে নির্ম্মল জ্যোৎস্নারাশি প্রদান করিয়া থাকে। তোমাতেও যদি কলঙ্ক থাকে তবে তুমি সে কলঙ্কে অপরকে কলঙ্কিত করিও না।

৭

যে বলে "আমি কিছু জানিনা" সেই জ্ঞানের মহাত্ম্য বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। আর যে বলে "আমি সব জানি" জ্ঞানের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই।

৮

যখন দেহবিশিষ্ট পক্ষিকে লৌহময় এক দ্বার বিশিষ্ট পিঞ্জরে সতর্কভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও সুযোগ পাইলেই পলায়ন করে, তখন উন্মুক্ত নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপিঞ্জর হইতে বায়ুরূপী প্রাণপাখি কোন্ সময়ে পলায়ন করিবে তাহার নিশ্চয়তা কি ?

৯

ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরের নাম বড়। তাহার প্রমাণ রামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া সেতু-বন্ধন-পূর্ব্বক সাগর পার হইয়াছিলেন ; আর হনুমান "রাম" নাম উচ্চারণ করিয়াই অনায়াসে সাগরপার হইয়াছিলেন।

১০

সিংহ অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেও কদাচ মূষিক ভক্ষণ করে না। সেইরূপ সাধুব্যক্তি যদি অত্যন্ত দরিদ্রও হয়েন, তথাপি তিনি কখন অসাধু পথ অবলম্বন করেন না।

১১

পরশমণি অপেক্ষা সাধুর গুণ অধিক। পরশমণি লৌহকে স্বর্ণ করিতে পারে, কিন্তু পরশমণি করিতে পারেনা। কিন্তু সাধুর সংস্রবে পাপী পুণ্যবান হয় এবং সাধুও হয়।

১২

দেহের পরিণাম কৃমি, বিষ্ঠা, ভস্ম ; সম্পত্তি ছায়ার ন্যায় চঞ্চল ; যৌবন ও রূপ তরঙ্গের ন্যায় অস্থির ; স্ত্রী সম্ভোগ সুখ স্বপ্ন তুল্য ; পরমায়ু অনল সন্তপ্ত লৌহপিণ্ডে নিপতিত জল বিন্দুর ন্যায় ক্ষণ স্থায়ী ; তথাপি প্রাণীর এত অভিমান কেন ?

১৩

সুন্দর গোলাব ফুল-বিষ্ঠার উপর পতিত হইলে যেরূপ তাহার সৌন্দর্য্যের গৌরব থাকে না। সেইরূপ পরম রূপবতী কুলকামিনী যদি কুলটা হয়, তাহা হইলে তাহারও রূপলাবণ্যের সেইরূপ মহিমা নষ্ট হইয়া যায়।

১৪

তেক যেরূপ "কোমে কোমে" শব্দদ্বারা তাহার কালান্তক স্বরূপ দূরস্থিত সর্পকে নিকটস্থ করিয়া অকালে প্রাণ হারায় ; মনুষ্যও সেইরূপ "আমি আমার" শব্দদ্বারা দূরস্থিত কাল ব্যালকে আহ্বান করিয়া অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

২৫

একই দুগ্ধ স্বর্ণপাত্রে পান করিলেও যেরূপ তৃপ্তি, মৃণ্ময়পাত্রে পান করিলেও সেইরূপ তৃপ্তি হইয়া থাকে। পাত্রের জন্য স্বাদের কোনই ইতরবিশেষ হয় না। সেইরূপ নিজ ভার্য্যাতে সম্ভোগ করিলেও যে সুখ, পর স্ত্রীতে সম্ভোগ করিলেও সেই সুখ, স্ত্রীভেদে সুখের কোনই তারতম্য নাই। তবে একই প্রকার সুখের জন্য মাতৃসমা পরস্ত্রী গমন করিয়া নরকে পতিত হও কেন?

১৬

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রসনা ভোগীর পক্ষে বড়ই কৃতঘ্ন। ভোগীরা আজন্মকাল রসনাকে বিবিধ উপাদেয় খাদ্যে তৃপ্ত করিয়া থাকে। কিন্তু সত্যকথনের সময় রসনা বড়ই ইতস্ততঃ করে এবং মৃত্যুকালে হরিনাম উচ্চারণের সময় জড় হইয়া যায়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যোগীগণ রসনাকে চিরকাল কটু, তিক্ত, কষায় দ্রব্যের আস্বাদে বিরক্ত করিয়া থাকেন; অথচ কি সত্য বাক্য কহিবার সময়, কি অন্তকালে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কালে রসনা তাঁহাদের প্রতি অনুকূল ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করে না।

১৭

কেহ তরবারি দ্বারা কাহাকেও হত্যা করিলে তরবারি-নির্ম্মাতাকে হত্যাজনিত পাপ স্পর্শ করে না; হন্তাকেই স্পর্শিয়া থাকে। ক্ষুধার্ত্তকে সুপক্ক খাদ্য দান করিলে পাচক পুণ্যের ভাগ প্রাপ্ত হয় না; খাদ্যদাতাই পাইয়া থাকে। সেইরূপ ঈশ্বর পাপ এবং পুণ্য উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। যে পাপাচরণ করে সে পাপের, যে পুণ্যাচরণ করে সে পুণ্যের ফলভোগ করিয়া থাকে; নিরঞ্জন ঈশ্বরে উহার ফল বর্ত্তে না।

১৮

কোন একটী সাধু যাইতে যাইতে পথি মধ্যে জনৈক বারাঙ্গনার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশী দর্শন করিয়া প্রথমে হাস্য ও পরক্ষণেই ক্রন্দন করিলেন। বারযোষিৎ সাধুর ঈদৃশ ভাবদর্শনে সাধু চরিত্রে সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর তুমি আমাকে দেখিয়া হাসিলে কেন?" সাধু বলিলেন "মা! তোমার অতুলনীয় রূপমাধুরী সন্দর্শনে মনে বড় প্রীতির সঞ্চার হইল, তাহাতেই হাঁসিলাম। বেশ্যা কহিল "তবে ঠাকুর কাঁদিলে কেন?" সাধু কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন "মা! তোমার এই মনোহর সৌন্দর্য্যরাশি যে শিল্পী স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, না জানি সেই শিল্পী কত সুন্দর! তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না বলিয়াই ক্রন্দন করিলাম।"

১৯

রাজদ্রোহী হইয়াও সেই রাজার সসীম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, তুমি পার্থিব রাজার সসীম ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমাতিক্রম দুঃসাধ্য ভাবিয়া রাজদণ্ড ভয়ে রাজার অপ্রিয় কার্য্য করিতে সাহস করনা। কিন্তু ইহা কি তুমি একবারও

ভাবনা যে, যে রাজার রাজ্য অসীম অনন্ত, এমন স্থান নাই যেখানে তাঁহার শাসন দণ্ড উদ্যত নাই, যে রাজার ক্রোধ হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে কেহই সক্ষম নহে, তুমি প্রতিক্ষণে সেই রাজাধিরাজ ঈশ্বরের সুনিয়ম ভঙ্গ করত ঘোরতর রাজ বিদ্রোহ পাপে লিপ্ত হইতেছ, তোমার রক্ষার উপায় কি?

২০

কার্য্যতঃ মাতা অপেক্ষা পিতা পুত্রের হিতৈষী। পিতা পুত্রকে বিদ্যা শিক্ষার্থ দূর দেশে পাঠাইতে প্রস্তুত হইলে মাতা স্নেহের বশে তাহাকে গৃহে রাখিবার চেষ্টা করিয়া তাহার প্রকৃত পক্ষে অনিষ্ট করিবার উদ্যোগ পায়। বুদ্ধিমান্ বালক মাতার স্নেহ পাশ ছিন্ন করিয়া পিতার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া বিদ্যোপার্জ্জন করতঃ সুখী হয়। আর যাহারা নির্ব্বোধ তাহারাই পিতার আদেশ তুচ্ছ করিয়া মাতার স্নেহ প্রলোভনে ভুলিয়া নিজের অনিষ্ট সাধন করে। সেইরূপ পুরুষ-রূপী পিতা আমাদের হিতার্থে মোক্ষ প্রদান করিবার জন্য নিয়ত আহ্বান করিতেছেন; আর প্রকৃতি-রূপিণী মাতা মায়ায় ভুলাইয়া সংসাররূপ গৃহে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা পাইতেছেন। সাধক সন্তানেরা মাতার পশ্চাদনিষ্টকর মায়া প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া পিতার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া মোক্ষ লাভ করিতেছেন। আর সংসারাসক্ত-বিলাসী পুত্রগণ পুরুষ-পিতার আদেশ অবহেলা করিয়া প্রকৃতি-মাতার মায়ায় আবদ্ধ হওত পরিণামে অশেষ যন্ত্রনা পাইতেছেন।

২১

কোন জলাশয় উত্তীর্ণ হইতে হইলে কাষ্ঠময়ী তরণীর আবশ্যক হয়, সেইরূপ ভবসমুদ্র পারের জন্য হরিপদ তরণীর প্রয়োজন। কাষ্ঠময়ী তরণী নির্দ্দিষ্ট পরিমিত ভার বহনে সক্ষম, হরিপদ তরণী অসীম পাপ ভার বহন করিয়া থাকে। কাষ্ঠময়ী তরণী দ্বারা জলাশয়ের পর পারে গমন করিলে আবার পূর্ব্ব পারে আসিতে হয়, হরিপদ তরণী আশ্রয়ে ভব সমুদ্র পার হইলে আর সংসার পারে আসিতে হয় না। কাষ্ঠময়ী তরণীর নাবিককে ভক্তিরূপ আতর প্রদান করিলে তাহা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, পরন্তু ভবসমুদ্রের পরপারে যাওয়া যায়। কোন জলাশয়ের তীরে গমন না করিলে কাষ্ঠময়ী তরণী পাওয়া যায় না, কিন্তু অন্তকালে যে স্থানেই হরিপদ তরণীর নাবিককে স্মরণ করা যায়, সে স্থানেই তিনি তরণী লইয়া উপস্থিত হন। কাষ্ঠময়ী তরণীতে জল উঠিলে বিনাশের কারণ হয়, হরিপদ তরণীর জলে জীবের উদ্ধার হইয়া থাকে। কাষ্ঠময়ী তরণীকে গুণ দ্বারা টানিয়া লইয়া যাইতে হয়, হরিপদ তরণী নিজগুণে পারার্থীকে টানিয়া লয়। ভাই জীব সকল এমন তরণী আশ্রয়ে কদাপি অবহেলা করিও না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

আদর

(সন্তানের প্রতি)।

প্রীতির কুসুম, নয়নের তারা,
হৃদয়ের ধন, তুইরে মোর।
দুঃখময় মম, হইত সংসার,
না হইত যদি, জনম তোর ॥

কুসুমের বাস, চাঁদের কিরণ,
প্রণয়ের উচ্ছ্বাস, স্বপন সুখ।
মনে মম পড়ে, হেরিলে রে তোর,
শরত জলজ, বিজিত মুখ ॥

নন্দনের তুই, পারিজাত ফুল,
দেবের দুর্লভ, রূপের খনি।
স্বপনের দেশে, চলি যায় মন,
হেরি যবে তোর, বদন খানি ॥

কিসলয় শোভা, তটিনীর রব,
পবন হিল্লোল, বিহগ গান।
সব দেখি তোর, বদনে চিত্রিত,
হেরিলে মোহিত, হয় রে প্রাণ ॥

বড় আদরের, ধন তুই মোর,
কোথা রাখি তোমা, ভেবে না পাই।
হৃদয়ে রাখিলে, মেটে না ত আশা,
কোথায় রাখিব, জানি না তাই ॥

অন্ধকার মাঝে, আলোক দেখিলে,
হৃদয়েতে সুখ, যেমন হয়।
তোর মুখ খানি, তেমনি হেরিলে,
সুখে ডুবে মন, আমার রয় ॥

রাঙা রাঙা কম, হাত দুই খানি,
ছোট ছোট তায়, আঙুল গুলি।
বিধাতা যেনরে, নলিন গ্রথিত,
করিয়াছে কম, চাঁপার কলি ॥

বদন কমল, তোর চল চল,
কতই সুন্দর, অমিয় ভরা।
অমরের দেশে, বুঝি বা আছিল,
আসিয়াছে বুঝি, দেখিতে ধরা ॥

এত পবিত্রতা, এত কোমলতা,
এত প্রফুল্লতা, নহিলে কেন।
এমন অমিয়, জড়িত শরীর
সুন্দর মধুর, হইবে হেন ॥

তাই তোরে যবে, নিরখি নয়নে,
হৃদয়ের তার, বাজিয়া উঠে।
শিরায় শিরায়, অমনি আমার,
অমৃতের ধার, আপনি ছুটে ॥

নলিন নিন্দিত, নয়ন যুগল,
পবিত্রতা মাখা, মোহন হাসি।
ছোট পা দুখানি, কেমন গঠিত,
জগতে অতুল, ও রূপরাশি ॥

ভুলি যাই ধরা, ভুলিরে সংসার,
হেরিয়া বদন কমল তোর।
আদরের ছবি আমাদের তুই,
আমাদের তুই স্নেহের ডোর ॥

সংসারে যাদের, তোর মত ফুল,
ফোটে না সে স্থান মরুর মত।
দুঃখের বালুকা শুধু ধূ ধূ করে,
জীবন হরিণ পুড়িছে কত ॥

মাতৃ মনোরথ সহিত বর্দ্ধিত,
হও চিরজীবি হৃদয় ধন।
সংসারের পথে ধর্ম্ম লক্ষ করি,
চলিও আমার এই মনন ॥
জগদীশ প্রতি, থাকে যেন মতি,
পরকালে যেন থাকেরে ভয়।
তবে সুখী হবে, দুঃখ নাহি পাবে,
সুখ শান্তি দাতা হরি কৃপায়।

শ্রীশ্রীপতি কবিরত্ন।

আমিত্ত পাগল।

১

এ কি!

অকস্মাৎ কেন আমি হইনু এমন?
অকস্মাৎ কি কারণ, অবসন্ন দেহ মন,
অবশ ইন্দ্রিয়, যেন ঘুমে অচেতন!
অকস্মাৎ হইল কি নিদ্রা আকর্ষণ?

২

না! না!

কোথা নিদ্রা!—অবসাদ কোথায় বা আর!
এত হৃদয়ের তার, বাজিতেছে অনিবার,
তর তর তর স্পন্দে শোণিত আধার!
অকস্মাৎ এ কি বল হইল আমার?

৩

সহসা!

স্মৃতির সাগরে কেন উঠিল তুফান?
তাসিল হৃদয়,—বেগে কহিল উজান!
জ্বলিল বাড়বানল, গেল গেল বক্ষঃস্থল,
রে সর্ব্বনাশিনী স্মৃতে, সাবাস! সাবাস!
যে দেহে করিস বাস তারি সর্ব্বনাশ!

৪

উহুঃ!

অসহ্য হইল,—এ যে ভীষণ অনল!
পুড়ে হৃদি হ'ল খাক, যায় প্রাণ! যা'ক যা'ক!
কই যায়!—যায় না যে!—জ্বলিছে কেবল!
জ্বলুক জ্বলুক!—ক্রমে হউক প্রবল!

৫

বাপ রে!

ভীষণ জ্বালা সহিতে পারি না!
গগনস্পর্শিনী শিখা, বুকের ভিতরে রাখা,
আর কতক্ষণ যায়? না না না আর না!
এখনো রাখিতে হবে?—উহুঃ কি যন্ত্রণা!

৬

দেখেছ!

অই যে সোহাগ ভরে ঢলিয়া ঢলিয়া
পড়িছে সৈকত কোলে হেলিয়া হেলিয়া
অনন্ত নীলাম্বুরাশি! উহার ভিতরে পশি
নিবাই এ জ্বালা,—প্রাণে সহে না সহেনা!
দিলাম সুখেতে ঝাঁপ, ধর'না ধর'না!

৭

ছি! ছি!

কি করিলে!—ধরিলে যে! ডুবিতে দিলেনা!
নাই দিলে!—কিন্তু আর নিষেধ ক'রনা!
অই অনলের কুণ্ডে পড়ি আমি এই দণ্ডে
হই ভস্মীভূত, ভুলি নিখিল যন্ত্রণা!
বিষে বিষক্ষয় হ'ক!—তাহাও হবেনা?

৮

দেখি,

এই চলিলাম, কেবা নিবারে আমায়!
বেখিব এবার আসি কেবা বাধা দেয়!
উত্তুঙ্গ অচলশিরে সুখে আরোহণ ক'রে
দিব লম্ফ, পড়ি তুমে হ'ব চূর্ণীকৃত!
ধুলায় ধুলার দেহ হ'বে পরিণত!

৯

আহাঃ!

কে ধর?—ছাড় ছাড়!—বিরক্ত ক'র না!
আ র উপরে আর জ্বালা বাড়া'য়ো না!
পুড়ি ছি যে অনলে, চিরে দেখা'বার হ'লে
দেখা'ত চিরি' বক্ষঃ, তবু শুনিবে না?
ধ'রে কি লাভ?—আচ্ছা ধ'রেই রাখনা!

১০

তবে

এই দৃঢ় জ্জু আমি বাঁধিনু গলায়!
টানিয়া ইহ ফাঁস, করি জীবনের নাশ!
অই যা দুলিল রজ্জু—এ কি বিড়ম্বনা?
অভাগা পাপ প্রাণ তবে কি যাবে না?

১২

ভাই,

হাতে ধরি —ভিক্ষা করি,—রাখ মোর মান!
দাও বিষভ আনি, করি সুখে পান!
তীব্র হলাহল পানে, মুদি সুখে দু-নয়নে,
অনন্ত নিদ্রা ক্রোড়ে করিয়া শয়ন,
ভুলি হৃদয়ের জ্বালা অসহ ভীষণ!

১২

কিম্বা

আন তীক্ষ্ণ ছুরি, আমি হৃদে বসাইয়া
শোণিত তরঙ্গে ভাসি, নিবাই যন্ত্রণারাশি,
দেখা জগত জনে এ বক্ষঃ চিরিয়া,
কি ভীষণ অগ্নি জ্বলে শিখা বিস্তারিয়া!

১৩

অথবা

শীঘ্র আনি দাও ভাই, "ব্রাণ্ডির বোতল"!
খুলি সিপি মনোসুখে, লয়ে গ্লাস ঢালি মুখে,
সন্তাপ-নাশিনী সুরা,—পাশরি সকল!
পাগল! পাগল!! আমি, পাগল!!! পাগল!!!!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সোম।

তরু কোলে লতা।

১

অমল শারদ পূর্ণিমা নিশায়
হাসিয়া পাগলী প্রকৃতি সতী!
হেরিতে সে হাসি পাগলের চিতে
সহসা কৌতুক উপজে অতি।

২

কহিনু প্রিয়ারে "প্রমোদ-কাননে
চল চল সখি, দু-জনে যাই,
প্রমোদ-কানন হাসিছে কেমন
আমোদে উভয়ে দেখিব তাই!"

৩

শুনিয়া প্রেয়সী সানন্দ অন্তরে
তখনি ধরিল আমার কর।
চলিনু দু-জনে হরষিত মনে;
যাইতে যাইতে ক্ষণেক পর

৪

পশিনু উদ্যানে, যথায় মাধবী
হাসিয়া ঢলিছে রসাল কোলে
দাঁড়াইনু তথা সম্বোধি প্রিয়ারে
সাদরে কহিনু মধুর বোলে,—

৫

"দেখ দেখ প্রিয়ে, দেখ লো কেমন
তরুর কোলেতে হাসিছে লতা!"
শুনিয়া প্রেয়সী মুচকি হাসিয়া
না শুনিয়া যেন আমার কথা,

৬

পশারি দু-বাহু জড়া"য়ে এ গলে
কহিলা মধুরে, "অহে প্রাণধন,
দেখ দেখ চেয়ে অহে প্রাণনাথ,
তরু কোলে লতা হাসিছে কেমন!"

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সোম।

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

প্রথম খণ্ড।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী।

উপক্রমণিকা।

হুজুকে পড়িয়াই বঙ্গদেশের দফারফা হ'ল। অন্তঃসার-শূন্য হুজুকের হুড়াহুড়িতে বেহুঁস হইয়া, বাঙ্গালী হস্তাস্ফালন পূর্ব্বক লম্ফঝম্প করিতেছে, দেখিলে হাসিও আইসে, আবার অশ্রুসংবরণও দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়। এক মহাত্মা বঙ্গগর্ভে জন্মিয়া, চিরদিন তাহারই ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া, কয়েকদিনমাত্র বিমাতার বাহ্য সমাদরে এমনই মুগ্ধ হইলেন যে, স্বীয় গর্ভধারিণীর নাম পর্য্যন্ত ভুলিলেন; তাঁহার কথাগুলি পর্য্যন্ত স্মরণ রহিল না। এপাপ সহিবে কেন? "যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ" আর্য্যবংশে কি এ অকৃতজ্ঞতা স্থান পায়! অবিলম্বে পাপের ফল ফলিল; বিনা বা অত্যল্প অপরাধেই রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইলেন। শেষে আর কি করেন, রাজনীতির হুজুক তুলিয়া, বৃথা, অকিঞ্চিৎকর, অসম্বদ্ধ প্রলাপে ভারত মাতাইয়া বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কথায় বলে "কম বুদ্ধি ভরসা, বিশ পেরুলেই ফরসা"। যেমন বিপৎপাত, অমনি যেন আর তিনিই নন; মুখসর্ব্বস্ব হুজুকশীল বাঙ্গালীর বঙ্গবীর্য্য প্রায়ই এইরূপে "বালবৈধব্য-দগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব" অকালে বিলীন হইয়া থাকে। অদ্য এক সাধু পুরুষ কয়েকদিনমাত্র বারাণসী-ধামে গৃহে বাস করিয়া দুই একটী দর্শন-শাস্ত্রে লব্ধ প্রসর হইতে না হইতেই, হুজুকের পাল তুলিয়া বঙ্গসাগরে বা'চ খেলিবার জন্য পাগল হইলেন। ময়ূরের পক্ষে ভূষিত হইয়া বিজ্ঞানের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে গেলেন। সদর্প হস্তাস্ফালনে, সগর্ব্ব বাগ্‌জালে, অভিনব ধরণধারণে, রুচিব্যঞ্জক ভাবভঙ্গিতে, সাধারণকে তৎকালে মুগ্ধ করিলেন বটে কিন্তু কোন কোন সুচতুর ভিতরের ভাব বুঝিয়া, পার্শ্ব হইতে দুই একটী পালক তুলিয়া অপদস্থ করিবার উপক্রম করাতে, অগত্যা তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া রাজসীমান্তে লুক্কায়িত রহিলেন। ইহাঁরই হুজুকে আজ কাল কলিকাতায় একবিধ অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেবল একটী জন্তু আছে, যাহা সাহেব ও বিবি উভয়েরই গুণবিশিষ্ট। নবসৃষ্ট জীবেও

৯

আহ্বাঃ!

কে ধর?—ছাড় ছাড়!—বিরক্ত ক'র না!
জ্বা র উপরে আর জ্বালা বাড়া'য়ো না!
পুড়ি ছি যে অনলে, চিরে দেখা'বার হ'লে
দেখা'ত চিরি' বক্ষঃ, তবু শুনিবে না?
ধ'রে কি লাভ?—আচ্ছা ধ'রেই রাখনা!

১০

তবে.

এই দৃঢ় জ্জু আমি বাঁধিনু গলায়!
টানিয়া ইহ া ফাঁস, করি জীবনের নাশ!
অই যা ছিঁড়িল রজ্জু—এ কি বিড়ম্বনা?
অভাগা পাপ প্রাণ তবে কি যাবে না?

১১

ভাই,

হাতে ধরি —ভিক্ষা করি,—রাখ মোর মান!
দাও বিষভা ও আনি, করি সুখে পান!
তীব্র হলাহল পানে, মুদি সুখে দু-নয়নে,
অনন্ত নিদ্রা ক্রোড়ে করিয়া শয়ন,
ভুলি হৃদয়ের জ্বালা অসহ ভীষণ!

১২

কিম্বা

আন ক্ষ্ণ ছুরি, আমি হৃদে বসাইয়া
শোণিত তরঙ্গে ভাসি, নিবাই যন্ত্রণারাশি,
দেখা জগত জনে এ বক্ষঃ চিরিয়া,
কি ভীষণ অগ্নি জ্বলে শিখা বিস্তারিয়া!

১৩

অথবা

শীঘ্র আনি দাও ভাই, "ব্রাণ্ডির বোতল"!
খুলি সিপি মনোসুখে, লয়ে গ্লাস ঢালি মুখে,
সন্তাপ-নাশিনী সুরা,—পাশরি সকল!
পাগল! পাগল!! আমি, পাগল!!! পাগল!!!!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সোম।

তরু কোলে লতা।

১

অমল শারদ পূর্ণিমা নিশায়
হাসিয়া পাগলী প্রকৃতি সতী!
হেরিতে সে হাসি পাগলের চিতে
সহসা কৌতুক উপজে অতি।

২

কহিনু প্রিয়ারে "প্রমোদ-কাননে
চল চল সখি, দু-জনে যাই,
প্রমোদ-কানন হাসিছে কেমন
আমোদে উভয়ে দেখিব তাই!"

৩

শুনিয়া প্রেয়সী সানন্দ অন্তরে
তখনি ধরিল আমার কর।
চলিনু দু-জনে হরষিত মনে;
যাইতে যাইতে ক্ষণেক পর

৪

পশিনু উদ্যানে, যথায় মাধবী
হাসিয়া ঢলিছে রসাল কোলে
দাঁড়াইনু তথা সম্বোধি প্রিয়ারে
সাদরে কহিনু মধুর বোলে,—

৫

"দেখ দেখ প্রিয়ে, দেখ লো কেমন
তরুর কোলেতে হাসিছে লতা!"
শুনিয়া প্রেয়সী মুচকি হাসিয়া
না শুনিয়া যেন আমার কথা,

৬

পশারি দু-বাহু জড়া"য়ে এ গলে
কহিলা মধুরে, ""অহে প্রাণধন,
দেখ দেখ চেয়ে অহে প্রাণনাথ,
তরু কোলে লতা হাসিছে কেমন!"

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সোম।

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

প্রথম খণ্ড।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী।

উপক্রমণিকা।

হুজুকে পড়িয়াই বঙ্গদেশের দফারফা হ'ল। অন্তঃসার-শূন্য হুজুকের হুড়াহুড়িতে বেহুঁস হইয়া, বাঙ্গালী হস্তাস্ফালন পূর্ব্বক লম্ফঝম্প করিতেছে, দেখিলে হাসিও আইসে, আবার অশ্রুসংবরণও দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়। এক মহাত্মা বঙ্গগর্ভে জন্মিয়া, চিরদিন তাহারই ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া, কয়েকদিনমাত্র বিমাতার বাহ্য সমাদরে এমনই মুগ্ধ হইলেন যে, স্বীয় গর্ভধারিণীর নাম পর্য্যন্ত ভুলিলেন; তাঁহার কথাগুলি পর্য্যন্ত স্মরণ রহিল না। এপাপ সহিবে কেন? "যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ" আর্য্যবংশে কি এ অকৃতজ্ঞতা স্থান পায়! অবিলম্বে পাপের ফল ফলিল; 'বিনা বা অত্যল্প অপরাধেই রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইলেন'। শেষে আর কি করেন, রাজনীতির হুজুক তুলিয়া, বৃথা, অকিঞ্চিৎকর, অসম্বদ্ধ প্রলাপে ভারত মাতাইয়া বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কথায় বলে "বল বুদ্ধি ভরসা, বিশ পেরুলেই ফরসা"। যেমন বিপৎপাত, অমনি যেন আর তিনিই নন; মুখসর্ব্বস্ব হুজুকশীল বাঙ্গালীর বলবীর্য্য প্রায়ই এইরূপে "বালবৈধব্য-দগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব" অকালে বিলীন হইয়া থাকে। অন্য এক সাধু পুরুষ কয়েকদিনমাত্র বারাণসী-ধামে গুরুগৃহে বাস করিয়া দুই একটী দর্শন-শাস্ত্রে লব্ধপ্রসর হইতে না হইতেই, হুজুকের পাল তুলিয়া বঙ্গসাগরে বা'চ খেলিবার জন্য পাগল হইলেন। ময়ূরের পক্ষে ভূষিত হইয়া বিজ্ঞানের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে গেলেন। সদর্প হস্তাস্ফালনে, সগর্ব্ব বাগ্‌জালে, অভিনব ধরণধারণে, রুচিব্যঞ্জক ভাবভঙ্গিতে, সাধারণকে তৎকালে মুগ্ধ করিলেন বটে কিন্তু কোন কোন সুচতুর ভিতরের ভাব বুঝিয়া, পার্শ্ব হইতে দুই একটী পালক তুলিয়া অপদস্থ করিবার উপক্রম করাতে, অগত্যা তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বঙ্গসীমান্তে লুক্কায়িত রহিলেন। ইহাঁরই হুজুকে আজ কাল কলিকাতায় একবিধ অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেবল একটী জন্তু আছে, যাহা সাহেব ও বিবি উভয়েরই গুণবিশিষ্ট। নবসৃষ্ট জীবেও

ছু ট বিপরীত গুণ দৃষ্ট হয়, চশমা ও শিখা। মৃত কবিবর প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় দাড়ি ও চশমা দেখিয়াই ত গীত বাঁধিলেন—"চাপ ড়ি মুখে, চশমা ঢাকা চোকে, ভয়ানক এ ঙ্ উঠেছে বাঙ্গালায়"; আজ তিনি জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই এ জীবকে ঢঙের মিলন শব্দে অভিহিত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তার পর সংবাদপত্রের হুজুক। জ্ঞান সম্পাদক হয়ত কিছুকাল সহকারী স ম্পাদকের কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া হাত পাছাইয়া, কেহ বা নর্ম্মেল স্কুলের দুই একটী প রীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কেহ বা ইংরাজি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত বিদ্যার থ ম করিয়া, চতুরানন্দ পঞ্চানন্দ সমভিব্যাহারে-সম্পাদকের আসরে নামিলেন; অগাধ-জলসঞ্চারী রোহিতস্থানে গণ্ডুষজল-ফরফরায়মাণ শফরী উপস্থিত হইল, কাজে কাজেই না দেখিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। নারদের রাগ-আলাপের ন্যায় প্রকৃতকে বিকৃত করিতে লাগিলেন। তারপরত সমালোচ্য গ্রন্থে সি, আই, ই, বা কে, সি, আই, ই দেখিলেই একদম মাত। বৈতালিকরূপীর মহাত্মারা অমনি "অস্থিবদ্দধিবচ্চৈব শঙ্খবৎ বকবত্তথা" বলিয়া তারস্বরে গুণ-কীর্ত্তনে স্বর্গ মর্ত্ত ছাইয়া ফেলিলেন। একালে সু কি ভু কেহ দেখিতে চায় না। হুজুকপ্রিয় বঙ্গদেশে হুজুকওলাদেরই পোয়াবার। দুগ্ধপোষ্য বালক হইতে করধৃতকম্পিতযষ্টি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এই হুজুকের ঢেউএ এমনই বিহ্বল হইয়াছে, যে ভবিষ্যতে তাহাদের কাছে "হুজুগেব পরা বেদা হুজুগেব পরাক্ষরাঃ। হুজুগেব পরা মুক্তি-হুজুগেব পরা গতিঃ" না হইয়া দাঁড়ায়।

দেশীয়গণ! ভাল চাওত, হুজুক পরিত্যাগ কর। রাজনীতিই বল, আর ধর্ম্মকর্ম্মই বল, আর সমাজসংস্কারই বল, আর দেশ-হিতৈষীতাই বল, হুজুকে কিছুই হইবে না; তজ্জন্য অন্তঃসারবত্তার প্রয়োজন; সুতরাং তৎসংগ্রহেই সচেষ্ট হও; নতুবা, কখনও আর এই অধোগতির দুস্তর মহাপঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

এবার বিদ্যাশিক্ষা ও ইউনিবার্সিটীর হুজুক। আজকালকার ছাত্রগণত ভারতের ভাবী আশাস্থল (Future hopes of India)। তাঁহারাও কম হুজুকশীল নন। তাঁহারা নামে বিদ্যার্থী, কার্য্যে কিন্তু ঠিক বিপরীত। কেননা, প্রকৃত বিদ্যালাভ বোধ হয়, কেহই ইচ্ছা করে না, কেবল পাস করিয়া কিরূপে লোকের নিকট বাহাদুরী মারিব, তজ্জন্যই সকলে বিব্রত। অকারণ চশমা ধরিয়া লোকের নিকট পঠনশীলতার পরিচয় দেওয়া কেন? রাত্রি জাগরণ করিয়া উহার পরিপূরণের জন্য দিবানিদ্রার আবশ্যক কি? জানি, এককথার উত্তরে তোমরাত বলিবেই যে, দিবসে তিন ঘণ্টায় যে কার্য্য হইত, রাত্রে এক ঘণ্টায় তাহা হইতে পারে। তজ্জন্যই রাত্রি-জাগরণ করিয়া দিবানিদ্রায় বাধ্য। তোমাদের এ যুক্তি মানা যায় বটে, কিন্তু তোমারা একথা স্বীকার কর কি বলিতে পারিনা, যে, রাত্রিতে এক ঘণ্টা জাগিয়া দিবসে সাত ঘণ্টা ঘুমাইলেও উহার ক্ষতিপূরণ হয় কি না সন্দেহ। তবে প্রকৃত নিদ্রার সময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া আয়ু ক্ষয়

করা বৃথা। তোমাদেরত রাধিকা বাবুর স্বাস্থ্যরক্ষা পড়া আছে (১৮৬৪ সালে স্বাস্থ্য-রক্ষা প্রথম মুদ্রিত হইয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক-রূপে নির্দ্ধারিত হয়, তদবধি আজ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর সেইরূপই পাঠ্যপুস্তক আছে, এবং গ্রন্থকারের প্রপৌত্রের জীবিতকাল পর্য্যন্তও থাকিবে বলিয়া বোধ হয়। এই সময় আমাদের চক্ষে অনেক বেশী লাগে, কিন্তু শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের চক্ষে তত বেশী নয়, কারণ আমাদের মনুষ্য বর্ষ, এবং তাঁহাদের ব্রাহ্ম বর্ষ) সুতরাং বেশ জান, যে, বিশুদ্ধবায়ু-সেবিত গৃহে বাস করা উচিত; তবে নির্জ্জনতার ভাণে ঘরের সমস্ত দোর জা নালা বন্ধ করত, উহার ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাক কেন? প্রাতে উঠিয়াই শৌচ-প্রস্রাব-ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তোমরা নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত লেপ জড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে, তৎপরে একেবারে শৌচ-প্রস্রাব-ত্যাগ ও স্নানাহারান্তে বিদ্যালয়ে যাইবে; কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই সময়ের অল্পতার দের অভিযোগ করিবে। এ সকল বিষয়ে তোমরা-কত ভ্রম দেখ; নয়টার সময় শৌচ-প্রস্রাবে অল্প সময় লাগে, আর প্রাতে অধিক সময় লাগে, এরূপ নয়। সময় একই। তবে প্রাতেই একেবারে শৌচস্নানাদি সমাধা করিয়া পাঠে উপবেশন কর; যথাকালে আহার করিয়াই বিদ্যালয়ে যাইবে। তাহাতে শরীররক্ষা ও বিদ্যাসাধন দুই হইবে; "গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকিবে, অথচ পিতৃলোকেরও উদ্ধার হবে"। তোমাদেরত তা উদ্দেশ্য নয়; তোমরা লোককে দেখাও "মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ"।

মনে কিন্তু "যেন তেন প্রকারেণ বাহাদু মারিষ্যতে"।

কলিকাতা ইউনিবার্সিটিও বেশ হু ক তুলিয়াছেন। প্রথমতঃ, উহার উ দেশ্য খুব ভালই ছিল, কিন্তু এদেশের ভাগ্য-বশত এখন ঠিক বিপরীত য়াছে। তবে মাঝখান থেকে কএকজন লোকেরই মহেন্দ্র যোগ উপস্থিত। কেহ কেহ পাঠ্যপুস্তক সংকলন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন; কেহ কেহ পর্য্যুপরি পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া অর্থলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কেহ কে এমনই পসার করিয়া বসিয়াছেন, যে কতক লি চিতা ভস্ম সংগ্রহ করতঃ "দুই শত প্রশ্ন" নাম দিয়া এক পুস্তক বাহির করিলেন। খিতে ২ পাঁচ সহস্র কাপি বিক্রীত হই গেল। কিন্তু একজন বেপসারে লোক "সহস্র প্রশ্ন" নামে কোন পুস্তক প্রণয় করিলেও কেহই তাহা স্পর্শ করেনা। ই নিবার্সিটির সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করি, সহস্র হস্র পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে একখানিও কি তাঁহাদের উপযুক্ত বলিয়া ধারণা হইল না। ল, নাই হউক, তজ্জন্যও দুঃখ নাই। হারাও যে পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন, হাওত দিব্য। চতুর্হস্ত, পঞ্চপদ, পক্ষলাঙ্গুল বিশিষ্ট বলিলেও চলে। আর এককথা, দেশে কি আর অন্য লোক নাই; কএকজন লোকই যে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষক নিযুক্ত হন কেন? হাঁ মানিলাম, তাঁহারা যোগ্য লোক বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমকক্ষ লোক যে আর নাই, একথা কেমন করিয়া স্বীকার করিব। তবে পাঁড়ে সিং দোবে চোবে সরকার দালালের মত লোক অনেক আছে; সময়ে সময়ে তাহাদিগকেও এক একবার ডাক

উচিত। পরীক্ষক নির্ব্বাচনের নিয়মগুলিও চূড়ান্ত। কলেজের অধ্যাপক, সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের সম্পাদক অথবা গ্রন্থকার হইলেই যে কোন ব্যক্তি পরীক্ষক হইতে পারেন। স্কুল ডিপার্টমেণ্টের কোন শিক্ষক পরীক্ষক হইতে পারিবেন না। এখন যদি কেহ গ্রন্থকার কি সম্পাদক, বা গ্রন্থকার ও সম্পাদক উভয়ই হন, এবং স্কুলে মাষ্টারি কি পণ্ডিতি করেন, তবে কি তাঁহাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইবে না? কেন যে করা হইবে না, তাহা ইউনিবার্সিটীর সভ্যগণই বুঝেন। অধ্যাপক, সম্পাদক, কিম্বা গ্রন্থকার এগুলি কেবল গুণ-পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নয়। কেহ যদ্যপি গ্রন্থকার বা সম্পাদক হন, তাহাতেই তাঁহার গুণবত্তা জানা গেল। তবে তিনি স্কুল ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য করেন বলিয়া জাতি-ভ্রষ্ট হইয়াছেন নাকি? যে তাঁহাকে আর পরীক্ষক করিবার অধিকার দেওয়া গেল না। আবার এই নিয়ম কেবল অজ্ঞাত-নামার পক্ষেই খাটে; খ্যাতনামার যত গলদই থাকুক না, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আইসেনা। রেভারেণ্ড ডাক্তার সি ব্যোমান স্কুল ডিপার্টমেণ্টের অধ্যাপক ছিলেন। (যখন তিনি সি, এম এর বোর্ডিং স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়াইতেন, তখনও পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা এস্থলে তাঁহার কেথিড্রাল মিশন কলেজের অধ্যাপকত্বের কথা বলিতেছি না) তিনি অনেক বার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। গৌরীশঙ্কর দে এণ্ট্রান্স ক্লাসে গণিত শিখাইতেন, তিনিও কতবার পরীক্ষক হইয়াছেন। ইউনিভার্সিটীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই, তিনি বলিবেন, তাঁহাদিগকে অধ্যাপক বলিয়া জানি; এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ান কি না আমাদের দেখার আবশ্যক নাই। তবেই ইউনিভার্সিটিতেও হিন্দু-ধর্ম্মের গতিক দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুদের যেমন কার্য্যে ম্লেচ্ছ যবন হইলেও মুখে হিন্দুত্ব-রক্ষা; ইউনিভার্সিটীও, ভিতরে যত গলদই থাকুক না, মুখে সাফাই মারিয়া কাজ সারিতেছেন। এদিকে ত এই, অন্যদিকে কাগজ পাইয়া অতি অল্প পরীক্ষকই যথা-সাধ্য-পরিশ্রম সহকারে কাগজ দেখেন। শেষে প্রধান পরীক্ষকের নিকট কাগজ পাঠান হইলে, তিনি শতকরা হিসাবে পাস করিয়া সর্ব্ববিধ ঝোঁক হইতে নিষ্কৃতি পান। ইহাতেই স্থূলবুদ্ধির সাফল্য ও সূক্ষ্মবুদ্ধির নিষ্ফলতা ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান উপাধি-প্রাপ্ত যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই যে, সামান্য পত্র লিখিতেও ঝুড়ি ঝুড়ি ভুল করেন, ইহাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। ইউনিভার্সিটী শতকরা ত্রিশ কিম্বা তেত্রিশটী পাশ করিবেন, ইহাতে হয় ত দশ পনরটী অনুপযুক্ত ছাত্রও উত্তীর্ণ হইতে পারেন, আবার দশ বিশটী উপযুক্তেরও নিষ্ফলতা অপরিহার্য্য। ইহাকে আর গুণের পরীক্ষা বলা যায় না। সংখ্যার পরীক্ষাই বলা উচিত।

আবার আজকাল ইউনিভার্সিটীর লোকদিগের কাছে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" এই মহাবাক্যের বড়ই আদর দেখা যায়। পরীক্ষক দশজন; সকলেই বলিতেছেন —"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ—আমরাত/সামান্য মনুষ্য, সকল সময় কি মাথা ঠিক থাকে, যে বুঝিয়া সুঝিয়া নম্বর দিব। সময়ে সময়ে এমনই চিত্তবিকার জন্মে, যে কত

নম্বর দিব, তাহা ঠিক করিতেই আত্ম-বিস্মৃতি হয়; তখন অচেতন পদার্থ হস্তস্থিত কলমের উপরই ভার দিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকি। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি কলম মহাশয় এপাশ ওপাশ ফিরিয়া দুই এক অঙ্ক প্রসব করিয়াছে। তখন তাহাকেই বালকের পরিণাম বলিয়া স্বীকার করি।" এই চিত্ত-বিকৃতি বা আত্ম-বিস্মৃতি যদি শতকরা একজনেরও উপর ঘটে, তাহা হইলেই পঞ্চাশটী বা ততোধিক ছাত্রের পরিণাম এইরূপে মাঠেই মারা যায়। তৎপরে সমষ্টিকারী মহাশয় বলিতেছেন—"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, অন্যে পরে কা কথা—সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্যই, আমাদের হস্তের উপর ন্যস্ত। তিন আর দুয়ে পাঁচ, আর তিনে আট, আর পাঁচে তের, এ বিড়ম্বনা যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তিনিই ইহার মর্ম্মজ্ঞ। ইহাতেত পদে পদেই ভুল চুক হইবার সম্ভাবনা"। সুতরাং তাঁহাদের ভুলচুকেও অনেকছাত্র অব্যাহতি পান না। তারপর কেরাণী বাবুরা বলিতেছেন—"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ—যখন কোন কোন কার্য্যে মুনিদিগেরও মতিভ্রম ঘটে, তখন আমাদের ঘটিবে না কেন? যত বালক উত্তীর্ণ হইল, সকলের গুণানুসারে বা নামের বর্ণমালানুক্রমে তালিকা প্রস্তুত করা আমাদের কার্য্য। চারি পাঁচ হাজার ছাত্রের নাম লিখিতে কি একটীও এড়াইয়া যাইতে পারে না? কত সাবধান হইব। মানুষের ভ্রম পদে পদে।" অতএব এস্থানেও যে কেহ এড়াইলেন না এমন নহে। ইহার পরই প্রেসে উক্ত তালিকা প্রেরিত হইল। তথায়ও কম্পোজিটার, বা রিডার বা প্রুফকারেক্টারগণও কি "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" এই মহাবাক্য হইতে অব্যাহিত পাইবে? কখনই না! সেখানেও উক্ত বাক্যের সার্থকতা সমর্থিত হইল। এইরূপ নানা গোলযোগেই বর্ষে ইউনিভার্সিটীর গলদ বাহির হয়। ইউনিভার্সিটীর লোকগুলাকে কনের মা বলিলেও চলে। কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে। যে কার্য্যের মূলে স্বার্থ আছে, তাহা কখনই সুযশ প্রসব করিতে পারে না। এরূপ অসার ইউনিভারসিটীর কাছে আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকারের সম্ভাবনা দেখি না। সমস্তই অপকার। সুতরাং যত শীঘ্র ইহার উচ্ছেদ হয়, ততই মঙ্গল।

তারপরত খ্যাতনামাদের দুর্দ্দশা। ঈশ্বরেচ্ছায় যাঁহার একটু পসার হইয়াছে; তিনি মদগর্ব্বে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া এক প্রকাণ্ড উচ্ছৃঙ্খলবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। যা বলিতেছেন, তাহাতেই অমনি দেশের লোক অনিবার বাহবা বর্ষণ করিতেছে। বিলাত-প্রবাসী মহামহোপাধ্যায় ভট্ট ম্যাক্সমুলার এক অদ্বিতীয় প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া খ্যাত। একাল পর্য্যন্ত প্রাণপণে অনেকগুলি ভাষার অনুশীলন করিয়াছেন। সুতরাং, ভাষাসম্বন্ধীয় কোন কথায় তাঁহার অভিপ্রায় বেদবাক্য। তিনি যেই বলিলেন "এক সহস্রটী মূল ধাতু আছে, ইহা হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে"। অমনি তাড়িত বেগে এই নবাবিষ্কার পৃথিবীর একসীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল; সংবাদপত্রের জিহ্বায় জিহ্বায় উদ্ঘোষিত হইয়া দিগ্বিদিক্ ছাইয়া ফেলিল। চতুর্দ্দিকেই তাঁহার নামের ও গবেষণার টি টি পড়িয়া গেল। তিনি

আর্য্য বলিলেন—"ঋ ধাতু হইতে আর্য্য-শব্দ নিষ্পন্ন; ঋ ধাতুর অর্থ চাস করা; সুতরাং আর্য্য শব্দের অর্থ চাসা"—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর আর্য্য শব্দের যে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহা চূড়ান্ত। এইরূপ পণ্ডিতের বলিহারি বলিতেই হইবে। অহো গবেষণা! অহো অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি! অহো শাস্ত্রমর্ম্মগ্রাহিতা! ঋগ্বেদের সার গ্রহণ করতঃ পণ্ডিতপ্রবর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে পূর্ব্বকালে আর্য্যেরা কৃষিকর্ম্ম করিতেন; তাঁহারই পুচ্ছাবলম্বনে, অক্ষয়কুমার দত্তও অমনি লিখিলেন—"যে দিন আর্য্যগণ হলস্কন্ধে স্নেহপালিত গোধন সঙ্গে ভারতভূমে প্রবেশ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। ম্যাক্সমূলার আর্য্যদিগকে চাসা বলুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, অক্ষয় বাবুও তাহাতে মতপ্রদান করিলেন কেন? ভট্ট মহাশয়ত ঋগ্বেদের দোষই দেন, অক্ষয় বাবুও কি তাহাতেই সায় দিয়াছেন? ম্যাক্সমূলার রজঃপ্রকৃতিক ম্লেচ্ছ, বেদের বিপরীত অর্থই বুঝিয়াছেন; কিন্তু দত্তজ মহাশয়ত সত্ত্ব-প্রকৃতিক ছিলেন; তিনিও যে বিপরীত অর্থ বুঝিলেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে!

ম্যাক্সমূলার কেশবচন্দ্র সেন লিখিতে "Keshab Kandra Sen" এইরূপ লিখেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যাঁহার একটু পসার হইয়াছে, তিনি কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-রহিত। ভট্টজী কেশব চন্দ্র ইত্যাদি স্থলে ক ও চ এই দুয়ের স্থানেই কেমন করিয়া একK তে সারিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যদি কেশব স্থানে Ceshab ও চন্দ্রস্থানে Kandra লিখিতেন, তাহা হইলেও না হয়, বুঝিতাম, যে কলিকালের মত কার্য্যই হইয়াছে। আবার যদি কোন-টার পরে ব্যঞ্জন-বর্ণ থাকিত, তাহাহইলেও না হয় মনে করিতাম, যে ব্যঞ্জন পরে K র উচ্চারণ চ'র মত হয়, তাহাও হয় নাই; উভয়ই স্বরবর্ণ। তবে কি এক স্বরে দুই স্থানে দুই প্রকার কার্য্য করিল। আমরাত বুঝি, ইহা ভট্ট মহাশয়ের নূতনত্ব দেখান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত তদীয় Literature of Bengal নামক পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন 'From the stiff unmusical Vedic style, to the sweet harmonious strains of Kalidas' ইহাঁরাই ঠিক "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে"। দত্তজর বেদে কত দৌড়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ইহাঁর ঋগ্বেদের এডিসনও তদ্রূপ। সামগান শুনিলে পাষণ্ডের ও মন গলিয়া যায়, দত্তজ মহাশয় অনায়াসেই তাহাকে unmusical বলিলেন। তৎপরে প্রশংসা করা হইল, 'sweet harmonious strains of Kalidas' বলিয়া!. রমেশ বাবুর এইরূপ ধারণায় আমাদের একটী যৎসামান্য পুরাতন গল্প মনে পড়িল। "কুয়ে বলে গুয়ে দাদা, বনমালী নাম শুনেছিস্। চুপ কর্ চুপ কর্, পাদী দিদি শুন্‌লে পরে হেসে মরবে"। পাঠকবর্গ বোধ হয়, এই গ্রাম্য কবিতার আবৃত্তিমাত্রেই গল্পের ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তজ্জন্য ইহার বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে। কোন গ্রামে কুয়ে ও গুয়ে নামে

দুই সহোদর বাস করিত। পাদী নামে তাহাদের এক জ্যেষ্ঠা সহোদরাও ছিল। তাহাদের ধারণা, যে, লোকের নাম কুয়ে কি গুয়ে কি পাদী এইরূপই হয়। অন্যরূপ নাম এপর্য্যন্ত তাহাদের কর্ণে উঠে নাই। হঠাৎ একদিন কুয়ে শুনিল, কোন লোকের নাম বনমালী। সে এই অশ্রুতপূর্ব্ব অভিনব নামশ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাড়াতাড়ি গুয়ে দাদার নিকট যাইয়া বলিল "গুয়ে দাদা গুয়ে দাদা! বনমালী নাম শুনেছিস্" গুয়েও অমনি ব্যস্ততা সহকারে বলিল, "চুপ কর্ চুপ কর্, পাদী দিদি শুন্‌লে পরে হেসে মরবে"। কুয়ে গুয়ের অজ্ঞতা-বশতঃ যেমন অতি কদর্য্য কুয়ে গুয়ে বা পাদী নামই তাহাদের উৎকৃষ্ট বোধ হইত, এবং অতি সুন্দর বনমালী প্রভৃতি নামও যেমন তাহাদের উপহাসাস্পদীভূত হইয়া দাঁড়াইত, তদ্রূপ অজ্ঞতাবশতই দত্তজ মহাশয়ের নিকট বেদের unmusical style এবং sweet harmonious strains of Kalidas ঘটিয়াছে। দত্তজর বোধ হয় বনমালীবৎ উদাত্তানুদাত্তস্বরিত স্বরসমন্বিত বেদ পাঠ কখনও কর্ণ-প্রবিষ্ট হয় নাই। অহো আমিও ত কম অজ্ঞান নহি। তিনি শূদ্র, তাঁর বেদ পাঠ শ্রবণ কিরূপে সম্ভবে। বেদ-পাঠী ব্রাহ্মণগণত কখনও শূদ্রসমক্ষে বেদোচ্চারণ করেন না। তাহাতে আবার তিনি বিলাতপ্রত্যাগত হইয়া ম্লেচ্ছপদবাচ্য হইয়াছেন। যাঁহা হউক, অজ্ঞতাবশত যে রমেশ বাবু উক্তরূপ বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অণুমাত্র সংশয় নাই।

আজকালত দেশে ধামাধরা লোকই অনেক। প্রকৃত সারবান্ লোকত "লাখে না মিলিল এক" বলিয়াই বোধ হয়। নতুবা হোমরা চোমরা সকলকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতানুসরণ করিতে দেখি কেন? আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহারই সমর্থনার জন্য অসার প্রমাণ, কূট তর্ক, মিথ্যা যুক্তি, অসম্বদ্ধ বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু অস্মদ্দেশীয় খ্যাতনামা মহাত্মাগণও তাহারই পোষকতা করিবেন! বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকেও ইহার প্রসঙ্গ! বালকগণ প্রথম হইতেই এই ভ্রমময় শিক্ষা পাইয়া সমস্ত জীবনের মত আত্মহারা হইতেছে। তাহারাও এখন হইতে আপনাদের পূজ্যপাদ পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে বাস্তুত্যাগী অনার্য্য বলিয়া জানিবে! ইংরাজ চক্ষে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইয়া উপনিবেশ করিয়া থাকা, সভ্যতার চিহ্ন হইতে পারে, আমাদের চক্ষে কিন্তু উহা বিপরীত দেখায়। কথায় বলে বাস্তুভূমি একবার পরিত্যাগ করিলে, সাতবার উদ্বাস্তু হইতে হয়; ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ম্লেচ্ছগণই প্রকৃত বাস্তুত্যাগী অনার্য্য। নতুবা, মধ্য-এসিয়া হইতে যাওয়া অবধি আমেরিকা প্রভৃতি কত স্থানে কত বার উপনিবেশ স্থাপন করত বসতি করিবে কেন? আর্য্যগণ যদি মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতভূমে পদার্পণ করিতেন, তাহা হইলে কখনই এখানেও চিরদিনের মত থাকিতে পারিতেন না। সুতরাং আর্য্যগণকে মধ্য-এসিয়া-নিবাসী বলা ঘোরতর পাষণ্ডের কর্ম্ম। এরূপ পাষণ্ডদের কথায় কেহ যেন আস্থাবান্ না হন।

ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন—"Their laws,like those of rude nations, in general, are in verse, their sacred books, and even their books of science are in verse, and what is more wonderful still, their dictionaries." ভট্ট প্রবরের মতে আর্য্যেরা অসভ্য ছিলেন, কেন না, তাঁহাদের যাবতীয় গ্রন্থ ছন্দোবদ্ধ পদ্যে লিখিত। বহুদর্শী ভট্ট মহাশয়ের এ ধারণা কোথা হইতে আসিল যে rude-nation মাত্রেরই গ্রন্থ সকল পদ্যে লিখিত হইয়া থাকে। সভ্য জাতিদিগের হয় না। আমাদের ধারণা ত ঠিক বিপরীত। আমরা জানি, পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য জাতির সমগ্র উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থই পদ্যে লিখিত। জর্ম্মন ভাষায় 'Lay of Hildebrand and Hadubrand,' 'Lay of Nibelunger,' 'Heljand,' অটফ্রিড সঙ্কলিত পবিত্র কাব্য 'Krist'; 'Ludwigslied' গ্রীক্ ভাষায় ভাষায় হোমর প্রণীত 'Illied,' 'Odyssey,' হিসিঅদ প্রণীত 'Works and Day, এবং 'Theogenia'; ইতালীয় ভাষায় ডান্টে প্রণীত 'Divine Comedy,' 'Vita Nuova,' 'Convito,' কিম্বা 'De Monarchia'; লাটীন ভাষায় 'Laws of Numa,' Laws of the Twelve Tables,' 'Salian Hymn,' 'Annales,' 'Menander,' ও 'Eneid,' হোরেস ও ভর্জিলের গ্রন্থনিচয়; ফরাসী ভাষায় 'Roman de Renard, 'Roman de la Rose'; এবং হিব্রু ভাষায় Old testment প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় কি পদ্যে লিখিত নয়? আদিম কালের যাবতীয় গ্রন্থই পদ্যে লিখিত হইত, এবং তাহাই হওয়া উচিত। আজকালই পদ্য লেখায় ভূয়িষ্ঠ প্রচলন হওয়াতে যেখানে সেখানেই অসংখ্য গ্রন্থকার পাওয়া যায়। যাহা হউক, পদ্যের উপর ভট্টজীর এত আক্রোশ কেন? আবার ভয় হয়, পাছে কোন দিন বা বলিয়া বসেন—'Rude Bengalis, in general, with pearl-like teeth.'

ভাই বঙ্গবাসী তোমাদিগকে শত শত বার ধিক্কার দিলেও চিত্তের ক্ষোভ দূর করা যায় না। তোমাদের বেদমাতা, গায়িত্রী জননী, সংস্কৃত-ভাষাকে ম্লেচ্ছগণ সেমেটিক শাখার অন্তর্ভুক্ত করিল, আর তোমরা হাতে সোনার চাঁদ পাইয়াছ মনে করিয়া সহস্র মুখে তাহাদেরই দোহাই দিতেছ! নোহার পুত্র শেম যে ভাষায় কথোপকথন করিতেন, তাহাই সেমেটিক। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই শেমাদির উল্লেখ আছে, বেদমাতা আর্য্য-ভাষার সঙ্গে তাহার সংস্রব কি? প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শেম বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার নামে আর্য্যভাষার নামকরণ হইল। কিন্তু, শেম কি নোহারও সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভাষার প্রচলন ছিল, সত্ত্বপ্রকৃতিক মহর্ষিগণ যে ভাষায় কথোপকথন করিতেন, হিন্দুরা যাহাকে আজ পর্য্যন্ত দেবভাষা বলিয়াই জানে, আত্মগৌরবেচ্ছু ম্লেচ্ছগণ সেই ভাষার গৌরব লাঘবমানসেই শেমাদির অবতারণা করেন, দেশীয় মহাত্মারা ত তাহা বুঝেন না। (অথবা সে সকল বুঝিবার লোকই বা কে আছে, যে আছে, সে লোকের নিকট নগণ্য) ম্লেচ্ছদের প্রতারণা-জালের অবান্তর ভেদ করিতে না পারিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহারই পোষকতা করেন।

ক্রমশঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্মা।

আমি কে!

অহং সৃষ্টিরহং কালো-
হপ্যহং ব্রহ্মাপ্যহং হরিঃ।
অহং রুদ্রোহপ্যহং শূন্য-
মহং ব্যাপী নিরঞ্জনম্॥

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র।

অহং প্রাণসংজ্ঞো ন তে পঞ্চবায়ু-
র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চ কোষাঃ।
ন বাক্যানি পাদো ন চোপস্থপায়ুঃ
চিদানন্দরূপং শিবোহহং শিবোহহম্॥

নির্ব্বাণাষ্টক।

অপার অনন্ত জলধি কোলে একটী ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদের ন্যায় সর্ব্বদাই ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি যে আমি, সেই আমি কে! মাথার উপর দিক্‌দিগন্তরব্যাপী সুনীল আকাশ, আকাশে অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ, অগণন নক্ষত্ররাজি, তার মধ্যে নিশানাথ বিমল চন্দ্রিকা ছটায় জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া বিশ্বস্রষ্টার বিমুগ্ধকারিণী শক্তির পরিচয় দিতেছে। নিম্নে অভিনব শস্য-শ্যামলা ধরিত্রী বাসন্তী শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; ধরিত্রী বক্ষে শত শত জনপদ, জনপদে সহস্র সহস্র নরনারী, এখন সকলেই নীরব; নিশা আগমনে ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন! নিশীথিনী গম্ভীরা! প্রকৃতি ধীরা, স্থিরা নিশ্চলা! পর্ব্বতে পুলিনে কাননে কন্দরে, জলে স্থলে সর্ব্বত্রেই এক শান্তিময় ভাব! একা আমি, সেই শান্তিময় নিশীথ সময়ে এক প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া একবার আকাশ কোলে একবার পৃথ্বীতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম;—দেখিলাম, ভাবিলাম, বুঝিলাম, মজিলাম। সেই ভাব-নিমগ্ন হৃদয়ে আবার এক নূতন ভাবের উদয় হইল; মনে হইল, সকলইত সকলি, কিন্তু আমি কে!

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে আমি কে? স্রোতস্বতী-স্রোতে একটী ছিন্ন তৃণ ভাসিয়া ভাসিয়া আসিল, ভাসিতে ভাসিতে স্রোতের সহিত চলিয়া গেল, পরে—ক্ষণকাল পরে কোথায় যাইয়া পড়িল; আমি কি সেই ছিন্ন তৃণ! কাদম্বিনী-সঙ্কুলা অমারজনীর অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া একটী বিদ্যুৎ ছটা ছুটিল কিন্তু দেখিতে না দেখিতে আবার সেই অন্ধকারেই মিশাইয়া গেল; আমি কি সেই সৌদামিনীর আভা! লতাকুঞ্জে কুসুমকোরক দেখা দিল, সময়ে ফুল প্রস্ফুটিত হইল, মৃদু-সমীর সঞ্চারে দুলিয়া দুলিয়া হাঁসিতে লাগিল, আবার দুই দণ্ড পরে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িল; আমি কি সেই কুসুমের শোভা! দার্শনিকেরা বলেন জগৎ মিথ্যা; তরু-লতা, পশু-পক্ষী, মানব-দানব কিছুই কিছু নয়, সবই ভ্রান্তি! "আমিও ভ্রান্তি, কেবল সেই নিত্য-নি-

জ্ঞানই সত্য আর সবই ভ্রান্তি। অহো ভ্রান্তি! সে দার্শনিক দর্শনশক্তি বিহীন! "আমি" যদি মিথ্যা, জগৎ যদি মিথ্যা, তবে তিনিও মিথ্যা। জগতের অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব, আমার অস্তিত্বে তাঁর অস্তিত্ব। যদি জগৎ না থাকিত, যদি আমি না থাকিতাম, তবে তিনি কোথায় থাকিতেন? কার্য্যেই কর্ত্তার কর্তৃত্ব; যদি কার্য্য না থাকে, তবে কর্ত্তা কোথায় থাকিবে? সেই কার্য্য কি মিথ্যা হইতে পারে? কার্য্য জগৎ, কারণ আমি, কর্ত্তা তিনি। জগৎ সত্য, আমি সত্য, তিনি সত্য, মিথ্যা কিছুই নয়।

এই বিশ্বরঙ্গালয়ে আমি এক বহুরূপী! কতবার কতরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছি, থাকিয়াছি, চলিয়া গিয়াছি। আবার কতবার কতরূপ ধারণ করিয়া আসিব, থাকিব, চলিয়া যাইব। কতবার কতকার্য্য সম্পন্ন করিলাম, কত কার্য্য সম্পন্ন করিব; উদ্দেশ্য সাধন হইলেই আবার চলিয়া যাইব। সমুদ্রবক্ষে বাষ্প উত্থিত হইল, বাষ্প হইতে মেঘের উদয় হইল, মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িল, সেই বৃষ্টি নদী গর্ভে পতিত হইয়া প্রবাহরূপে ধাবিত হইল; কিন্তু কোথায়? সেই সমুদ্র উদ্দেশেই তীব্রবেগে ধাবিত হইল; সেই সমুদ্রবক্ষেই সে নির্বৃত্তি লাভ করিল! সেই বারি বিন্দু, আর জলধির অসীম জলরাশি, উভয়ের প্রভেদ কি? কিছুই নয়! তিনি সেই চিন্ময় বিভূ অনন্ত জলধি, আমি অতি ক্ষুদ্র জলবিন্দু, আমাদের উভয়ের প্রভেদ কি? কিছুই নয়!

আমিই সমুদয়। আমি, তুমি, তিনি, এই তিনই যখন তিনি এবং তিনিই যখন আমি, সুতরাং আমি সমুদয়। আমি জগৎ; যে শক্তিতে জগৎ পরিচালিত হয় আমি সেই জগৎসঞ্চালিনী শক্তি। আব্রহ্মা স্তম্ব পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যাহা কিছু আছে, আমিই সমুদয়! আমি ভিন্ন অন্য আর কিছুই নাই, কিছু থাকিতে পারে না, কিছু থাকিবে না! যখন আমিই সব, আমারই সব; তখন আর "আমার আমার" করিব না কেন? তাহাতে ভ্রান্তির বিকাশ কি আছে? তাহাতে ভ্রমের বিকার কি থাকিতে পারে? ভ্রান্ত তুমি, তাহাতেই এ বিশ্বরাজ্যে "আমার" কিছুই দেখিতে পাওনা! ভ্রান্ত তুমি, তাহাতেই "তোমার" ও "আমার" মধ্যে এক পার্থক্যের রেখা অঙ্কিত করিয়া বসিয়া আছ!

আমি চিরকাল আছি, চিরকাল থাকিব। আমার যাহা কিছু আছে তাহাও চিরকাল থাকিবে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটী পরমাণুও নষ্ট হইবে না। কতবার বিশ্বসৃষ্টির ধ্বংস হইয়াছে, কতবার নূতন সৃষ্টি অভিনব চারু শোভায় সুশোভিত হইয়াছে, আবার হয়ত প্রলয় পয়োধিজলে প্লাবিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার ধ্বংস নাই, আমি সমান ভাবেই চিরকাল বিরাজমান আছি; অজড়, অক্ষয়, অবিনাশী! আমার বিনাশ নাই, বিকৃতি নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই! আমার এই যে পঞ্চভূতময় মানব দেহ, যাহাকে আমরা নশ্বর বলি, ইহারই কি বিনাশ আছে? একটী মাত্র পরমাণুও লয়প্রাপ্ত হয় না, তবে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নামান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে মাত্র! এমন যে আমি, সেই আমার ভ্রম হয় কেন? তুমি, আমি, তিনি এ তিনে প্রভেদ দেখি কেন? অজ্ঞানই তাহার কারণ।

যাহাকে বেদান্তে অনির্ব্বচনীয় মায়া বলে, সাংখ্যে অব্যক্ত প্রকৃতি বলে, পুরাণে মহামায়া ভগবতী-বলে, এবং তন্ত্রে সৃষ্টি স্থিতি-লয় কারিণী শক্তি বলে, সেই মায়ার বলেই আমি আমার "আমিত্ব" ভুলিয়া যাই। নতুবা "তৎপ্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম অহমস্মি" সেই প্রকৃষ্ট জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মই আমি।

শ্রীধনকৃষ্ণ ...ন।

দণ্ড।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস দণ্ডের এইরূপ বর্ণনা করেন "ইহলোকে যাহা দ্বারা সমুদয় বশবর্ত্তী হয় তাহার নাম দণ্ড। দণ্ড প্রধান দেবতা;—উহার তেজঃ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ও রূপ নীলোৎপল দলের ন্যায় শ্যামল। উহার চারি দন্ত, চারি বাহু, দুই জিহ্বা, আট চরণ ও অসংখ্য চক্ষুঃ। উহার কর্ণ অতিদীর্ঘ, লোম সকল ঊর্দ্ধ, মস্তক জটাজালে জড়িত, আস্যদেশ তাম্রবর্ণ, এবং শরীর কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় চর্ম্মে আবৃত। দণ্ড প্রতিনিয়ত এইরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন।" ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, "প্রকৃতি গোপ্তা প্রজাপতি প্রজা রক্ষার জন্য রাজদণ্ডাকারে দণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য দণ্ড সকলের নিয়ন্তা।"

শ্রীমান্ দণ্ডের শ্রীমতী মূর্ত্তির কুটিল মুখ ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিয়াই সঙ্কর্ষণ শক্তির আবির্ভাব। ইহারই শক্তিতে জীবগণ পরস্পরে আসক্ত, প্রীতিসম্পন্ন, অনুরাগী ও সমসুখ-দুঃখভাগী। কেহ ভয়ে, কেহ বিস্ময়ে, কেহ ভক্তিতে, কেহ অনুরাগবশে, এই দণ্ডের অনুগত। দণ্ডের তেজেই দণ্ডবৎ। কোথাও সম্মতিতে দণ্ড, কোথাও অসম্মতিতে দণ্ড।

দেব তোমায় নমস্কার। তোমার সুশীতল সুকোমল সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট তনুর জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিভাত এবং তাহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের সংহতি ভীমকান্ত ভাবে জড়িত ও সর্ব্বলোকে অটল ভাবে বিরাজমান।

তোমার তেজেই ক্ষৌমান্তরিত মেখলা, সদ্বীপা, সসাগরা, রত্নগর্ভা বসুমতী বীর ভোগ্যা। তোমার ঐশী শক্তিগুণে সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন অখণ্ড ভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর উদরান্নের নিমিত্ত লালায়িত ও উঞ্ছবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহেও অকুণ্ঠিত। আর তোমার সেই কান্তকায়া অবলম্বন করিয়াই কপর্দ্দকহীনও সমুদ্রান্তা বিশ্বম্ভরার অধিপতি। তোমার আশ্রয়ই পরমাশ্রয় এবং তোমার ভয়ই মহৎ ভয়।

দেব তুমি রক্ষক ও রক্ষণীয় এবং তুমিই

শত্রু ও শরণ্য। তোমার প্রতাপেই রাজা প্রজার মুখাপেক্ষী ও পীড়ক এবং প্রজা রাজার অনুগামী ও ধ্বংসকারী। অজ্ঞাত কুলশীল অনাসন্ন ব্যক্তিও সুপরিচিত নেদিষ্ঠ এবং সর্ব্বদা সহচর; অভেদাত্মাও অজ্ঞাত ও বিপ্রকৃষ্ট। তোমার গুণেই অনাত্মীয়ও আত্মীয় এবং তোমার গুণেই পিতা পুত্রে অনন্ত কলহ। আর তোমারই রোষ কষায়িত নয়ন যুগল দর্শন করিয়া "বসুধৈব কুটুম্বকঃ।" তুমি যে মূর্ত্তিতে রক্ষাকর তাহাতেই বিনাশ কর। তোমার যে কলেবর দেখিলে সন্ধি হয় তাহাতেই অনতিবিলম্বে বিচ্ছেদ ঘটে। একাধারে এমন স্থায়ী ও উদ্‌বায়ী দ্বন্দ্বগুণ আর কাহার আছে?

ভগবান্ তুমি পরিমাপক ও পরিমেয়। "কেশান্তিকঃ ব্রাহ্মণস্ত দণ্ডকার্য্যঃ প্রমাণতঃ। ললাট সন্মিতা রাজঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ॥ (উপবীতে) ব্রাহ্মণের কেশান্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাটান্ত এবং বৈশ্যের নাসান্ত প্রমাণ দণ্ড।" আর তোমার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়াই পদস্থ ও প্রভুত ক্ষমতাশালীর পরিমাণ অবধারিত হয়। সেই নিশ্চক্ষুঃ অকোমল অঙ্গের মধুময় ভাব হৃদয়মন্দিরে নিহিত করিতে পারিলেই আত্মশক্তি ও প্রভাব সহজে অনুমিত হয়। আর দেহ-পঞ্জরে সেই তরল প্রভার প্রভা সংক্রমিত হইলে স্বয়ং শূন্যমান হইতে হয়। বেদ, বেদান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, কোরাণ, বাইবল সমস্তই তোমার চরণ রজঃ শিরে ধারণ করিতেছে।

প্রভু ইহ সংসারে তুমিই সুখ দুঃখের মূল। কেহ অত্যাচরিত হইয়াও প্রফুল্ল এবং কেহ পীড়ন করিয়াও বিমর্ষ। তোমার শক্তিতে অজ্ঞই অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানীই মুর্খ। তোমার প্রভায় কুলীনও অকুলীন এবং নীচও নৈকষ্য। তোমার বলেই দণ্ডধর চক্রবর্ত্তী নামে অভিহিত আর সেই ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া বিদ্রোহোন্মুখ অশান্ত অমাত্যবর্গ কৃত-কলঙ্ক নৃপতিস্কন্ধে অর্পণ করিয়া প্রকৃতি পীড়নে প্রবৃত্ত। তোমার তেজেই ধর্ম্মাধিকরণে প্রাড়্-বিবাক নির্ব্বাক, ব্যবহার অব্যবহার, সত্য অসত্য এবং অসত্যও সত্য। তুমি উন্মার্গ-গামীর উত্তেজক, দুষ্টের দমনকর্ত্তা, শিষ্যের পৃষ্ঠ পোষক, সুখাভিলাষীর পরম সুখ, এবং কুশলেপ্সুর ক্ষেমাস্পদ। তুমি উগ্র বলিয়াই শান্ত, ভীষণ বলিয়াই কমনীয়, নিরাকার বলিয়াই সাকার, মুখরিত বলিয়াই নিশব্দ, চিন্ময় বলিয়াই অনাসন্ন, জ্যোতিস্বান বলিয়াই তমসাবৃত, করতলস্থ বলিয়াই অশান্তি প্রদ। সামান্য মশক হইতে নরপতি পর্য্যন্ত দমনের ক্ষমতা তোমা ভিন্ন আর কাহার ও নাই।

দেব! জগজ্জন তোমারই দীপ্তিরশ্মি দ্বারা নিয়মিত এবং তোমার ভয়ে নিষ্কণ্টকে নিদ্রা যায় ও তোমার ভয়েই সুখ-সুপ্তি ত্যাগ করে; ভবদীয় তেজেই সূর্য্যের দীপ্তি, অগ্নির দ্যুতি, শশাঙ্কের রমণীয়তা, নদীর প্রবাহ, সাগরের চাঞ্চল্য, জলের তরলতা, বাষ্পের বায়বীয় ভাব। তোমার তেজেই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, দেবতার দেবত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, নৃপতির নৃপত্ব। তোমার দক্ষিণে শৌর্য্য, বামে চৌর্য্য।

তুমি যে মূর্ত্তিতে ধার্ম্মিকের করকমল শোভিত কর, সেই মূর্ত্তিতেই অধার্ম্মিকের বাহুদ্বয় নিন্দিত কর। যে ভাবে বীরের পবিত্র দেহে পূজিত হও সেই ভাবেই কা-

পুরুষের পদে দলিত হও, যে তনু পরিগ্রহ করিয়া স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর, তাহা-তেই ভক্তির চরম মার্গ দেখাও, যে অবয়বে বিচক্ষণ বিচারকের হস্তে ন্যস্ত হইয়া সুখ ও শান্তির জননী হও, তাহাতেই প্রদীপ্ত প্রতাপ, অদূরদর্শী বাক্‌সর্ব্বস্ব ধর্ম্মাধিকারের নিকট অরাজকতার ভূয়োভূয়ঃ নিদর্শন সংগ্রহ কর। তুমি যাহাতে সনাতনকে অনিত্যকর, তাহাতেই উষরকে উর্ব্বরা কর। তুমি ভয়, বিস্ময়, ও ভীতির আকর, স্নেহের খনি, শান্তির প্রস্রবণ। তোমার ভয়েই ব্যবহারাজীব বিচার করে, রাজা যুদ্ধ করে, চোর চুরি করে, কৃষক হল চালনা করে, অত্যাচারী অত্যাচার করে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ হয়, এবং স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী মাসমিত শুল্কের অধিকারণী হন। আর তুমি আছ বলিয়া প্রবল পুরুষও প্রহরিত হয়। তুমিইত প্রবল রাজ বিধি।

তুমি জাতীয়ভাবের পরিচালক, পরি-পালক, পরিরক্ষক ও পরিপোষক। ভবদীয় প্রতাপেই হিন্দু-সন্তানই হিন্দু, মুসলমানই মুসলমান, ইংরজই ইংরেজ, বৌদ্ধই বৌদ্ধ, ম্লেচ্ছই ম্লেচ্ছ।

তুমি সত্যকে মিথ্যাকর এবং মিথ্যাকে পরম সত্যে পরিণত কর, ন্যায়কে অন্যায় কর, তোমার প্রভাবেই চোর সাধু আর সাধু তস্কর এবং প্রকৃতি পুরুষ ও পুরুষ প্রকৃতি।

বালক সেই মূর্ত্তি দেখিলে যুগপৎ হর্ষ ও বিপদে মগ্ন হয়। বৃদ্ধের তুমিই একমাত্র অবম্বলন।

প্রভু তোমার স্নিগ্ধ গম্ভীর বপু নেত্র-পথের পথিক হইলে স্বকীয় অতুল মর্য্যাদা ও বিভব বিস্মৃতিরূপ অগাধ সমুদ্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মুষ্টিমেয় উদরান্নের নিমিত্ত পর-মুখাপেক্ষী হইতে হয়, এবং সর্ব্বান্তকরণে অপ্রীতিকর বিষয়ের সহিত সহবাস ঘটে। কোটী পতিও তোমার ভয়ে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ ও ক্ষুণ্ণ এবং নিরন্ন তোমার সাহায্যেই পরম পুরুষ। তুমিই ধনের রক্ষক ও ভক্ষক।

অদ্বিতীয় চরণ খঞ্জের, তুমিই প্রকৃতচরণ। সে স্বীয় দেহ যষ্টি তোমার স্কন্ধে সংক্রমিত করিয়া প্লুতগমন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অন্ধের তুমিই উজ্জ্বল চক্ষুঃ; সে ভবদীয় দেহ অবলম্বনরূপ সুন্দর দৃষ্টি প্রসার করিয়া উচ্চাবচ ভূমি সমতল বোধ করে। তুমি স্বয়ং অগতি হইলেও অগতির পরম গতি ও দিব্য পদ্ধতি।

তুমি সমাজ বন্ধনরূপ আময়ের মহৌষধ। তোমার সেবন ব্যতীত সে ব্যাধি অপনীত হইবার নহে। দোষজ্ঞ কর্ত্তৃক যথাযথ প্রযুক্ত হইয়াই সেই উপতাপ প্রশমিত হয়। দেশ-কাল পাত্র ভেদে তোমার প্রয়োগই প্রয়োগ।

শ্রীরামশঙ্কর রায়।

সতরঞ্চ-বিজ্ঞান। *

পাশা বা গৈবিতে দাবা খেলা আমাদের দেশে আজ কম প্রচলিত। একছক দাবা বিছাইলে দেশ শুদ্ধ লোক পড়িয়া "এটা চালুন," "উটা চালুন," "ঘোড়া ও ঘরে বসুন" ইত্যাদি গোলযোগে প্রধান খেলোয়ারের মন অস্থির করিয়া দেন। এই খেলায় মনের একাগ্রতা একান্ত প্রয়োজনীয়। যেমন বিপক্ষের গোপনীয় মন ভাব বা কৌশল ভেদ করাই এই খেলার নিপুণতা; তেমনি নিজের গুঢ়ভাব যাহাতে প্রকাশ না হইয়া পড়ে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়াও কর্ত্তব্য। যে পথ দিয়া আপনি শত্রুকে আক্রমণ করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন যদি তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে মাথা ঘুরান বৃথা মাত্র। স্বপক্ষের উপর-চালকের দল "এটা" "ওটা" দেখাইতে গিয়া শেষে তাই প্রকাশ করিয়া বিপক্ষকে সতর্ক করিয়া দেন। তাই বলিয়া কি উপর-চাল লওয়া উচিত নয়? অবশ্য লওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইলে দুই পক্ষের দুইটী "ছক" বিছাইয়া এক গৃহের স্বতন্ত্র স্থানে স্ব স্ব পক্ষীয় উপর চালক লইয়া বসা উচিত। বলা বাহুল্য উভয় ছকেই উভয় পক্ষীয়ের বল বসান থকিবে। একপক্ষ বিপক্ষের দর্শন পথের বাহিরে ইচ্ছা মত বল এ ঘর হইতে ও ঘরে চালিয়া মন্তব্য স্থির ও দৃঢ় হইলে বলিয়া দিতে পারেন "আমি অমুক বল অমুক ঘরে চালিলাম" অপরপক্ষও বিপক্ষের কথা মত সেই বলটী সাঙ্কেতিক স্থানে বসাইয়া উহার মর্ম্মভেদ করিতে আরম্ভ করিবেন। তাহার দলেরও ঐ প্রকারে সিদ্ধান্ত স্থির হইলে উত্তর দিবেন "আমি অমুক বল অমুক ঘরে চালিলাম"। এইরূপ প্রণালীতে খেলিতে পারিলে প্রকৃত বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ পায় এবং কে যথার্থ খেলোয়ার তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপ প্রথানুসারে দুই ছকে খেলা প্রচলিত করিতে হইলে এমন কতকগুলি পরিভাষা (সাঙ্কেতিক শব্দ) প্রচলিত হওয়া উচিত যাহাতে ৬৪ ঘরের প্রকাশক স্পষ্ট ৬৪টী নাম বা অক্ষর সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। এই উদ্দেশে কোন এক মহৎ গ্রন্থকারের অবলম্বিত পদ্ধতি পরপৃষ্ঠে প্রকাশ করিয়া আমরা পাঠক বর্গকে প্রদর্শিত প্রণালীতে ক্রীড়া করিতে অনুরোধ করি। যখনই কোন দিকে উপর-চালক উপস্থিত হইবেন তখনই পূর্ব্বোক্ত মতে দুই ঝাল বল লইয়া আলাদা আলাদা বসিবেন ও কথায় চাল বলিয়া দিবেন।

---

* যে কোন ব্যক্তি সতরঞ্চ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন বিষয় লিখিয়া অথবা প্রকাশিত প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া পাঠাইবেন, প্রতিনিধিতে সাদরে তাঁহার নাম সম্বলিত তাহা প্রকাশিত হইবে। উ, প্র, স।

কালর দিক।

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	
৮	ক ৮	খ ৮	গ ৮	ঘ ৮	ঙ ৮	চ ৮	ছ ৮	জ ৮	৮
৭	ক ৭	খ ৭	গ ৭	ঘ ৭	ঙ ৭	চ ৭	ছ ৭	জ ৭	৭
৬	ক ৬	খ ৬	গ ৬	ঘ ৬	ঙ ৬	চ ৬	ছ ৬	জ ৬	৬
৫	ক ৫	খ ৫	গ ৫	ঘ ৫	ঙ ৫	চ ৫	ছ ৫	জ ৫	৫
৪	ক ৪	খ ৪	গ ৪	ঘ ৪	ঙ ৪	চ ৪	ছ ৪	জ ৪	৪
৩	ক ৩	খ ৩	গ ৩	ঘ ৩	ঙ ৩	চ ৩	ছ ৩	জ ৩	৩
২	ক ২	খ ২	গ ২	ঘ ২	ঙ ২	চ ২	ছ ২	জ ২	২
১	ক ১	খ ১	গ ১	ঘ ১	ঙ ১	চ ১	ছ ১	জ ১	১
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	

সাদার দিক।

এক্ষণে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, এই ৮টী বর্ণও ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, এই ৮টি অঙ্কের মিলনে অনায়াসে আমরা ৬৪ ঘরের যে কোন ঘরটী প্রকাশ করিতে পারি। ক৪ বলিলে কোন ঘর বুঝায় আর ছ৫ বলিলে কোন ঘর বুঝায় অনায়াসে একটী বালকও দেখাইয়া দিতে পারে। মনে করুন যদি গ১ ঘরের গজকে চালিতে হয় তবে কোন্ কোন্ ঘর উহার লক্ষ স্থান তাহা, কে না সহজে বলিতে পারেন। এক পক্ষের খেলোয়ার যদি গৃহের এক পার্শ্ব হইতে বলেন আমি ক১ হইতে নৌকা চ১ ঘরে চালিলাম, তাহা হইলে অপর পক্ষীয় দল অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিয়া ইঙ্গিত অনুসারে নৌকা আপন সমক্ষে সরাইয়া লইয়া আপন চাল ভাবিতে পারেন।

এইটী স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত আমাদের প্রথম প্রতিজ্ঞার পূরণ প্রকাশ করিতেছি। বোধ হয় অনেক পাঠকই সেটী পূরণ করিয়াছেন কিন্তু কোন প্রকার পরিভাষা প্রচলিত না থাকায় আমাদিগকে উত্তর দেওয়া সহজ মনে করেন নাই। কাযেই প্রায় দুই মাস গত হইল এই বহুসংখ্যক পাঠক হইতে "প্রতিজ্ঞা-পূরণ" বলিয়া কোন উত্তরই পাইলাম না। ভরসা করি প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিয়া এখন হইতে অনেকেই আমাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া পাঠাইবেন।

যে কোন ব্যক্তি আমাদিগের প্রতিজ্ঞার উত্তর প্রদান করিবেন তিনি আমাদিগের এই নিম্ন প্রকাশিত ৬৪ ঘরের নাম উল্লেখ করিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি চাল লিখিলে আমরা চরিতার্থ হইব।

প্রথম প্রতিজ্ঞা-পূরণ।

সাদা—

১। নৌকা চ৪ হইতে চ৩
২। গজ ঙ৫ হইতে ঘ৪
৩। নৌকা ঙ৩ হইতে চ৬
৪। নৌকা ঙ৬ হইতে গ৬

কাল—

১। বড়ে ঙ৪ হইতে ঘ৩
২। বড়ে গ৫ হইতে ঘ৪
৩। রাজা গ৪ হইতে গ৫

} যদি রাজা দিয়া গজ মারে তবে নৌকার কিস্তি ও ঘোড়ার কিস্তিমাৎ।

এক্ষণে দেখা যাউক কাল প্রথম চালে ঘোড়া বড়ে দিয়া না মারিয়া যদি অন্য কিছু চালে অর্থাৎ যদি নৌকা মারে তাহা হইলে ;—

সাদা

১। ——
২। ঘোড়া ঘ৩ হইতে চ৪
৩। ঘোড়া জ৮ হইতে চ৭
৪। ঘোড়া চ৭ হইতে ঘ৬।

কাল—

১। বড়ে ঙ৪ হইতে চ৩
২। বড়ে ঘ৫ হইতে ঘ৪ *
৩। যাহাই চালুক

আবার দেখা যাউক কাল প্রথম চালে ঘোড়া কিম্বা নৌকা না মারিয়া যদি ;—

সাদা—

১। ——
২। ঘোড়া ঘ৩ হইতে চ৪
৩। ৪। ঘোড়া জ৮ হইতে দুই চালে ঘ৬ কিস্তি মাৎ করিবে।

কাল—

১। বড়ে ঘ৫ হইতে ঘ৪
২। যাহাই চালুক

* বড়ে চ৩ হইতে চ২ চালিতে পারে না, যেহেতু তৃতীয় চালে বড়ে টীপে কিস্তি মাৎ।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা।

কালর দিক।

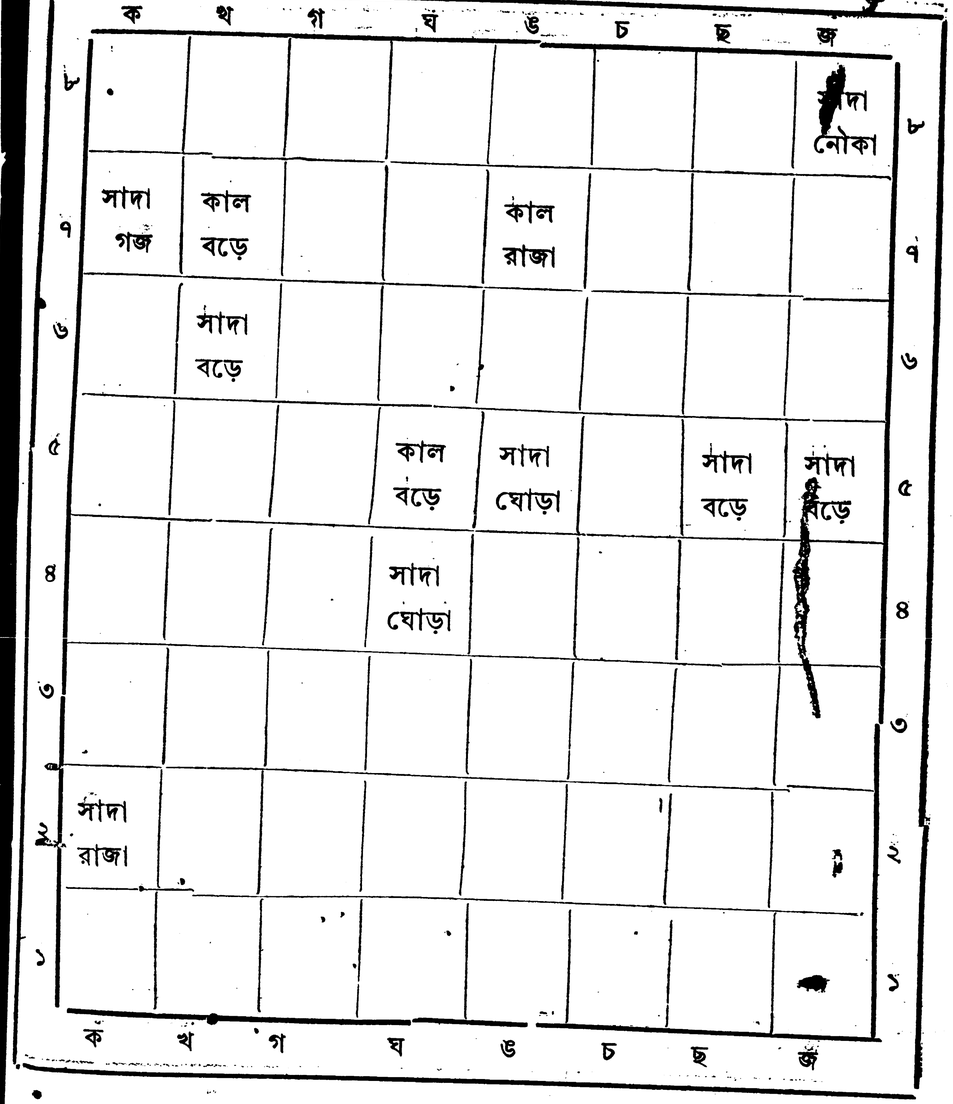

সাদার দিক।

সাদা প্রথম চালিয়া কালকে চতুর্থ চালে মাৎ করিবে।

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা।

কালর দিক।

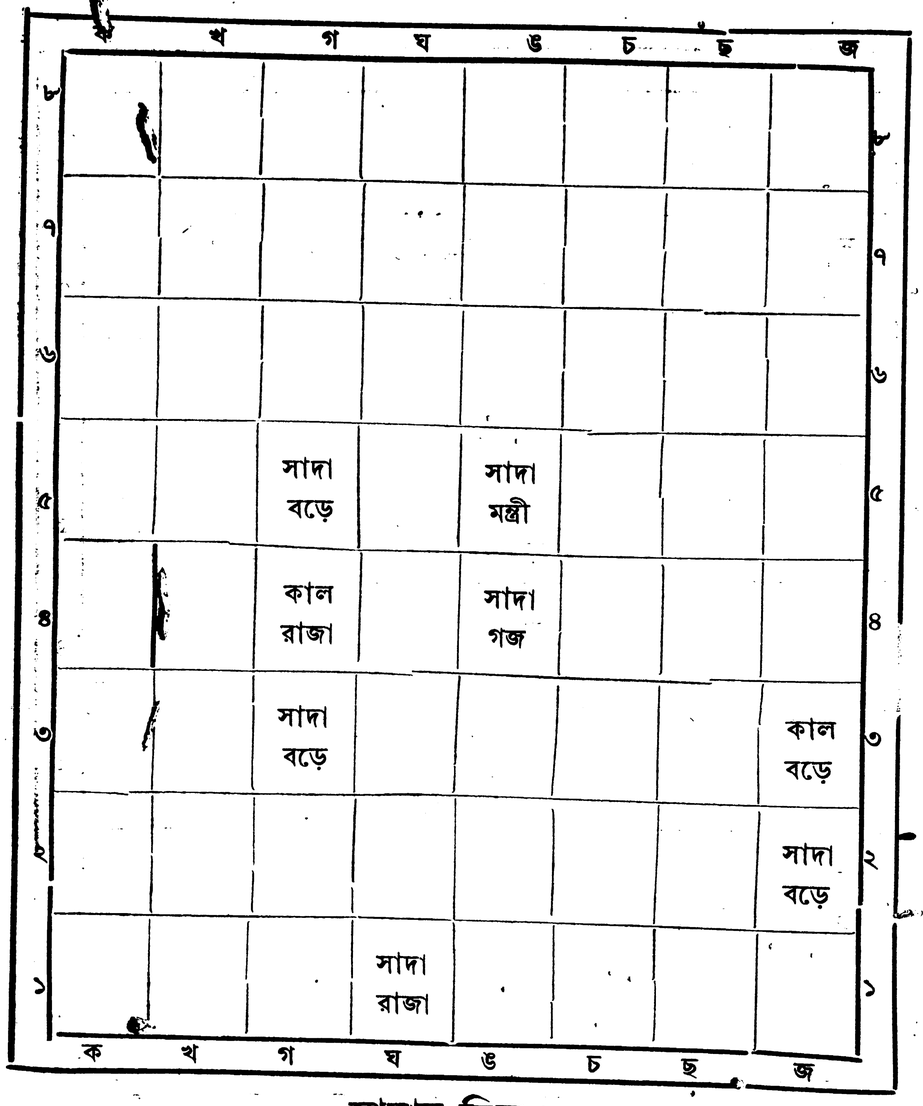

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	
৮									৮
৭									৭
৬									৬
৫			সাদা বড়ে		সাদা মন্ত্রী				৫
৪			কাল রাজা		সাদা গজ				৪
৩			সাদা বড়ে					কাল বড়ে	৩
২								সাদা বড়ে	২
১				সাদা রাজা					১
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	

সাদার দিক।

সাদা প্রথম চালিয়া কালকে তৃতীয় চালে মাত করিবে।

শ্রীকুমুদ বিহারী সামন্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভূতপূর্ব্ব রাজা সুরচন্দ্রের সিংহাসন ভ্রষ্টের মূল কারণ টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ ; আমরা একথা পাঠকবর্গকে গতবারে অবগত করিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট ইহা জানিতে পারিয়া স্থির করিলেন যে, "ভারতে ইংরাজ ভিন্ন কেহ কাহাকেও সিংহাসন দান বা গ্রহণ করিতে পারিবে না। কেননা তাহা হইলে, ইংরাজ আর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কি প্রকারে"। এই অভিমান বা অহংকারে বড়লাট বাহাদুর অন্ধ হইয়া হতভাগ্য কুইণ্টনের সহিত পরামর্শ করিলেন, টিকেন্দ্রজিৎ সিংহকে চিরনির্ব্বাসিত করাই কর্ত্তব্য। অতএব মণিপুরে প্রকাশ্য দরবারে এক বরে কুলচন্দ্রকে সিংহাসন দান ও অপর বরে টিকেন্দ্রজিতকে কারাগারে বদ্ধ করিতে কুইণ্টরের উপর হুকুম হইল। যথাসময়ে পলিটীকেল এজেণ্ট গৃহে দরবার আহুত হইল। বর্ত্তমান রাজা কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিত দরবার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন কিন্তু সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশতঃ কুইণ্টন বাহাদুর তৎক্ষণাৎ সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। কাযেই দুই ভাইকে ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে হইল। রণচতুর টিকেন্দ্র কুইণ্টনের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। দরবারের চতুর্দ্দিকে সান্ত্রী পাহারা দেখিয়া কে না সন্দেহ করিতে পারে? সুতরাং শিরঃপীড়ার ভাণ করিয়া টিকেন্দ্রজিৎ কেল্লার মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। কুইণ্টন বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যাহার জন্য এ ঐন্দ্রজালিক দরবার সেই পলাতক। তৎক্ষণাৎ আদেশ হইল যুবরাজ টীকেন্দ্রজিতের অনুপস্থিতে দরবার হইবে না, অতএব কল্য প্রাতে দরবার পুনরাহুত হইক। পরদিন প্রাতে ঠিক সেই আয়োজন, অথচ টিকেন্দ্র অনুপস্থিত। সুতরাং দরবার হইবে কি প্রকারে। সংবাদ পাঠান হইল ; উত্তর আসিল "শরীর সুস্থ নাই"। কুইণ্টন অধীর হইলেন—ল্যানস্ডাউনের নিকট মুখ দেখাইবেন কি করিয়া। পলিটীকেল এজেণ্ট শ্রীযুক্ত গ্রীম্উড্ সাহেবকে আদেশ করিলেন তুমি কেল্লার মধ্যে যাও ও টীকেন্দ্রজিতকে বল যে ইংরাজের হুকুম—"তোমাকে এই দণ্ডেই স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া জন্মের মত মণিপুর ত্যাগ করিতে হইবে। যদি না কর ; বল প্রকাশ হইবে।" গ্রীমউড্ "জো হুকুম" বলিয়া কেল্লায় প্রবেশ করিলেন বটে কিন্তু টীকেন্দ্রজিতের ভাবী অবস্থা ভাবিয়া কাতর হইলেন। গ্রীমউডের মুখে আপন চিরনির্ব্বাসন বার্ত্তা শুনিয়া বীর টীকেন্দ্রজিত সদর্পে বলিলেন "আমি এ অন্যায় হুকুম মানি না, আমি কোন অপরাধে দোষী নহি"। বার্ত্তাবাহক গ্রীমউড্ ফিরিয়া আসিয়া কর্ত্তাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। কর্ত্তা রাগান্ধ হইয়া—মণিপুর ছারখার যাইবে বলিয়াই—হুকুম দিলেন কল্য প্রাতে যেন সসৈন্যে টীকেন্দ্রজিতের আবাস গৃহ আক্রমণ করা হয়। তাহাই হইল। এদিকে বড়-

বা[illegible]নের বংশধর টীকেন্দ্র "সৈন্যসাজ্" বলিয়া জাগরিত হইলেন। ৩৬ ঘণ্টা অবিরত বারিধারে গোলাগুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। ইংরাজ পরাস্ত মানিয়া সংবাদ দিলেন "একবার যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি"। চতুর টীকেন্দ্র বলিলেন "অস্ত্র ত্যাগ করিয়া আসিতে পার"। কি করেন সব যায় ভাবিয়া, কুইণ্টন চারিজন ইংরাজ সহ বিপদ সাগরে ঝাঁপ দিলেন। যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল। ২ ঘণ্টা যায় ২ঘণ্টা যায় ৩ঘণ্টা যায়, কুইণ্টন ও গ্রীমউড্ ফেরেন না; ক্রমে সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। প্রাণভয়ে বাহিরের ইংরাজদল পলায়ন করিলেন।

এদিকে কেল্লার সেনাপতি টঙ্গেল প্রমুখ কয়েক জন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ লইয়া একটী দরবার বসিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল "অদ্য নরশোণিতে মায়ের পদ পূজা হউক।" হুকুম হইবা মাত্র টক্ টক্ করিয়া নরবলী পড়িল। কুইণ্টন, গ্রীম্উড্ প্রভৃতি স্বদেশ হিতৈষীদল দেহ-শিরের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। দেহ শির হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অর্দ্ধক্রোশ দূরে এক বাজারের নিকট ভূগর্ভে প্রোথিত হইল, মস্তক মায়ের ভোগের জন্য রহিল। ক্রমে এই ভীষণ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা ও কাল সেপাইতে মণিপুর বেষ্টিত হইল। উপস্থিত সম্মুখ সংগ্রাম অসম্ভব বুঝিয়া সমস্ত রাজ পরিবার ও টাঙ্গেল প্রভৃতি নিভৃতে আশ্রয় লইয়া সুযোগ অন্বেষণে রহিলেন। আশা পূর্ণ হইল না! চতুর ইংরাজ প্রত্যেক পলায়িত রাজপুরুষকে গ্রেপ্তার করিলেন। মণিপুরে ইংরাজ কাছারী বসিল। এক একটী করিয়া বিচার আসিতে লাগিল, আর অমনি একচেটে ভাবে ফাঁসির হুকুম হইতে লাগিল। রাজা কুলচন্দ্রের ফাঁসি, যুবরাজ টীকেন্দ্রজিতের ফাঁসি, তৎকনিষ্ঠ সেনাপতি অঙ্গ সিংহের ফাঁসি। টঙ্গেলের ফাঁসি, সুবাদারের ফাঁসি, শেষে জল্লাদ বেচারা ও সাস্ত্রীর পর্য্যন্ত ফাঁসি। অর্থাৎ ফাঁসি ভিন্ন অন্য হুকুম নাই। মহারাজার তরফের উকীল জানকী বাবু দেখিলেন এ ফাঁসির আদালতে সুবিচারের আশা নাই। কলিকাতার বারিষ্টার মনমোহন ঘোষকে আপীল আদালতের জন্য নিযুক্ত করিলেন। এই আদালতের প্রধান বিচারপতি খোদ বড়লাট বাহাদুর। মনমোহনের ওকালতনামা নামঞ্জুর হইল। লাট বাহাদুর হুকুম দিলেন ১০ই জুলায়ের মধ্যে আসামীদিগের যাহা কিছু বলিবার থাকে, আপন উকীল দ্বারা লিখিয়া বলিতে পারেন। উকীল বা বারিষ্টার বক্তৃতার জন্য এ আদালতে আসিতে পারিবেন না। জানকী বাবু অনন্যোপায় দেখিয়া অতিশয় বিনয়ের সহিত দরখাস্ত করিলেন, যে মণিপুর হইতে কাগজ পত্র সহ কলিকাতায় যাইয়া কোন সুবিজ্ঞ বারিষ্টারের পরামর্শ লইয়া ১০ জুলাই মধ্যে দরখাস্ত করা কখনই সম্ভব নহে। অতএব আসামীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া অন্ততঃ ৩১ জুলাই পর্য্যন্ত দিন বাড়াইয়া দেওয়া হউক। সদয় হৃদয় বড়লাট বাহাদুর জানকী বাবুর এই আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক ৩১ তারিখে কে বাঁচে কে মরে। লোকে বলে মরণ জীবনের কর্ত্তা ঈশ্বর কিন্তু আমরা এক্ষণে দেখিতেছি মণিপুর রাজবংশের মরণ/ জীবনের

কর্ত্তা "বড়লাট বাহাদুর"। এতদ্ সম্বন্ধে বিলাতে যাহা কিছু আন্দোলন হইতেছে পাঠকবর্গকে আমরা আগামী বারে অবগত করিব।

কএক বৎসর হইতে দামোদরের বন্যায় গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। গত বৎসর এই বন্যা-প্রপীড়িত অঞ্চলের প্রজাদিগের আর্ত্তনাদে আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট শ্রীযুক্ত সার ষ্টুয়ার্ট বেলী মহোদয়ের কোমল হৃদয় বাস্তবিকই ব্যথিত হইয়াছিল। কি উপায়ে বন্যার প্রবল প্রতাপ নিবারিত হয়, কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রজাদিগের ধনপ্রাণ রক্ষা হয়, এই বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তিনি পূর্ত্ত বিভাগের সুযোগ্য এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হায়! শিক্ষা-বিকৃত মস্তিষ্কে কোনও সদুপায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না। কেহ বলিলেন বর্ষাকালে দামোদরের জল যেরূপ বালী এবং পলীতে পরিপূর্ণ হয় তাহাতে যে ইহার দক্ষিণ উপকুল অচিরে ভরাট হইয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রজানিচয়কে বর্ষে বর্ষে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবে ইহাতে আর সংশয় কি? কেহ বলিলেন দক্ষিণ পার্শ্বের হানা সকল মেরামত করিতে গেলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল পথ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠিবে; আবার কোন কোন মহাত্মা এরূপও অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ উপকুল মেরামত করিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের মতে বর্ষে বর্ষে বন্যাজলে বিধৌত হইলে জমির উর্ব্বরতা বাড়িয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিপুরণ হয়। বন্যা কেবল ধান্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হইতে পারে কিন্তু যব সরিশা কলাই প্রভৃতি ফসলের বিশেষ উপকারী। যাহাই হউক, ছোটলাট কিন্তু ইহাতে ভুলিলেন না। বিগত হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভেই তিনি বঙ্গের চীফ ইঞ্জিনিয়ার বাহাদুরকে স্বয়ং পরিদর্শনার্থে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার তদন্তের ফলাফল যদিও কোন কাগজ পত্রে প্রকাশ হইতে দেখি নাই, তথাপি ইহাই অনুমিত হয় যে, তাঁহারই পরামর্শানুসারে লাখরা, টালা প্রভৃতি প্রধান প্রধান হানাগুলির যথা নিয়মে সংস্কার কার্য্য সমাধা হইয়াছে এবং সদরঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া দামোদরের গঙ্গাসঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত বাঁধকেই এক সমতলস্থ করা হইয়াছে। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব, এ পূর্ত্ত-নীতির গভীরতা কি বুঝিব! তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহাতে বিপদের শঙ্কা কম দূরে থাকুক, উপকুলস্থ গ্রামবাসীগণ স্ব স্ব ধন-প্রাণ লইয়া স্থানান্তরে পলাইবার পন্থা দেখিতেছে। দামোদরের কুটা ছেঁড়া স্রোতের কথা কি সচীব মহাশয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন? নদী তিন পোয়া হইলেই যখন সেই প্রবল বন্যার জল বাঁধ ছাপাইয়া মাঠ, গ্রাম, পল্লী উপপল্লী প্লাবিত করিয়া তর তর শব্দে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইবে, তখন গরীব প্রজাদিগের অবস্থা কি হইবে সচীব মহাশয় কি তাহা একবারও ভাবিয়াছিলেন? এই গত ২৩ শে আষাঢ়ের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বন্যাতেই টালার হানা ভাঙ্গিয়া বল্লা, বলেরপুর, সুকুর, ধামাষু, তেয়াগুল প্রভৃতি গ্রাম সমূহের যথেষ্ট দুরবস্থা ঘটাইয়াছে। সে দিন আমাদের বর্ত্তমান ছোট,

লাট শ্রীযুক্ত সার্ চার্লস ইলিয়ট্ বাহাদুর লাখ্‌রার হানা পরিদর্শন করিয়া, বাঁধে বাঁধে জামালপুর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা যাউক তিনি তাঁহার চির-প্রসিদ্ধ প্রজাবৎসলতার কি পরিচয় দেন। আমরা পরম্পর শ্রুত হইলাম যে, ছোট-লাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, দামোদরের স্রোতের প্রবল বেগ নিবারণের জন্য বর্ত্তমান বর্ষে যেরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা যদি ফলপ্রদ না হয়, তবে আগামী বর্ষে মজবুত করিয়া দক্ষিণ ধারের বাঁধ বান্ধিয়া দেওয়া যাইবে! আমরা সহৃদয় লাট বাহাদুরের মুখে ইহার সত্যাসত্য শ্রবণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

আজ কএক মাস হইতে "বঙ্গনিবাসী" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ৺ বামদেব দত্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহার নির্দ্দিষ্ট সম্পাদক কেহ থাকেন নাই। শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় ইহার স্বত্বাধিকারী। বামদেব বাবুর মৃত্যুর পর ইহাঁরই তত্ত্বাবধানে বঙ্গনিবাসী প্রকাশিত হইতেছিল। অল্পকালের মধ্যে সহযোগীর পসার প্রতিপত্তিও বড় মন্দ বাড়িয়াছিল না। আজিকালিকার সংবাদ পত্রের প্রধান রোগ অপরের কুৎসা রটনা করা। নবীন সহযোগীও এই সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মিকা গিরিজাসুন্দরীর হত্যাকাণ্ড লইয়া যখন হুলস্থূল বাধে, সেই সময় আমাদের নবীন সহযোগী "সঞ্জীবনীর" অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাহার পত্নী শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু ও সমগ্র ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করেন। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় দ্বয় এবং দ্বারিক বাবু স্বয়ং প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, পি,হাওলি বাহাদুরের এজলাসে বঙ্গনিবাসীর স্বত্বাধিকারী বাবু মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় ও উহার প্রকাশক ও প্রিণ্টারের নামে মান হানীর বাবদ নালিস করেন। শ্রীমতী কাদম্বিনীও হাইকোর্টে স্বত্বাধিকারীর নামে লক্ষ টাকার দাবী দিয়া নালিস করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেটের আদালতে আসামীর পক্ষে ব্যারিষ্টার মিঃ টিঃ পালিত ও মিঃ ডন, এবং ফরিয়াদির পক্ষে মিঃ গার্থ ও মিঃ রায় কৌন্সলী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আজ দুই মাস অতিশয় তুলের সহিত এই মকোদ্দমা চলিতেছিল। ১১ই জুলাই তারিখে এই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারে স্বত্বাধিকারী মহেশ বাবুর ৬ মাস কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড, প্রকাশকের ৩ মাস কারাবাস ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড এবং প্রিণ্টারের কেবল মাত্র ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। সহযোগী ব্রাহ্মদিগকে গালাগালি দিয়া অবশ্য ভাল কাজ করেন নাই তাহা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের এরূপ কঠোর দণ্ডাজ্ঞায় আমরাও আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। সহযোগীর প্রথম অপরাধ বলিয়া দণ্ড লঘু হওয়া উচিত ছিল। আর মহেশ বাবু অবশেষে ক্ষমা চাহিলেও ব্রাহ্মরাও ক্ষমা না দিয়া বড় উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দেন নাই। আমরা ভরসা করি শ্রীমতী কাদম্বিনী এরূপ ঘটনার পর আর আপনার মান হানীর মোকর্দ্দমা চালাইবেন না।

ক্ষুদ্র চারাগাছ যদি অনুকূল জল বায়ু কর্ত্তৃক পোষিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে তাহাতে কালে সুফল ফলে না। সেইরূপ বালক চরিত্রও যদি সময়ে উত্তমরূপে সুগঠিত না হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবন কখন উন্নত হয় না। এই জন্য বালক চরিত্র যাহাতে উত্তমরূপে সংগঠিত হয়, সমাজের নেতাগণের সে দিকে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। বালক চরিত্র দিন দিন মন্দ হওয়াতেই আমাদের সমাজেরও অধঃপতন ঘটিয়াছে। কংগ্রেস, কনফারেনস্, এসোসিএসন স্থাপন করিতে আমাদের দেশের সকলেই অগ্রণী কিন্তু বালক চরিত্র সংগঠনোপযোগী সভা সমিতি বসাইতে কয় জনে চেষ্টা করিয়া থাকেন? বিলাতে বালক চরিত্র সংগঠনের জন্য "স্বর্ণ-সূত্র-সমিতি" নামে সমিতি আছে। সর্ব্ব শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের সন্তানগণই এই সমিতির সভ্য। সমিতিতে ছয়টি প্রতিজ্ঞা আছে। প্রত্যেকেই এই ছয়টী প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য। প্রতিজ্ঞা গুলি এই;—

১। সকলকে ভাল বাসিব ও সকলের ভাল বাসার পাত্র হইব।

২। দুর্ব্বল ও দরিদ্রকে দয়া ও সাহায্য করিব।

৩। নিরীহ জীব জন্তুর প্রতি দয়া প্রকাশ করিব।

৪। অসাধুতা নীচতা ও সর্ব্ব প্রকার কপটতা ঘৃণা করিব।

৫। বাক্য চিন্তা ও কার্য্যে পবিত্র হইব।

৬। সর্ব্বদা ঈশ্বরের সেবা করিতে যত্ন করিব।

আমাদের দেশেও এইরূপ স্বর্ণ-সূত্র-সমিতি সংস্থাপন সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

কলিকাতায় "সিটি থিয়েটর" নামে একটী নূতন নাট্য সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়াছে। বীণা-রঙ্গভূমিতে সিটি থিয়েটরের অভিনয় ক্রিয়া চলিতেছে এবং ষ্টার থিয়েটরের অধিকাংশ অভিনেতা ও অভিনেত্ দ্বারা ইহার অভিনয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। বলা বাহুল্য ষ্টারের জীবন স্বরূপ বঙ্গীয় গ্যারিক শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সিটি থিয়েটরের প্রধান পাণ্ডা হইয়াছেন। এক কথায় ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ষ্টারও যে পদার্থ সিটিও তাহাই; কেবল নাম মাত্র পৃথক। সুতরাং ইহার অভিনয় সম্বন্ধে আমাদের নূতন বলিবার কিছুই নাই। বলিবার আছে ইহার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের ব্যবসা-নীতির কথা। এই থিয়েটরের স্বত্বাধিকারীগণ এক নিয়ম করিয়াছেন যে, যে সকল দর্শক মাসে ১ টাকার টিকিট কিনিবেন, তাঁহারা এক দিন অভিনয় দেখিতে পাইবেন এবং ৩০ দিনে বঙ্গবাসী আকারের বিভিন্ন নামের একখানি দৈনিক পত্র পাঠ করিতে পাইবেন। দর্শকবৃন্দের পরম লাভের কথা। বঙ্গের বিখ্যাত ধনী শ্রীযুক্ত রায় ধনপৎ সিং বাহাদুরের অনুকূলতায় এই বৃহৎ ব্যাপার চলিতেছে। আমরা সিটিথিয়েটরের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের কার্য্য দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ॥০ করিয়া ২খানি টিকিট কিনিলে ২ জনের অভিনয় দেখা হইবে, আরও ৩

খানা বৃহৎ সংবাদপত্র পাঠ করিতে পাওয়া যাইবে, ইহা কি কম সুবিধার কথা? দর্শকের গঙ্গাস্নান ও পাথর কেনা দুইই হইবে।

শ্রীমতী ভারতেশ্বরী যখন আহারে বসেন তখন তাঁহার সম্মুখস্থ প্রত্যেক ভোজন পাত্রে পাচকের নাম দেওয়া থাকে। লিখিত পাচক উক্ত পাত্রস্থ ভোজ্যের গুণাগুণের দায়ী। ইহ সংসারে সুখ কাহারও নাই।

ডাক্তার এডমণ্ড ১৫০০৲ টাকা বাজি রাখিয়া বলিতেছেন যে, তিনি ৩ বৎসরের মধ্যে মিস্ কাল লোককে সাদা করিয়া দিবেন। চিকিৎসার খরচ বাৎসরিক ২৫৲ টাকা মাত্র। ডাক্তার সাহেব এদেশে এলে কিন্তু টাকাটা লুটে লইয়া যায়।

গয়া জেলাতে একটী ভদ্র লোকের স্ত্রী জজ আদালতে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত না হওয়ায় ফৌজদারি সোপরদ্দ হইয়াছেন, হবেনই ত, বিচারপতি যে শ্বেতাঙ্গ!

লাহোরে ডেপুটী কমিসনারের আদালতে একটি ব্রাহ্মণ বালক মাতৃহত্যা অপরাধে ৫ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। বোধ হয় পত্নী হত্যা অপরাধ হইলে সাহেব ফাঁসি কি দ্বীপান্তর দিতেন।

হায়দ্রাবাদের সেন্সস্ আপিশে কেরাণী দল ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, তাঁহাদের দুঃখের কথা কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা না শুনিলে কার্য্য করিবেন না। বাঙ্গালি কেরাণী সেখানে আছে কি?

ঢাকায় একটি স্ত্রীলোকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও তাহার উপপতির ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। অপরাধ স্ত্রীলোকটীর পতি হত্যা। উক্ত আদালতে আর একটী ষোড়শীর ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। অপরাধ, উপপতির উপদেশ অনুসারে স্বামীর বধ চেষ্টা। ব্যভিচারিণীদিগের কি কিছুই অসাধ্য নাই?

মাইসোর হেরল্ড বলেন এই সহরে এক মালিনী এককালীন ৩টী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র; প্রসূতি ও সন্তান কয়েকটী সকলেই সুস্থ আছে। ছেলের বাপ ভাল আছে ত?

বোম্বাই সহরে সম্প্রতি মেমেদের একটী চাঁদমারি বাজি হইয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ের লাটের স্ত্রী ও একজন বাজিওয়ালি এই চাঁদমারিতে ছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী ভনডলপের উপস্থিতিতে লাট মহিলা পরাজিতা হইলেন। শ্রীমতী ভনের গুলি একেবারে ঠিক ঠিকানায়। একেই বলে "এ মেয়ে পুরুষের বাবা"।

একজন নব্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, যে মৃত্তিকা পুড়িয়া ইষ্টক হয় সে আর সংযোগ বিয়োগ নিয়ম অনুসারে আর মৃত্তিকা রূপ প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং বর্ত্তমানে পৃথিবী ইষ্টক প্রস্তুত জন্য যে মৃত্তিকা প্রদান করিতেছেন, তাহাতে ৪২৭০০৯ বর্ষ পরে মৃত্তিকা শূন্য

বা ইষ্টকময়ী হইবেন। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান এইরূপই অদ্ভুত বটে!

মিঃ হফ এক জন শ্বেতাঙ্গ বিচারক। ইনি ভারতবাসীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া কমবেশ বার্ষিক সিকি লক্ষ টাকা গ্রহণ করতঃ বিচার বিতরণ করিয়া থাকেন। আজকাল ইনি ডেপুটী কমিশনর বেশে রেঙ্গুনের বিচারাসন সুশোভিত করিতেছেন। সম্প্রতি ইহাঁর এজলাসে একটী মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। রেঙ্গুনের একটী বিধবা মান্দ্রাজি হিন্দু মহিলা মধুসূদন নামক জনৈক বাক্তির সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেয়। গত ১৫ই মে এই শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ কালীন কন্যার বয়স ১১ বৎসর ৮ মাস ছিল। বিবাহের পর বর কন্যাকে নিজ বাটীতে লইয়া যায়। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই স্ত্রী ঋতুমতি হইলেও স্বামী মধুসূদন নব আইনের ভয়ে স্ত্রীর সহিত একঘরে শয়ন করে নাই। এদিকে এইরূপ চলিতেছে, অপর দিকে কন্যার মাতা ৩০ শে জুন তারিখে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ এক মুসলমানের সহিত নিকা করিয়া বসিল। পাপীয়সীর ইহাতেও বাসনা পূর্ণ হইল না, তাই নব পতির সাহায্যে জামাতার অনুপস্থিতি কালে বিবাহিতা কন্যাকে চুরি করিয়া আনিল! অভিপ্রায় কন্যাকে নিজ নীতির অনুসরণ করাইবে। হিন্দুপতি মধুসূদন স্ত্রী পাইবার জন্য রেঙ্গুনের ডেপুটি কমিশনর হফ বাহাদুরের এজলাসে নালিস করিল। উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় পতির পক্ষে দাঁড়াইলেন। হাকিম বাহাদুরকে অনেক বুঝান হইলেও তিনি কোন মতেই মুসলমানী মাতার নিকট হইতে হিন্দুস্বামীকে তাহার হিন্দু স্ত্রী প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ দিলেন না। এই খানেই বিচার লীলা শেষ হইলেও কোন কথা ছিল না। তার পর স্বতন্ত্র অভিযোগ না হইলেও, অদ্ভুত অনুমান শক্তির বলে হফ বাহাদুর দুর্ভাগ্য স্বামীকে নব বিধির অধীনে আনিয়া কঠোর দণ্ড দিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। সহবাস প্রমাণিত হইল না, অগত্যা মনোদুঃখে আসামীকে পরিত্রাণ দিতে বাধ্য হইলেন। সম্মতি আইনের যে অনিষ্টকারিতার আশঙ্কা লইয়া দেশ মধ্যে তুমুল আন্দোলন হইয়া গেল এবং এখনও তলে তলে যেরূপ হইতেছে; আইন সম্যক প্রকারে চলিত হইতে না হইতেই আইনজ্ঞ হফ সেই আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত। বিনা অভিযোগে নালিস চলিবে না, বর্ত্তমান আইনে যাহাতে প্রজাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয়, লাটবাহাদুর ইতি পূর্ব্বে এক সর্কুলার জারি করিয়া সে বিষয়ে মফঃস্বলের হাকিম দিগকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আইনেও এসম্বন্ধে কড়াকড়ি নিয়ম হইয়াছে। এ স্বত্বেও যখন হফ বড় লাটের আদেশ তুচ্ছ ও আইন অগ্রাহ্য করিয়া নিজের অযথা খামখেয়ালির পরিচয় দিয়াছেন, তখন বড় লাটের হফের কৈফিয়ত লইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপ তিরস্কার করা কর্ত্তব্য। হাকিমেরা যদি নূতন আইন সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার মতে চলেন, তাহা হইলে বড়লাটের কথায় কাহার আস্থা থাকিবে না। আমাদের মতে হফকে তিরস্কার করিয়া অন্যান্য হাকিমদিগকে

সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। একেত নূতন আইন দেশীয়দিগের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়াছে, তাহার পর যদি আইনের বিধান মত কার্য্য না হয়, তবে প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার হইবে।

গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটের ক্রোড় পত্রে, কলিকাতা পুলিশের বার্ষিক শাসন বিজ্ঞাপনী সম্বন্ধে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। মন্তব্য পাঠে জানা যায় যে, পুলিশের শাসন কার্য্য বিশেষ সন্তোষকর। চুরীর সংখ্যা কমিয়াছে বটে কিন্তু অপহৃত সম্পত্তির পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা অনেক বেশী। ১৮৮৯ অব্দে কলিকাতা ও উপনগরে ১৫১,২৬৭ টাকার সম্পত্তি চুরী গিয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর উভয় স্থানে সর্ব্বসমেত ১,৫৩,৯৫৭ টাকার সম্পত্তি চুরী গিয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১৮৯০ সালে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২,৬৯০ টাকা বেশী চুরী হইয়াছে। গত বৎসর পেনাল কোড অনুসারে কলিকাতায় ১০১৫৮ জন অপরাধী দণ্ডিত হইয়াছিল; ইহার মধ্যে ৬০৬০ জন হিন্দু; ৩,৬২৫ জন মুসলমান ৪৪৫ খৃষ্টান; অবশিষ্ট জৈন, বৌদ্ধ ও য়িহুদী। পার্শী শিখ অথবা ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই কোন প্রকারে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই। কলিকাতার **সমগ্র লোক সংখ্যা ৪৩৩,২১৯ জন। ইহাতে শত করা ২.৯ মুসলমান ২.১ জন হিন্দু, ১.৬ জন খৃষ্টান;** জৈন ও বৌদ্ধ ১.০৪ জন এবং ১.০১ জন য়িহুদী অপরাধী। মুসলমানজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক অপরাধী হইয়াছিল। পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায় গত বৎসরে তিনটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরে একটি বেশী হইয়াছিল। মুদ্রা ও ষ্ট্যাম্প সংক্রান্ত অপরাধ পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে গত বৎসর ১৫ জন অপরাধী, কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরে কেবল ৫ জনের উল্লেখ দেখা যায়। গত বৎসর বিশ্বাসঘাতকতারূপ অপরাধের সংখ্যা ৩১৮; কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরে উক্ত অপরাধে ২৬১ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল। পুলিশ রিপোর্টে আরও দেখা যায় যে, গত বৎসর কলিকাতা ও উপনগরে ৫৫১টি শিশু অলঙ্কার সমেত হারাইয়াছিল সকলকেই অলঙ্কার সহিত পুনর্ব্বার পাওয়া গিয়াছিল, কেবল একটী শিশুর গহনা পাওয়া যায় নাই। আর একটী সন্তোষের বিষয় এই যে, কলিকাতা ও উপনগরে স্ত্রীজাতির প্রতি আক্রমণরূপ কোন অত্যাচার ঘটিতে দেখা যায় না। কলিকাতা পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য সম্বন্ধে ছোট লাট খুব প্রশংসা করিয়াছেন। মফঃস্বলের পুলিশের কার্য্যে ছোট লাট কিরূপ সন্তুষ্ট?

স্বার্থের টান বড় টান, পেটের দায়েই লোককে এটানে পড়িতে হয়, অনেকেই কিন্তু আবার দুর্জ্জয় লোভের হাত এড়াইতে না পারিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বার্থের প্রণয়ে জড়ীভূত হইয়া পড়েন। **স্বার্থের প্রণয়ে যখন লোক অন্ধ হইয়া পড়ে তখন আর** কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না। স্বার্থে মনুষ্যকে যে কেবলি কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করে এমত নহে, উচ্চ পদমর্য্যাদার গৌরব হইতেও বঞ্চিত করিয়া থাকে। সমাজে

ব্যবহারাজীবদিগের মান সম্ভ্রম বড় কম কিন্তু অধিকাংশ উকীল মোক্তারই আত্মমর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসত্যকে এরূপ প্রশ্রয় দিয়া থাকেন যে, সে কথা ভাবিলে মনে যুগপৎ দুঃখ ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। উচ্চ পদস্থ উকীল মোক্তারদের নামে কলঙ্ক রটিলে মনে আমাদের দুঃখ ভিন্ন আনন্দ হয় না। কিন্তু তাঁহারা সকল সময়ে সে কলঙ্কের ভয় করেন কই? এই সে দিন বরিশালের জনৈক সজ্ঞানী উকীল মক্কেলের মামলায়—স্বার্থের টানে ভিন্ন আর কি বলিব—মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ায় দুই মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ফিস্‌টা মন্দ পান নাই! পুনশ্চ—কৃষ্ণনগরের জনৈক উকিল তাঁহার মক্কেলের মোকর্দ্দমা আপিল করিবার জন্য ১৫৲ টাকা লইয়াছিলেন। এক মাস যায়, দুই মাস যায়, কোন সংবাদ নাই। মক্কেল মহাশয় উকিল বাবুর নিকট গিয়া শুনিলেন আপিলে মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মন মানিল না। অন্য এক উকিলের নিকট সংবাদ জানিবার জন্য উপস্থিত হইলেন, ইনি সেরেস্তা হইতে সংবাদ আনিলেন—আদৌ আপিল করা হয় নাই। উকিল মহাশয় ১৫৲ টী টাকা উদরসাৎ করিয়াছেন! না করিয়া আর করেন কি? শুধু সার্টী ফিকেটেত আর পেট ভরে না? বড়ই কলঙ্কের কথা। আমরা এই কথা ভুলিতে না ভুলিতেই আবার কোন সহযোগীর মুখে শ্রুত হইলাম, বর্দ্ধমানেও এইরূপ এক কেলেঙ্কারী উপস্থিত হইয়াছে। সহযোগী বলেন "বর্দ্ধমানের জজ আদালতের জনৈক প্রসিদ্ধ উকিল তত্রত্য জনৈক প্রসিদ্ধ মোক্তারের নামে মানহানির অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। অভিযোগের হেতু এই যে মোক্তার মহাশয় আদালতে হাকিমের সাক্ষাতে বলেন যে 'উকীল বাবু সাক্ষীকে শিখাইয়া দিতেছেন।' এই কথা শ্রবণে উকীল বাবু চটিয়া মোক্তার মহাশয়ের নামে মানহানির নালিস রুজু করিয়া দিয়াছেন। এই মোকর্দ্দমা আপোসে মিটাইবার জন্য বর্দ্ধমানের গণ্যমান্য ভদ্র লোক মাত্রেই চেষ্টা করিতেছেন।" আমরাও বলি এ কেলেঙ্কারী আপোসে মিটানই কর্ত্তব্য। উকিল মহাশয় যদি প্রকৃত পক্ষেই সাক্ষীকে শিখাইয়া থাকেন, তবে তিনি সাধারণের চক্ষে অতি অপমানের কার্য্যই করিয়াছেন। আদালতের সাহায্যে সে মান পুনর্ব্বজায় হইবে কি? আর যদি মোক্তার মহাশয় মিছামিছি তাঁহার নামে কলঙ্ক রটাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও পদমর্য্যাদার গুরুত্ব ভাবিয়া উকীল বাবুর বিচলিত হওয়া উচিত হয় নাই। আর অভিযুক্ত মোক্তার মহাশয়েরও উকীল বাবুর নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাওয়া উচিত, উকীল বাবুরও ক্ষমা করা কর্ত্তব্য।

জ্ঞাতি দ্রোহিতা কি ভাল?

পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের আয়ুর্ব্বেদ পুস্তক প্রকাশের জন্য শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী এম, আই, ও, সি আই মহোদয়া ৩৫০ টাকা এক কালীন দান করিয়াছেন।

এক জনের স্বামী বহির্দ্দেশে যাইবার সময় তাহার স্ত্রীয়ের পায়ে শিকল দিয়া

বাঁধিয়া রাখিয়া যাইত। এই অপরাধে সে কলিকাতার পুলিশ আদালতে ৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মন না বাঁধিতে পারিলে, পায়ে বান্ধা বৃথা, লোকটা কি ইহাও বুঝিত না ?

বাবু সত্যেন্দ্রনাথ পালিত বিলাতে, ভারতীয় সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় এবার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি বারিষ্টার তারকনাথ পালিতের পুত্র। ইহাঁর অগ্রজ লোকেন্দ্রনাথ পালিত ইতিপূর্ব্বেই সিবিলিয়ান হইয়াছেন।

৺ বৈদ্যনাথ ধামের নিরাশ্রয় কুষ্ঠরোগীদের উপকারার্থে দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি "নব্য ভারতে" বৈদ্যনাথের কুষ্ঠরোগীদিগের দুরবস্থার বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হয়। যোগেন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্য সাধু। সকলেরই সাধ্যানুসারে তাঁহার সাহায্য করা উচিত।

দুই জন আড়কাটী বর্দ্ধমান হইতে একটী রমণীকে ভুলাইয়া আনিয়া ভবানীপুরের কুলি ডিপোতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে; রমণীটী গাড়ী হইতে চীৎকার করিতে থাকে। তাহার চীৎকারে একজন কনষ্টবল যাইয়া উপস্থিত হয় এবং গাড়ী আটকাইয়া আড়কাটী দুই জনকে আলিপুরে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করে। তাহাদের বিচার শেষ হইয়াছে। একজন খালাস পাইয়াছে, আর এক জনের চল্লিশ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। আড়কাটীদের জরিমানায় চৈতন্য হইবে না। কঠিন কারাদণ্ডের প্রয়োজন।

হত কুইনটনের ভার্য্যা নিয়মিত পেন্‌সন অপেক্ষা ৩০০০৲ টাকা বাৎসরিক বেশী পেন্‌সন পাইবেন। শ্রীমতী গ্রীমউড্ এককালে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ও বাৎসরিক ১৪০০৲ টাকা পেন্‌সন পাইবেন। আরও কিছু বেসি দেওয়া উচিত ছিল। শির দিয়া একটা দেশ হস্তগত করিয়া দিলে!

চট্টগ্রাম হইতে আসাম পর্য্যন্ত শীঘ্র একটী রেল খুলিবে। শুনিতেছি বর্ষার পরই কার্য্য আরম্ভ হইবে। ইংরেজ বণিকেরই পোয়াবার।

একজন দৈবজ্ঞ পরীক্ষক কোন এক ব্যক্তির বাটীতে গণনা করিতেছিল। ফলাফল পঠিত হইলে বিদায় কালীন গৃহ-স্বামী সজোরে ৩টী চপেটাঘাত দৈবজ্ঞ মহাশয়ের কপোলে প্রদান করিলেন। দৈবজ্ঞ মহাশয় একেবারে "থ"। বলিলেন কি দোষে এ দণ্ড? গৃহ-স্বামী উত্তর করিলেন তুমি মিথ্যাবাদি জ্যোতিষে অনভিজ্ঞ। আমার অদৃষ্ট গণিবার পূর্ব্বেই তোমার জানা উচিত ছিল, তোমার কপালে আজ কি আছে। রহস্য মন্দ নয়! গৃহ-স্বামী রসিক বটেন!

শ্রদ্ধাস্পদ ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড রিপন বিলাতে মহা সভায় মণিপুর সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। রাজপুত্রদিগের যাহাতে প্রাণ

দণ্ড না হয় তাহাই এই বক্তৃতার সার মর্ম্ম। এ দিকে ত ফাঁসির হুকুম! একেই বলে "দুর্গা বলে ফাঁসিতে চড়ে বসো, এর পর আপিলে জুতা মেরে খালাস করবো।"

গিরীডিতে এক ব্যক্তির হস্তস্থিত যষ্টি কোন এক শিশুর মস্তকে পতিত হওয়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। বিচারে ৫০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। অপরাধী ও বিচারক, সাহেব না নেটিভ?

এত দিন খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে নিরামিস ভোজন ইচ্ছাধীন ছিল। ধর্ম্ম পুস্তকে কোন নিষেধ বা বিধি ছিল না। সম্প্রতি ফিলেডেলফিয়া নগরে একটী নিরামিস ভোজী সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের কর্তৃক একটী গির্জা স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত গির্জায় নিরামিষাশীর দল উপাসনা করিবেন। অহিংসা সভ্যতার লক্ষণ বটে।

ময়ুরভঞ্জের মহারাজ বাহাদুরের সহিত মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের এক কন্যার বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল। ইহাতে মহারাজের আত্মীয় স্বজনবর্গ বিশেষ আপত্তি করেন। সহযোগী ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন যে, উক্ত বিবাহ আর হইবে না। ময়ুরভঞ্জের মহারাজার অসবর্ণ বিবাহে খেয়াল হইয়াছিল কেন?

আগামীবৎসর আমেরিকায় যে বৃহৎ প্রদর্শনী (মেলা) বসিবে, শ্রীযুক্ত এডিসন সাহেব, তাহাতে এক আশ্চর্য্য তামাসা দেখাইবেন। একমাইল দূরে যাত্রা বা থিয়েটর হইলে তাহার সুর ও পট পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত সব গৃহে বসিয়া শুনিতেও দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণের ক্ষমতা অনেকটা ঈশ্বরের কাছাকাছি!

শ্রীমতী জনসন জনৈক ভারতবাসীর বিধবা স্ত্রী। ইনি সম্প্রতি লণ্ডন সহরে এ দেশীয় মতে রান্নাবান্না এবং আসনে বসিয়া আহার প্রভৃতি প্রচার জন্য একটী দোকান খুলিয়াছেন। ধুতি না পরিলে আসনে বসিবে কি করে?

এলাহাবাদে একজন পোষ্টমাষ্টার কোন এক আত্মীয়ার বিবাহের দায়ে ১০০ টাকা সরকারি তহবিল হইতে চুরী করেন। ধরা পড়িবার ভয়ে রেল গাড়ীর তলে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এতেও লোকের চৈতন্য হয় না। আর চুরী ডাকাতি না করিলে ইহার পর কন্যার বিবাহ দেওয়া দায় হইয়া উঠিবে।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে একটী বন মানুষ ধরা পড়িয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ৪ ইঞ্চি লম্বা লোমে সমাবৃত, কটীতটে কোনরূপ আচ্ছাদন নাই। হাতের নখ পাঁচ ইঞ্চি ও রুক্ষ কেশ চারি ইঞ্চি দীর্ঘ। চেহারা ভয়ানক বিকট, দেখিলে ভয়ের সঞ্চার হয়, বনমানুষটীকে কথা শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে।

বড় লাটের হুকুম—মধ্যপ্রদেশে ১০ বৎসরের কম যাহার বয়স, এমন বালক কয়েদী বিচারে দোষী প্রমাণীত হইলে, তাহাকে

৭ বৎসরের কম রিফরম্যাটারী স্কুলে রাখা হইবে না, যাহার বয়ম ১০ বৎসরের বেশী, তাহাকে ৫ বৎসরের কম রাখা হইবে না। পাকাপাকা বদমাইস থাকিতে বালকের প্রতি বলোটের এত কড়া কড়ি কেন?

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের গলসী ষ্টেসনে প্লাটফরম অভাবে আরোহীগণের নামা উঠায় বড়ই কষ্ট হইত। কিছুদিন হইতে রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সে অভাব পূরণ করিয়া লোকের কষ্ট দূর করিয়াছেন এবং ষ্টেসন ঘরটীও পাকা হইয়াছে। আরও শুনা যাইতেছে বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রীকট বোর্ড উক্ত ষ্টেসনের সম্মুখ হইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাতে গলগ্রাম, মথুরাপুর, প্রভৃতি গ্রামের ব্যবসায়ীগণের বিশেষরূপ সুবিধা হইবে।

১লা জুলাই হইতে বঙ্গদেশের সকল জেলাতেই ডাকযোগে রেণ্টমণিঅর্ডার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। প্রজাদের অনেকটা সুবিধার কথা বটে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সুচিকিৎসক বর্দ্ধমান মানকর নিবাসী ভোলনাথ সেন গুপ্ত মহাশয় ১লা আষাঢ় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির মৃত্যুতে আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি!

গত মার্চ্চ মাসে বিলাত হইতে ভারতে ১৪৯৭৩০৪ টাকার বস্ত্র আমদানি হইয়াছে।

ফরিদপুরে একটা ১১ হাত লম্বা সাপ শূকরবাচ্চা গিলিতেছিল। লোক জন জড় হইয়া সেটাকে মারিয়া ফেলে। সাপটার বেড় প্রায় ৪ হাত হইবে। সাপটা বাসুকীর প্রপৌত্র না কি?

বিলাতে যুবরাজের কন্যারা গাউন তৈয়ারি করেন, রাঁধিতে পারেন, রুটি তৈয়ারি করিতে এবং ঘোল মাড়িয়া মাখন করিতে জানেন। এ দেশের বাবুদের কন্যারা নড়িয়া বসিতে পারেন না!

মার্কিণ মুলুকে একটা দুধ যোগানর কোম্পানী হইয়াছে। দুধ একটা চৌবাচ্ছায় জমা থাকে। সেই চৌবাচ্ছা হইতে নলে করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী দুধ যোগান হয়। কলিকাতায় এরূপ হইলে মন্দ হয় না।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক চন্দ্রভাগা নদীতীরে ৪ বৎসরের এক আশ্চর্য্য বালিকা দেখিয়াছেন। বালিকাটির নাম সরস্বতী। পরিব্রাজক মহাশয় সেই বালিকাটির সহিত বহুক্ষণ সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিয়াছেন বেদ বেদান্তের দুরুহ ও জটিল অংশের মীমাংসা তাহার নখদর্পণে। পরিব্রাজক মহাশয় তাঁহাকে সরস্বতীর অবতার বলিয়া মনে করেন। এরূপ হইলে সরস্বতী সরস্বতীর অবতারই বটে!

ব্রাসেল্‌স নগরে একটী অদ্ভুত ঘড়ি আছে। শুনা যায় তাহাতে কখনও দম

দিতে হয় না; সূর্য্য কিরণে তাহাতে আপনিই দম লাগে এবং ঘড়ি তাহাতেই চলে। বিজ্ঞানের মহিমায় কি আশ্চর্য্যই না সাধিত হইতেছে!

আর, জি জর্জ্জ সাহেব ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস পত্রে লিখিয়াছেন—কাহাকেও বিছায় কামড়াইলে একটা টাটকা পেঁয়াজ কাটিয়া একটু লবণ ও ভিনিগারের সহিত দুই তিন মিনিট ক্ষত স্থানে ঘসিবে, পরে এক বৎসরের অপেক্ষা পুরাতন না হয়, এরূপ একটী তেঁতুলের বীচি লইয়া যে স্থান হইতে অঙ্কুর বাহির হয়, সেই খাঁজে অল্প জলের সহিত যে পর্য্যন্ত না সাদা শাঁস বাহির হইয়া পড়ে মসৃণ পাথরের উপর ঘসিতে থাক। এক্ষণে ঐ বীচিটি আস্তে আস্তে ক্ষতস্থানের উপর ধরিয়া একটু চাপিতে থাক, অল্পক্ষণ পরে দেখিবে, উহা ক্ষত ছানে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ না সমস্ত বিষ শুষিয়া লয় ততক্ষণ উহা পড়িয়া যাইবে না। ইহা বিছার বিষ বাহির করিবার অব্যর্থ মহৌষধ।

ধর্ম্মঘট এক্ষতার অন্যতম নাম মাত্র। বিলাতে এই ধর্ম্মঘটের বড় বাড়াবাড়ি সম্প্রতি তথাকার অশ্বপালকদিগের ধর্ম্মঘটে উচ্চপদস্থ সাহেব দিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত বাবুরা কিন্তু ৩টী এক মত হইতে পারেন না।

এলাহাবাদ জেলায় এক রমণী গর্ভস্রাব করার অপরাধে জেলে প্রেরিত হয়, কিন্তু সে জেলে অবস্থান কালে পূর্ণা গর্ভিণী প্রকাশ পায়। তদন্তে প্রকাশ হইয়া পড়ে, পুলিশের ভয়ে হতভাগিণী একরার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তবে গর্ভস্রাব কে করিয়াছিল? পুলিশ একটী মৃত শিশু গুপ্তস্থানে পাইয়া প্রকৃত দোষীকে ধরিতে না পারিয়া, অভাগিণীকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া গর্ভস্রাবের একরার করাইয়াছিল। পুলিশের হৃদয়ে কি মনুষত্ব একেবারেই নাই?

ইটালি দেশে সম্প্রতি ভূমিকম্পে অনেক লোক গৃহ চাপনে প্রাণ দিয়াছেন। শুনিয়াছি পাপের ভরেই বসুমতি কাঁপেন।

বর্ম্মা লুঠে একটী সুন্দর ঘণ্টা ইংরেজ সৈন্যরা সংগ্রহ করেন। এক্ষণে সেটি ভারতেশ্বরীর রাজবাটীর উত্তর দিকে টাঙান হইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে "মাণ্ডালে ১৮৮৭"। এটা বুঝি জয় চিহ্ন? বর্ম্মা যুদ্ধে জয় লাভের চিহ্ন ঘণ্টাই ঠিক।

হাম্বর্গ নগরে একটী কাগজের হোটেল তৈয়ার হইয়াছে। উহা কাষ্ঠেরই ন্যায় কঠিন। শুধু তাহাই নহে, আবার আগুনে পুড়িবে না। ধন্য বিজ্ঞান!

সম্মতি আইনের মূল কারণটা বোধ হয় পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। হরিমোহন মাইতির বালিকা স্ত্রী সহবাসেই হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। সম্প্রতি মাইতির বদলে এক হরিমোহন মণ্ডল আবার এই প্রকাণ্ড কাণ্ডে আপন বালিকা স্ত্রী হত্যা অপরাধে আলিপুরের

বিচারাধীন। কি হবে এখন বলা যায় না। এক হরির কল্যাণে ১০ হইতে ১২ হইয়াছে, এই হরির আবার কল্যাণে পাছে ১২ হইতে ১৪ হয়?

পৃথীবিতে যত সেতু আছে তন্মধ্যে চীনদেশে সংসং নগরের নিকট "পীত-সমুদ্রের" একটী শাখার উপর "সিংহ" সেতুই শ্রেষ্ঠ। ইহা দীর্ঘে ৫।০ মাইল। ৩০০ খিলানের উপর রক্ষিত। জল হইলে ৭০ফুট উচ্চ। প্রত্যেক স্তম্ভের উপর একটী করিয়া সিংহের প্রতিমূর্ত্তি বসান আছে। তাই নাম সিংহ সেতু। চীনের কাণ্ডই এমনি অদ্ভুত!

প্রসিদ্ধ তাসের জুয়া মোকর্দ্দমায় মহারাণীর জেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস্‌কে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। তাই একজন সহযোগী বলিয়াছেন "ইংরাজের আইন বাদশা ও ফকীরকে সব ভাবে আলিঙ্গন করে।" আমরাও তাই বলি—কাগজে ও কলমে।

রাস্তা ঝাড়া ময়লাতে সার প্রস্তুত করিয়া পঞ্জাবের মিউনিসিপালিটি গত বৎসর ১২০,৭৯০, টাকা লাভ করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য মিউনিসিপালিটীও এই উপায়ে কিছু কিছু বাৎসরিক লাভ করিয়া থাকেন। অথচ কৃষি কার্য্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমাদের কলিকাতার মিউনিসিপালিটী এ সব সুলভ উপায় ত্যাগ করিয়া কেবল বাড়ীর ট্যাক্স বাড়াইয়া আয় বৃদ্ধি করিতে মজবুত!

ফরাসী দেশে এক নদীতে একজন কৃষক একটী কচ্ছপ ধরিয়া দেখিলেন তাহার পৃষ্ঠে খোদা আছে, "১৭০০ খৃষ্টাব্দে কার্ণেডো গোমিস্ কর্ত্তৃক ধৃত হইল ইত্যাদি।" তাই দেখিয়া কৃষক নিম্নে লিখিলেন "১৮৯০ সালে পুনরায় ধৃত" এবং ছাড়িয়া দিলেন। এটা কূর্ম্ম অবতারের বংশধর নয়ত?

মান্দ্রাজে একদল হিন্দু (?) তথাকার লাট বাহাদুরকে এই বলিয়া দরখাস্ত করিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট হইতে হিন্দু-বিবাহ বিষয়ক আইন পরিশোধিত হউক। উত্তর পাইয়াছেন "হইবে না"। সুবিজ্ঞ লাট কারণ দর্শাইছেন যে, এই সম্মতি আইন লইয়া দেশময় হলস্থূল হইয়া গেল। অগ্নি না নিভিতে সিভিতে আবার ঘৃতাহুতি কেন? এবার কিন্তু আহুতিতে দেশ ছারখার হইবে। গভর্ণমেণ্ট যেন বুঝিয়া সুঝিয়া কার্য্য করেন।

বিক্রমপুর—মধ্যপাড়া গ্রামে এক ব্যক্তির স্ত্রীর মৃতবৎসা দোষ ছিল। এক ফকির মৃতবৎসা ভাল করিবে বলিয়া তাহার বাটীতে অবস্থান করে এবং সেই ব্যক্তির পত্নীর সহিত ফকিরের প্রণয় সংঘটিত হয়। ফকির সেই ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত যোগ করিয়া তাহাতে হত্যা করে। সেসন আদালতের বিচারে ফকিরের প্রাণদণ্ডের ও ভ্রষ্টা রমণীর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজাও মধ্যে মধ্যে এই শ্রেণীর ঔষধ বিতরণ করেন।

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

প্রথম খণ্ড।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী।

উপক্রমণিকা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ছগণ তোমাদের সত্য-ধর্ম্মের, তোমাদের ত্রের, তোমাদের মাতৃভূমির, তোমাদের র্য্যত্বের গৌরবলাঘবমানসেই পেলেষ্টাইন, আসিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বথমে মনুষ্যসঞ্চার বলিয়া কল্পনা করে, কেন না, তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐরূপ থে) তোমরা তাহাই গুরুমন্ত্র ভাবিয়া রপুটে নিয়ত জল্পনা কর! বালকদিগকেও মূলমন্ত্রে দীক্ষা দাও! ঐ সকল স্থানকে াশনাদের পূর্ব্বপুরুষাধিষ্ঠিত মনে করিয়া ক্তিরসে আপ্লুত হও! ইহা কি রক্তংসের শরীরে সহ্য হয়? "বাপ পিতামহের ম ডুবাইয়া হিরে জোলার নাতী" হইতে তোমাদের লজ্জা হয় না? সুচতুর শ্চাত্য পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিয়াছেন সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষেই (অবশ্য ধুনিক-সীমান্তর্গত ভারতবর্ষ নহে) সঞ্চার হইয়াছিল; ভারতবাসীরাই প্রকৃত আর্য্য; দেবভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সকল ভাষারই মূলস্বরূপ; ভারতবর্ষই সর্ব্ব-প্রথমে সভ্যতার সোপানের উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিল, ভারতীয় ধর্ম্মই প্রাচীনতম, অদ্বিতীয়, সুতরাং সংজ্ঞাবিহীন; তথাপি আত্মগৌরবপ্রখ্যাপনেচ্ছায় অনর্গল বাগ্‌জাল বিস্তারকরত তোমাদিগকে ফাঁকি দিতেছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? তাহারাও ভারতে আসিয়া 'হাম্ বি কায়েত' হইতে চাহে, আর তোমরাও, তাহাতে আপত্তি না করিয়া 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্' ভাবে অনুমোদন করিতেছ! বেদ তোমাদেরই ধর্ম্মশাস্ত্র, তোমাদেরই বেদিতব্য, কিন্তু তাহাতে তোমাদের ক অক্ষরও জ্ঞান নাই দেখিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'গজভুক্ত কপিত্থবহিরেব মনোহর' হইয়া সহস্র সহস্র বিরুদ্ধ বিষয়ের অবতারণা করিতেছে, আর

তোমরা অনারত্তের ভায় ‘হবেও বা হবেও বা’ বলিয়া আপনাদের হীনতা স্বীকার করিতেছ! ভাই! ইংরাজি ট্রান্সলেসন পড়িয়া তোমাদের বেদে বিদ্যা। আবার সেই ট্রান্সলেসনগুলিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের লীলাভূমি। তাঁহারা অনেক স্থানেরই প্রকৃতার্থ-গ্রহণে অসমর্থ, তথাপি গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে ছাড়েন নাই। কোথাও বা আর্য্যদিগের গৌরবলাঘবমানসে প্রকৃতার্থের গোপন করিয়া নানা খেল খেলিয়াছেন। আমাদের বেদ-বেদান্তাদিশাস্ত্রে অধিকারী হইতে হইলে যে যে গুণের আবশ্যক, কৈ ম্লেচ্ছদের মধ্যে ত তাহার একটীও পরিদৃষ্ট হয় না। তবেই আমাদের স্থূল বুদ্ধির মতে, তাঁহারা উহাতে আদৌ অধিকারীই হয়েন নাই; তাঁহাদের মতগ্রহণের কথাত দূরে থাকুক। অদ্যাপি আমরা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রনিচয়ের কোন কোন দুরধিগম্য স্থলের মর্ম্মাববোধে অক্ষম হইলে, আপনাদের অনধিকারিত্বই নির্ণয় করিয়া মৌনী হইয়া থাকি। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের পল্লবগ্রাহিতাগুণে দুরূহত্যাগ ও সুগমগ্রহণজন্যই তাঁহারা তত্তৎ-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকারী। তজ্জন্যই অনেকস্থলে মতদ্বৈধ ঘটিয়া থাকে। যে সকল গ্রন্থ এইরূপ দ্বৈধীভাবে পরিপূর্ণ, সাহেবকৃত বলিয়া তাহাতেই আস্থাপ্রদর্শন যেন দেশীয়দিগের উৎকট ব্যাধিস্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। ওহে হামমস্ত, হুজুকপ্রিয় দিগ্‌গজগণ! এতাদৃশ গ্রন্থের উপর বিশ্বাস করিয়া তোমরা আপনাদিগকে মধ্য আসিয়ার আদিমনিবাসী মনে কর, তাহাতে নিষেধ করি না; কিন্তু অধস্তন সন্তানদিগের কচি মাথা আর খাইও না। তোমরা আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম অতল সাগরগর্ভে ডুবা[ও] তাহাতে ক্ষতি নাই; যদি কস্মিন্‌কালে তোমাদের বংশধরেরাও সেই সকল পূজ্য পাদ পূর্ব্বপুরুষদিগের চিরনিমগ্ন নামে[র] উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়, তাহার প[থ] এখন হইতে রুদ্ধ করিও না।

সংস্কৃতভাষামৃত হইলেও আমাদেরই মাতৃ ভাষা। সত্ত্ব-প্রকৃতিক হিন্দুগণ এভাষায় যেরূ[প] লব্ধাধিকার হইবেন, ম্লেচ্ছ-প্রভৃতি জাতি[র] পক্ষে ততদূর হওয়া একপ্রকার অসম্ভ[ব] বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কলি[র] প্রভাবে নানাপ্রকারে শৌচাচার-বিহী[ন] হওয়ায় সেই হিন্দুদিগের মধ্যেও আজ বা[র] আনা লোক সংস্কৃতজ্ঞানবিহীন। তথা[পি] তাঁহারাও বেদাদিশাস্ত্রের উপর মত চাল[না] করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। ইংরা[জি] ভাষায় out study চলিতে পা[রে] কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় উহার বৃত্তি একবারে প্রতিহত। যিনি একরূপ-শাস্ত্র-অধ্যয়[নে] জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, দেখিয়া শুনিয়া [যে] তিনি অন্য শাস্ত্রে অধিকারী হইবেন, তাহা[র] যো নাই। তজ্জন্যই এতদ্দেশে একবি[ধ] শাস্ত্রাধ্যায়ী সুরিগণের এক এক স্ব[তন্ত্র] উপাধি আছে; যথা, নৈয়ায়িক, স্মার্ত্ত, বৈদা[ন্]তিক, বৈদিক ইত্যাদি। কিন্তু আজকা[ল]কার সংস্কৃতজ্ঞানহীন ভায়ারাও পূর্ব্বো[ক্ত] সকল উপাধিগুলিই একচেটিয়া করি[য়া] বসিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছু নহে, একজন কোন বিষয়ে দুই এক[টী] প্রবন্ধ লিখিলেন, তৎপ্রবন্ধপাঠে অন্যান্য সকলেই তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করি[য়া] বসিলেন। ইংরাজদিগের মধ্যে এই রো[গ]

[ব]ড়ই সংক্রামক; তজ্জন্য প্রথমে যিনি [শ]কুন্তলা’ or ‘Fatal Ring,’ “মৃচ্ছকটিক” or ‘Toy Cart,’ “যজ্ঞোপবীত” or ‘sacred string,’ “যজ্ঞ” or ‘ceremony’ “হোম” or ‘pouring ghee on fire’, “আত্মা” or ‘self’ ‘পরমাত্মা’ or ‘supreme self’ লিখিলেন, তদবধি শত শত লেখক পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি সমভাবেই রাখিয়াছেন, কিছু-মাত্রও ইতরবিশেষ করেন নাই। এইরূপ অনুবাদ পড়িয়াই আজ ইংরাজমাত্রেই শকুন্তলার সুরস-রসাস্বাদনে কৃতার্থম্মন্য; ভগবদ্গীতার সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ব্রহ্মযোগ প্রভৃতির গূঢ় রহস্যোদ্ভাবনে সমর্থ; ইংরাজগণ, বেদের মধ্যে ঋগ্বেদেরই বেশী বেশী দোহাই দেন, সামের কাছে বড় ঘেঁসিতে পারেন নাই। প্রিয় প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ! সরল অকপট হৃদয়ে বল দেখি, বেদান্তের পঞ্চীকরণে জগৎ-সৃষ্টির কি মর্ম্মগ্রহ করিলে? পঞ্চদশীর ‘অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়স্পৃহা। অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ’॥ এই শ্লোকের কি ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ-জ্ঞানলাভ করিলে স্পষ্ট করিয়া বল। তোমরা আপনাদের বিদ্যাপ্রকাশ-ভয়ে, একজন যাহাকে ভাল বলিয়াছে, যাহার প্রশংসা করিয়াছে, তাহারই দোহাই দিয়া সহস্রপ্রকারে বাহাদুরী মারিতেছ; রাজপুত্রদত্ত ভস্ম চক্ষে দিয়া ‘বাহবা, বেশ দেখা যাচ্চে’ ইত্যাদি বলিয়া আপনাদিগেরই অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ। পাঠকবর্গ! ঈশ্বরদত্ত বাকৃশক্তি পাইয়া লোকে সময়ে সময়ে এমন কথা বলিয়া ফেলে, যাহা সামলাইতে তাহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। দেখুন না আমিও সেই শক্তির জোরে রাজপুত্রদত্ত বলিয়া ফেলিয়াছি; এখন ইহার ভিতরের কথাটিত না বলিলে চলিবে না; তাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন দেশে এক ন্যায়নিষ্ঠ রাজা ছিলেন; তাঁহার দুই পুত্র। একদা তাঁহার মনে হইল, বিদ্যা ও সামাজিকতা এ দুয়ের মধ্যে উৎকর্ষ কার! এইরূপ ভাবিয়া এক পুত্রকে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী করিবার জন্য বিচক্ষণ সদ্‌গুরুর সমীপে প্রেরণ করিলেন; দ্বিতীয়কে কথায় বার্ত্তায় বিবিধপ্রকারে সামাজিক করিবার জন্য বাকৃপটু, উপস্থিতবক্তা, সুরসিক লোকদিগের সহবাসে রাখিয়া দিলেন। কতিপয় বর্ষমধ্যেই অগ্রজ নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠও তৎসঙ্গে সঙ্গে বৈদগ্ধী, চাতুর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বক্রোক্তিতে সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে বিশেষ পারদর্শী হইল। একদা উভয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত সুবিজ্ঞ নৃপতি, একটী সুবর্ণ-নির্ম্মিত কৌটার মধ্যে চারিটী চিতাভস্ম রাখিয়া, উহার উপরিভাগ সাটীন, মখমল, বনাতদ্বারা আবৃত করত জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, বৎস! এই মহামূল্য উপহার অমুক দেশের রাজার সমীপে গিয়া প্রদান কর। পুত্রও পিত্রাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যথা-কালে চতুরঙ্গসেনা-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল। ক্রমে পূর্ব্বোক্ত রাজার রাজ্যপ্রান্তে উপস্থিত হইলে, তিনিও সাতিশয় সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক রাজপুত্রের প্রত্যুদ্গমনের জন্য অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত প্রেরণ করত তাহাকে রাজসভায় উপস্থাপিত করিলেন।

রাজকুমার উপস্থিত হইয়া নৃপতিকে যথোচিত সম্মানসহকারে অভিবাদন করত তৎসমীপে পিতৃপ্রদত্ত-উপহার--স্থাপন--পূর্ব্বক রাজাদেশে নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হইল। নৃপবর উপহারের প্রথম আবরণ বনাত, দ্বিতীয় মখমল ও তৃতীয় সাটীন, এবং পাত্রটী সুবর্ণনির্ম্মিত দেখিয়া মনে করিলেন, না জানি, ইহার মধ্যে কি মহামূল্য দ্রব্যই আছে। কিন্তু খুলিবামাত্রই দেখেন, উহার ভিতর কতকগুলি চিতাভস্ম। তখন অবমান এবং উপহাসবোধে ক্রোধান্ধ হইয়া রাজপুত্র ও তৎসমভিব্যাহারী সমস্ত লোককে কারাবদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। অগত্যা জ্যেষ্ঠ রাজকুমার এই অজ্ঞাত দেশে বন্দীরূপে কাল-যাপন করিতে লাগিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গিয়া প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, তথাপি পুত্র প্রত্যাগমন করিল না। রাজার চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল। পুত্রের পরিণাম জানিবার নিমিত্ত কনিষ্ঠকেও তদ্রূপ দ্রব্য ও লোকজন-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার প্রেরণ করিলেন। যথাকালে সেও রাজসভায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্তভাবে উপহার প্রদান করিলে রাজাও খুলিয়া পূর্ব্ববৎ চিতাভস্ম দেখিলেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার শিরচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, কনিষ্ঠ রাজপুত্র বড়ই চতুর, বাঙ্‌নিপুণ ও প্রত্যুৎপন্নমতি। রাজাজ্ঞা-শ্রবণে ঝটিতি তাহার মস্তকে বিপৎপ্রতীকারের বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বিনয়পুরঃসর করযোড়ে কহিল, মহারাজ! মদীয় জনক আপনার পরম সুহৃৎ। তৎপ্রেরিত ভস্মের বিশেষ গুণ না জানিয়াই আপনি আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতেছেন। ইহার অসাধারণ গুণ এই, সুজন্মা পুরুষ ইহার দ্বারা চক্ষে প্রলেপ দিয়া মর্ত্ত হইতে স্বর্গের যাবতীয় দেবতাকে দেখিতে পান। আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন! যিনি বিজন্মা, তাঁহার ভাগ্যে এ সুখ ঘটিবে না। রাজপুত্রের বাক্যশ্রবণে মহারাজ ব্যগ্রতাসহকারে কিঞ্চিৎ লইয়া চক্ষুতে প্রলেপ লাগাইয়া স্বর্গপানে চাহিয়া দেখেন, কোথায় বা ইন্দ্র, আর কোথায় বা ব্রহ্মা, আর কোথায় বা বিষ্ণু, আর কোথায় বা ত্রেত্রিশকোটী দেবতা! যদিও কিছুই দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু রাজসভায় সে কথা প্রকাশ করিলে পাছে লোকে বিজন্মা বলে, এই আশঙ্কায় মনোভাব গোপনকরত বলিলেন, 'বাহবা, ঐ যে ইন্দ্র শচী সহ বিমানারোহণে নন্দন-কাননে ভ্রমণ করিতেছেন; এই যে হংস-বাহনে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা; আহা কি চমৎকার! মহাদেব তম্বরুহস্তে কেমন রাগ আলাপ করিতেছেন'। মহারাজের দেখাদেখি মন্ত্রী-মহাশয়ও গোটাকতক লইয়া চক্ষে প্রদান-করত পূর্ব্বোক্তরূপে স্বীয় মনোভাব-গোপনে বলিলেন, 'তাইত কি আশ্চর্য্য! গরুড়-বাহনে শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণের কি অপরূপ মূর্ত্তি। পাশহস্তে বরুণ কোথা যাচ্চেন!' ক্রমে ক্রমে পাত্রমিত্র ও সভাসদ্‌গণ সকলেই লয়েন, আর দেখুন আর না দেখুন, সকলেই মুখে বাহাদুরী করেন; স্পষ্টকথা কাহারও বলিবার যো নাই, পাছে গোড়ার কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কেহই দেখিলেন না, বুঝিলেন না, অথচ সহস্রমুখে প্রশংসা করিতেও ছাড়িলেন না।

অস্মদ্দেশ এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যাভিমানী দেশের অবস্থাও আজকাল ঠিক এইরূপ। অনেকেই প্রকৃত তথ্য বুঝেন না, অথচ 'The melodious and remarkable alliterations of Joydeva,' 'The vivid fancy and far-reaching imagination of Bidyapati,' 'The considerable deep feelings of Chandidas' বলিতেও ছাড়েন না। না বলিলেইত বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। প্রশংসা-লিপ্সা বড়ই উৎকট ব্যাধি। এই রোগের বশে কত লোক যে কত প্রলাপ বকিতেছে, তাহা ভাবিলেই আমাদিগের শরীর শিহরিয়া উঠে। দেশীয় ও বিদেশীয় স্তাবকগণ! তোমাদের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা, না বুঝিয়া সুঝিয়া কপটহৃদয়ে কোন বিষয়ে মতপ্রদান করিও না। বুঝিবার অসাধ্য হয়, স্পষ্ট বলিতে আপত্তি কি? পৃথিবীতে কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহেন, তজ্জন্য দুঃখ করিবার কারণ নাই। পেটে এক, মুখে আর, করিয়া পাপসংগ্রহ কেন?

যাক্, আর ওসব কথায় কাজ নাই, আমরা ধান ভান্‌তে শিবের গীত আরম্ভ করিয়াছি। বাঙ্গালা-সাহিত্যশাস্ত্রের সমালোচন করিতে বসিয়া কর্ত্তকিসের সমালোচন করিয়া ফেলিলাম। বাজে কথায় অনেকক্ষণ কাটাইলাম। এক্ষণে প্রকৃত-প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করাই উচিত; কিন্তু আর একটী সমালোচন বাকী আছে; সেটী আবার সাহিত্য-সমালোচনের কাছাকাছি; সুতরাং, তদ্বিষয়ে দুই চারিটী কথা না বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ভাল দেখায় না। উৎসুক পাঠকগণ আমাদের এই কালাতিরেকে ক্ষমাপ্রদর্শনকরত ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। আমরা মন্তব্য কেচ্ছা (১) সুরু করিয়াই দস্ত বদস্ত (২) তমাম করিয়া লইব। আপনারা বলিতে পারেন, এত আর চাহার দরবেশেরও কেচ্ছা নয়, কিম্বা নিজাম পাগলারও কেচ্ছা নয়, অথবা কেচ্ছা সাহারামও নহে, তবে কিসের জন্য অপেক্ষা করিব। এতদুত্তরে আমাদের নিবেদন এই, যদিও এ কেচ্ছায় পরীজাত (৩) আসিয়া নিদ্রিত শাহজাদীকে (৪) বহন-করত বাদশাহজাদার (৫) কাছে পৌছাইয়া দিবেনা, কিন্তু তৎসদৃশ কোন বস্তু থাকিবে। যদিও এ কেচ্ছায় আশক মাশুকের (৬) আশনাই দেখিতে পাইবেন না সত্য, কিন্তু তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিবেন। এ কেচ্ছা কি, তাহা বোধ হয়, পাঠকবর্গ বুঝিতে পারেন নাই, তজ্জন্য বলিয়া দিই। ইটি ইনস্পেক্টর কেচ্ছা।

বিদ্যালয় সকলের উন্নতিপরিদর্শন এবং উপযুক্ত-পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন, এই দুই কার্য্যের জন্যই ইন্‌স্পেকৃটরী পদের সূত্রপাত। বলিতে কি উক্ত দুই কার্য্যেই ইনস্পেকৃটর মহোদয়গণ অমনোযোগী। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একবার একজন ইন্‌স্পেক্টর (ডেপুটী নন) কোন বিদ্যালয়-

(১) কেচ্ছা—অদ্ভুত গল্প। (২) দস্ত-বদস্ত—হাতে হাতেই অর্থাৎ শীঘ্র। (৩) পরীজাত—পরীসকল। (৪) শাহজাদী—রাজকন্যা। (৫) বাদশাহজাদা—সম্রাটের পুত্র। (৬) আশকমাশুক—প্রণয়ী ও প্রণয়িনী

পরিদর্শন করিতে গিয়া তত্রত্য বালকগণের গুণাগুণ কিছুই দেখিলেন না, কেবল লোহার বীমে কড়া আঁটিয়া কিরূপে পাখাগুলি ঝুলান হইয়াছে, তাহারই পরিদর্শন করিয়া এবং হেডমাষ্টার মহাশয়কে তদ্বিষয়ে দুই একটী প্রশ্ন করিয়াই আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিলেন। শুদ্ধ ইনিই কেন, এঁরা যাবতীয় বিদ্যালয়ই যে এইরূপে পরিদর্শন করেন, তদ্বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ব্যতীত আর কাহারও সন্দেহ নাই। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি বলিব, ১২৯৮ সালের ১৬ই শ্রাবণের "সময়" পাঠে অবগত হইলাম, যে ঢাকা বিভাগের কোন কোন ইন্‌স্পেক্টর মহাপুরুষ বিদ্যালয়ে পদধূলি পর্য্যন্ত দেন না, আপন বাসায় বালকদিগকে আনিয়া পরীক্ষা করেন। স্কুলের শিক্ষকদিগের ইহাতে আপত্তি করিবার যো নাই, কারণ, তাঁহারা খোর্দ্দমহল-বাসিনীর (১) ন্যায় ইন্‌স্পেক্টর জাঁহাপানার অপাঙ্গদৃষ্টির ভিখারী। পাঠক! এদৃশ্য কি আশকমাশুকের দৃশ্য অপেক্ষা সুদৃশ্য নয়! আবার কোন সময়ে বৃষ্টি হওয়ায় পথের কর্দ্দমে যাওয়া অসম্ভব বিবেচনায় ইন্‌স্পেক্টর সাহেব কোন শিক্ষককে ক্রোড়ে করিয়া কর্দ্দম পার করিতে বলেন। পাঠক! তোমার চক্ষে পরীজাতের শাহজাদীর বহন অপেক্ষা কি এ বহন ভাল লাগে না! কর্ত্তৃপক্ষ এ সকল বিষয় কিছু দেখিতে পান না বলিয়া আমরা দুঃখ করি; তাঁহারা কেমন করিয়া দেখিবেন, ও যে "ঢাকা" বিভাগ। "ঢাকা" থাকলে কেহই ত কিছু দেখিতে পায় না। যদি বল হুগলির কথা—সেখানেও "গলির" ভিতর কি লোকের দৃষ্টি যাওয়া সম্ভব। যদি কলকেতার কথা বল—এখানে একমাত্র কেতা দোরস্ত থাকিলেই সব সারিয়া যায়। ইন্‌স্পেক্টরদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যবলে এই সমস্ত সুবিধাগুলি ঘটিয়াছে।

আমরা দেখিতেছি, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিয়ম ও অপামার্গের মূল উভয়ই একগুণ-বিশিষ্ট। কেন না, অপামার্গের শিকড় গর্ভিণীর কেশমধ্যে বাঁধিয়া দিলেই তৎক্ষণাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। কিন্তু তখনই উহাকে কেশ হইতে অপসারিত না করিলে, উহা ভালমন্দ বাছিবেনা; গর্ভিণীর নাড়ীপর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিবে। উহার গুণই হচ্ছে টানিয়া বাহির করা; তা কে জানে সন্তান, আর কে জানে নাড়িভুঁড়ি। সরকারী চাকরী গুলিও ঠিক তদ্রূপ। যাহার ভাগ্যে উহা ঘটিয়াছে, সে উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত কোনরূপ বিচার না করিয়া কেবলই তাহাকে টানিয়া তুলিতেছে; তাই বলি, সরকারী চাকরী অপামার্গ-গুণ-বিশিষ্ট নয়ত কি! নতুবা, পঞ্চদশমুদ্রা হইতে একজনকে পাঁচশত মুদ্রায় টানিয়া আনিবে কেন? অথবা নিম্নতম্ শ্রেণীর শিক্ষকইবা কিরূপে শেষে সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর হইতে পারেন? তাহাতেই আমাদের ধারণা, যে অপামার্গগুণবিশিষ্ট বলিয়াই সরকারী চাকরীগুলি ভালমন্দ না বাছিয়াই ইহাদিগকে টানিয়া তুলিয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, সরকারী চাকরী পাইয়া যে সকল ভাগ্যধর বিশ পঁচিশ হইতে হাজার বারশয়

(১) খোর্দ্দমহল—যেখানে বাদশাহদিগের বেশ্যারা থাকে।

উঠিয়াছেন, বেসরকারী চাকরী হইলে, তাঁহাদের কক্‌কেশ ধবলিত হইত, অথচ দুই চারিটাকা বেতন-বৃদ্ধি হইত কিনা সন্দেহ। প্রায়ই প্রত্যক্ষ হয়, সরকারী বৃত্তিভোগীর মধ্যে গুণবান্ লোক অতি অল্প।

পূর্ব্বেই বলাগিয়াছে, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন ইনস্পেক্টরদিগের অন্যতর কার্য্য। অনেকে বলেন, তাঁহারা একার্য্যে বড়ই শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা বলি যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে এ বিষয়ে এত তৎপর হন, যে পুস্তক যন্ত্রস্থ হইল না, অথচ তাহাকে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহাদের চিত্ত এমনই উদার, যে, তাঁহারা পুস্তকের দোষের দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপই করেন না। তাঁহাদের আশ্রিত-বাৎসল্য-গুণে সহস্র সহস্র দোষও ক্ষমার মধ্যে পড়িয়া যায়। তৈল জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয় না, কিন্তু দুগ্ধ জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যায়। ইন্‌স্পেক্টরদিগের স্বভাবও দুগ্ধের ন্যায়; যতই দোষ থাকুক না কেন, উত্তমরূপে মিশিয়া যায়, কেহ জানিতে পারেনা। আরও তাঁহাদের এক অসাধারণ গুণ এই, যে, তাঁহাদের ক্ষুদ্রদৃষ্টি আদৌ নাই, মহৎদৃষ্টিই, সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাগরাদির উপরে তাঁহাদের তীব্র নজর; ক্ষুদ্র কূপাদির দিকে দৃক্‌পাতও করেন না। বাইবেলে লিখিত আছে, "তুমি এরূপে দান করিবে, যেন তোমার দক্ষিণহস্ত জানিতে না পারে"। ইঁহাদের দান তদপেক্ষাও গুপ্ত। যাহাকে বাক্য দেন, তথায় সেই অনুরোধ করিবার লোক ভিন্ন (যাহার কথা ঠেলিলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়) আর কেহই থাকে না। তাঁহারা এমনই ক্ষমাশীল, যে, সহস্র২ লোকের কটূক্তি, সংবাদপত্রের তিরস্কার, আপামর সাধারণের তাড়না অনায়াসেই সহ্য করেন। অধিকন্তু, তাঁহাদের আরও একটী মহান্ গুণ এই যে, তাঁহারা আপনার নাম জাহের করিতে বড় অভিলাষী নহেন। আপনি পুস্তকরচনা করিয়া অন্যের নাম জাহের করেন। তাঁহাদের লোভও অনেকটা সংযত। তাঁহাদের অনুগ্রহে যে সকল পুস্তক বিক্রীত হয়, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা উহার লভ্যাংশ সমস্তই কবলিত করিতে পারেন; কিন্তু, তাহা না করিয়া কিঞ্চিৎ লইয়াই নিরস্ত হন। আরও সংসারের ইহা এক বিচিত্র গতি, যাহার ধনসম্পত্তি আছে, বিষয়-বৈভব আছে, স্বর্ণরৌপ্য আছে, মণিমাণিক্য আছে, লোকের চিত্ত স্বভাবতই তৎপ্রবণ; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরদিগের চিত্ত, যাহার তৈল আছে, প্রায়ই তৎপ্রবণ দেখা যায়। তেল দিলে নরম হয় না, এমন দ্রব্য জগতে অতি বিরল। এমন যে কঠিন লোহর কল, তাহাও তেলে জল হইয়া যায়। "তৈলমৃষ্টময়োঽপি মার্দ্দবং ভজতে কৈব কথা শরীরিষু।" "অভিতপ্তং" নয়, উহা কালিদাসের ভুল। ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়দিগের এই সমস্ত অমানুষগুণেই বিদ্যালয় সকলের বিপরীত উন্নতি হইয়া থাকে। তা হউক, তাহাতে কার কি ক্ষতি; তৈলমান্ লোকদিগের কিন্তু খুব সুযোগ উপস্থিত। প্রকৃত গুণের আদর আর নাই; কৃতযুগে কিন্তু নির্গুণেরই খুব আদর ছিল। দৈবতগণ নির্গুণ শব্দে অভিহিত হইতেন। আজকালও ত নির্গুণের তেমনি আদর দেখা যাইতেছে। কৃত-

যুগ আবার উপস্থিত হইবে নাকি? পূর্ব্ব লক্ষণও দেখা দিয়াছে।

পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচন-বিষয়ে আজকাল ভারি গোলযোগ উপস্থিত। যাঁহাদের হস্তে উক্ত গুরুতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা এমনই ধর্ম্মজ্ঞানপরিশূন্য যে স্বার্থপরবশ হইয়া ঘোরতর পাতক করিতেও কুণ্ঠিত হন না। পুস্তকমাত্রেই অচেতন পদার্থ, সুতরাং, চলিতে পারে না, তাহাত সকলেই জানে; তবে কয়েকখানি পুস্তকই বা বেশ চলে কেন? ইহাদিগকে চলিবার শক্তি কে দিল? সৃষ্টিকর্ত্তা দিলে ত আর কাহারও আপত্তি থাকিত না। রচয়িতার রচিত গ্রন্থ নির্জ্জীবই বটে, চলচ্ছক্তিহীন, কিন্তু সম্বন্ধস্প্রীঙে ও ইন্‌স্পেক্টরের দমে বারমাসই টুক টুক করিয়া চলিতেছে। বন্ধ হইতে আর চায় না। যদি কখন স্প্রীঙ্ ছিঁড়ে, কি দম ফুরাইয়া যায়, তখন বন্ধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু স্প্রীঙ্ ছিঁড়া একপ্রকার দুরাশা; কেন না উহা পাকা ষ্টীলের তৈয়ারী, শীঘ্র ছিঁড়িবে না। আর দমও ত রোজ রোজ, কি সপ্তাহে সপ্তাহে দিতে হয় না যে, দৈবাৎ ভুলও হইতে পারে। এ দম বৎসরে একবার, সুতরাং ভুল ও হয় না। তাই চিরকালই যে চলিবে, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি। অন্য অন্য গ্রন্থকারদের ত আর সম্বন্ধ স্প্রীঙ্ নাই; সুতরাং, তাঁহাদের গ্রন্থ চলিবার আশা আর হিমাদ্রির অপসারণে ভারতের অশী তার আশা দুই সমান। অনেকে সময় সময়ে ভ্রমান্ধতাবশত ইন্‌স্পেক্টরের দম দিয়া লন বটে, কিন্তু তাহা কোন কার্য্যেরই হয় না। স্প্রীঙ্ না থাকিলে দম লাগিবে কিসে।

সম্প্রতি একটী বিষয় লইয়া স্থানে স্থানে তর্কবিতর্ক হইতেছে। বিষয়টি এই; পাঠ্যপুস্তকরচয়িতৃগণের চরিত্র বিশুদ্ধ হওয়া উচিত কি না? ন্যায়পরতা বা ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার কোন সংশ্রব আছে কি না? অন্যান্য বিবাদের ন্যায়, ইহাতেও দুই দল আছেন। এক দলের অভিপ্রায়, রচয়িতা যেরূপ চরিত্রেরই লোক হউন না, যদি তৎকৃত গ্রন্থে তদীয় স্বভাবের পরিচয় আদৌ না পাওয়া যায়, তবে সে গ্রন্থ কেন না আদরণীয় হইবে। দ্বিতীয় দলের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন, যদিও ইহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধর্ম্ম বা ন্যায়পরতার হানি হইতেছে না, কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে ঘটিতেছে। বর্ষায় নদীতে জলসঞ্চয় অধিক হইলেই যেমন উহার তরঙ্গেরও প্রাবল্য প্রত্যক্ষ হয়, জলাভাবে তত তরঙ্গ কখনই দেখা যায় না, তদ্রূপ আয়পথ প্রশস্ত থাকিলে পাপাচারীর পাপের স্রোতও প্রবল হয়, আয়পথ সঙ্কীর্ণ হইলে কখনই ততটা সম্ভবে না; সুতরাং তাদৃশ গ্রন্থকারের গ্রন্থপরিচালন ও পাপের প্রশ্রয়দান একই কথা। পশুধর্ম্মী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থগুলি যাহাতে একেবারে পাঠ্য মধ্যে পরিগণিত না হইতে পারে, তজ্জন্য সাধারণের সবিশেষ চেষ্টা একান্ত প্রার্থনীয়!

'আজকাল ডিরেক্‌টর অব্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকসন স্বয়ংই পাঠ্যপুস্তকের তালিকা-প্রস্তুত করিতেছেন; কিন্তু তাঁহারত বাঙ্গালা ভাষায় এত অধিকার নাই, যে, তিনি পুস্তকের দোষগুণ বিচারকরতঃ তাহাকে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ।

অসমুদ্রোত্থিত রত্ন।

১১

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

অর্থাৎ নীতিজ্ঞ লোকেরা নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন; লক্ষ্মীদেবী আসুন বা যান; অদ্যই মরণ হউক কিম্বা যুগান্তরেই মরণ হউক; ধীরগণ কখন ন্যায্য পথ হইতে বিচলিত হয়েন না।

১২

প্রণাতি যঃ সুচরিতৈঃ পিতরং স পুত্রো
যদ্ভর্ত্তুরেব হিতমিচ্ছতি তৎ কলত্রম্।
তন্মিত্রমাপদি সুখে চ সমং প্রযাতি
এতত্ত্রয়ং জগতি পুণ্যকৃতো লভন্তে॥

অর্থাৎ সচ্চরিত্র দ্বারা যে পিতাকে সতত সন্তুষ্ট রাখে, সেই পুত্র; যে সর্ব্বদাই স্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষা করে, সেই স্ত্রী; কি সম্পদে কি বিপদে যে বন্ধু সমীপে সমান রূপে গতায়াত করে, সেই মিত্র। পুণ্যবান লোকেরাই এইরূপ পুত্র, স্ত্রী ও বন্ধু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

১৩

আত্মানদী সংযমপুণ্যতীর্থা
সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র!
ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥

মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন "হে পাণ্ডুপুত্র! আত্মাই পবিত্র নদী; সংযম তাহার পুণ্যতীর্থ-ক্ষেত্র, সত্যই তাহার সলিল, চরিত্র তাহার তট, দয়া তাহার তরঙ্গ, তুমি তাহাতে স্নান কর। অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয়না।"

১৪

অগাধে বিমলে শুদ্ধে সত্যতোয়ে ধৃতি হ্রদে।
স্নাতব্যং মানসে তীর্থে সত্যমালম্ব্য সাশ্বতম্॥
তীর্থ শৌচমনর্থিত্বমার্জ্জবং সত্যমার্দ্দবম্।
অহিংসা সর্ব্বভূতানামানৃশংস্য দমঃ শমঃ॥
তত্ত্ববিত্তনহং বুদ্ধিস্তীর্থ প্রবরমুচ্যতে।
শৌচ লক্ষণমেতত্তে সর্ব্বত্রৈবাম্ববেক্ষণম্॥
নোদক ক্লিন্নগাত্রস্তু স্নাত ইত্যভিধীয়তে।
স স্নাতো যো দমস্নাতঃ সবাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ॥

অর্থাৎ যাহা অগাধ, বিমল এবং শুদ্ধ, সত্যই যাহার সনাতন জল, সেই ব্রহ্মযোগ রূপ মানসতীর্থেই স্নান করিবে। নিস্পৃহতা, প্রসন্নতা, সারল্য সত্যনিষ্ঠা, কোমলতা, অহিংসা, সর্ব্বজীবে দয়া, বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় সংযম এই সমুদয়ই প্রকৃত শৌচ। অহং জ্ঞানশূন্য ব্রহ্মযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া কথিত। সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারকে শৌচের প্রধান লক্ষণ বলিয়া জানিও। জলে গাত্র ভিজাইলেই স্নান করা হয়না; সংযমজলে স্নান করাকেই স্নান বলে এবং সেই জলেই অন্তর্ব্বাহ্য শুদ্ধ হয়।

১৫

আত্মৈব পরমং তীর্থং মুক্তিক্ষেত্র সনাতনম্।
ত্রিতাপহারিণী যত্র ভক্তিগঙ্গা বিরাজতে॥
ঈশ্বরাদ্রি সমুদ্ভূতা যেশ্বরাম্বুধিগামিনী।
প্রেমদ্রবময়ী ধারা সৈব গঙ্গা সনাতনী॥

যেখানে ত্রিতাপ-হারিণী ভক্তিরূপা গঙ্গাদেবী বিরাজিতা, সেই আত্মাই সনাতন মুক্তিক্ষেত্র ও পরম তীর্থ। যে দ্রবময়ী প্রেম-ধারা ঈশ্বর রূপ মহাগিরি হইতে সমুদ্ভূতা হইয়া আবার ঈশ্বর রূপ মহাসমুদ্রে মিলিতা হইয়াছে, তাহারই নাম সনাতনী গঙ্গা।

শ্রীনৃসিংহমুরারি পাত্রা।

বর্ণাশ্রম-বিবেক। (২)

[ব্রাহ্মণ বিচার]

(জনৈক পূজ্যপাদ পরমহংসের বিবৃতি)।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রমাণ তবে শুনুন;—

তিলকং যজ্ঞসূত্রঞ্চ ত্রিসন্ধ্যা বিষ্ণুপূজনম্।
গায়ত্র্যাদি জপেন্নিত্যং এতদ্‌ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥

অর্থাৎ কপালে তিলক, স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র, ত্রিসন্ধ্যা বিষ্ণোপাসনা এবং গায়ত্র্যাদি বৈদিক মন্ত্র নিত্যজপ এই সকল ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

বৃহস্পতি ব্রাহ্মণের মুখে এই শ্লোকটী শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন তোমার কথিত লক্ষণে দুইটী দোষ পড়িতেছে; একটী দোষ অতিব্যাপ্তি আর একটী দোষ অব্যাপ্তি। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এ দুই বর্ণও তোমার লক্ষণের ভিতরে আসিয়া পড়িতেছে, সুতরাং অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিতেছে; আর শুকদেব দত্তাত্রেয় প্রভৃতি জ্ঞানিগণ এবং মূর্খ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞসূত্র ধারণ বা ত্রিসন্ধ্যা বিষ্ণুর উপাসনাদি করেন না, এখানে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিতেছে। অতএব তোমার লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণ সিদ্ধ হইতেছে না।

ব্রাহ্মণ তখন অন্য লক্ষণ কহিতেছেন;—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরুতোঽস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

আচার্য্য বৃহস্পতি ব্রাহ্মণের উক্ত যজুর্বেদীয় মন্ত্র শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে, তোমার এই মন্ত্রদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে যাহার জন্ম সেই ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে যাহার জন্ম সেই ক্ষত্রিয়, উরু হইতে যাহার জন্ম সেই বৈশ্য, আর পদ হইতে যাহার জন্ম সেই শূদ্র। ইহাতে আমার এই বক্তব্য যে, ইহা সর্ব্ব-

শাস্ত্র সঙ্গত নহে। যেহেতু ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে আছে;—

উৎসঙ্গান্নারদো যজ্ঞে দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
প্রাণাদ্বশিষ্ঠঃ সংজাতো ভৃগুস্ত্বচি করাৎ ক্রতুঃ॥
পুলহো নাভিতো যজ্ঞে পুলস্ত্যঃ কর্ণয়োর্ঋষেঃ।
অঙ্গিরা মুখতোঽক্ষ্ণোঽত্রির্মরীচির্মনসোঽভবৎ।
ছায়ায়া কর্দ্দমো যজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ॥

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; অপর নয়জন ঋষি ব্রহ্মার অন্যান্য অবয়ব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁরা তবে কোন্ বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইবেন? তোমার মতে ত ইহাঁরা ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই, অঙ্গিরা গোত্র-ভিন্ন অন্য গোত্রে যে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিবেন তিনি জাতিভ্রষ্ট হইবেন কি না? স্ববর্ণ-ভার্য্যা গ্রহণ না করিলেই ত জাতি নাশ হইবে।

ব্রাহ্মণ এই সমস্ত খণ্ডন শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে আজ প্রাতে কাহার মুখ দেখিয়াছি যে, আমাকে নাস্তিক পদে পদে ঠকাইতেছে। তৎপর তিনি প্রমাণ-দ্বারা ব্রাহ্মণ নিশ্চয় হইল না দেখিয়া লক্ষণ-দ্বারা ব্রাহ্মণ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন;—

অবগীত ব্রাহ্মণি জন্যত্বে সতি
অবগীত ব্রাহ্মণ জন্যত্বং ব্রাহ্মণত্বম্।

অর্থাৎ অনিন্দিত মাতৃপিতৃকুল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী সংজাত যে, সেই ব্রাহ্মণ।

বৃহস্পতি তখন হাস্য করিয়া বলিলেন;—এই যে লক্ষণ ইহা সকল লক্ষণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা করি, যতদিন হইতে এই ব্যবহারিক সৃষ্টি চলিয়াছে, সেই কালের মধ্যে এমন কোন কুল কি আছে যাহাতে কোন পুরুষ বা রমণী কস্মিন্ কালে কি কায়িক, কি বাচনিক, কি মানসিক কোন-প্রকার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই? আর অন্যের কথাই বা কি কহিব স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা সদ্যজাতা কন্যা সরস্বতীতে উপগত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যথা ভাগবতে;—

বাচং দুহিতরং তন্বীং স্বয়ম্ভুর্হরতীং মনঃ।
অকামাং চকমে ক্ষত্তঃ সকাম ইতি নঃ শ্রুতম্॥

আর ব্রাহ্মণঠাকুর! তোমাকে বলি, কেবল জন্মমাত্রে কেহই ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণ হইতে হইলে বহু তপঃসাধনার প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণ তখন বিচলিত হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন কেন এই যে, ভগবদ্বাক্য রহিয়াছে;—

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ

অর্থাৎ কৃতবিদ্যই হউক আর মহামূর্খই হউক ব্রাহ্মণমাত্রেই আমার তনু।

বৃহস্পতি তখন অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন ঠাকুর! শ্লোকের অর্দ্ধেক পাঠ করিয়া অপরার্দ্ধ কেন পাঠ করিলে না?

ব্রাহ্মণ—আপনি তবে আবৃত্তি করুন।

বৃহস্পতি—সবিদ্যো মমৈবং জ্ঞেয়মবিদ্যো মামকী *।

অর্থাৎ বিদ্বান্ আমার মূর্ত্তি স্বরূপ আর মূর্খ আমার গুহ্যদেশ। আর ইহাও ত ভগবদ্বাক্য। সুতরাং ইহাতেই বা কি বুঝিলে? আরও দেখ, মনু বলিয়াছেন;—

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
স্বাধ্যায় বর্জ্জিতো বিপ্রস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥

অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠ নির্ম্মিত হস্তীতে হস্তী ধর্ম্ম নাই, চর্ম্ম নির্ম্মিত মৃগেতে মৃগের ধর্ম্ম নাই, সেইরূপ বেদাধ্যয়ন--বর্জ্জিত বিপ্র কেবল নামমাত্র, সে বিপ্রই নয়।

ব্রাহ্মণ তখন কহিতেছেন, কেন ইহাও ত মনুতে আছে ;—

সর্ব্বস্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যচ্চ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্।

অর্থাৎ যেদিন ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছে, সেই দিনই জগতের সমস্ত সম্পত্তি তাহারই হইয়াছে।

বৃহস্পতি একটু হাস্য করিয়া বলিলেন যে, যদি তুমি দুঃখিত না হও তাহা হইলে এ সম্বন্ধে তোমাকে শাস্ত্র শুনাইতে পারি।

ব্রাহ্মণ—আচ্ছা আপনি বলুন।

বৃহস্পতি—তবে শুনুন।

অত্রি সংহিতায় এবং কল্লুকভট্টে অছে ;—

সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণ ব্রুবে।
অধীতে শতসহস্রমনন্তং বেদপারগে॥

অর্থাৎ অব্রাহ্মণকে দান করিলে সমান ফল হয়, যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাকে দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয়, বেদাধ্যায়ীকে দান করিলে লক্ষগুণ ফল হয় আর বেদ-পারগ যিনি অর্থাৎ বেদের শব্দার্থ উভয়বিদ্ যিনি, তাঁহাকে দান করিলে অনন্ত ফল হয়।

ব্রাহ্মণ—আচ্ছা, অব্রাহ্মণ কাহাকে বলে।

বৃহস্পতি—শুনুন।

অব্রাহ্মণাঃ ষট্ প্রোক্তা ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভি।
রাজ্ঞো রাজভৃতাস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী॥
তৃতীয়ো বহ্বাদ্যস্যাচ্চতুর্থো গ্রামযাচকঃ।
পঞ্চমস্তু তৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ॥
আগতায়াঞ্চ যঃ পূর্ব্বামাদিত্যাং চৈব পশ্চিমাম্
নোপাসীদ দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ॥

তত্ত্বদর্শী ঋষিরা ছয়প্রকার ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণ কহিয়াছেন ; যথা ১। রাজার চাকর ; ২। দোকানদার ; ৩। বহুযাজক অর্থাৎ যে বহুলোকের পূজা পার্ব্বণ করিয়া বেড়ায় ; ৪। যে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় ; ৫। যে গ্রামের বা নগরের ভৃত্য ; এবং ৬। যে প্রাতঃকালীন এবং সায়ংকালীন সন্ধ্যা বন্দনাদি না করে।

অত্রি সংহিতায় আরও আছে—

দেবমুনির্দ্বিজোরাজা বৈশ্য শূদ্র বিড়ালকঃ।
পশু ম্লেচ্ছশ্চ চণ্ডালো বিপ্রো দশবিধঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ—সকল ব্রাহ্মণ সমান নহে।

ব্রাহ্মণ দশপ্রকার কথিত হইয়াছে, যথা ; ১। দেবতা ; ২। মুনি ; ৩। দ্বিজ ; ৪। ক্ষত্রিয় ; ৫। বৈশ্য ; ৬। শূদ্র ; ৭। মার্জ্জার ; ৮। পশু ; ৯। ম্লেচ্ছ ; ১০। চণ্ডাল।

১। দেব বা দেবতা ব্রাহ্মণ—ভিক্ষোপজীবী, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ, সন্তুষ্ট চিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, বেদাভিজ্ঞ।

২। মুনিব্রাহ্মণ—একান্তসেবী, জিতেন্দ্রিয়, বেদার্থবিদ্, এবং ব্রহ্মমননশীল।

৩। দ্বিজ ব্রাহ্মণ—কন্দমূলভোজী, বনবাসী, যথাকালে স্ত্রীগমনকারী।

৪। রাজা বা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ—অশ্ব বাহন তত্ত্বজ্ঞ, সংগ্রাম কুশল, বীর।

৫। শূদ্র ব্রাহ্মণ—লাক্ষা, তৈল, নীল, কুসুম, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ ও তক্রবিক্রেতা।

৬। বৈশ্য ব্রাহ্মণ—লৌহদ্রব্য নির্ম্মাতা, পশু পালক, বাণিজ্য এবং কৃষিকুশল।

৭। বিড়ালক বা মার্জ্জার ব্রাহ্মণ—পাপকর্ম্মী শক্র হননকারী, দাম্ভিক, স্বার্থপরায়ণ, মহাপাপকারী, ভেদকর্ত্তা।

৮। পশু ব্রাহ্মণ—ভক্ষ্যাভক্ষ্য, বাচ্যাবাচ্য, প্রিয়াপ্রিয়, গম্যাগম্য বিচারহীন, কৃতঘ্ন।

৯। ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ—বাপী, কূপ, তড়াগ, অতিথিশালা, চতুষ্পাঠী বিনাশকারী।

১০। চণ্ডাল ব্রাহ্মণ—দেবদ্রব্য গুরুদ্রব্য অপহরণকারী, পরদারগামী, নিষ্ঠুরভাষী, সর্ব্বভূতের অপ্রিয় কারী।

আর এক কথা। ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ত উচ্চতর জীব রহিয়াছে।

শুনুন ;—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধি জীবিষু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ॥

অর্থাৎ ভূত-সকল অপেক্ষা প্রাণী-শ্রেষ্ঠ, প্রাণী অপেক্ষা বুদ্ধিজীবী শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবী অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্ অপেক্ষা উদ্যোগী পুরুষ শ্রেষ্ঠ, উদ্যোগী পুরুষ অপেক্ষা ক্রিয়াশীল শ্রেষ্ঠ এবং ক্রিয়াশীল অপেক্ষা ব্রহ্মবাদী শ্রেষ্ঠ। হে ব্রাহ্মণ ঠাকুর! এখন একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন আপনার যুক্তি ও প্রমাণ কেমন দুর্ব্বল।

সাধক-সঙ্গীত।

৬

বাউলের সুর।

মন করিস্‌নে গণ্ডগোল!
একবার মিটিয়ে সন্দ, মনের দ্বন্দ্ব,
আনন্দে বল হরিবোল॥
ওরে পাঁচ হাওয়া পাঁচ ছাওয়া ঘরে
পাঁচ ভূতে তুলেছে রোল।
যদি পাঁচ-পাঁচে পঁচিসের মানুষ
দেখ্‌বি তবে দুয়ার খোল॥
ছেড়ে খুঁটিনাটি ময়লা মাটি
মনটা খাঁটি করে তোল।
দেখ্ পাঁচ পথে এক রঙ্গের মানুষ
করতেছে লীলা কেবল॥
ওরে কালা ধলা যত বল
পুরুষ মেয়ে সেই সকল।
নানা বুলি বাজায় ঢুলি
বাজে কিন্তু একই ঢোল॥
ওরে পাঁচ ঘাটে এক গঙ্গা বট
ঠারে ঠোরে বোঝ্ পাগল।
পরিব্রাজক বলে পাঁচরূপে এক
আলোকরে রঙ্গ মহল॥

৭

রাগিণী—ধানীমিশ্র।

তাল—একতালা।

যুড়াইতে চাই, কোথায় যুড়াই!
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই॥
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই, সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায় আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর,
অধীর অধীর যেমত সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধায়॥
জানিনা কেবা এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি কেবা নিয়ে যায়,
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিগে গোল, উঠে মহারোল,
কত আসে যায়, হাঁসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই॥
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
না জানি কেমনে কি খেলা হ'ল,
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,
যাই যাই ভেসে কুল যে নাই;—
যে আছ চেতন, করহে চেতন,
কতদিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন,
যে আছ চেতন ঘুচাওনা আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমঃ নাশ, হও হে প্রকাশ,
তুমি বিনা মোর নাহিক উপায়!
তব পদে তাই শরণ চাই॥

৮

রাগিণী—ঝিঁঝিট।

তাল—একতালা।

জয় মা আদ্যা, মা মহাবিদ্যা,
পরমারাধ্যা ঈশ্বরী।
তোমারি কাণ্ড, অতি প্রকাণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী॥
তঞ্চাকাশ বায়ু বহ্নি পঞ্চভূতাধিশ্বরী।
নবাভ্র বরণা, করাল বদনা, অশেষ করুণা, সাগরী॥
ত্বং হি বেদমাতা গায়ত্রী, সন্ধ্যারাত্রি আদি করি,
ত্বং হি ধাত্রী, ত্বং ধরিত্রী, সকল কর্ত্রী শঙ্করী॥
ত্বং হি ব্রহ্মা, ত্বং হি বিষ্ণু, ত্বং মহেশ ত্রিপুরারী।
ত্বং হি রাম, ত্বং হি শ্যাম কূর্ম্ম বরাহ নরহরি॥
ত্বং হি বগলা, মাতঙ্গী কমলা,
উজ্জ্বলা রূপমাধুরী।
ত্বং হি বাকবাণী, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী,
গঙ্গা ত্রিবেণী কাবেরী॥
ত্বং হি দুর্গে কালী তারা শোড়ষী ভুবনেশ্বরী।
ত্বং ভৈরবী ছিন্নমস্তা উমা ধূমা শিবসুন্দরী॥
জ্ঞানদে জ্ঞানদে, ত্রাণদে ত্রাণদে,
শুভ দেগো শুভঙ্করী।
পুত্র অপরাধে, ফেল না প্রমাদে, ক্ষমা দেগো ক্ষেমঙ্করী॥

৯

রাগিণী—মূলতান।

তাল—একতালা।

আমি তোর আসামী নইরে শমন মিছে
করিস্ কেন তাড়না।
ও তোর নইরে এস্তাজারী, (শমনরে)
কেন করিস্ জারি, তোর ধার কিছু ধারিনা॥
ব্রহ্মময়ী আমার রাজা,
আমি মায়ের খাসের প্রজা,
তোর তালুকে থাকিনা;
পেয়ে মহাবীজ, হয়েছি খারিজ,
তোর কাছারি যেতে হবেনা;—
দেখ্‌গে চিত্র-গুপ্তের কাছে, (শমনরে)
সব বাঁকীজায় আছে,
আমার নামটী তাতে পাবিনা॥
আমি দুর্গাপুর নিবাসী,
সেখানে নাই নিরিখ্ বেশী,
নাই তহসিল যাতনা;
মা দিয়েছেন পাটা, জমাতে নাই বাটা,
সহস্তে করি নিসানা;—
প্রজা নাতোয়ান হলে, (শমনরে)
জমায় কমি মিলে,
সুদের অঙ্ক কিছু লিখেনা॥
সাবেক বাঁকী যত ছিল,
বাঁকীতে মা শূন্য দিল,
এমনি মায়ের করুণা;
রামপ্রসাদ কয়, তপনতনয়,
এখানে তুমি এসনা;—
যদি এসেছ এখানে,
মা যদি তা শুনে,
অপমানে বাঁকী খোবে না॥

১০

কীর্ত্তনের—সুর।

তাল—লোফা।

হলো সাঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ ভবে রঙ্গভূমির
খেলা আমার।
জনমের শোধ, শেষ অনুরোধ,
প্রবোধ বারি ত্যজে একবার।
এসে ব্রজের বেশে, ভীমদাসে,
দেখা দাও বিশ্বমূলাধার॥
জ্ঞান পরিহরি, শ্রীঅঙ্গেতে হরি,
কত যে যাতনা দিয়েছি তোমার।
দাসের সে সব দোষ পরিহরি,
পারকর ভবপারাবার॥
ধ্বজ পদ্ম আঁকা, ভৃগুপদ রেখা,
ত্রিভঙ্গিম বাঁকা, রূপটী তোমার।
একবার দেখাও হরি, কৃপা করি,
অন্তকালে এই ভিক্ষা আমার॥
ভক্তহৃদি পতি, আপনি শ্রীপতি,
পাণ্ডবের সারথী, সেজেছ এবার।
দাসের হৃদিরথে হও সারথী,
শমনের রণে হই অগ্রসর॥

প্রতিবাদের প্রতিবাদ।*

"জনৈক উগ্রক্ষত্রিয়" প্রথম বারের প্রতিনিধিতে আমার লিখিত "উগ্রক্ষত্রিয়-সমাজ ও সম্মতি আইন" শীর্ষক প্রবন্ধের "প্রতিবাদ" উক্ত পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রতিবাদে কিন্তু লেখক মহাশয় কেবল প্রভূত অপবাদই সঞ্চয় করিয়াছেন।

লেখক মহাশয়ের প্রতিবাদের সকল কথার খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা, কেবল বিড়ম্বনা ভোগমাত্র। তবে গোটা কয়েক কথার নিতান্ত অসারত্ব প্রতিপাদন করিব।

"উগ্রক্ষত্রিয়" লেখক মহাশয় প্রতিবাদের একস্থানে আমার কথা তুলিয়া বলিতেছেন "পূর্ব্বে বালা স্ত্রী ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আপন স্বামীর সহিত, অথবা তাহার স্বামী পত্নীর ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার সহিত সহবাস না করিয়া থাকিতে পারিত এখন নূতন আইনানুসারে না হয় আর দুই বৎসর অপেক্ষা করিবে। আহা মরি লেখক মহাশয়ের কি কল্পনা শক্তি! কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান! কি অদ্ভুত সমাজ-হিতৈষিতা! এই সামান্য ২ বৎসর বয়োবৃদ্ধির পরিবর্ত্তনে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইল তাহা কি লেখক মহাশয়কে আবার নূতন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে?" বলিহারি উগ্রক্ষত্রিয় মহাশয়ের উদ্ভাবন শক্তি! বালা স্ত্রীর দুই বৎসর বয়োবৃদ্ধিতে উগ্রক্ষত্রিয় মহাশয় "ভয়ানক পরিবর্ত্তন" রূপ অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া হর্ষে উন্মত্ত হইয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়াছেন। নাবিকরাজ কলম্বস নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়া এতটা আনন্দে উৎকুল্ল এবং স্ফীত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ, অথবা পিথেগোরস জ্যামিতির ৪৭ প্রতিজ্ঞার মীমাংসা উদ্ভাবন করিয়া এতটা উন্মত্ত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ; কিম্বা নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিয়া হর্ষে এতটা অধীর হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। "জনৈক উগ্রক্ষত্রিয়" লেখক মহাশয়ের জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমভাগ পর্য্যন্ত, দুই বৎসর বয়োবৃদ্ধিতে বালা স্ত্রীর "ভয়ানক পরিবর্ত্তন" রূপ পরম তত্ত্বের আবিষ্কার অপেক্ষা করিতেছিল; ভাগ্যে "উগ্রক্ষত্রিয়" মহাশয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল তাই আজ আমরা এ নবতত্ত্ব লাভ করিয়া পরম সৌভাগ্যশালী এবং প্রকৃত জ্ঞান-সম্পন্ন হইলাম!

---

* আমরা এবারে এই "প্রতিবাদের প্রতিবাদটি" মুদ্রিত করিলাম বটে কিন্তু ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আর কোন প্রতিবাদ আমরা মুদ্রিত করিব না। প্রবন্ধ-লেখক ও প্রতিবাদকারী মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। উ, প্র, স।

তার পর লেখক মহাশয়কে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করি—তিনি কি যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া এ অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন? না সমস্ত বৈদ্যক শাস্ত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া এই সারোদ্ধার করিয়াছেন? নিশ্চয়ই লেখকের ততদূর সত্যান্বেষণ করিবার অবসর হয় নাই।

আর এক কথা জিজ্ঞাস্য, ৮।১০ বৎসর বয়সে যে বালা স্ত্রী দুর্ভাগ্যবশতঃ বিধবা হয় তাহার "ভয়ানক পরিবর্ত্তন" ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও কেন শাস্ত্রকারেরা তাহার পক্ষে চির ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের বিধি করিলেন?

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, লেখক মহাশয় শাস্ত্রের কথায় ততটা আস্থা রাখেন নাই। বোধ হয় কেবল নিজের অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র সম্বল করিয়া লেখক মহাশয় এই নিগূঢ় তত্ত্বে উপনীত হইয়া থাকিবেন। আর তাঁহার এই অভিজ্ঞতা লাভের বোধ হয় বিশেষ সুযোগও ঘটিয়া থাকিবে। উগ্রক্ষত্রিয় মহাশয়কে কি একটু ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, "ক্ষত্রিয়াণী" মহোদয়া কি আজিও "আইন আমলে" আছেন না কি? এখানে পাঠক অবশ্য মনে মনে স্থির করিতেছেন; উগ্রক্ষত্রিয় লেখক মহাশয় তাহা হইলে অবশ্যই এক জন "রসিক সুজন" হইবেনই।

তার পর লেখক মহাশয় বলিতেছেন "আইন কর্ত্তারা যখন দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৫ ধারাতে ১০ বৎসর বয়সের পর সম্মতির বিধি করিয়াছিলেন তখন অবশ্যই তাঁহারা সাত পাঁচ ভাবিয়া অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ঐ বিধি করিয়াছিলেন। অবশ্যই বলিতে হইবে, যে অন্ধের মত যাহা মনে আসিয়াছিল তাহাই একটা লিখিয়া ফেলেন নাই।" লেখক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি বর্ত্তমান সংশোধন আইনে বিধিকর্ত্তারা কি কিছুমাত্র ভাবনা চিন্তা করেন নাই, তাঁহারা সকলেই কি অন্ধ হইয়া যা তা একটা করিয়া ফেলিয়াছেন? লেখক মহাশয় কি উক্ত সংশোধন আইন সংক্রান্ত সমস্ত ইতিবৃত্তটা একেবারে ভুলিয়া-গিয়াছেন না কি? চারিদিক হইতে কত আপত্তি কত আন্দোলন হইল সে সব কি তিনি সম্পূর্ণ বিস্মরণ হইলেন? না তর্কের খাতিরে সত্য গোপন করিতে হয়? এক্ষণে আমি কি উল্টা বলিতে পারি না আহা মরি! লেখক মহাশয়ের কি কল্পনা-শক্তি! কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান! কি অদ্ভুত সমাজ-হিতৈষিতা! আর এক কথা। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে জানিতে চাহিয়াছিলাম যে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে কোন্ অঞ্চলে বা কোন্ কোন্ পরিবার মধ্যে রীতিমত শাস্ত্রানুসারে গর্ভাধান ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে কথার উত্তরে "প্রতিবাদ" লেখক কি বলিতেছেন শুনুন্—"ঘটার সহিত ক্রিয়াটী উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে নাই এরূপ কথা কোনরূপেই বলা যাইতে পারে না।" বলি এই কি আমার প্রশ্নের কোন উত্তর হইল না কি? আমি স্থান ও বংশ নির্দ্দেশে উত্তর চাহিয়াছিলাম, আর লেখক খানিকটা আবল তাবল বকিলেন, ভাল এক কথা লেখককে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি অন্যত্রে না হউক, আদালতে গিয়াও কি একবার ভাল উকীলের ওকালতী শুনেন নাই; কিরূপ প্রশ্নের কিরূপ উত্তর করিতে

হয় সে শিক্ষা কি লেখকের আজিও হয় নাই? এরূপ ব্যক্তিকে কোন বিষয়ের ওকালতি ভার দিলে ত দেখিতেছি, মক্কেলের ঘোর বিপদ!

উগ্রক্ষত্রিয় মহাশয়ের পাকা ওকালতির এবং সমাজতত্ত্বের গভীর অভিজ্ঞতার আর একটু পরিচয় দেই! তিনি "মেয়েলি" শব্দের কি অপূর্ব্ব অর্থ করিতেছেন পাঠক একবার প্রণিধান করুন, যে ক্রিয়াতে স্ত্রীলোকের কোনরূপ সংস্রব বা কোন কর্ত্তব্য পালন থাকে সেই ক্রিয়াই "মেয়েলি।" দশক্রিয়ার মধ্যে অন্যান্য কয়েকটী ক্রিয়াতেও পুরুষেরা বিশেষ সংস্রব রাখেন না—(কাহারা রাখেন এবং কোন্ কোন্ ক্রিয়াতে?) সুতরাং সেগুলিও "মেয়েলি।" লেখক মহাশয় "মেয়েলি" শব্দের এ অভিনব অর্থ কোন্ অভিধান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া কি বলিয়া দিবেন? কিন্তু যাহাই হউক, বলিহারি লেখকের তর্কশক্তি এবং বিচার পদ্ধতি! এমনটা পূর্ব্বে জানিলে, উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে এরূপ অদ্ভুত শিক্ষিত লোক আছে অবগত থাকিলে, আমি যে "আজকাল উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত হইতেছেন এবং সমাজের হিতকামনা করিতেছেন" বলিয়াছিলাম তাহা কখনই বলিতাম না; এখন দেখিতেছি সেরূপ বলা নিতান্তই ঝকমারি হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া উগ্রক্ষত্রিয় মহাশয় সে জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

বাল্যবিবাহ।

(প্রথম প্রস্তাব)

সম্প্রতি আইন উপলক্ষে হিন্দু-সমাজ-সাগরে যে আন্দোলনরূপ প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা আজিও সম্যক প্রকারে বিলীন হয় নাই। প্রবল আন্দোলনরূপ উত্তাল তরঙ্গ নিচয় বিতর্করূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় পরিণত হইয়া বিক্ষুব্ধ সমাজ-সাগরের মহান্ কলেরবে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; সমাজ সাগরের প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। সমাজ আন্দোলনের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, পরেও আবার সেইরূপ হইবে ইহা প্রকৃতির নিয়ম। নৈসর্গিক ব্যাপারে যখন এ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না, তখন সমাজ সম্বন্ধেই বা হইবে কেন? যাহা হউক এক্ষণে এই অভূতপূর্ব্ব আন্দোলনে হিন্দু-সমাজের কতদূর ইষ্ট হইয়াছে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য হইলেও ইহার দ্বারা যে সমাজের বহুল পরিমাণে অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে তাহা আমাদের স্থূল বুদ্ধির অনায়ত্ব নহে। ইহার দ্বারা তীব্রবেগ উন্নতি-স্রোত একেবারেই রুদ্ধগতি হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কারোদ্যম সুদূর ভবিষ্যৎ গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া ম্লানজ্যোতি দীপশিখার ন্যায় অল্প অল্প আলোক বিস্তার করিতেছে মাত্র। জন সাধারণের মন এরূপ বিকৃত এবং বিপর্য্যস্ত হইয়াছে যে, অন্তত দশ বৎসরেও এ ভাব নিরাকৃত হইবার নহে। এরূপ সময়ে বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধীয় কোনও প্রস্তাব যে সরল ও উদারভাবে গৃহীত হইবে এমত আশা করা যায় না। তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে আমরা অদ্য বাল্যবিবাহের দোষ-গুণ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এতবড় গুরুতর বিষয়ে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির কোন স্বাধীন মত ব্যক্ত করা উচিত নহে। শাস্ত্র, ইতিহাস, ও মনীষীগণের অবলম্বিত যুক্তিই আমাদের প্রধান অবলম্বন। আমরা যখন এই সকলেরই অনুসরণ করিয়া বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব, তখন আর আমাদের সাত পাঁচ ভাবিবার প্রয়োজন কি?

প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ আদৌ প্রচলিত ছিল না। রামায়ণ বলুন, মহাভারত বলুন, স্মৃতিসংহিতা বলুন, মহাপুরাণ বলুন সকলেই অন্ততঃ পুরুষ সম্বন্ধে যৌববিবাহের পক্ষপাতী। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন;—

"ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥
গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥"

গুরুগৃহে ৩৬ বর্ষ ত্রৈবেদিক ব্রত আচরণ করিবে, ৩৬ বৎসর না হয়, ১৮ বৎসর, তাহাও না হইলে ৯ বৎসর, অথবা যে পর্য্যন্ত ব্রত সমাপ্ত না হয় তাবৎ গুরুগৃহে অবস্থিতি করিয়া উহা সমাপন করিবে।

তদনন্তর গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্নানান্তে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিবে এবং তখন সুলক্ষণান্বিত সবর্ণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবে।

বাল্যকাল বিদ্যানুশীলনের সময়, এ অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যই পুরুষের ধর্ম্ম, ইহা ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির সময় নহে। প্রাগুক্ত মনু বচনের দ্বারা এই মত সুস্পষ্টরূপে সমর্থিত হইতেছে। স্থানান্তরে অন্যান্য মহর্ষিদিগেরও অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, বাল্যবিবাহ কখনই তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না। বস্তুতঃ আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতেছি যে বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধুনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী অনুসারে সাধারণতঃ চতুর্বিংশ বর্ষের পূর্ব্বে ছাত্রত্বের শেষ হয় না। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, এই চতুর্বিংশ বর্ষের মধ্যেই ঋষিঋণ পরিশোধের পূর্ব্বেই, বালক পিতৃঋণের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিতেছে! কেহ বা ইতি মধ্যে অর্দ্ধ ডজন অপগণ্ড সন্তানের পিতৃত্ব-শৃঙ্খলে জড়িত হইয়া চিরাভীপ্সিত বিদ্যালাভ বাসনায় ইহজন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টায় দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিতেছে। কেহ বা সংসারের কঠোর অভাব, অদম্য অপত্য স্নেহের কঠিন নিগড় অবাধে উপেক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তৎ তৎ ক্রীড়া-ভূমি সগর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়া চলিতেছে। কিন্তু স্বভাবের দুর্দ্দমনীয় গতি কাহার সাধ্য রোধ করে! অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে অভাবের নিকট পরাস্ত মানিতে হয়, অপত্য-স্নেহরূপ যূপকাষ্ঠে বিদ্যোপার্জ্জনরূপ বাসনার বলিদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। হইতে পারে

হই এক জনকে দারিদ্র্য অনুভব করিতে হয় না, হইতে পারে হই একজন ভাগ্য দেবীর সুকোমল ক্রোড়ে সুখশায়িত কিন্তু তাহাত সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বস্তুতঃ অভাবের সহিত অপত্য-স্নেহের যোগ হইলে অনেক ছাত্রকেই যে পাঠ সাঙ্গ করিতে হয় তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

দারিদ্র্য যাউক, বিবাহের প্রস্তাবেই সুকুমারমতি বালকদিগের মনে যে এক প্রকার চাঞ্চল্যের উদয় হয় তাহা কি বিদ্যানুশীলনের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকারক নহে? আমাদের দেশে বিবাহ রাত্রে যে বাসর গৃহের প্রথা প্রচলিত আছে তাহা আর নূতন করিয়া কাহকেও বুঝাইতে হইবে না। সেই বাসর গৃহের জন্য প্রস্তুত হইতে অনেক ছেলেকে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া অন্ততঃ কিছু কালের জন্য কুরুচি বিশিষ্ট ঠাট্টা তামাসা, গান প্রভৃতির আলোচনায় নিযুক্ত হইতে হয়। এই এক রাত্রিতেই সেই অগঠিত চরিত্র, অনভিজ্ঞ বালকের হৃদয়ে যে "ইয়ারকীর" বীজ নিপতিত হয়, তাহাই তিল তিল করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভবিষ্য জীবনে শাখা পল্লবান্বিত বিষ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া উঠে। তাহার পর আবার বিবাহের অব্যবহিত কাল পরেই বাল্য জামাতার শ্বশুরালয় গমন। তথায় শ্যালী শালাজদিগের অত্যাচার, বৃদ্ধা ঠাকুরাণী-দিদিদিগের হাস্যালাপ, পাড়াপ্রতিবেশিনী-দিগের নূতন জামাতা দর্শনের হুড়াহুড়ি ইত্যাদি নানা প্রকার কারণে বালক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। নূতন সংসারে, নূতন জীবনে প্রবিষ্ট হইয়া বালক চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখে সুখ এবং বিলাসিতা সর্ব্বত্র বিরাজমান। নিরস অধ্যয়ন-চিন্তা কি আর তখন তাহার মনে তিলার্দ্ধ স্থান পায়? শ্বশুর শাশুড়ীরও সেদিকে বড় একটা দৃষ্টি থাকে না। বরং তাঁহারাই বাল্য জামাতার সন্তোষ সাধনার্থ নানারূপ অবৈধ এবং অবাল্যোচিত আমোদ প্রমোদের প্রশ্রয় প্রদান করেন। তাঁহারা ভাবেন জামাতা দুই দিনের জন্য শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছে আমোদ আহ্লাদ করিয়া চলিয়া যাউক। কিন্তু বালক ত তাহা বুঝে না, সে ভাবে তাহার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পোষাক পরিচ্ছদ তাহার মন আকর্ষণ করে, দৈহিক চাকচিক্যের উপর তাহার দৃষ্টি পড়ে এবং অবশেষে বালক বিলাসিতার দাস হইয়া দাঁড়ায়।

অনেকের ধারণা বাল্যবিবাহ সুনীতি প্রবর্ত্তক এবং দুর্নীতি নিবর্ত্তক। তাঁহারা বলেন, শৈশবে যে প্রণয় বা আসক্তির অঙ্কুর হয় তাহা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইয়া আজীবন প্রণয়ী যুগলের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, পরকীয় প্রণয়েচ্ছা তথায় কস্মিন্ কালেও প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। এ প্রকার বিশ্বাস যে ভ্রমাত্মক এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বাল্যে বা যৌবনে যে আসক্তির সঞ্চার হয় তাহা রূপজ। রূপের অভাব হইলেই তাহারও তিরোধান হয়। অধুনা আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ যে আকারে প্রচলিত, তাহাতে অতি তরুণ বয়সেই বালিকারা অকাল পক্কতায় উপনীত হয়। কুড়ীতেই বুড়ী হইয়া পড়ে—The flower that blooms early fades early. তখন স্বামীর রূপ-লালসা আর গৃহে পরিতৃপ্ত হয় না, কাজেই অন্যা সঙ্গমেচ্ছা তাহার মনে উদয় হইয়া তাহাকে তৎপ্রবণ করিয়া ফেলে। অধুনা বঙ্গদেশে যে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব অবলোকিত হয় এই বাল্য বিবাহই তাহার প্রধান কারণ। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা অবশ্যই উপলব্ধ হইবে। আর এক কথা সে কালে যুবকগণ বহুকাল যাবৎ গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত, তাহাতে তাহাদের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিত না। আর এখন পিতৃগৃহে থাকিয়া আত্মীয় স্বজনের শাসনাধীন হইয়াও দুশ্চরিত্র এবং বিপথগামী হইয়া উঠিবে এই আশঙ্কায় শৈশবেই যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই তাহাদিগের হস্তে এক বালিকারূপ ক্রীড়া পুত্তুল প্রদান করা হয়। ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বিস্ময়জনক হইতে পারে।

ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও বাল্য বিবাহের প্রচলন আছে কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তথাকার লোকে বাল্য সহবাসের উপর খড়্গহস্ত। বিবাহের পর বালদম্পতীকে পৃথক রাখিবার জন্য তাহারা বিশেষ যত্ন করে। কোন অংশেই তাহাদিগকে এক গৃহে এক শয্যায় শয়ন করিতে দেয় না। এ সম্বন্ধে হিন্দি-ভাষায় একটী সুন্দর উপদেশবাক্য প্রচলিত আছে কিন্তু তাহার দুই একটী কথা মার্জ্জিত রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া এখানে সন্নিবেশিত হইল না। যাহা হউক আমাদের কিন্তু এ পোড়া অনুকরণপ্রিয় বঙ্গদেশে আবার সম্পূর্ণ বিভিন্নাবস্থা। এখানে বাল্যবিবাহ

বাল্য সহবাসের উত্তেজক, প্রশ্রয়দাতা এবং প্রধান সহায়। এ দেশে পিতা মাতা নবোঢ়া বালিকাকে পুত্রের শয়ন কক্ষে প্রেরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। বাল্য সহবাসের অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল তাঁহাদের চিন্তার অতীত অথবা জানিয়াও তাঁহারা নিশ্চিন্ত।

শরীর-তত্ত্ববিৎ সুশ্রুত বলিয়াছেন—যে পঞ্চবিংশ বর্ষে পুরুষের পুংশক্তি এবং ষোড়শ বর্ষে স্ত্রীর গর্ভধারণ শক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যথা;—

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥

সুশ্রুত।

কিন্তু এ সকল মহাত্মাদিগের মত উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা কি? কে না জানে বাল্য সহবাসে জীবনশক্তির হ্রাস হইতেছে; কে না জানে বাল্য সহবাসে দেশ উৎসন্ন হইতেছে! একবার সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ধাতু-দৌর্ব্বল্যের শত শত বিজ্ঞাপন একেবারে নয়নগোচর হইবে। ইহা কি দেশের শোচনীয় অবস্থার পরিচায়ক নহে? ইহা কি অকালোচিত ইন্দ্রিয় পরিচালনার বিষময় ফলের অভ্রান্ত সাক্ষ্য নহে? বাল্য বিবাহের মূলে কুঠারাঘাত কর, দেখিবে এই সকল বিজ্ঞাপনের প্রভাবও ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে এবং বালকদিগের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইবে।

পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তি-লাভ করা বিবাহের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। "পুত্রাৎ ত্রায়তে" পুত নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে, এই অর্থে পুত্র শব্দ নিষ্পা-

দিত। এই জন্যই ঋতুকাল স্ত্রীগমনের পক্ষে প্রশস্ত সময় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।"
মনু, ৩।৪৫

অর্থাৎ পুরুষ নিজ স্ত্রীতে সতত অনুরক্ত থাকিয়া কেবল ঋতুকালে (পুত্রলাভ বাসনায়) ভার্য্যায় উপগত হইবে।

রজস্কা কন্যাকে অনূঢ়া রাখায় নিষেধ বাক্যগুলিও এই মতের অর্থাৎ প্রজা জনন-দ্বারা বংশ পরম্পরা অচ্ছিন্ন রাখার পোষকতা করে। গর্ভাধান ব্যাপারে সে সকল শ্লোক এতই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে যে, এখানে তাহাদের পুনরুক্তি বিরক্তিকর হইবার সম্ভব এবং পুনরুল্লেখের আবশ্যকতাও পরিলক্ষিত হয় না। পুত্রোৎপাদন এবং সুপুত্রোপাদন যে দার পরিগ্রহের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা অস্বীকার করিতে কেহই সাহসী হইবেন না, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক শাস্ত্রকারেরা অপত্যোৎপাদন সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষের কিরূপ বয়স নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাঙ্গলার ব্যবস্থা গুরু রঘুনন্দন লিখিয়াছেন,—

পুমান্ বিংশতিবর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া।
স্ত্রীয়া সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধে রজস্যপি।
অপত্যং জায়তে ভদ্রং তয়োর্ন্যূনেঽধমং স্মৃতম্

অর্থাৎ সুসন্তানোৎপাদন হেতু বিংশবর্ষের যুবক ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীতে উপগত হইবে। ইহার বিপর্য্যয় হইলেই সুসন্তান প্রাপ্তির ব্যত্যয় ঘটিবে।

শরীর-তত্ত্ববিৎ প্রাচীন ঋষি সুশ্রুত বলিয়াছেন ;—

"ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।"

পঞ্চবিংশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক পুরুষের দ্বারা অপ্রাপ্ত ষোড়শবর্ষীয়ার যে গর্ভসঞ্চার হয় সে ভ্রূণ প্রায় গর্ভেই বিনষ্ট হয়। আর জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ট হইলেও অল্পায়ু হয়। আর অল্পায়ু না হইলেও চিরকাল দুর্ব্বল থাকে। অতএব বালা স্ত্রীতে গর্ভাধান কর্ত্তব্য নহে।

আবার শুনুনঃ—

পূর্ণষোড়শবর্ষা স্ত্রী পূর্ণবিংশেন সঙ্গতা।
শুদ্ধে গর্ভাশয়ে মার্গে রক্তে শুক্রেঽনিলে হৃদি॥
বীর্য্যবন্তং সুতং সূতে তয়োর্ন্যূনাব্দয়োঃ পুনঃ।
রোগ্যল্পায়ুরধন্যো বা গর্ভো ভবতি বা ন বা॥
ভাগবত।

অর্থাৎ অতীতবিংশ যুবকের উরসে পূর্ণষোড়শ বর্ষীয়া স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহা বলবান এবং দীর্ঘজীবী হয়। ইহার অপেক্ষা কম বয়স হইলে, সন্তান রুগ্ন, অল্পায়ু এবং দুশ্চরিত্র হয়। এবং গর্ভসঞ্চার নাও হইতে পারে।

এই সকল বচনের সহিত মহর্ষি মনুর পূর্ব্বোল্লিখিত ; "ষট্ ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং" ইত্যাদি বচনের বিশেষ ঐক্যতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি বরং পুরুষের পক্ষে আরও বেশী বয়সের পক্ষপাতী। চতুর্বিংশ বর্ষ তাঁহার ন্যূন সীমা।

স্বাস্থ্য চরিত্র ও বিদ্যোপার্জ্জনের পক্ষে বাল্যবিবাহ যে বিশেষ অন্তরায় তাহা শাস্ত্রীয় বাক্যের দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সদ্‌গুণ সম্পন্ন বলশালী ও দীর্ঘায়ু পুত্রলাভ যে পিতামাতার পরিণত বয়সের

উপর নির্ভর করে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পরিপক্ক বীর্য্য ও অচঞ্চল মনোবৃত্তি সুপুত্র উৎপাদনের প্রধান উপাদান। পঞ্চবিংশ বর্ষের পূর্ব্বে পুরুষের বীর্য্যের পরিপক্কতা ও মানসিক বৃত্তির স্থৈর্য্যতা জন্মে না। আর পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, চতুর্বিংশ বর্ষের পূর্ব্বে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। অতএব আমাদের মতে অন্যূন পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে পুরুষের বিবাহ করা উচিত নহে। বিবাহ করিলেই যখন স্ত্রী সহবাস অনিবার্য্য এবং স্ত্রী সহবাসের ফলই যখন পুত্র, তখন বিবাহ একটা খেয়ালের জিনিস না হইয়া জীবনের গুরুতর ব্রত বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। আর্য্য-ঋষিগণ বিবাহকে তাহাই বিবেচনা করিতেন বলিয়া উহার সম্বন্ধে বিশেষরূপ বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমরা সে সকল বিধি মান্য করিয়া চলি কই? বিবাহের সমুদয় বিধি মানিয়া যদি আমরা চলিতাম তাহা হইলে বাল্য-বিবাহের ফলে আমাদের দেশে এত চরিত্র-হীনতা, এত নৈতিক শিক্ষার অভাব ও বালখিল্য সদৃশ বীরগণের জন্ম হইত না। বাল্যবিবাহে যে কেবলি নিজের চরিত্র নষ্ট এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যাঘাত ও দারিদ্রের কঠোর তাড়নে তাড়িত হইতে হয় এমত নহে, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রেরও ইহকাল এবং পরকালের মস্তক চর্ব্বিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিষময় অনিষ্ঠকারিতা উপলব্ধি করিয়া বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। এবারে আমরা পুরুষের বিবাহ বয়স সম্বন্ধে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিলাম। বারান্তরে স্ত্রীলোকের বিবাহ বয়স সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রী হরিদাস সাঁই।

রত্ন-খনি।

২২

যাহার চক্ষু নাই দর্পণে তার কি করিবে?
যাহার প্রজ্ঞা নাই শাস্ত্রপাঠে তার কি ফল?

২৩

অহিংসাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই প্রধান জ্ঞান, সত্যই পরম পবিত্র ব্রত।

২৪

ধনে অহঙ্কার জন্মে না, অহঙ্কারের উৎপত্তি স্থল মন। সেইরূপ অধিক বয়স্ককে বৃদ্ধ বলা যায় না; যে জ্ঞানী সেই প্রকৃত বৃদ্ধ।

২৫

মৃত্যুর অবধারিত কাল নাই বলিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনেরও অবধারিত কাল নাই। সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মোপার্জ্জন করা উচিত।

২৬

সর্ব্ব প্রাণীতে দয়া, মিত্রতা, দান ও মধুর বাক্য এই চতুষ্টয়ের তুল্য সম্বল জগতে আর কিছুই নাই।

২৭

যদি প্রকৃত তেজস্বী হইতে চাও তবে ক্রোধ পরিহার কর। যে ক্রোধে উন্মত্ত হয় তার তুল্য দুর্ব্বল কাপুরুষ কোথায়?

২৮

বিদ্যার সমান চক্ষু নাই, সত্যের সমান তপস্যা নাই; বিষয়াসক্তির ন্যায় দুঃখ নাই এবং পরোপকারের ন্যায় সুখ নাই।

২৯

নির্ধনকেই ধন দান কর, ধনবানকে দান করিয়া ফল কি? রোগীরই ঔষধে প্রয়োজন, নীরোগীর ঔষধে কি আবশ্যক?

৩০

প্রিয় বাক্য সহিত দান, অহঙ্কার রহিত জ্ঞান, ক্ষমাযুক্ত শূরতা, ও দান নিয়োজিত ধন এই চারিটী লাভ করিতে পারিলে ঈশ্বরের প্রিয় হইতে পারা যায়।

৩১

নিবিড় অন্ধকার মধ্যে চক্ষু উন্মিলন অথবা মুদ্রিত করিয়া গেলে যেমন কিছুই দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ কি পণ্ডিত কি মূর্খ কেহই মায়া অন্ধকার ভেদ করিতে সমর্থ নহে।

৩২

সংসারে নানা বর্ণের গাভী আছে কিন্তু সকলের দুগ্ধই শ্বেতবর্ণ। সেইরূপ সংসারে নানা সম্প্রদায়ের উপাসক বৃন্দ আছেন, কিন্তু সকলের উপাস্য দেবতাই এক।

৩৩

গুরুদেব শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি ঈশ্বর কোন কার্য্য করিতে অক্ষম?" উপযুক্ত শিষ্য উত্তর করিল "ঈশ্বর কাহাকেও তাঁহার অধিকারের বাহির করিয়া দিতে পারেন না।"

৩৪

যিনি অতিথি ভৃত্য প্রভৃতিকে আহার করাইয়া স্বয়ং আহার করেন, তিনি অমৃত ভোজন করেন। আর যিনি উপাদেয় বস্তু একাকী ভোজন করেন, তিনি 'নরক' ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

৩৫

বিষধরের কণ্ঠ-কুহরে যাইতে ততেইাযও ভোজনের জন্য মশকদিগের অপেক্ষা করা ভেকের পক্ষে যেরূপ; কালরূপ মহাসর্প কবলিত লোকদিগের পক্ষে অস্থায়ী ভোগ সকলের অপেক্ষা করাও তদ্রূপ।

৩৬

যে বিদ্যায় অহঙ্কার দূর না হইয়া উহার বৃদ্ধির কারণ হয়, সে বিদ্যা অবিদ্যা। যে জীবনে পরোপকার স্রোত প্রবাহিত হয় না, সে জীবন মৃত নদীর সমান। যে ধর্ম্মে হিংসা বৃত্তিকে উত্তেজিত করে, সে ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্ম।

৩৭

সূর্য্য কিরণ সকল পদার্থেই পতিত হয় কিন্তু স্বচ্ছ পদার্থেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে, অস্বচ্ছ পদার্থে হয় না; সেইরূপ আত্মা সকল ঘটেই আছেন, জ্ঞানীর হৃদয়েই প্রকাশ হন; অন্যেতে হন না।

৩৮

যেমন একটী দীপ হইতে অসংখ্য অসংখ্য দীপ প্রজ্জ্বালিত হইলেও পূর্ব্ব দীপের তেজোহানী হয় না; সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইলেও তিনি পূর্ণ-ভাবেই বিরাজিত থাকেন।

৩৯

নীল বর্ণের চস্‌মা চক্ষে দিয়া থাকিলে যেরূপ সমস্ত জগৎ নীল বর্ণ দেখায়, সেইরূপ নিজের অন্তর কলুষিত থাকিলে সকলকেই অসৎ বলিয়া মনে হয়। যখন নিজের অন্তর নির্ম্মল হইবে, তখনই সাধু চিনিতে পারিবে।

৪০

নিন্দুক,চোরের অপেক্ষাও অধম। চোর একজনের ধন অপহরণ করিয়া তাহাকে নির্ধন করে বটে কিন্তু স্বয়ং লাভবান হয়। আর নিন্দুক পরের যশঃরূপ ধন অপহরণ করিয়া তাহাকে নির্ধন করে অথচ সে নিজে কিছু লাভ করিতে পারে না।

৪১

প্রস্তর অনেক আয়াসে পর্ব্বতোপরি উত্থাপিত হয় কিন্তু নিম্নে পতিত হইতে ক্ষণ বিলম্বও লাগেনা, সেইরূপ অনেক যত্নে চরিত্র উন্নত হয় এবং সামান্যেতেই নীচত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৪২

নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার মূলে সামান্য জল সেচন করিলে, সে আমরণ কাল অমৃত-কল্প জল প্রদান করে; সেইরূপ সাধু ব্যক্তি অতি সামান্য মাত্র উপকার প্রাপ্ত হইলেই অন্তকাল পর্য্যন্ত প্রত্যুপকার করিয়া থাকে।

৪৩

রক্তাক্ত হস্ত যেমন রক্ত দ্বারা ধৌত করিতে পারা যায় না, পরন্তু হস্তকে যেমন আরও অতিরঞ্জিত করা হয়; সেইরূপ অসদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা পাইলে পুণ্য ত উপার্জ্জিত হয়ই না, উপরন্তু পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়।

৪৪

কমলিনী সুগন্ধময়ী বলিয়া তাহার কর্দ্দমে জন্ম ও মুক্তা উজ্জ্বল বলিয়া তাহার শুক্তিতে উৎপত্তি, একথা মনে করিয়া কেহ যেমন তাহাদের অনাদর করে না, সেইরূপ নীচ কুলোৎপন্ন কদাকার ব্যক্তিও যদি শিক্ষিত হয়, তবে সেও নীচ কুলোৎপত্তির জন্য সমাজে অনাদৃত হয় না।

৪৫

ভগ্ন-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহী যেমন নূতন গৃহে আশ্রয় গ্রহণকালে, অথবা জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান সময়ে, লোকে যেমন কোনই শোক প্রকাশ করে না, সেইরূপ আত্মাও জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। তবে কাহার মৃত্যুতে শোকের কারণ কি ?

৪৬

মৃগ যেমন পিপাসার্ত্ত হইয়া চঞ্চল চরণ দ্বারা জলভ্রমে মৃগতৃষ্ণিকার প্রতি ধাবমান হওতঃ প্রাপ্ত হইতে প্রান্তান্তরে গমন পূর্ব্বক ক্লিষ্ট হইয়া অকালে প্রাণ হারায় ; জীবগণও সেইরূপ সুখার্থী হইয়া চিন্তাশীল মন দ্বারা প্রকৃত সুখ ভ্রমে বিষয় ভোগে লোলুপ হওতঃ ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তরে আসক্তি পূর্ব্বক অধিকতর তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৪৭

তুমি যখন স্বধাম-চ্যুত হইয়া জন্মগ্রহণচ্ছলে এই মায়ান্ধকারাবৃত অপরিচিত সংসারে আসিয়া বিপদ গ্রস্ত হইয়া কাঁদিয়াছিলে, তখন তোমার প্রতিবেশীগণ তোমার প্রতি সহানুভূতির পরিবর্ত্তে তোমার বিপদ দেখিয়া হাস্য করিয়াছিল। তুমি ঐ কথাটী মনে রাখিয়া এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে থাক, যাহাতে তুমি গমনকালে হাসিতে হাসিতে যাইতে পার ; আর তোমার বিপদ সময়ে যাহারা হাসিয়াছিল কেবলি তাহারা নহে, তোমার জন্য যেন সমগ্র জগৎ কাঁদিয়া আকুল হয়।

৪৮

গৃহে চোর প্রবেশ করিয়া তোমার সম্পত্তি হরণ করিলে বড়ই কাতর হও এবং তাহা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাক, অপিচ হৃতাবশিষ্ট ধন রক্ষার জন্য সতর্ক হও। কিন্তু তোমার হৃদয় মন্দিরে পাপরূপ চোর দিবা নিশি প্রবেশ করিয়া তোমার হৃদয়স্থিত অমূল্য নিধি-সদ্বৃত্তি সকল অপহরণ করতঃ তোমাকে প্রকৃত পক্ষে নির্ধন করিতেছে এবং শমন দস্যুর ন্যায় জীবন ধন অপহরণে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে, সে সকল ধন রক্ষার কি উপায় করিতেছ ?

৪৯

সৎকার্য্য করিয়া ব্যক্ত করিওনা। কারণ সৎকার্য্যের নামই ঈশ্বরের ঋণ-পরিশোধ করা। তুমি কাহার নিকট লক্ষ-মুদ্রা কর্জ্জ লইয়া তাহাকে সামান্য পাঁচটী টাকা দিবার সময় কতই লজ্জিত হও এবং পাছে সাক্ষী করিয়া দিলে উত্তমর্ণ ঐ সামান্য টাকা লইতে অস্বীকৃত হন এই ভয়ে অতি সঙ্গোপনে কাতরতার সহিত টাকা কয়টী তাহার হস্তে প্রদান কর। সেইরূপ তুমি ঈশ্বরের নিকট গুণরাশী পাইয়া গুরুতর ঋণী হইয়াছ। তখন সামান্য সৎকার্য্যের দ্বারা তাঁহার ঋণ শোধ করিতে গিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করিবে না কেন? প্রকাশ করিলে যদি তিনি বিরক্ত হইয়া না গ্রহণ করেন ?

সতরঞ্চ-বিজ্ঞান।

সতরঞ্চ শিক্ষার্থীদিগের প্রতি কয়েকটী সাধারণ উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। মধ্যকার বটীকাদ্বয়কে প্রথম দুই পদ করিয়া চালা কর্ত্তব্য। তদনন্তর দুইটী গজের মধ্যে যেটী হউক একটী গ৪ বা চ৪ পদে বসান উচিত* তার পর ঘোটক ছকের মধ্যভাগ লক্ষ্য করিয়া চালিবে। মন্ত্রীকে শীঘ্র স্বস্থানচ্যুত করিলে বিশেষ কোন ফল দর্শেনা। বল সকলকে এরূপ ভাবে সাজাইতে হইবে, যাহাতে পরস্পর জোর থাকে, আপন রাজাকে পাহারা দিতে পারে ও বিপক্ষের বল বিশেষতঃ রাজাকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে। সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত যেন আপন রাজাকে হঠাৎ অজানিতভাবে কিস্তি না পড়ে। বাজীর প্রথমাবস্থায় রাজাকে অকারণ চালিবার দরকার নাই। নৌকার সহিত উল্‌টাইয়া রাজার বামদিকে কেল্লা (কোট), প্রস্তুত করা ভাল। তাহা হইলে অন্যান্য বল খেলিবার অবসর পায় অথচ রাজা সম্মুখস্থ বটীকাত্রয় (ক২ খ২ গ৩)* দ্বারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। যখন অনেক বল বিশেষতঃ মন্ত্রী ও গজ দুইটা বদল হইয়া যায়, তখন রাজাকে কেল্লা হইতে বাহির করিয়া অবশিষ্ট বলের সাহায্য করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম হইতেই রাজাকে কোটবন্দী করিবার প্রয়োজন নাই। সুবিধানুসারে ডান কিম্বা বামদিকে কোট বান্ধা উচিত (বামদিকেই ভাল)। বিপক্ষে যেদিকে বান্ধিয়াছে তাহার বিপরীত দিক পছন্দ করাই ভাল তাহা হইলে নিজের বল ও বড়ে দ্বারা বিপক্ষের দুর্গ ভাঙ্গিবার সুবিধা হয়।

বিনা আবশ্যকে কিস্তি দিবার দরকার নাই ; যদি বাজীর প্রথমাবস্থায় কিস্তি দিয়া রাজার আড়াই পদ বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে একবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ওট্‌শা কিস্তি যাহাতে দিতে পারা যায় সে চেষ্টায় সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকা উচিত। মন্ত্রী, নৌকা ও গজে ওট্‌শা কিস্তি পড়ে বলিয়া ইহারা প্রথম শ্রেণীর বল মধ্যে পরিগণিত।

গজের কিম্বা নৌকার কিস্তি চাপিয়া লইতে হইলে, যে বলের কিস্তী সেই বল দিয়া চাপিয়া লওয়াই ভাল। কারণ তাহা হইলে চাপিত বলটা অধিকক্ষণ বন্ধ থাকে না। মন্ত্রীর কিস্তি চাপিয়া লইতে হইলে যদি ঘোড়া দিয়া সুবিধা না হয় বা অন্য কোন বল দিয়া চাপিলে যদি বিপক্ষের মন্ত্রী ধরা না পড়ে তবে মন্ত্রী দিয়া চাপাই কর্ত্তব্য।

* সাদার দিক হইলে।

যদি কোন একটা উত্তম চাল নজরে পড়ে অথচ তার ফল বিলম্বে পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেটী মনোমধ্যে রাখিয়া ভিতরে ভিতরে আরও উত্তম চালের চেষ্টায় থাকা কর্ত্তব্য।

একবারে দুই তিনটা বল ধরিবার চেষ্টা করা উচিত; ইহাতে প্রায় একটা লাভ হইয়া থাকে। মন্ত্রীকে ও রাজাকে এককালীন আক্রমণ অতি উৎকৃষ্ট চাল।

নূতন প্রতিজ্ঞা।

"প্রতিনিধির" প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যায় তিনটী "রচা" চালের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সাধারণের নিকট পূরণ প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এপর্য্যন্ত "প্রতিজ্ঞা পূরণ" বলিয়া কোনই উত্তর পাইলাম না। তাহাতেই ভয় হইতেছে বুঝি এরূপ প্রতিজ্ঞা পাঠকের রুচি-বিরুদ্ধ হইয়া থাকিবে তাই পূরণে চেষ্টা করেন নাই অথবা তাচ্ছিল্য করিয়া প্রকাশের জন্য সংবাদ দেন নাই। সেই ভয়ে এবারে পূর্ব্বকার মত "চারি চেলে মাৎ" "তিন চালে মাৎ" ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট চাল প্রকাশ করিলাম না; এবার এক নূতন ধরণের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলাম। ভরসা করি পাঠক—যদি সতরঞ্চ খেলোয়ার হন—প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করিবেন। এবারের প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম এই যে, ৬৪ ঘরে বিকীর্ণ বর্ণ ও পদ বা পদাংশ হইতে ঘোড়ার চালে (আড়াই পদে) একটী "কবিতা" প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই কবিতার কোন একটী অর্থ থাকা চাই। নতুবা যাঁহার ৬৪ ঘর ঘোড়া ফেরান জানা আছে, তিনি সেই সেই ঘরে অক্ষর বসাইয়া একটা অর্থ-শূন্য ছন্দ করিয়া দিলে আমাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ বলিয়া স্বীকার করিব না।

অবশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে কোন ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে, প্রতিনিধির ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিজ্ঞা ২টি পূরণ করিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিবেন, আমরা তাঁহাকে সাদরে এক বৎসরের জন্য নিজ ব্যয়ে "উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধির" বিনামূল্যে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিব। অবশ্য সর্ব্বাগ্রে যাহার নিকট হইতে সংবাদ পাইব তিনিই পুরস্কারের যোগ্য পাত্র হইবেন।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা।

ছন্দবিন্যাশ পূর্ব্বক ঘোটকের ৬৪ ঘর ভ্রমণ।

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	
৮	বি	ভু	অধিকার	পি	হ	খা	ভু	হ্ব	৮
৭	ন	রূপ	দি	তু	কর	দাস	তো	রস	৭
৬	ত	মি	ব	ন	রীতি	মো	ম	ব	৬
৫	ত	স্পর্শ	প্র	না	ন	প্রে	য়ী	মা	৫
৪	ক	না	রম	প্রেমিক	ণ	র	ন	মম	৪
৩	ম্য	ব	না	র	র	হায়	ত্রে	হ	৩
২	রূপে	সি	পবিত্র	ম	পা	র	দুষ্ট	জা	২
১	যে	ত্র	নানা	হিক	অ	নেসে	বি	ক	১
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	

শ্রীকুমুদবিহারী সাম্মন্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিগত ১১ই ও ১৩ই শ্রাবণ তারিখের নিশা কি ভয়ঙ্করী! ঐ দুই রজনীতে বঙ্গাকাশের অসংখ্য অসংখ্য নক্ষত্র রাজির মধ্যে চন্দ্র সূর্য্যবৎ দুইটী অত্যুজ্জ্বল গ্রহ আকাশ চ্যুত হইয়া চতুর্দ্দিক শোকরূপ তিমিরাবরণে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করতঃ কাল-সাগরের অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। রবি শশী একবার অস্ত যায় আবার উদয় হয়, এ রবি শশী দ্বয় জনমের মত অস্ত গিয়াছে আর উঠিবে না। বাঙ্গালির গৌরব প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের শিরোভূষণ, বিদ্যার অগাধ সমুদ্র, সর্ব্বদেশীয় বিদ্বান মণ্ডলীর আদরের ধন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র আর দয়ার পূর্ণাবতার আধুনিক বঙ্গভাষার জন্মদাতা, বিধবার অদ্বিতীয় সহায়, কাঙ্গালের হৃদয়বন্ধু, ভারতবাসীর আরাধ্য দেবতা, পরম ন্যায়বান, গুণের সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই যে বঙ্গাকাশের অস্তমিত রবি শশী তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গ ইঙ্গিত মাত্রেই বুঝিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ন্যায় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় হৃদয়বান লোক যে দেশে জন্মগ্রহণ করে সে দেশ পরপদানত হইলেও গৌরবের লীলা-ভূমি। আজ এই মহাপুরুষদ্বয়ের মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গ অন্ধকার, সর্ব্বস্থলেই হাহাকার ধ্বনি! যেখানে যেখানে এই মহাত্মা যুগলের মৃত্যুবার্ত্তা পঁহুছিতেছে তৎ তৎ স্থলেই হাহাকারের ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই এই দুই পুরুষ-রত্নের প্রতি শোক-সম্মান প্রদর্শিত হইতেছে। কি মাঠে কি ঘাটে, কি অন্তঃপুরে কি রাজদরবারে, কি বিদ্যালয়ে কি আপিস আদালতে সর্ব্বত্রই এই মহাত্মাদ্বয়ের অদ্ভুত কীর্ত্তি কাহিনী সহস্র সহস্র মুখে বিঘোষিত হইতেছে। শত শত রাজার মৃত্যুতে শত শত রাজপুরুষের বিয়োগে বোধ হয় এত শোকের উচ্ছ্বাস বহে না। ধন্য বিদ্যাসাগর! ধন্য রাজেন্দ্রলাল! কে বলে তোমরা মরিয়াছ? তোমরা কিরূপ সম্মানের পাত্র তাহাই স্বয়ং পরীক্ষা করিবার জন্য বিনশ্বর ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অমরাত্মা লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিয়া রহস্য সন্দর্শন করিতেছ। তোমাদের কীর্ত্তি অতুল! তোমরা মরিবে কেন! এই যে মহাজনের বাক্য রহিয়াছে;—

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

হে শিক্ষাভিমানী যুবক সকল! সৌন্দর্য্যাভিমানী বিলাসিগণ, ঐশ্বর্য্যাভিমানী নৃপতিবর্গ, পদগৌরবাভিমানী রাজপুরুষবৃন্দ! তোমরাও দেখিয়া শিক্ষাকর কিরূপ গুণে ভূষিত হইলে জগতের পূজ্য ও ভক্তির পাত্র হওয়া যায়। বাস্তবিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় অসাধারণ গুণসম্পন্ন লোক জগতে অতি বিরল। উভয়ের জীবন লীলা অতীব বিস্ময়কর। উভয়েই প্রায় সমকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার উভয়েই একই সময়ে মর্ত্ত্যলীলা শেষ করিয়া ত্রিধামে গমন করিলেন। ইহ জীবনে পরস্পর পরস্পরের গুণ অধিকার করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতেন। ইহাতে বোধ হয় উভয়েই যেন জন্ম জন্মান্তরেও প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এইরূপ মানবীয় লীলা করিয়া আসিতেছেন।

মরি মরি! দুইটী দিব্য জীবনে গুণের কি অপূর্ব্ব সমাবেশ! নিদাঘ কালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, রাজা রাজেন্দ্রলালের অসাধারণ গুণে জগৎ চমকিত! আর শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের জগৎ বিমুগ্ধ কারিণী বিমল চন্দ্রিকার ন্যায় বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্রের রমণীয় গুণরাশিতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। রাজা-বাহাদুর বহুভাষাজ্ঞ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিয়া খ্যাত; বিদ্যাসাগর মহাশয় আধুনিক বঙ্গভাষার জন্মদাতা ও বিধবা-বিবাহ-বিধির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা বিদ্বান্ মণ্ডলীর আদরের সামগ্রী; বিদ্যাসাগর সর্ব্বসাধারণের আরাধ্য দেবতা। রাজা শিক্ষিতের শিক্ষক; বিদ্যাসাগর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই গুরু। পাণ্ডিত্য ও তেজস্বীতায় রাজা হিমাদ্রির অত্যুচ্চ শিখরে আসীন, সহৃদয়তা ও বদান্যতায় বিদ্যাসাগর দেবতার আসনে অধিরূঢ়। উচিত বাক্য কথনে রাজার হৃদয় বজ্রেরন্যায় দৃঢ় ও অচঞ্চল; দয়া-গুণে বিদ্যাসাগরের অন্তর শিরীষ কুসুমাপেক্ষাও সুকোমল ও পরদুঃখে সদা বিগলিত। রাজা মর্ত্তের রাজচক্রবর্ত্তী; বিদ্যাসাগর স্বর্গের দেবতা। আমরা এই দুই অমরাত্মার পরোলোক-গত আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করি। এই দুই মহাত্মার জীবন চরিত যথা সময়ে কয়েকখানি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে প্রসঙ্গক্রমে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা এক্ষণে ইহাঁদের জীবনী প্রকাশ করিতে বিরত থাকিলাম।

মণিপুর ব্যাপার সংক্রান্ত অভিনয়ের ৪র্থ অঙ্ক শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন ৫ম অঙ্কের অভিনয় বাঁকী, তাহা দেখিবার জন্য আর লোকের ঔৎসুক্য নাই। মণিপুর ঘটনার প্রথম অঙ্ক—শূরচন্দ্রের রাজ্যচ্যুতি, তৎসংবাদে ইংরাজরাজের মণিপুর গমন, দরবার, সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা ও কুইণ্টনাদি হত্যা। দ্বিতীয় অঙ্ক—মণিপুরে ইংরাজ রাজের সমরাভিযান, মণিপুর দখল, টিকেন্দ্রজিৎ প্রমুখ পলায়িত রাজ-যে টুকু গ্রেপ্তার। তৃতীয় অঙ্ক—কুলচন্দ্র, গুণাগুণ বিচার, টেঙ্গাল জেনারেল ও অপরাতালিকাভুক্ত করে অপরাধীদিগের সামরিক সম্পাদক যেমন নাপ্রাণদণ্ডাজ্ঞা, বড়লাটের সমালোচন করিয়া প্রাণ ভিক্ষার জন্য আপীল গ্রন্থকার বা প্রেরণের সংক্রান্ত ঘটনা লইয়া পুস্তক তালিকাভুক্ত বাক্‌বিতণ্ডা। আমরা এই তিন অঙ্কের বিবরণ যথা সময়ে পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছি। এবারে চতুর্থ অঙ্কের সমাচার। সমাচার বড়ই শোকাবহ। বড়লাট বাহাদুর টিকেন্দ্রজিতের প্রাণ ভিক্ষা দেন নাই। বিলাতের কর্ত্তারাও লাটবাহাদুরের মতই সমর্থন করিয়াছেন। বিগত ২২শে শ্রাবণ অপরাহ্নে টিকেন্দ্রজিত ও টাঙ্গেল জেনারেলের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে! কুলচন্দ্র ও অঙ্গসেনার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে। সকলেই আশা করিয়াছিল বড়লাট টিকেন্দ্রজিতের প্রাণভিক্ষা দিবেন। বড়লাটের এ বিচারে কয়েকজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সহযোগী ব্যতীত সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছেন। শুনিয়াছি ফাঁসির সময় বীর টিকেন্দ্রজিত ধীর ও প্রশান্ত ভাবে

ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কোনরূপ চিত্ত বৈকল্য দৃষ্ট হয় নাই। বৃদ্ধ টাঙ্গেল ভয় ও বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত দাঁড়াইতে না পারায়, তাহাকে একখানি টুলে বসাইয়া ফাঁসি দেওয়া হয়। উভয়ের সম্মুখে উভয়ের বধকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ ফাঁসি কাষ্ঠের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ছিল। মণিপুরী প্রজাবর্গ নীরবে এই ভীষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া বধ্যভূমি হইতে চলিয়া যায়। পঞ্চম অঙ্কের বিষয় মণিপুর বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হইবে কি না? শুনিলাম মণিপুর রাজবংশের জনৈক বালককে মণিপুর রাজসিংহাসনে বসাইয়া ইংরেজ রেসিডেণ্ট্ কর্ত্তৃক মণিপুর শাসিত হইবে। মণিপুর সম্বন্ধে বিধাতার যাহা মনে ছিল তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল, যাহা মনে আছে তাহা হইবে। সর্ব্বজ্ঞ বিধাতার কার্য্যের ও প্রবল প্রতাপ বৃটিশ রাজের নীতির মর্ম্ম ক্ষুদ্রশক্তি আমরা কি বুঝিব! আমাদের নীরব থাকাই ভাল!

সহযোগী বঙ্গবাসী অদৃষ্টবশে আজ ঘোর বিপদে পতিত। সম্মতি আইন লইয়া যে সময় দেশ মধ্যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময়ে আমাদের বিজ্ঞ সহযোগী আন্দোলনকারীদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন অথবা ইহা বলিলেই ঠিক বলা হয় যে, বঙ্গবাসীই সেই সমুদয় আন্দোলনের মূল এবং প্রধান নেতা। সেই সময়কার বঙ্গবাসীতে নাকি গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তেজক কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বাদী হইয়া সরকারী উকিল দ্বারা বঙ্গবাসীর নামে কলিকাতা পুলিশকোর্টে অভিযোগ আনিয়াছেন। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট এই মোকর্দ্দমা সেশন সোপর্দ্দ করিয়াছেন। মহামান্য হাইকোর্টের জনৈক জজ ও ৯ জন জুরী কর্ত্তৃক সহযোগীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র রায়ের বিচার হইবে। ইহাঁরা এক্ষণে সকলেই জামিনে খালাস আছেন। ইহাঁদের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট যে অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহা যদি বিচারে সপ্রমাণ হয়, তবে ইঁহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। অভিযোগ বিচারাধীন বলিয়া আমরা এক্ষণে কোন মতামতই প্রকাশ করিলাম না। কারণ ইহা আইন বিরুদ্ধ। আমরা ইহার বিচার ফল জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম। বঙ্গবাসীর বিচারে একটী গুরুতর সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। সংবাদপত্র সমূহ গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যে কিরূপ ভাবে সমালোচনা করিতে অধিকারী তাহা বোধ হয় সহযোগীর বিচারেই নির্দ্ধারিত হইবে। সুতরাং সহযোগী একা নহে, সমুদয় সংবাদপত্রই এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করেন। মহামান্য হাইকোর্ট হইতে যে, সহযোগীর সূক্ষ্ম বিচার হইবে ইহা আমরা নিঃসন্দেহে আশা করিতে পারি। সহযোগীর বিপদে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সহযো... রয়া-ন্যায়বান গবর্ণমেণ্টের ন্যায় বিচা... নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করি...ই সময়ে করিতে সক্ষম হউন। ... ধামে গমন বশে সহযোগীকে রাজ্য... পরস্পর পরস্পরের গুণ হয়, তাহা হইলেও ... প্রতিদ্বন্দ্বীতা করি-শ্লাঘার বিষয়। যেহে... হিত করিতে গিয়া বিপ... উভয়েই. যেন গীতার ক্ষেত্রে অব-

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

প্রথম খণ্ড।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী।

উপক্রমণিকা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অধিকন্তু, তিনি একাকীই কি এত অধিক কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিতে পারেন? কখনই না, সুতরাং তাঁহাকে পরসাপেক্ষ হইতেই হইবে। তজ্জন্যই তাঁহাকে Text Book Committeeর তালিকা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি পুস্তক লইতে হয়। Text Book Committeeর মেম্বরগণ কেহ বেতনভুক্ নহেন। তাঁহাদিগের স্ব স্ব কার্য্যনির্ব্বাহার্থই তাঁহাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। এই পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে যে টুকু অবসর পান, তাহাতেই পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করিয়া তাহাকে কমিটীর তালিকাভুক্ত করেন। অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদক যেমন নাম দেখিয়া পুস্তকের সমালোচন করিয়া থাকেন, ইহাঁরাও তদ্রূপ গ্রন্থকার বা প্রেসের নাম দেখিয়া সেই পুস্তক তালিকাভুক্ত করেন কি জানি না; তবে উপরোধ অনুরোধ যে অনেকটা রাখেন, তাহা নিঃসন্দেহ। এইরূপেই অনেক পুস্তক Text Book Committeeর দ্বারা পাস হইয়া যায়। তৎপরে, যাঁহারা ডিরেক্টরের সহকারীরূপে বিরাজ করেন, তাঁহাদের সকলেই রক্ষক ও ভক্ষক। পূর্ব্বে যে ইন্স্পেক্টরদিগের দোষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ইন্স্পেক্টরদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ইহাতে পূর্ণ সহায়তা করেন। তাঁহারই সাহায্যে তাঁহার অভিপ্রেত পুস্তকগুলি ডিরেক্টরের তালিকায় স্থান পায়। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি বলিব, কলিকাতার কোন প্রেসে পুস্তক ছাপাইলে, সেই পুস্তক শীঘ্রই Text Book Committeeর দ্বারা পাস হইয়া পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ত গেল এদিকের কথা, শেষে আবার সর্ব্ববিধ ইন্স্পেক্টরগণই স্বস্ব অধিকারভুক্ত বিদ্যালয় সমূহে আপনাপন অভীষ্ট পুস্তকের

গুণ বর্ণনা করিয়া সেই খানিই পড়াইবার জন্য শিক্ষকদিগকে অনুরোধ করেন; সুতরাং তাঁহার রাজ্যে তাঁহার পুস্তকই চলে। অহো স্বার্থান্ধতা! ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন অজ্ঞ লোকেরা যে স্বার্থের জন্য লোকের মস্তকে লগুড়াঘাত করে, তাহাদের স্বার্থপরতা কি ইহাঁদের স্বার্থপরতার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে? তাহাদের স্বার্থের পরিণাম অপেক্ষা কি ইহাঁদের স্বার্থের পরিণাম গুরুতর নহে? তাহারা এককালে একজন বা এক পরিবারের বৈ সর্ব্বনাশ করিতে পারে না। ইহাঁরা এককালে সহস্র সহস্র লোকের বা পরিবারের সহস্র সহস্র প্রকারে সর্ব্বনাশ করেন। তজ্জন্য আমরা ডিরেক্টর মহোদয়ের নিকট সবিনয়ে অনুরোধ করি, এবার হইতে তিনি কোন প্রকাশ্য স্থানে Lottery করিয়া পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচিত করুন। Text Book Committeeর যে কয়জন মেম্বর আছেন, তাঁহাদিগকে অপসারিত করিয়া, তাঁহাদের স্থানে কয়েকজন বেতনভোগী লোক নিযুক্ত করতঃ যাহাতে দোষগুণের সুবিচার হয়, তাহার বন্দ ও বস্ত করিয়া, তাঁহাদের দ্বারাই দোষ-গুণ-গুলি লিপিবদ্ধ করাইয়া লউন। পরে লিপিবদ্ধ দোষগুণের বিচারপূর্ব্বক কমিটী যে যে পুস্তক যে যে ক্লাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবেন, সেই সেই পুস্তকগুলি লইয়া লটারি করিলে, যাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাহারই নাম উঠিবে; অথচ Text Book Committeeর তালিকাভুক্ত কোন পুস্তকের নাম উঠাতে, বালকদিগেরও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে না। আমাদের বিবেচনায়, এরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিলে প্রতি বৎসরই এক একজন নূতন গ্রন্থকার প্রতিপালিত হইতে পারেন। চিরকালই আর এক জনের পেট ভরান হইবে না। এতাদৃশ উপায়ে আয়পথ সঙ্কীর্ণ হইলে দুই একজন পাষণ্ড গ্রন্থকারের পাপস্রোতও কতকটা কমিয়া যাইতে পারে; তাহাতেও সাধারণের পুণ্যসঞ্চয়ের সম্ভাবনা। ডিরেক্টর মহোদয় আমাদের এ অনুরোধে কর্ণপাত করিবেন কি?

আমরা দেখিতেছি বিধাতা বড় নির্ব্বোধ; একবার তিনি কোন রাজপুত্র ও রাজকন্যার ভাগ্যে 'অশ্বগবাদি বিক্রয় ও বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে' লিখিয়া বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার চৈতন্য হইল না। তিনি সেকেলে লোক—সাদা সিদে; কূটবুদ্ধির ত ধার ধারেন না; তাই তাঁহাকে সময়ে সময়ে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। আজ কাল এটর্ণি বেরিষ্টারের যেমন ছড়াছড়ি, কূটবুদ্ধিরও তেমনি ছড়াছড়ি। আমাদের ভাগ্যবান্ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যেমন অনেক সময় ইহাঁদের সাহায্যে আইনের রহস্যভেদ করিতে পারেন, প্রাচীন পিতামহের রাজ্যে জনকতক এইরূপ ব্যবহারাজীব থাকিলেও তিনি অনেক সময় অনেক সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। "ঘোটকে চড়িয়া এই স্থান দিয়া যাইলে দশ টাকা জরিমানা।" যদি কেহ ঘোটকীতে চড়িয়া যায়, সেও এই নিয়মের অন্তর্ভূত হইবে কি না, পাছে ইহা লইয়া কখন বিসম্বাদ ঘটে, এই ভাবিয়া কূটবুদ্ধিমান্ আইনকর্ত্তাগণ অমনি নোট করিলেন—"এস্থলে ঘোটক অর্থে ঘোটকীও ধরিতে হইবে।" আমাদের বৃদ্ধ পিতামহের কি এত বিষয়বুদ্ধি বা দূরদর্শিতা আছে! থাকিলে আর রাজপুত্র ও

রাজকন্যার বেলায় অত নাকাল হইতেন না। পাঠকবর্গ বোধ হয় রাজপুত্র ও রাজকন্যার কাহে বিধাতার নাকালের কথা শুনেন নাই; আমার কাছে শুনুন। ভরতরাজার বর্ষ মধ্যে এক অতুলবিভূতিভাক্ নরপতি ছিলেন। হস্ত্যশ্ব-রথপত্তি-প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ সেনা, যানাসনবাহন, সুহৃদমাত্য-কোষ, মণিমাণিক্য-রত্ন প্রভৃতি কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। ভারতবর্ষের জলবায়ুর এমনই গুণ, যে রাজা হইলেই যেন তাহাকে অপুত্রক হইতেই হইবে। তাই এ রাজাও অপুত্রক। পুত্রমুখদর্শনে বিমুখ হইয়া সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ থাকেন। একদা এক তপোবলসম্পন্ন সিদ্ধবাক্ যোগী রাজসদনে উপনীত হইয়া "স্বস্তি" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে নরপতি সাশ্রুনয়নে কহিলেন, যোগিবর! আমার আর মঙ্গল কি? আমি অপুত্রক। যে কয়দিন ধরাধামে থাকি, কেবল বিড়ম্বনাভোগ; পরকালেও অনন্ত নরক। রাজার নির্ব্বেদবাক্যে যোগীর অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি কালত্রয়দর্শী। তপোবলে দেখিলেন, মহারাজের একপুত্র ও এককন্যা হইবে। কিন্তু পুত্র হইতে রাজ্যনাশ ও বংশলোপ ঘটিবে; আর কন্যাটি কুলকলঙ্কিনী হইবে। আপাতত সামান্য অরিষ্টবশত তাহাদের জন্ম হইতেছে না। দিব্যচক্ষে এই সমস্ত ব্যবহিত বিষয়ও প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিয়া ঋষিবর রাজসমক্ষে নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনার একপুত্র ও এককন্যা জন্মিবে। পুত্র হইতে রাজ্যনাশ ও বংশলোপ ঘটিবে; এবং কন্যাটি কুলকলঙ্কিনী হইবে। এখন পঞ্চম স্থানে শনির পূর্ণদৃষ্টি থাকায় তাহাদের জন্মের বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। বৃহস্পতির দশায় শনির দৃষ্টি-হ্রাস হইলেই তাহাদের জন্ম অনিবার্য্য। ঋষিবাক্য শ্রবণে রাজার অন্তরে যুগপৎ হর্ষবিষাদের আবির্ভাব হইল; কিন্তু নিয়তিসূত্র সর্ব্বথৈব মানবশক্তির অখণ্ডনীয় বিবেচনায় কথঞ্চিৎ স্বস্থচিত্ত হইলেন। প্রস্থানকালে তপোধন ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনাকে একটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিতে হইবে। রাজ্ঞীর প্রসবকালে আমাকে সূতিকাগৃহের দ্বাররক্ষা করিতে দিবেন। আমি যেখানেই থাকি, তৎকালে আসিয়া উপস্থিত হইব। ভূভৃৎ তদীয় বাক্যে সম্মতিপ্রকাশ করিলে, তপস্বী যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। কালক্রমে রাজ্ঞীর গর্ভসঞ্চার হইল। প্রকৃতিপুঞ্জ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এ শুভ-সংবাদ-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল। রাজাও পুত্রমুখদর্শনে পৈতৃক ঋণ ও পুন্নামক নরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, এই পারত্রিক মঙ্গলে পুলকিত হইলেন। একাদিক্রমে নবম মাস অতীত হইলে, দশম মাসে রাজ্ঞীর প্রসববেদনা উপস্থিত হওয়ায়, তিনি এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ইত্যবসরে পূর্ব্বোক্ত যোগী আসিয়া রাজাজ্ঞামতে সূতিকা-গৃহের দ্বার আবদ্ধ করিয়া যেন কেহ প্রবেশ করিতে না পারে, এই ভাবে শয়ান থাকিলেন। এই সময়ে বিধাতাও বালকের ললাটে শুভাশুভ লিপি করিতে আসিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বারত্যাগ করিবার অভিপ্রায় জানাইলে, যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আগন্তুক উত্তর করিলেন, আমি বিধাতা।

যোগী—কিজন্য গৃহাভ্যন্তরে যাইবেন?

বিধাতা—বালকের অদৃষ্টে সমস্ত জীবনের শুভাশুভ লিপি করিতে।

বিধাতার এতদ্রূপ বাক্য-শ্রবণে মহানুভব তাপস দ্বারত্যাগ করিলেন, এবং পিতামহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, তিনি পূর্ব্ববৎ দ্বার বন্ধ করিয়া শুইলেন। পরমেষ্ঠী স্বীয় মন্তব্য লিপি করিয়া প্রত্যাগমনকালে পুনর্ব্বার দ্বারত্যাগ করিতে বলিলেন। সাধু কোনমতেই দ্বার ছাড়িবেন না, বলিলেন, কি লিখিয়াছেন অগ্রে বলুন, তবে দ্বারত্যাগ করিব।

বি। আমার লিপি কাহাকেও বলি না।

যো। তবে দ্বারও ছাড়িব না।

বি। সে কথা শুনিয়া তোমার কি লাভ হইবে?

যো। যাহাই হউক, না বলিলে আমি কখনই আপনাকে যাইতে দিব না।

সুরজ্যেষ্ঠ বিষম বিপদে পড়িয়া অগত্যা বলিলেন "ইহা হইতে পৈতৃক রাজ্যাদি নষ্ট হইবে; এ এক একটী অশ্ববিক্রয় করত জীবিকানির্ব্বাহ করিবে" ইহাই লিখিয়াছি। যোগিবর দ্বারত্যাগ করিলে পিতামহ অন্তর্হিত হইলেন। তপোধনও "কন্যা জন্মিবার কালে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইব" এই কথা মহারাজের নিকট জ্ঞাপনকরতঃ পুনরায় দেশভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

আবার গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় কালও ছুটিতে লাগিল। প্রথম বৎসর যেদিকে গেল, দ্বিতীয়ও তৎপশ্চাৎ ছুটিল, তৃতীয় চতুর্থও সেইদিকে চলিল, পঞ্চমও তদভিমুখী হইল। রাজ্ঞী পুনর্ব্বার অন্তর্বত্নী হইলেন, এবং যথাকালে এক কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যোগী মুহূর্ত্তজ্ঞ। যে মুহূর্ত্তে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সমস্তই দিব্যচক্ষে দেখিতে পান। সুতরাং, রাজ্ঞীর কন্যা-প্রসব-ব্যাপার অবগত হইয়া আবার আসিয়া সূতিকাগৃহের দ্বার চাপিয়া শুইলেন। পূর্ব্ববৎ বিধাতা আসিলে, যাইবার সময় পথ দিয়া প্রত্যাগমন-কালে বলিলেন, কি লিখিয়াছেন অগ্রে বলুন, তবে দ্বার-পরিত্যাগ করিব। বিধাতাও স্বলিপি-প্রকাশ করিবেন না, যোগীও যাইবার পথ দিবেন না। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর বিধাতা বলিলেন "এ কন্যা দুকুল খাইয়া শেষে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবনধারণ করিবে" ইহাই লিখিয়াছি। এই বলিয়া মুক্তদ্বারে অন্তর্হিত হইলে যোগীও প্রস্থান করিলেন।

কালপ্রবাহ অনন্ত ও অসীম। কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোথা যাইতেছে কে বলিবে! কালের এই ধারাবাহিক গমন বড়ই বিস্ময়াবহ। রত্নাকর অভাবের সময় সহস্র সহস্র নদী হইতে সাহায্য গ্রহণ করে বটে, কিন্তু নিজে পূর্ণ হইলে আবার তাহাদিগকে স্ব স্ব অংশ ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু কালস্রোত যে অনন্ত অসীম অগাধ সমুদ্রে পড়িতেছে, কত যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইল, কত মন্বন্তর কাটিয়া গেল, তথাপি কি ইহার পূর্ণতা সম্পাদিত হইল না! হইলে ত গতকাল আবার প্রত্যাগত হইত। এই রূপ অপ্রত্যাবৃত্তভাবে দেখিতে২ বৎসরানুক্রমে সার্দ্ধৈক যুগ অতিবাহিত হইল। কালের ভীষণ সংঘর্ষণে মুহূর্ত্তৈক মধ্যে যে কত খণ্ড-প্রলয় ঘটিয়া থাকে, তাহা কে বলিতে পারে। কালের এই করাল নিষ্পেষণ দেখিয়া মহাত্মা কবীর সাশ্রুনয়নে বলিলেন—"চলতী চক্কী দেখ্ কর্ দিয়া কবীরা রো। দো পাটন কে বীচ আন সাফত গিয়া কো।" ইহার অর্থ এই,—

চালিত পেষণী (জাঁতা) যন্ত্রে শস্য পড়িয়া নিপিষ্ট হইতেছে, কেহই নিষ্কৃতি পাইতেছে না, দেখিয়া মহাত্মা কবীর রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার রোদনের তাৎপর্য্য এই, পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থও এইরূপ কালের পেষণীতে নিপিষ্ট হইতেছে, কেহইত নিষ্কৃতি পাইতেছে না। আজ কএক বৎসর ধরিয়াই আমাদের পূর্ব্বোক্ত রাজবাটীতে কালের "চক্কী" ঘুরিতেছে। তাহাতে রাজারাণী, সুহৃদমাত্য, কোষদুর্গ, রাষ্ট্রবল, কিছুই নিষ্পেষিত হইতে বাকী রহিল না। ধন, ঐশ্বর্য্য, বিষয়, বৈভব, সম্পত্তি, মণি, মাণিক্য, রত্ন সকলই গেল। অশ্বশালায় যে কতিপয় অশ্ব ছিল, তাহারই এক একটীর বিক্রয়লভ্য অর্থে রাজপুত্রের কথঞ্চিৎ জীবিকানির্ব্বাহ হইতে লাগিল। রাজকন্যারও শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলে কেহই রক্ষক না থাকায়, সে কুক্ষিপোষণার্থ বারযোষিদ্-বৃত্তি অবলম্বন করিল।

প্রায় বিংশতি বৎসর পরে রাজপুত্র ও রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে যোগীবর সেই রাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেখেন, রাজবাটীর চিহ্নও নাই। লোক পরম্পরায় অবগত হইয়া রাজপুত্র-সমীপে উপনীত হইলেন, এবং আপনাকে তাহার পিতার সুহৃৎ বলিয়া পরিচয় দিয়া নানাবিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

যো। তোমার পিতারত বিষয় সম্পত্তি সব গিয়াছে, এখন কি উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছ।

রা। সে দুঃখের কথা কন কেন! এক একটী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা অতি কষ্টে কালযাপন করি। আর অল্পই ঘোড়া আছে, ফুরাইলে কি হবে জানি না। যত কমিতেছে, আমিও তত খরচ কমাইতেছি।

যো। আমার কথা শুন। তুমি রাজপুত্র; এত কষ্ট কি তোমার সহ্য হয়; তুমি প্রতিদিনই এক একটী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া পাঁচ সাতশ টাকা যা পাও, একদিনেই তাহা খরচ করিয়া কেল।

রা। ঘোড়া গুলি ফুরাইয়া গেলে কি করিব। তখন যে অনাহারে মরিতে হইবে।

যো। তাও কি হয়! যিনি তোমায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তোমার আহারও দিবেন। তুমি রাজপুত্র, তোমার ভাগ্যে তিনি এত কষ্ট কখনই লেখেন নাই।

যোগিবাক্যশ্রবণে রাজপুত্র ভাবিলেন, তাওত বটে; আমি রাজপুত্র, আমার ভাগ্যে কি তিনি এতকষ্ট লিখিয়াছেন। অদ্য হইতে আমি প্রতিদিনই এক একটী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া পাঁচ সাতশত টাকা যাহা পাইব, সমস্তই একদিনে খরচ করিব; দেখি ভবিষ্যতে অনাহারে মরি কি না। এই বলিয়া সে প্রতিদিনই এক একটী অশ্ব বিক্রয় করত তদ্দ্বারা মহাসমারোহে দিনপাত করিতে লাগিল। অশ্বশালায় শতাধিক ঘোটক ছিল না, মাসত্রয়মধ্যেই সেগুলি নিঃশেষ হইল। কল্য কি উপায়ে দিনপাত হইবে, তাহার সংস্থান নাই, রাজপুত্র ভাবিয়া আকুল হইলেন; এদিকে বিধাতাও ভাবিলেন, ইহার ভাগ্যেত অশ্ববিক্রয় করিয়া দিনপাত করিবে লিখিয়াছি, অশ্বশালায় ত আর অশ্ব নাই, কল্য কি বেচিবে? আমার লিপিত ব্যর্থ হইবে না। যাই অশ্বশালায় একটী অশ্ব রাখিয়া আসি, এই বলিয়া তথায় এক অশ্ব রাখিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজপুত্র অশ্বশালায় প্রবেশ করিয়া দেখেন, একটী অশ্ব রহিয়াছে; সে আহ্লাদে উহাকে বিক্রয় করত যা পাইল, সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিল। বিধাতা সে দিন আবার একটী অশ্ব দিয়া গেলেন। পর-দিন রাজপুত্র সেটিকে বিক্রয় করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিল। এইরূপে প্রতি-দিনই বিধাতা অশ্ব যোগান, আর রাজপুত্র তাহা বিক্রয় করিয়া দিনপাত করেন। অশ্ব যোগাইতে যোগইতে বিধাতার প্রাণ ওষ্ঠাগত। কি করিবেন, নিজের অবিমৃষ্যকারিতার ফল-ভোগ কাহাকেও বলিবার যো নাই। যোগি-রাজ দেখিলেন, বিধাতা ত রাজপুত্রের নিকট খুবই নাকাল হইতেছেন; এখন রাজকন্যার কাছেও উহাঁর কিছু নাকাল আবশ্যক। বিরি-ঞ্চিকে শিক্ষাদিবার এই উপযুক্ত অবসর। নিজের হাতের কলমে যা ইচ্ছা লিখেন, কখনত দায়ে ঠেকিতে হয় না। এবার তাঁহাকে যথোচিত শিক্ষা দিব। এই বলিয়া রাজকন্যাসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার পিতার সহৃদয় মিত্র ছিলাম। তাঁহার রাজ্যনাশ ও তোমাদের এবম্বিধ বিপৎপাতে আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইতেছে। যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করি, কি উপায়ে দিনপাত করিতেছ। রাজ-কন্যা স্বীয় জঘন্য বৃত্তির পরিচয় দিয়া অতি-কষ্টে দিন যাপনের কথা বলিলেন।

যো। আমার কথা শুন, তুমি রাজকন্যা; এত কষ্ট তোমার সহিবে কেন? বিশেষত তুমি কিছু কুরূপাও নও। তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিবে, লক্ষমুদ্রা ব্যতীত কাহাকেও গৃহে স্থান দিবে না।

ক। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিলে লোকে আসিবে কেন? দুই এক টাকাতেই প্রতিদিন লোক জুটে না।

যো। অবশ্য আসিবে! প্রতিজ্ঞা চাই; লক্ষহীরা-প্রভৃতিও ত ছিল; তাহাদের কাছে লোকে লক্ষ হীরা দিতে পারিত; আর তোমাকে লক্ষ মুদ্রা দিবে না! ভাল এক দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াই দেখ না। আর এক কথা, যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ মুদ্রা পাও, পরদিন সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিবে, এক কপর্দ্দকও সংস্থান রাখিবে না। আবার সন্ধ্যাকালে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিবে। দুই এক দিন এরূপ করিয়া দেখ। অবশ্যই প্রত্যহ লক্ষ মুদ্রা পাইবে।

যোগীর বাক্যে রাজকন্যা সে দিন প্রতিজ্ঞা করিয়া রহিল। অনেক ছোট খাট বাবু আসিল, কিন্তু দর শুনিয়া সকলেই প্রস্থান করিল। ক্রমে রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল, বিধাতার উৎকণ্ঠা ততই বাড়িতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, ইহার ভাগ্যে ত বারাঙ্গনাবৃত্তি লিখিয়াছি। আজ লক্ষমুদ্রাদায়ী লোক না আসিলে ত আমার লিপি ব্যর্থ হয়। যাই কোথাও একজন এইরূপ লোকের অনুসন্ধান করি। এই বলিয়া যত রাজারুজির ছেলের খোসামোদ করত একজনকে পাঠাইলেন। সে লক্ষ মুদ্রা দিয়া এক রাত্রি রাজকন্যাগৃহে যাপন করিল। রাজকন্যা রাত্রিতে লক্ষ মুদ্রা পাইয়া, পরদিন সমস্ত ব্যয় করত সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। হিরণ্যগর্ভ আবার অনুসন্ধান করিয়া এক লক্ষমুদ্রাবান্ ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। পরদিন রাজকন্যা তদ্দত্ত সমস্তই নিঃশেষ করিল। সে প্রতি-দিনই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে; পদ্ম-

যোনি প্রতিদিনই 'নাকের জলে চোকের জলে' হইয়া লোক জুটাইয়া দেন। আপনি যা করিয়াছেন, তাহারও আর চারা নাই। পাঠকবর্গ! কমলযোনির দুর্গতি দেখুন! রাজপুত্রের ঘোড়া ও রাজকন্যার পুরুষ জুটাইতে জুটাইতে তাঁহার 'নাকে দম' হইল। এত কষ্ট ভোগ করিয়াও তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না। তবুও তিনি বুঝিয়া সুঝিয়া লিখিতে শিখিলেন না; তবও জনকতক লোকের ভাগ্যে লিখিলেন— 'তোমাদের বই স্কুলে চলিবে'। তিনি ভাবিয়াছিলেন ইহাদের পুস্তক ভাল হউক, মন্দ হউক পাঁচ সাতটা স্কুলে (তৎকালে পাঁচ সাতটা বৈ স্কুল ছিল না) চলিলে কাহারও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমরাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধির দূরদর্শিতা আদৌ নাই। তিনিত তখন এরূপ ভাবেন নাই, যে, যদি কালক্রমে দুই চারি হাজার স্কুল হয়, আর তথায়ও এই পুস্তকগুলি চলে, তাহা হইলে আমার সৃষ্ট অন্যান্য গ্রন্থকারগণ একবারেই বিফলমনোরথ হইবে। আর ইহারা দেশের সর্ব্বনাশ করতঃ বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিবে। তাঁহার এই অদূরদর্শিতার জন্যই আজ বঙ্গে দুই চারি জন ভিন্ন সকল গ্রন্থকারই নিরুদ্যম ও ভগ্নসাহস। যদি তিনি লিখি-বার সময় 'বর্ত্তমান' এই কথাটি অধিক লিখিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে নিজের লেখার জন্য অনুতাপ করিতে হইত না। তাই বলি এত ঠেকিয়াও তিনি শিখিলেন না। এখন কেবল সান্ত্বনার জন্য বিড়ম্বিত গ্রন্থকারগণকে বলিতেছেন—'পৃথি-বীর কিছুই চিরস্থায়ী নয়, যদুবংশ ধ্বংস হইবে; শশী সূর্য্য গ্রহ কিছুই থাকিবে না; এ সংসারে চিরকালই কি অক্ষয় থাকিবে। স্বয়ং ঈশ্বরও এ নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারি-বেন না। সকল মনুষ্যই, তারা কুমারই হউক, আর যুবাই হউক, নবীনই হউক, আর প্রবীণই হউক, একদিন যাইবেই যাইবে। তোমরা কয়েক দিন অপেক্ষা কর; উহা-দের ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছি, তাহা ঘটিতে দাও। উহাদের পর তোমাদেরই জয়জয়-কার হইবে'। বিড়ম্বিত গ্রন্থকারগণ! আপ-নারা সৃষ্টিকর্ত্তার বাক্যে আস্থাবান্ হইয়া কিছুদিন অপেক্ষা করুন। বৃদ্ধ পিতামহ এক কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বার বার তিরস্কার করিলে আর কি হবে। সহৃদয় পাঠকবর্গ! আপনাদিগকেও ইনস্পে-ক্টর কেচ্ছা বলিবার পূর্ব্বে একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া অনেকক্ষণ ডিটেন করিয়াছি; তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। মুখে যা বলা যায় কার্য্যে তার অনেক ইতরবিশেষ ঘটিয়া থাকে। পাঠকবর্গ আপনারা যদি আমাকে—'ওজুদের বিচে দেখ জবান হালাল। এনছানে একরার রাখেন বাহাল' (অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে জিহ্বাই পবিত্র; কেননা উহার দ্বারা ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া লোকে কৃতার্থ হয়। সেই জিহ্বা পাছে অপবিত্র হয়, এই ভয়ে যিনি মনুষ্য, তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেন তাহা নিশ্চিতই পূর্ণ করিয়া থাকেন।) এই শ্লোক দ্বারা দোষী করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে আমিও 'Quick promisers are often slow performers' অর্থাৎ শীঘ্র অঙ্গী-কারকারীরা প্রায়ই বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি করে' এই বলিয়া আমার নিজের দোষটুকু কাটাইয়া দিব। যাহা হউক, দোষ কাটাই-লাম বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব না। আগামী-বারে মূল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্মা।

বর্ণাশ্রম-বিবেক। (৩)

[ব্রাহ্মণ-বিচার]

(জনৈক পূজ্যপাদ পরমহংসের বিবৃতি)

বৃহস্পতি আরও বলিতেছেন—কেবল নাম মাত্রে বা তপস্যাদি দ্বারাও কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না ; যথা শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে আছে—

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষ বুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ৯ ॥
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ,
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥১০॥

অর্থাৎ—ধন, সদ্বংশে জন্ম, সুন্দর রূপ, পঞ্চাগ্ন্যাদি তপস্যা, বেদাভ্যাস, ব্রহ্মচর্য্য, কান্তি, প্রতিপত্তি, ধন জন বাহুবল, নিরালস্য, শাস্ত্রার্থ-কুশলতা, অষ্টাঙ্গ যোগ (১) এই দ্বাদশ গুণ পরমব্রহ্মের উপাসনার পরম উপযোগী বলিয়া মনে করি না। কিন্তু এক প্রেমভক্তি দ্বারা হস্তি মূর্খও উদ্ধার পান ॥ ৯ ॥ আর পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশগুণ ভূষিত বিপ্রও যদি পরব্রহ্মের চরণারবিন্দে ভক্তি বিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে, যে চণ্ডাল মন বাক্য কর্ম্ম, ধন ও প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া সকুলের সহিত নিজ আত্মাকে উদ্ধার করে, সে চণ্ডালকে আমি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি। কিন্তু ধনবিদ্যাদি দ্বারা গর্ব্বিত যে ব্রাহ্মণ, সে কুলকে পবিত্র করা দূরে থাকুক, নিজ আত্মাকেও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না।

ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির প্রামাণিক বচনাদি শ্রবণ করিয়া মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণ জাতি স্থাপন মানসে পুনঃ বলিতেছেন—

ক্ষত্রিয়াদিভিন্নত্বে সতি ব্যাহৃতিপূর্ব্বক-
সার্থগায়ত্র্যাচরিতত্বং ব্রাহ্মণত্বম্।

বৃহস্পতি ব্রাহ্মণের এই বচন শুনিয়া বলিলেন ;—আপনার অভিপ্রায় আমি ব্যক্ত করিতেছি, প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন—

ব্যাহৃতি—যথা, ভূর্ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যং (সপ্তলোক)।

গায়ত্রী—ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

ওঁ শব্দে উক্ত সপ্তব্যাহৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন কর্ত্তা ও সংহার কর্ত্তা বুঝায়।

তৎ—উক্ত সপ্ত ব্যাহৃতির।

সবিতুঃ দেবস্য—প্রসবিতা পরম দেবতার।

বরেণ্যং—সর্ব্বারাধনীয়ং, সুন্তজনীয়ং, পূজনীয়ং, চিন্তনীয়ং ইত্যাদি।

ভর্গঃ—জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি।

অর্থাৎ যে জ্ঞানদ্বারা মানবের মনোবাক্যের অগোচর সূক্ষ্ম হইতে ও সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল এই বিশাল জগতের আলোচনা হইয়াছে এবং যে ক্রিয়া-শক্তিদ্বারা এই অপূর্ব্ব পরমাশ্চর্য্য সৃষ্টি রচিত হইয়াছে।

ধীমহি—ধ্যান করি।

ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ—অর্থাৎ সংসারকূপে নিমজ্জিত পাপরজ্জুতে বদ্ধ যে মনোবৃত্তি সকল, সে সমুদয়কে যিনি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের দিকে প্রেরণ করিতেছেন, অর্থাৎ যিনি আমাদিগকে সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া নিজ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের সহিত অভেদ করিতে বাসনা করিতেছেন।

এই ত গায়ত্রীর অর্থ আর ব্রহ্মধাম প্রাপ্তি হইতেছে গায়ত্রী উপাসনার পরম ও চরম ফল। আর এই ফল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অধিক কি দস্যু, ব্যাধ পর্য্যন্ত সকলেই ভগবৎ প্রসাদে, লাভ করিয়া থাকেন।

প্রমাণ যথা—(মহাভারতে)—

জঙ্গীষব্যো যথা বিপ্রো যথা চৈবাসিতাদয়ঃ।
ক্ষত্রিয়াজনকাদ্যাস্তু তুলাধারাদয়ো বিশঃ ॥
সম্প্রাপ্তাঃ পরমাং সিদ্ধিং পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগতঃ।
ধর্ম্মাব্যাধাদয়ঃ সপ্ত শূদ্রাঃ পৈলবকাদয়ঃ ॥
মৈত্রেয়ী সুলভাশার্ঙ্গী শাণ্ডিলী চ তপস্বিনী।
এতে চান্যে চ বহবো নীচযোনি গতা অপি।
জ্ঞাননিষ্ঠাং পরাং প্রাপ্তা পূর্ব্বাভ্যস্তস্য যোগতঃ ॥

অর্থ—জঙ্গীষব্য ও অসিতাদি ব্রাহ্মণ, জনকাদি ক্ষত্রিয়, তুলাধারাদি বৈশ্য, ইহাঁরা সকলেই সমানরূপে পূর্ব্ব যোগাভ্যাস দ্বারা পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ; এই প্রকার ধর্ম্মব্যাধ ও পৈলবাদি শূদ্র এবং মৈত্রেয়ী শার্ঙ্গী, শাণ্ডিলী প্রভৃতি স্ত্রী লোক সকল, ইহাঁরা নীচ যোনি প্রাপ্ত হইলেও শিক্ষাদ্বারা শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান-লাভ করিয়া ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের ন্যায় পরমসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, আচ্ছা আপনিত আমার সমস্ত কথাই খণ্ডন করিতেছেন ; আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনার মতে ব্রাহ্মণ আছে, না নাই ?

বৃহস্পতি তদুত্তরে বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর ! ব্রাহ্মণ আছে বৈকি, সেই জন্যই ত আপনার সহিত এত বাকবিতণ্ডা করিতেছি। ব্রাহ্মণের বিচার বজ্রসূচি উপনিষদে স্পষ্টভাবে রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ—আমি ত বজ্রসূচি কখন দেখি নাই, এমন কি উহার নাম পর্য্যন্ত ও কখন শুনি নাই। উহাতে কি আছে কৃপা করিয়া আপনি আমাকে বলুন।

বৃহস্পতি—তবে শুনুন।

উহাতে এইরূপ আছে—

কো ব্রাহ্মণঃ—কে ব্রাহ্মণ ?

কিং জীবঃ ? ইত্যাদি।

জীব ব্রাহ্মণ, কি দেহ ব্রাহ্মণ, কি ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ, কি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ, কি পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ, কি জাতি ব্রাহ্মণ, কি বর্ণ ব্রাহ্মণ, এইরূপ সপ্তপ্রকার বিকল্পের পর ব্রাহ্মণ নিশ্চিত হইয়াছে—

প্রথম, জীব ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। যেহেতু বেদে, আছে যে, সকল শরীরে এক

(১) যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি।

আত্মাই বিরাজ করিতেছেন; সুতরাং চণ্ডাল হইতে দেবতা পর্য্যন্ত সকলেতেই এক আত্মা বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব জীবরূপ আত্মাকে ধরিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বিভাগ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়, শরীর ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। কারণ, সকল শরীরেতেই জন্ম মৃত্যু, জরা ব্যাধি, শোক মোহাদি সমানরূপেই আছে। শরীর যদি ব্রাহ্মণ হইত তাহা হইলে দাহকারী পুত্রদিগকে ব্রহ্মবধের ভাগী হইতে হইত।

তৃতীয়, ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ হইতে পারে না; কারণ গোদান, অশ্বদান, গজদান, ভূমিদান রত্নদান প্রভৃতি ষোড়শদানের দাতা শূদ্র বৈশ্যাদি অনেক আছেন এবং ধর্ম্ম বর্জ্জিত ব্রাহ্মণে অব্যাপ্তি দোষ পড়ে।

চতুর্থ—কর্ম্ম ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। কারণ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম শূদ্রাদি ও করিয়া থাকে এবং অকর্ত্তা ব্রাহ্মণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

পঞ্চম, পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। কারণ বৈশ্য, শূদ্র, যবন, ম্লেচ্ছের মধ্যে অনেক পদপদার্থবিদ্ পণ্ডিত বিদ্যমান্ আছেন এবং পাণ্ডিত্য বিরহিত ব্রাহ্মণে অব্যাপ্তি দোষ বর্ত্তে।

ষষ্ঠ, জাতিও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। কারণ বিনা জাতিতেও ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা শৃঙ্গীঋষি (হরিণী গর্ভোৎপন্ন), অগস্ত্য ঋষি (কুম্ভ হইতে উৎপন্ন), বশিষ্ঠ ঋষি (বেশ্যাগর্ভজাত), সত্যকাম জাবালি (বারাঙ্গনাসম্ভূত) নারদমুনি (দাসীপুত্র), মহামুনি ব্যাস (ধীবর কন্যাজাত), বিশ্বামিত্র ঋষি (গাধিরাজার পুত্র), ঋষভদেব ঋষি (নাভিরাজার পুত্র), এইরূপ শত শত তপোধন ঋষি শুদ্ধজ্ঞান ভক্তি প্রেম বৈরাগ্য দ্বারাই সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। ইহাদের জাতি কোথায়? অথচ এই সকল ঋষিগণের নামরূপ গোত্র অবলম্বন করিয়া এখনকার ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে কতই গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন? সে কথা যাউক। কিন্তু প্রমাণ হইল যে জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না।

সপ্তম, বর্ণ দ্বারাও ব্রাহ্মণ হয় না। কারণ শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্ত বর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণ বর্ণ। কিন্তু এখন এই বর্ণানুসারে ব্রাহ্মণাদি নিশ্চয় করিবার উপায় নাই; কারণ এমন ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা শূদ্রাপেক্ষাও কৃষ্ণকায়।

আরও দেখুন—

জন্মনাজায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোভবেৎ।
বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ।

অর্থাৎ জন্মমাত্রে সকল জাতিই শূদ্র হয়, যেহেতু শিশু দর্শনে জাতি নির্ণয় করা যায় না আর জন্মমাত্রে সকল শিশুই নির্ব্বোধ ও পরাধীন থাকে। সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন রূপ সংস্কার দ্বারা ঐ শূদ্রের নাম দ্বিজ হয় (১)। আর যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন করে তাহার নাম হয় বিপ্র (২)। আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়

১। আর এই দ্বিজ শব্দের বাচ্য কেবল মনুষ্য নহে; কাক, গৃধ্র, বক, কচ্ছপ প্রভৃতি অণ্ডজ জীবের নামও দ্বিজ।

২। আর এই বিপ্র শব্দ বাচ্য ব্যক্তি বড় গৌরবাস্পদ নহে। যেহেতু পূর্ব্বে প্রহ্লাদের কথায় প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম বিমুখ অথচ দ্বাদশগুণযুত বিপ্র অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ।

অর্থাৎ নিত্য (১) নৈমিত্তিক (২) প্রায়শ্চিত্ত (৩) উপাসনা (৪) ক্রিয়াদ্বারা অন্তঃকরণকে নিতান্ত নির্ম্মল করিয়া এবং বৈরাগ্য (৫) বিবেক (৬) ষট্ সম্পত্তি (৭) ও মুমুক্ষুত্বরূপ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া গুরুর নিকটে একান্তচিত্তে ব্রহ্ম শ্রবণ (৮) পূর্ব্বক তাঁহার মনন(৯)ও নিদিধ্যাসন পূর্ব্বক(১০)যিনি বিশ্বকর্ত্তা পরমপিতাকে হৃদয়াকাশে আনন্দময়, শান্তিময়, মঙ্গলময়, নিত্যসুখস্বরূপ ভূমা পরমেশ্বরকে হস্তামলকের ন্যায় সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই সর্ব্ববর্ণের পূজ্য এবং তিনিই জগতের হিতকারী। বেদাদি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের যে এত গৌরব কীর্ত্তিত হইয়াছে সে এইরূপ ব্রাহ্মণের। ঠাকুর! এখন বুঝিলেন ব্রাহ্মণ কিরূপ বস্তু এবং ব্রাহ্মণ কে?

---

(১) নিত্যকর্ম্ম—ঈশ্বরোপাসনা।

(২) নৈমিত্তিক কর্ম্ম—পুত্রেষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া।

(৩) প্রায়শ্চিত্ত—পাপক্ষয় জনক ঈশ্বর স্তবাদি।

(৪) উপাসনা—চিত্তের একাগ্রতা করণ; শাণ্ডিল্য বিদ্যাদি। ইহাকেই সগুণ ব্রহ্মোপাসনা কহে; যথা সূর্য্যাভ্যন্তরে ব্রহ্মধ্যান, চন্দ্রাভ্যন্তরে ব্রহ্মধ্যান, নাসিকাগ্রে ব্রহ্মধ্যান, ত্রিপুটীস্থানে ব্রহ্মধ্যান, ইত্যাদি।

(৫) বৈরাগ্য—সাংসারিক ভোগে দোষদৃষ্টি তৎপরে সেই ভোগ ত্যাগের ইচ্ছা, তদনন্তর তাহাতে অনাসক্তি। ইহাই বৈরাগ্যের কারণ, স্বরূপ ও ফল।

(৬) বিবেক—শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ইহাই বিবেকের কারণ।
সারাৎসার বিচার বিবেকের স্বরূপ।
শরীর ইন্দ্রিয়াদিতে অনভিমান; অর্থাৎ আমি অমুকের পুত্র, আমার অমুক নাম, আমি অমুক জাতি, আমি দ্রষ্টা, আমি শ্রোতা, ইত্যাদি রূপ অভিমান ত্যাগ বিবেকের ফল।

(৭) ষট্ সম্পত্তি—সম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা।

সম—বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ।

দম—অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ।

উপরতি—উদাসীনতা অথবা বিধিবৎ কর্ম্মের ত্যাগ, যাহাকে সন্ন্যাস কহে।

তিতিক্ষা—শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখ মানাপমান, প্রভৃতি সকল প্রকার দ্বন্দ্বের মধ্যে সমভাব।

সমাধান—চিত্তের একাগ্রতা।

শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদান্তবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

(৮) শ্রবণ—একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদান্ত বাক্য সকলের তাৎপর্য্যাব ধারণে অনুকূল মানস ব্যাপার।

(৯) মনন—বেদান্তাবধারিত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ে মতান্তর দ্বারা যে সংশয়োৎপত্তি তন্নিরাকরণাকুল তর্কাত্মক জ্ঞানজনক মানসিক ক্রিয়া।

(১০) নিদিধ্যাসন—বিষয়াসক্ত মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ পক্ষে স্থৈর্য্যানুকূল মানসিক ব্যাপার।

কে বড় ?

প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বদিক্ বালার্কের রক্তিম ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া যেন সুন্দরী ষোড়শীর বিম্বাধর প্রান্তে তাম্বুলরাগের অনুকরণ করিতেছে। তাপসকুল প্রাতঃস্নানে নিযুক্ত হইয়াছে। মুনি কুমারগণ মৃদুকণ্ঠে সুমধুর সামগীতি গান করিতে করিতে ইতস্ততঃ পুষ্পচয়ন করিতেছে। পুষ্পচয়ন সমাপ্ত হইল; মুনি কুমারগণও সকলে আসিয়া একস্থানে মিলিত হইল। একে চঞ্চলমতি বালক, তাহাতে আবার সকলেই অনন্যমনে স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত ছিল; আর কতক্ষণ থাকিতে পারে, সকলে একত্রিত হইবা মাত্র তাহার মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই বল দেখি, এই যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইহাঁদের মধ্যে বড় কে?" এ প্রশ্ন শুনিয়া অন্য একজন বলিল "একথার উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয়; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইঁহারা তিনজনেই এক, তিনজনেই সমান; ইহা অপেক্ষা এ প্রশ্নের আর অন্য উত্তর নাই।" এই খানেই বোধ হয় সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইত, কিন্তু মুনি সন্তানগণের মধ্যে একালের মত জনৈক অকালপক্ক তর্কবাগীশ ছিল, সে ছাড়িল না, বলিল "তা কখন হ'তে পারে না; তা যদি হ'তো, তবে তিনটে পৃথক নামের প্রয়োজন কি? যাঁর নাম সকলের আগে আছে তিনিই বড়; ব্রহ্মাই সকলের বড়।" চতুর্থ বলিল "তাই বা কেমন ক'রে হ'বে ভাই; পুরাণের অনেক স্থানে দেখ্‌তে পাওবা যায়, কোথাও ব্রহ্মা বিষ্ণুর ধ্যানে নিযুক্ত আছেন, কোথাও বিষ্ণু ব্রহ্মার স্তব কর্‌ছেন; কোথাও মহেশ্বর বিষ্ণুর নামগুণগাণে বিহ্বল হ'য়ে উঠেছেন, কোথাও বিষ্ণু মহেশ্বরকে পরমগুরু ব'লে স্বীকার ক'রেছেন। তবে, কে ছোট, কে বড়, একথার মীমাংসা কেমন ক'রে হ'তে পারে?" কথায় কথায় গোলযোগ বাড়িয়া উঠিল, কোন মীমাংসাই হইল না।

সেই সময়ে মহাত্মা ভৃগু প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া কুটীরে প্রত্যাগত হইতেছিলেন; পথে মুনিকুমারগণের কলহ শ্রবণ করিয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৃগুকে দেখিয়া জনৈক বালক নম্রভাবে বলিল "আর্য্য, আপনি যদি এখানে উপস্থিত হ'য়েছেন;তবে আমাদের একটী কথার মীমাংসা ক'রে দিয়ে যান্।" ভৃগু বলিলেন "কি কথা বাপু?" বালক বলিল "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন জনের মধ্যে বড় কে, এইটীর আপনাকে মীমাংসা করে দিতে হ'বে।" প্রশ্ন শুনিয়া ভৃগুত নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন; কি যে বলিবেন, তাহা ক্ষণকালের জন্য স্থির করিতে পারিলেন না; পরে বলিলেন "দেখ বাপু, একথার মীমাংসা বড়ই কঠিন। তোমরা মনে মনে যাঁহাকে বড় বলে জ্ঞান কর, তিনিই বড়।" কথাটী বালকগণের মনের মত হইলনা, তাহারা বলিল "না মহাশয়, আপনাকে এ কথার স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে দিতে হ'বে, তা না হ'লে কিছুতেই ছাড়্‌বনা।" ভৃগু অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু বালকগণ বুঝিলনা; অগত্যা তিনি বলিলেন "যদি একান্তই আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তবে আমি যেখানে যাই, তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে এস; তা হ'লেই তোমাদের একথার মীমাংসা ক'রে দিব। "যে আজ্ঞে" বলিয়া বালকগণ মুনিসত্তমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাঠাকুর গত দিবস একাদশীর উপবাস করিয়াছিলেন; প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্নানাদি সমাপ্ত করিলেন। আহা, ঠাকুরের বড় কষ্ট; ঘরে তেমন মেয়েছেলে নাই, গৃহকার্য্যাদি সকলই নিজে করিয়া লইতে হয়। কবি বলিয়াছেন, "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" গৃহিণীই গৃহ, গৃহিণী শূন্য গৃহ অরণ্য বিশেষ; আমাদের ব্রহ্মাঠাকুরের বারমাসই অরণ্যেবাস। একাদশী গিয়াছে, দ্বাদশীর পারণা করিতে হইবে, তাই পিতামহ সকালে সকালে স্নান করিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছেন। এমন সময় মুনিকুমার গণ সহ তাপস কুলতিলক ভৃগু তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "গৃহে কে আছেন?" রন্ধন গৃহ হইতে উত্তর হইল "কে আপনি?" ভৃগু বলিলেন "ব্রাহ্মণ, অথিতি" পুনর্ব্বার উত্তর হইল 'উপবেশন করুন' ভৃগু বলিলেন "আসন নাই" উত্তর হইল "দেখিয়া লউন, অবসর নাই।" ভৃগুর মনে বড়ই রাগ হইল, রাগ আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তীব্রস্বরে বলিলেন "কে আপনাকে লোক পিতামহ বলে? আপনার কি কোন কাণ্ডজ্ঞানই নাই, উদরের জ্বালা কি এতই অধিক হইয়াছে!" একে উপবাস, তায় গৃহকার্য্যের ঝন্‌ঝাট, তার উপর এই তীব্র উক্তি, পিতামহ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, চতুর্ম্মুখের অষ্টনেত্র হইতে বিদ্যুৎ শিখা বহির্গত হইতে লাগিল, দ্রুতবেগে রন্ধনশালা হইতে বহির্গত হইয়া বলিতে লাগিলেন "কেতুই নির্ব্বোধ, নীচমুখে উচ্চকথা, আমাকে তুচ্ছজ্ঞান!" সৃজনকারীর সেই প্রলয়কারী মুর্ত্তি অবলোকন করিয়া সকলে কম্পিত কলেবর হইয়া উঠিল, এবং সেখান হইতে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

কৈলাসে প্রমথগণ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, নন্দী গাঁজা টিপিতেছে; ভৃঙ্গী ভাঙ সাজিতেছে, ভগবতী ঠাকুরাণী সিদ্ধি ঘুঁটিতেছেন, ভূতনাথ গণেশকে ক্রোড়ে লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেইদিকে চাহিয়া আছেন। একে সিদ্ধি, তায় আবার স্বয়ং সিদ্ধিদায়িণী সেই সিদ্ধি প্রস্তুত করিতেছেন, ভোলানাথ আর কি স্থির থাকিতে পারেন,সকল ভুলিয়া গিয়া সিদ্ধিতেই মন সংযোগ করিয়াছেন। সেই সময় সেখানে জমদগ্নি নন্দন উপনীত হইলেন। মহাদেবের দৃক্‌পাত নাই। ভৃগু বলিলেন "আমি ব্রাহ্মণ" একবার, দুইবার, তিনবার এইরূপ বলিলেন, কিন্তু মহাদেব ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। মহেশ্বরের এই অসাধু ব্যবহার তাপসবরকে আর ভাল লাগিল না, তিনি বিরক্তি ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "লোকে

তোমায় পাগল বলে, আমি একথা বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু আজ জানিলাম, তুমি নিতান্তই পাগল। ভূতনাথের তখন চমক ভাঙ্গিল, ভৃগুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "কে তুমি, কি বলিতেছ?" ভৃগু বলিলেন "বলিতেছি মাথা মুণ্ড, নেশাখোর হইলেই কিতার জ্ঞান-বুদ্ধি সবই নষ্ট হয়।" ভৃগুর কঠোর বাক্যে ত্রিলোচনের ত্রিলোচন হইতে অনলরাশি বাহির হইতে লাগিল, বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন "নন্দি, কই ত্রিশূল?" ত্রিশূলের নাম শুনিয়াই ভৃগু থরহরি কাঁপিয়া উঠিলেন, মুনিবালকগণকে বলিলেন "পলাইয়া এস।" সকলে পলায়ন করিল।

বৈকুণ্ঠে সদাই শান্তিসুখ বিরাজমান। কমলাদেবী সকালে সকালে রন্ধন করিয়া নারায়ণকে ভোজন করাইয়াছেন। নারায়ণ ভোজনান্তে রত্নময় পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছেন, লক্ষ্মী পদসেবা করিতেছেন; সময় বুঝিয়া নিদ্রা নারায়ণের নয়ন যুগলে আবির্ভূতা হইয়াছে। মুনিকুমারগণের সহিত ভৃগুও সেই সময় সেই শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন "আমি অভুক্ত অতিথি"। নারায়ণ নিদ্রানিমগ্ন, সুতরাং কোন উত্তরই পাইলেন না। ভৃগু তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "কি, অথিতিকে অর্ভথনা না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছ? তার প্রতিফল ভোগ কর", বলিয়াই সজোরে নারায়ণের বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন। কঠিন আঘাতে নারায়ণ চকিত ভাবে উত্থিত হইলেন। লক্ষ্মী নির্ব্বাক্, মুনিকুমারগণ স্তম্ভিত। নারায়ণ উত্থিত হইয়াই দেখেন, সম্মুখে ভৃগু; তখন লক্ষ্মীকে বলিলেন "যাও যাও, শীঘ্র জল আনয়ন কর"; বলিয়াই আপনি স্বহস্তে আসন আনিয়া মুনিবরকে উপবেশন করাইলেন। লক্ষ্মী জল আনিলেন। নারায়ণ ভৃগুকে বলিলেন "আপনার কোমল চরণ আমার এই কঠিন বক্ষস্থলে আহত হওয়ায় বেদনা বোধ হয় নাইত?" ভৃগু নিরুত্তর, কি যে উত্তর দিবেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। নারায়ণ জল লইয়া ভৃগুর পদধৌত করিয়া দিলেন। তখন ভৃগু অতি কাতর ভাবে বলিলেন "আমি বড় আপরাধ করিয়াছি, আমায় ক্ষমা করুন।" নারায়ণ বলিলেন "আপনার কি অপরাধ, যে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন? আমিই অপরাধী; আপনি এখন পর্য্যন্ত অনাহারী, আমার গৃহে আগত, আমি আপনার অভ্যর্থনা না করিয়া নিদ্রিত ছিলাম। আপনার এই পদাঘাত আজ আমার পক্ষে পরম উপদেশে পরিণত হইয়াছে; এবং এই পদচিহ্ন আমার বক্ষস্থলে চিরকাল অলঙ্কার স্বরূপ বিরাজমান থাকিবে।" ভৃগুপদচিহ্ন নারায়ণের বক্ষঃস্থলে সমুজ্জল হইয়া উঠিল। নারায়ণ সকলকে ভোজন করাইয়া সাদরে বিদায় দিলেন। ভৃগু বাহিরে আসিয়া মুনিবালকগণকে বলিলেন "এখন বল দেখি বাপু, কে বড়?" আমরাও জিজ্ঞাসা করি 'পাঠক বলুন দেখি, কে বড়?"

শ্রীধনকৃষ্ণ সেন।

তুমি কে? (প্রতিবাদ)।

আমি একজন উগ্রক্ষত্রিয়। সুতরাং "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" আমার অতি আদরের সামগ্রী। অতএব উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধিতে কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদ স্থান না পায় ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাবশেই আজিকার এই প্রতিবাদের অবতারণা। যথার্থ ভ্রমপ্রদর্শন বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইলেও পাছে কেহ ভ্রমপ্রদর্শককে পাণ্ডিত্যাভিমানী ভাবিয়া বসেন, এই ভয়ে এরূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে আমি এক্ষণে স্বতঃই পশ্চাৎপদ। বিশেষ আবশ্যকস্থলে অন্য কাহাকেও এরূপ বিষয়ের ভার লইতে দেখিলে আমি বড়ই আহ্লাদিত হই, কাজেই এ ভার লইয়া কেহ আমাকে আনন্দিত করেন কি না দেখিবার জন্য কাল প্রতীক্ষা করা আমার প্রকৃতি, অধিকন্তু স্বভাবতঃই আমি কিছু দীর্ঘসূত্রী, এই সব কারণে এই প্রবন্ধটী কিছু বিলম্বে লিখিত হইল।

প্রতিনিধির প্রথম সংখ্যার "তুমি কে?" প্রবন্ধটী বেশ সসার। কিন্তু অনবধানতাবশতঃ উহাতে কয়েকটী অসার কথা লিখিত হইয়াছে। অমন সসার প্রবন্ধে একটীও অসার কথা স্থান না পায় ইহা কাহার না কামনীয়? উক্ত প্রবন্ধের একস্থলে লিখিত আছে, "মানুষকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।" এখানে মানুষকে না লিখিয়া মানুষ শরীরকে লেখা কর্ত্তব্য ছিল। মানুষ অর্থাৎ মানবীয় আত্মা কখনই বিভাজ্য নহে। যথা,—

"আত্মা নিত্যোব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্যানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবঃ দেহাদৌ মোহজং
ত্যজেৎ॥"

বেদান্তসারে সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে এই রূপ লিখিত আছে যে,—

"সূক্ষ্মশরীরাণি সপ্তদশাবয়বাণি লিঙ্গশরীরাণি।
অবয়বাস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং বায়ু পঞ্চকঞ্চেতি।"

অর্থাৎ সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গশরীরকে সূক্ষ্মশরীর বলে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ লেখক বলিতেছেন, "দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও তজ্জাত সদসৎ বৃত্তির সমষ্টিকে লিঙ্গশরীর বলে।" এই লক্ষণে পঞ্চ বায়ুর উল্লেখ নাই। অহঙ্কারকে একটী অবয়ব বলা হইয়াছে, কিন্তু বৈদান্তিক মতে অহঙ্কার একটী স্বতন্ত্র অবয়ব নহে। উহা উপরিউক্ত সপ্তদশ অবয়বের অন্যতর অবয়ব মনের একটী বৃত্তি। "তজ্জাত

সদসৎ বৃত্তির সমষ্টি” এ কথার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

দেহাত্মবাদীর ভ্রম দূর করিতে গিয়া উক্ত প্রবন্ধ লেখক স্বয়ংও সেই ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ আত্মা নহে বুঝাইয়া বলিতেছেন,—“শেষ রহিল কারণ শরীর, তিনিই পরমাত্মা বা ঈশ্বর।” শরীর ও শরীরী এক নহে। ঈশ্বর কারণ শরীরে উপহিত বটেন, কিন্তু কারণ শরীর নহেন। যথা,—বেদান্তসারে—

“এতদুপহিতং (অজ্ঞান বা কারণ শরীর সমষ্টিতে উপহিত) চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকং সদসদব্যক্তমন্তর্য্যামি জগৎকারণমীশ্বর ইতি।”

আর এক কথা এই যে, কারণ শরীর সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর। মনুষ্য কারণ শরীরে অর্থাৎ ব্যষ্টীভূত কারণ শরীরে উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর নহেন। বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে “প্রাজ্ঞ” আখ্যা দিয়া থাকেন। যথা,—

“এতদুপহিতং (ব্যষ্টীভূত অজ্ঞান বা কারণ শরীরে উপহিত) চৈতন্যমল্পজ্ঞত্বানীশ্বরত্বাদিগুণকং প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে।”

আর এক কথা বলিয়া এই প্রতিবাদের উপসংহার করিতেছি যে, শুদ্ধ “তুমি কে?” শীর্ষক প্রবন্ধটী বলিয়া নহে, উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধিতে এপর্য্যন্ত যতগুলি অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিষয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, পরিতাপের বিষয় সে সকলগুলিই শুদ্ধ জীবপক্ষে অতীব অশ্রদ্ধেয় নির্ব্বিশেষ বাদে পরিপূর্ণ। কলিকলুষহারী সর্ব্বাবতারী শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-বিহারীর আবির্ভাবের পরও পরম পরিশুদ্ধ সবিশেষবাদের সমাদর না হইয়া অবিশুদ্ধ নির্ব্বিশেষ বাদের বিস্তার হইতে দেখিলে অন্তরে বড়ই ব্যথা জন্মে। এ সম্বন্ধে সময়ান্তরে সবিস্তার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

জনৈক গৌরদাসানুদাস।

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব।

“তুলসী তম্ যব্ জগমে আওয়ে, জগ হসে তোম্ রোয়।
য়্যায়সা করনেকো কর্ চল, তোম্ হসো জগ রোয়॥”

প্রতিদিন নৈশগগনে অসংখ্য তারকারাজি আপনার মনে উদিত হইয়া আবার আপনার মনে অস্ত যায়। কে তাহাদের কয়টীর অনুসন্ধান রাখে? কিন্তু একমাত্র চন্দ্রদেবের উদয়াস্তে মানবের মনে বিমল সুখের ছায়া ও গভীর দুঃখের রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। কেন এমন ঘটে? ইহার উত্তর সহজ। অসংখ্য নক্ষত্রমালার উদয়াস্তে জগতের কোনই ইষ্টানিষ্ট সংসাধিত হয় না, কিন্তু একমাত্র সুধাকরের আবির্ভাব, তিরোভাবে জগতের বহুতর মঙ্গলামঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক জগতে

যেমন মানব-জগতেও তেমনি। সংসারে প্রতিদিন কত শত মানবের জন্ম হইতেছে, আবার কত শত মানব ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া শমনসদনে গমন করিতেছে। তোমার আমার ন্যায়—তোমার আমার ন্যায়ই বা কেন? কত শত ধন-কুবের, কত শত রাজ-রাজেশ্বর কত শত জ্ঞানী ও পণ্ডিত, মানব জীবনের নশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়া ইহ সংসার হইতে জনমের মত বিদায় গ্রহণ করিতেছে; কৈ তাহাদের মৃত্যুবার্ত্তা ত তাহাদের স্ব স্ব বাসস্থলীর সীমা অতিক্রম করিতেছে না? তাহাদের আত্মীয় স্বজন ব্যতীত কৈ অপরের চক্ষু হইতে ত তাহাদের জন্য শোকাশ্রু পতিত হইতে দৃষ্ট হইতেছে না? কিন্তু একি! পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে আজ সমগ্র বঙ্গে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইতেছে কেন? কি ছাত্রসমূহ কি শিক্ষক শ্রেণী, কি প্রজাবৃন্দ, কি রাজন্যবর্গ, কি অনাশ্রিত বালকগণ, কি নিরাশ্রয়া বিধবা কুল, কি ধনীদল কি দরিদ্রবর্গ, কি সম্পাদকগণ কি কবিবৃন্দ, কি শিক্ষিত শ্রেণী কি অশিক্ষিতগণ—বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই, বঙ্গের সর্ব্বত্রই আজ বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে কাতর হইয়া নানা উপায়ে তাঁহার প্রতি শোক সম্মান ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। সহস্র সহস্র রসনায় দেবকাহিনীর ন্যায় তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী বিঘোষিত হইতেছে! এরূপ ঘটনার কারণ কি? সমগ্র বঙ্গবাসীই কি বিদ্যাসাগরের পরিবার? না তাহা নহে। তবে বিদ্যাসাগর কি অদ্বিতীয় পণ্ডিতছিলেন? না তদপেক্ষাও অধিকতর পণ্ডিতের মৃত্যু হইয়াছে। তবে কি তিনি মহাধনবান ছিলেন? না, তিনি তাদৃশ ধনীও ছিলেন না, তাঁহাপেক্ষা শতগুণে ধনবান ব্যক্তিবর্গ ত নিয়তই মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে। তবে বিদ্যাসাগর কি বড়-লোকের পুত্র ছিলেন? না তাহা নহে, তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। যে সকল গুণ থাকিলে সাধারণ লোক, লোককে বড়-লোক বলিয়া থাকে, তাহা যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ণমাত্রায় ছিলনা, তবে কোন গুণে বঙ্গবাসী আজ তাঁহার জন্য ঝুরিতেছে? ইহার উত্তর ত পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তোমার আমার ন্যায় কোটী কোটী নর-নারী ক্ষীণরশ্মি তারকারাজি সদৃশ নিষ্প্রভ। আমাদের জন্ম মরণে জগতের বিশেষ কিছু ইষ্টানিষ্ট নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র প্রকৃতই বঙ্গাকাশে চন্দ্রবৎ উদিত হইয়া স্বীয় বিমল যশঃচন্দ্রিকায় সমস্ত বঙ্গ আলোকিত করিয়াছিলেন; সে চন্দ্রের অস্তগমনে বঙ্গদেশ শোকতিমিরে সমাচ্ছন্ন না হইবে কেন? বিদ্যাসাগর যে গুণে সমগ্র নর-নারীর আন্তরিক ভক্তির পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন আমরা সেই গুণকে “বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব” আখ্যায় অভিহিত করিলাম। আমরা এই প্রবন্ধের শিরোভাগে মহাত্মা তুলসীদাসের যে দোঁহাটী উদ্ধৃত করিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যথার্থ তাহার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডিত্যই বল আর ধনৈশ্বর্য্যই বল, আভিজাত্যই বল, আর রূপ যৌবনই বল কিছুই কিছু নয়, কায়মনোবাক্যে একমাত্র সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠানই লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণের মূল। স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার জলন্ত উদাহরণ। আমরা প্রিয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুটী কএক মহত্ত্বের পরিচয় নিম্নে প্রদান করিলাম।

বিদ্যাসাগরের বিদ্যাশিক্ষা।

বিদ্যাসাগরের পিতা ১০৲টাকা বেতনে কলিকাতা নগরীতে একটী কার্য্য করিতেন। এই সামান্য ১০টী টাকার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাকে পরিবারাদি প্রতিপালন এবং পুত্রের শিক্ষাদান কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। উপযুক্ত পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র স্বহস্তে পাককরা একবেলার ভাত দুবেলা খাইয়া, একদিনের রন্ধন করা মৎস্য তিন দিন ভক্ষণ করিয়া সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি ধারণ করেন। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিদ্যাসাগর যেরূপ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, ২।৪ জন ব্যতীত ওরূপ বিদ্যালাভ বঙ্গের আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আহারের কষ্টে যাঁহাদের কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া করা অসুবিধা হয়, যাঁহারা ২০।২৫ টাকাতেও আপনাদের ব্যয় কুলাইয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহারা বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন হইতে কিছু শিক্ষালাভ করিবেন কি?

বিদ্যাসাগরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

বিদ্যাসাগর সর্ব্ব প্রথমে ৫০ টাকা বেতনে শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। প্রিন্সিপালি করিতে করিতেই ইনি স্কুল বিভাগের ইনস্‌পেক্টরীর পদ প্রাপ্ত হন। এই দ্বিবিধ কার্য্যের জন্য তিনি ৫০০ টাকা বেতন পাইতেন। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তার সহিত এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন বিষয় লইয়া মতভেদ হয়। ডিরেক্টর সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আপন মতে আনিবার জন্য বিশেষ রূপ পীড়াপীড়ি করিলে ইনি স্বীয় মত বজায় রাখিবার জন্য অম্লান বদনে এই ৫০০ টাকা বেতনের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। পরিশেষে অনেক বড় বড় সাহেব এমন কি বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর পর্য্যন্ত তাঁহাকে সে কার্য্য পুনর্গ্রহণ করাইতে পারেন নাই। ধন্য বিদ্যাসাগরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা! চাকরী-জীবন পরপদ-লাঞ্ছিত বাঙ্গালী বাবু ইহাতে কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন কি?

বিদ্যাসাগরের মহানুভবতা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করিয়া "বিধবা বিবাহ বিধি" প্রণয়ন করেন, তখন অনেকেই তাহার প্রতিবাদ করিয়া পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই সময় এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহযোগী প্রাট সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনার বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তকের কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিবাদ বাহির করিয়াছে" তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পুস্তকের যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কুৎসা, গ্লানিপূর্ণ ও যুক্তিবিহীন অসার প্রতিবাদ বাহির করিয়াছিল, রহস্যচ্ছলে তাহার নাম করিলেন। প্রাট সাহেব তাহা সত্য মনে করিয়া তাহার নাম স্বীয় নোট বুকে লিখিয়া লইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই ব্যক্তির নাম লিখিয়া লইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রাট্ সাহেব বলিলেন "আমার অধীনে একটী ডেপুটী ইনিস্‌পেক্টরী খালি আছে, আমি ইহাকে সেই পদ দিব। এ ব্যক্তি যখন আপনার গ্রন্থের উৎকৃষ্ট প্রতি-

বাদ বাহির করিয়াছে তখন উপযুক্ত সন্দেহ নাই।" বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে মনে হাসিলেন। বিধবাবিবাহবিধির প্রতিবাদ লিখিয়া ইনি যত উপযুক্ততার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না কিন্তু যে পদে সে নিযুক্ত হইতেছে সে পদের যে উপযুক্ত তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতেন। সুতরাং তিনি রহস্য প্রকাশ না করিয়া প্রাট্ সাহেবের মতেই মত প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা তাহার ইষ্ট ব্যতীত কখন কোন অনিষ্ট হয় নাই। পরে সে ব্যক্তি প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। পর ছিদ্রান্বেষী বাঙ্গালী ভায়াগণ! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসাধারণ মহানুভবতার জন্য তাঁহার দেব-হৃদয়ের এ অমূল্য আদর্শ গ্রহণ করিবে না?

বিদ্যাসাগরের নিস্পৃহতা।

এখনকার লোকেরা সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান প্রায় বক্তৃতা দ্বারাই সারিয়া থাকেন, অর্থ দ্বারা কোন কার্য্য করিতে ইহাঁরা রাজী নহেন অথচ 'রিফরমার,' প্রতিনিধি এবং স্বদেশ-হিতৈষী নাম লইবার জন্য বড়ই লালায়িত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষসমর্থন করিয়া দেশে তুমুল আন্দোলন উত্থাপন করেন। অসহায়া বিধবাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য তিনি ৮০ হাজার টাকা ঋণী হন। সেই ঋণ পরিশোধ এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের সাহায্যার্থ দেশের বড় বড় লোক তাঁহাকে বিস্তর অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা কখন গ্রহণ করেন নাই এবং নিজেই সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। একি কম নিস্পৃহতা!

বিদ্যাসাগরের সংযম।

যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, যদিও তিনি জেদের বশবর্ত্তী হইয়া ৫০০ টাকা বেতনের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া একরূপ নিস্বম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তত্রাচ স্বীয় অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও অধ্যবসায়ের গুণে বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় এবং সমাজের হিতসাধক রাশি রাশি পুস্তক পুস্তিকা প্রণয়ণ করিয়া বার্ষিক ৬০।৭০ হাজার টাকা আয় করিয়া গিয়াছেন। মধ্যম শ্রেণীর অনেক জমিদারেরই এরূপ আয় নাই। তিনি দরিদ্রের সন্তান হইয়া এত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কখন ধন জনিত অহংকার তাঁহার মনে উদয় হয় নাই এবং অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম পৈতৃক ধনের অধিকারী অপদার্থ বিলাসী বাবুগণের ন্যায়, শাল জামেওয়ার, জুড়িগাড়ী, চেন ঘড়ি, আতর গোলাপ, কালিয়া পোলাও লইয়া মত্ত থাকেন নাই। তিনি এত যে ধনবান্ হইয়াছিলেন, কিন্তু এ জীবনে মার্কিনের চাদর, নয়নশুকের ধুতি এবং তালতলার চটী ব্যতীত কখন অন্য বসন ভূষণে অঙ্গ শোভিত করেন নাই এবং মুড়ি খাইতেও লজ্জাবোধ করিতেন না। স্বল্পবেতনভোগী চাকুরে বাবুগণ! স্কুল কলেজের বিলাসী ছাত্রবর্গ! বিদ্যাসাগরের এ সাধু দৃষ্টান্তে সংযম নীতি শিক্ষা করিয়া দারিদ্র্য

ও অভাবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে কি?

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতার বিবাহ উপস্থিত। তাঁহার মাতা এই উপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতা হইতে বাটী যাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন; না গেলে তিনি সাতিশয় দুঃখিতা হইবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কি জননীর মনে দুঃখ দিতে পারেন? ঈশ্বরাদেশ অপেক্ষা তিনি মাতার আদেশকে অধিক গুরুতর বলিয়া মান্য করিতেন। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্‌সিপাল; শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের নিকট ছুটীর আবেদন করিলেন, আবেদন অগ্রাহ্য হইল। এক দিকে মাতৃ আজ্ঞা, অন্য দিকে ৫০০ শত টাকা বেতনের উচ্চ পদের মায়া। অন্যের নিকট হইলে, মাতৃ আজ্ঞা উচ্চ পদের মায়ার নিকট ঘাড় হেঁট করিয়া যাইত তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু কাহার নিকট এরূপ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে? এ যে তেজঃস্বীতার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বাধীনতা-প্রিয় মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর! বিদ্যাসাগর অবিলম্বে চাকরী ত্যাগ পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। বিদ্যারসাগর বিদ্যাসাগরকে ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত কলেজের ক্ষতি সাধন করিতে ডিরেক্টর সাহসী হইলেন না। বিদ্যাসাগর ছুটী পাইলেন। আর সময় নাই, নির্দ্ধারিত দিনে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইতে হইবে। কলিকাতা হইতে তাঁহার জন্মভূমি বীরসিংহা ৫০ মাইল। হাঁটিয়া এই সুদীর্ঘ পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া, যথা সময়ে দামোদরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বর্ষাকাল, বর্ষার জলে দামোদরের প্রসস্ত উদর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অসীম জলরাশি দামোদরের দুকুল ভাসাইয়া খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। নক্র চক্র পরিপূর্ণ প্রবল তরঙ্গ-সমাকুল দামোদর অতীব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পারার্থীর ভীতি উৎপাদন করিতেছে। সে সময়ে দামোদরের পানে তাকাইতেও শঙ্কা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তীরে আসিয়া দেখিলেন পারের কোনও যান উপস্থিত নাই; পারে যদি বিলম্ব ঘটে তবে যথা সময়ে বাটী পঁহুছান ঘটিবে না। মাতৃদেবী মনে বড়ই ব্যথা পাইবেন। এই চিন্তা মনে উদয় হইবা মাত্র মাতৃপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দামোদরের ভীষণ তরঙ্গবেগে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ভীষণ নদী গর্ভে ঝম্প প্রদান করতঃ স্বীয় অসাধারণ সামর্থ্যবলে সন্তরণ দিয়া অবিলম্বে পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন ও যথা সময়ে বাটী উপস্থিত হইয়া মাতৃপদ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং সমুদয় পথশ্রম ভুলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই দৃষ্টান্তটী হইতে অনেকগুলি নীতি শিক্ষা করা যাইতে পারে। চাকরী-প্রিয় বাঙ্গালী বাবু শিক্ষা করিতে পারিবেন, কি করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য পালনের জন্য চাকরীর মায়া তুচ্ছ করিতে হয়। আর সামান্য বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীগণ যাহারা গাড়ি ব্যতীত অর্দ্ধমাইল দূরস্থিত আপিস আদালতে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয়েন না, তাঁহারা কি উচ্চপদস্থ বিদ্যাসাগরের এই সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করায় কিছুই শিক্ষা

পাইবেন না? চাকরী বজায়ের অনুরোধে, ও মাতারাতের অসুবিধা বশতঃ যাঁহারা মাতার মৃত্যুকালেও উপস্থিত হইতে পারগ হন না, যাঁহারা ঈশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি জননী দেবীকে "পিতার পরিবার" বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাতার একটী সামান্য আদেশ প্রতিপালন করিতে কিরূপে উচ্চ চাকরীর মায়া পরিত্যাগ, কিরূপে দুরূপথকষ্ট সহ্য, কিরূপে দামোদরে জীবনকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন তাহা চিন্তা করিয়া মাতৃভক্তি শিক্ষা করুন।

বিদ্যাসাগরের দানশীলতা।

বিদ্যাসাগর কেবলই বিদ্যার সাগর ছিলেন না, তিনি দয়ারও সাগর ছিলেন। স্বীয় পুরুষকারের বলে, তিনি বার্ষিক ৬০।৭০ হাজার টাকা আয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অন্য কেহ হইলে সে অর্থ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্ত্যর্থে ব্যয় অথবা লোহার সিন্ধুকেই আবদ্ধ করিয়া যাইতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিকট কি তাহা হইবার যো আছে, তিনি দানকেই স্বর্গের সোপান বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে তিনি এত অর্থের অধিকারী হইয়াও এবং প্রলোভন পূর্ণ কলিকাতা নগরীতে বাস করিয়াও, বিলাসীতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের জন্য যাহা আবশ্যক তৎ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অর্থ সৎকার্য্যার্থে ব্যয় করিতেন। মেট্রপলিটেন কলেজ তাঁহার উচ্চ দানের সুমহৎ ফল। এবং ইহাই তাঁহার জীবনের স্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ। বহুসংখ্যক স্কুলের ছাত্র, বঙ্গীয় বিধবা বালা, দীন দুঃখী, অন্ধ আতুর, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অতিথি অভ্যাগত, বিপন্ন শরণাগত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট নিরূপিত দান প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার আয়ের অধিকাংশ মুদ্রাই এইরূপে ব্যয়িত হইত। এতদ্ব্যতীত দেশহিতকর অনেক কার্য্যে তাঁহার মোটা মোটা দান ছিল। আয়ের অনুপাতে ধরিতে গেলে, তাঁহার ন্যায় দাতা ভারতে আর কেহ নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ক্ষুধাতুরকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, শিক্ষার্থীকে শিক্ষা, রোগীকে ঔষধ প্রদান করিতে বিদ্যাসাগরের কোমল হৃদয়, বোধ হয়, কখন কাতর হয় নাই। বিলাসী ধনীগণ! অর্থের কিরূপে সদ্ব্যবহার করিতে হয় তাহা বিদ্যাসাগরের দানশীলতা হইতে শিক্ষা কর।

বিদ্যাসাগরের বিশ্বপ্রেম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য ছিল না। সত্য কথা বলিতে গেলে তিনি বড়লোককে ততটা প্রিয় জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু গরিব দুঃখীদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তিনি বলিতেন গরিব দুঃখীই আমার আত্মীয় স্বজন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্ডলাইনের অন্তর্গত খার্ম্মাটার নামক স্থানে একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। খার্ম্মাটারের নিকটেই সাঁওতাল দিগের বাস। তিনি যখন খার্ম্মাটারে যাইতেন তখন প্রায়ই সাঁওতাল দিগকে লইয়া অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। পাঠক! যে অসভ্য গরিব সাঁওতাল দিগের ছায়া স্পর্শ করিতেও আমরা নাসিকা কুঞ্চন করি, সেই সাঁওতাল দিগের মধ্যে তিনি গমন করিয়া তাহাদিগের সহিত আপনার

ও অভাবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে কি?

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতার বিবাহ উপস্থিত। তাঁহার মাতা এই উপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতা হইতে বাটী যাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন; না গেলে তিনি সাতিশয় দুঃখিতা হইবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কি জননীর মনে দুঃখ দিতে পারেন? ঈশ্বরাদেশ অপেক্ষা তিনি মাতার আদেশকে অধিক গুরুতর বলিয়া মান্য করিতেন। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্‌সিপাল; শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের নিকট ছুটীর আবেদন করিলেন, আবেদন অগ্রাহ্য হইল। এক দিকে মাতৃ আজ্ঞা, অন্য দিকে ৫০০ শত টাকা বেতনের উচ্চ পদের মায়া। অন্যের নিকট হইলে, মাতৃ আজ্ঞা উচ্চ পদের মায়ার নিকট ঘাড় হেঁট করিয়া যাইত তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু কাহার নিকট এরূপ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে? এ যে তেজঃস্বীতার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বাধীনতা-প্রিয় মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর! বিদ্যাসাগর অবিলম্বে চাকরী ত্যাগ পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। বিদ্যারসাগর বিদ্যাসাগরকে ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত কলেজের ক্ষতি সাধন করিতে ডিরেক্টর সাহসী হইলেন না। বিদ্যাসাগর ছুটী পাইলেন। আর সময় নাই, নির্দ্ধারিত দিনে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইতে হইবে। কলিকাতা হইতে তাঁহার জন্মভূমি বীরসিংহা ৫০ মাইল। হাঁটিয়া এই সুদীর্ঘ পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া, যথা সময়ে দামোদরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বর্ষাকাল, বর্ষার জলে দামোদরের প্রসস্ত উদর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অসীম জলরাশি দামোদরের দুকুল ভাসাইয়া খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। নক্র চক্র পরিপূর্ণ প্রবল তরঙ্গ-সমাকুল দামোদর অতীব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পারার্থীর ভীতি উৎপাদন করিতেছে। সে সময়ে দামোদরের পানে তাকাইতেও শঙ্কা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তীরে আসিয়া দেখিলেন পারের কোনও যান উপস্থিত নাই; পারে যদি বিলম্ব ঘটে তবে যথা সময়ে বাটী পঁহুছান ঘটিবে না। মাতৃদেবী মনে বড়ই ব্যথা পাইবেন। এই চিন্তা মনে উদয় হইবা মাত্র মাতৃপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দামোদরের ভীষণ তরঙ্গবেগে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ভীষণ নদী গর্ভে ঝম্প প্রদান করতঃ স্বীয় অসাধারণ সামর্থ্যবলে সন্তরণ দিয়া অবিলম্বে পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন ও যথা সময়ে বাটী উপস্থিত হইয়া মাতৃপদ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং সমুদয় পথশ্রম ভুলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই দৃষ্টান্তটী হইতে অনেকগুলি নীতি শিক্ষা করা যাইতে পারে। চাকরী-প্রিয় বাঙ্গালী বাবু শিক্ষা করিতে পারিবেন, কি করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য পালনের জন্য চাকরীর মায়া তুচ্ছ করিতে হয়। আর সামান্য বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীগণ যাহারা গাড়ি ব্যতীত অর্দ্ধমাইল দূরস্থিত আপিস আদালতে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয়েন না, তাঁহারা কি উচ্চপদস্থ বিদ্যাসাগরের এই সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করায় কিছুই শিক্ষা

পাইবেন না? চাকরী বজায়ের অনুরোধে, ও যাতায়াতের অসুবিধা বশতঃ যাঁহারা মাতার মৃত্যুকালেও উপস্থিত হইতে পারগ হন না, যাঁহারা ঈশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি জননী দেবীকে "পিতার পরিবার" বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাতার একটী সামান্য আদেশ প্রতিপালন করিতে কিরূপে উচ্চ চাকরীর মায়া পরিত্যাগ, কিরূপে দুরূপথকষ্ট সহ্য, কিরূপে দামোদরে জীবনকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন তাহা চিন্তা করিয়া মাতৃভক্তি শিক্ষা করুন।

বিদ্যাসাগরের দানশীলতা।

বিদ্যাসাগর কেবলই বিদ্যার সাগর ছিলেন না, তিনি দয়ারও সাগর ছিলেন। স্বীয় পুরুষকারের বলে, তিনি বার্ষিক ৬০।৭০ হাজার টাকা আয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অন্য কেহ হইলে সে অর্থ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্ত্যর্থে ব্যয় অথবা লোহার সিন্ধুকেই আবদ্ধ করিয়া যাইতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিকট কি তাহা হইবার যো আছে, তিনি দানকেই স্বর্গের সোপান বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে তিনি এত অর্থের অধিকারী হইয়াও এবং প্রলোভন পূর্ণ কলিকাতা নগরীতে বাস করিয়াও, বিলাসীতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের জন্য যাহা আবশ্যক তৎ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অর্থ সৎকার্য্যার্থে ব্যয় করিতেন। মেট্রপলিটেন কলেজ তাঁহার উচ্চ দানের সুমহৎ ফল। এবং ইহাই তাঁহার জীবনের স্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ। বহুসংখ্যক স্কুলের ছাত্র, বঙ্গীয় বিধবা বালা, দীন দুঃখী, অন্ধ আতুর, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অতিথি অভ্যাগত, বিপন্ন শরণাপন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট নিয়মিত দান প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার আয়ের অধিকাংশ মুদ্রাই এইরূপে ব্যয়িত হইত। এতদ্ব্যতীত দেশহিতকর অনেক কার্য্যে তাঁহার মোটা মোটা দান ছিল। আয়ের অনুপাতে ধরিতে গেলে, তাঁহার ন্যায় দাতা ভারতে আর কেহ নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ক্ষুধাতুরকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, শিক্ষার্থীকে শিক্ষা, রোগীকে ঔষধ প্রদান করিতে বিদ্যাসাগরের কোমল হৃদয়, বোধ হয়, কখন কাতর হয় নাই। বিলাসী ধনীগণ! অর্থের কিরূপে সদ্ব্যবহার করিতে হয় তাহা বিদ্যাসাগরের দানশীলতা হইতে শিক্ষা কর।

বিদ্যাসাগরের বিশ্বপ্রেম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য ছিল না। সত্য কথা বলিতে গেলে তিনি বড়লোককে ততটা প্রিয় জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু গরিব দুঃখীদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তিনি বলিতেন গরিব দুঃখীই আমার আত্মীয় স্বজন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্ডলাইনের অন্তর্গত খার্ম্মাটার নামক স্থানে একটী কাটী নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। খার্ম্মাটারের নিকটেই সাঁওতাল দিগের বাস। তিনি যখন খার্ম্মাটারে যাইতেন তখন প্রায়ই সাঁওতাল দিগকে লইয়া অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। পাঠক! যে অসভ্য গরিব সাঁওতাল দিগের ছায়া স্পর্শ করিতেও আমরা নাসিকা কুঞ্চন করি, সেই সাঁওতাল দিগের মধ্যে তিনি গমন করিয়া তাহাদিগের সহিত আপনার

পরিবারের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ১৫।১৬ বৎসরের সাঁওতাল রমণীরা এবং ছোট বালক বালিকাগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবামাত্র তাঁহার গাত্রে পড়িয়া, কেহ বা তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া, তাঁহার নিকট হইতে পয়সা কাড়িয়া লইতেন, তিনি কতকগুলি পয়সা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আমোদ দেখিতেন। তাহারা একরূপ তাঁহাকে দলন করিত, তাহাদের কত পদাঘাত তাঁহার গাত্রে লাগিত! বিদ্যাসাগর ইহাতে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি স্বহস্তে পীড়িত সাঁওতালদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। স্বহস্তে তাহাদিগকে ঔষধ প্রদান করিতেন এবং আবশ্যক হইলে তাঁহাদের মল মূত্র পরিস্কার করিয়া দিতেও ঘৃণা বা বিরক্তি বোধ করিতেন না। পাঠকগণ বলুন দেখি বিদ্যাসাগর মনুষ্য না দেবতা?

বিদ্যাসাগরের নিরহংকারিতা।

একাধারে পাণ্ডিত্য, উচ্চপদ, রাজসম্মান ও অর্থ, বোধ হয় বিদ্যাসাগরের ন্যায় আর কাহারও ছিলনা। এহেন বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নিরহংকার ছিলেন। একদিন তিনি কলিকাতার কোন সদর রাস্তার ধারে একটী সামান্য লোকের দোকানে বসিয়া আছেন। সে সব শ্রেণীর দোকানে না কি বাবুদের চরণরেণু পড়িলে উচ্চ সম্মানের মূলে কুঠারাঘাত হইয়া পড়ে! বিদ্যাসাগর মহাশয় নেহাত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কি না? বোধ হয়, কি করিয়া সম্মান রক্ষা করিতে হয় তাহা জানিতেন না, তাই দোকানদারের নিকটে বসিয়া মানের কথা ভুলিয়া গিয়া সরল মনে আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে এই মহানগরীর একটী খ্যাতনামা বড়-লোক সেই রাস্তা দিয়া জুড়ী হাঁকাইয়া যাইতে ছিলেন। বিদ্যাসাগরের দুর্ভাগ্য তাই বাবুর চক্ষু তাঁহার উপর পতিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঈদৃশ ঘৃণিত ব্যবহার দর্শনে তিনি মরমে মরিয়া গেলেন। পর দিন বাবুটী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে আত্মসম্মান রক্ষার বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতে গেলে অর্থাৎ সামান্য লোকের দোকানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তির বসা উঠা ভাল দেখায় না এই কথা বলিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার হিতবাক্য বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "যদি সামান্য লোকের দোকানে বসিলে তোমরা আমার সহিত মিশিতে লজ্জা বোধ কর, তোমরা আমার সহিত না মিশিলেই তবে পার।" আর একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বাজার হইতে আম কিনিয়া হাতে করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছেন। আম হাতে করিয়া সদর রাস্তা দিয়া গেলে সম্ভ্রমের হানী হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মোটা বুদ্ধিতে ইহা আসিতনা। কি গ্রহ! বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈদৃশ অবস্থায় একটী মান্যগণ্য ভদ্রলোকের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন। ভদ্র (?) বাবুটী বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া অপর ধারের রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া, দ্রুতগতি তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, বাপু হে! "আমার হাতে আমের থলে দেখিয়া তোমার লজ্জা হইতেছে, কিন্তু আমার কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইতেছে না?"

বিদ্যাসাগরের অদ্ভুত শিক্ষাদান।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন সদুপদেষ্টা তেমনি সাধু আদর্শ ছিলেন। তিনি পুস্তকে যাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কার্য্যে স্বয়ং তাহা আচরণ করিয়াছেন। একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা হইতে কোন কার্য্যবশতঃ কৃষ্ণনগর যাইতেছেন। সে দিন দশহরা গঙ্গাস্নানের যোগ; বিদ্যাসাগর মহাশয় সিয়ালদহে গাড়ি চাপিয়া পূর্ব্ব বঙ্গরেলের বগুলা ষ্টেসনে নামিলেন। সেই সময় গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিয়াছে, কৃষ্ণনগর কলেজের কতকগুলি ছাত্রও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত গাড়ি হইতে নামিল। বগুলা ষ্টেসন হইতে হাঁটিয়া অথবা ঘোড়ার গাড়িযোগে কৃষ্ণনগর যাইতে হয়। 'শেয়ারে' গেলে ।০ আনাতেই বগুলা হইতে কৃষ্ণনগর যাওয়া চলে, কিন্তু যোগের সময় বলিয়া গাড়োয়ানেরা প্রত্যেক আরোহীর নিকট ২৲।২॥০ টাকা লইতেছে। ছাত্রগণ এ গাড়ি সে গাড়ির নিকট গিয়া ভাড়ার বন্দোবস্ত করিতেছে, ইত্যবসরে বিদ্যাসাগর মহাশয় তথায় পহুঁছিয়া, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কোথা যাইবে?" তাহারা বলিল "আমরা কৃষ্ণনগর যাইব।" তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট তাহাদের পরিচয় দিল কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে পরিচয় দিলেন না। বলা বাহুল্য তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিত না, তাঁহার বেশভূষায় তাহারা তাঁহাকে একজন সামান্য ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করায়, বিশেষ পরিচয় লওয়ার আবশ্যকও বোধ করিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "বাপু সকল! তোমরা কেন অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া মরিবে। চল সকলে মিলিয়া হাঁটিয়া যাওয়া যা'ক্। এই ৫।৬ ক্রোশ রাস্তা বৈত নয়? আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাঁটিয়া যাইতে পারিব, আর তোমরা যুবক হইয়া পারিবে না? ছাত্রজীবনে বিলাসী হওয়া ভাল নহে। যে ২॥০ টাকা দিয়া ঘোড়ার গাড়ি চাপিয়া যাইবে তাহা এক দরিদ্রকে দান করিলে তাহার মহৎ উপকার হইবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় সকলে সম্মত হইল, এবং সকলেই কথায় বার্ত্তায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সরল চুটকি গল্প ও নানা প্রকার উপদেশসূচক কথাবার্ত্তায় তাঁহার প্রতি তাহাদের ক্রমশঃ শ্রদ্ধা হইতে লাগিল। মূর্খ ব্রাহ্মণ বলিয়া যে ধারণা ছিল তাহা ঘুচিয়া গেল। এইরূপ কথাবার্ত্তায় যাইতে যাইতে তাঁহারা ক্রমশঃ কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সহরের সম্মুখে একজন ছিন্নপদ ভিক্ষুক বসিয়া পথিকগণের নিকট কাতরকণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছে; সহৃদয়-ব্যক্তিমাত্রেই তাহাকে এক একটী পয়সা দিয়া যাইতেছে। ছাত্রগণ সহ বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিক্ষুকের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ছাত্রেরা সকলেই তাহাকে এক একটী করিয়া পয়সা দিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিক্ষুকের অবস্থা দর্শন করিয়া দয়ায় গলিয়া গেলেন; একেবারে ৫টী টাকা লইয়া তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে ছাত্রগণ বলিলেন মহাশয় করেন কি? "উহাকে ৫ টাকা দেওয়া কেন, একটী পয়সা উহার পক্ষে যথেষ্ট এবং তাহাতেই ও সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া উত্তর করিলেন "ও ব্যক্তি কি ৫ টাকা পাইবার উপযুক্ত নহে? উহারাই

অধিকতর দান পাইবার উপযুক্ত। গাড়ি না চাপিয়া উহার মত ব্যক্তিকে দান করিলেই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা হয়। আমি নিষেধ না করিবে, তোমরা এখনি প্রত্যেকে ২৲। ২॥ দিয়া গাড়ি চাপিয়া আসিতে। গাড়ি না চাপায় যে অর্থ বাঁচিয়া গেল, ভাল তাহার অর্দ্ধেকও উহাকে দাওনা কেন? ২৲। ২॥ টাকা কেন ১০ টাকা লাগিলেও আমি গাড়ি চাপিয়া আসিতে পারিতাম। কিন্তু উহা আমার স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্য। বিশেষতঃ তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই আমি অদ্য হাঁটিয়া আসিয়াছি। আমি অর্থ কিরূপে ব্যয় করিতে হয় তাহা জানি। ভরসা করি অদ্য হইতে তোমরা অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে শিখিবে।" ছাত্রগণ একজন চটি পায়ে, মার্কিনের চাদর গায়ে ও থানের ধুতি পরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবহার দর্শনে অবাক্ হইল। এবং সকলেই তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইলে, তিনি যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। ছাত্রগণ তাঁহার পরিচয় পাইবা মাত্র ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল এবং পথে কোনরূপ বাচালতা হইয়াছে ভাবিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় ভিক্ষুককে আর কিছু কিছু দিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

আর এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় সন্ধ্যার ট্রেণে হাবড়া ষ্টেসনে নামিয়া প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া আছেন। দুইটী স্কুলের ছাত্রও সেই গাড়িতে নামিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একটী করিয়া কার্পেটের ব্যাগ। তাহা অনায়াসে হাতে করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। ব্যাগ দুইটী লইয়া যাইবার জন্য বাবুদ্বয় "ঝাঁকামুটে ঝাঁকামুটে" করিয়া ডাকিতেছে। ঝাঁকামুটে মিলিল না, বাবু দুইটী বিষম বিপদে পড়িলেন। তাহারা আর কোন মতেই আসিতে পারেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের ভাব দেখিয়া নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই মহাশয়?" তাহারা বলিল "মুটে চাই বাপু, তুমি একটা মুটে ডেকে দিতে পার?" বলা বাহুল্য তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিত না এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ থাকায়, তাহারা তাঁহাকে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "মশায়, মুটেত এখন মিলিবে না আপনারা কোথায় যাবেন?" তাহারা বলিল "আমরা কলিকাতা যাইব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "তবে না হয় আমাকেই ব্যাগ দু'টা দিন, আমাকেই কিছু দিবেন।" নির্ব্বোধ ছাত্রেরা তাহাতেই সম্মত হইয়া তাঁহার হস্তে ব্যাগ প্রদান করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাগ দুইটী লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রি হওয়ায় তাঁহাকে পথে কেহ চিনিতে পারিল না। তিনি বালক দ্বয়কে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া একেবারে নিজের বাটীতে পঁহুছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে কোয়ার্টারে বাটী, তাহার কিছু দূরেই ছাত্রদ্বয়ের বাসা। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাটী আসিয়া বাবুদিগকে পরিচয় প্রদান করিলেন। বাবুরাত একেবারে মরমে মরিয়া গেল। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদিগকে নানা প্রকার হিতোপদেশ দিয়া এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া বিদায় দিলেন।

উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতি।

কোন এক কাল্পনিক সংজ্ঞাকে আকার বিশিষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে হইলে, বর্ণনা সোকার্য্যার্থে তাহার অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদি কি কি উপাদানে গঠিত, তাহা সর্ব্বাগ্রে পাঠকের গোচরার্থ প্রকাশ করা উচিত। মানব-দেহকে তরণী বলিলে, যেমন বিবেককে নাবিক, ষড়রিপুকে দাঁড়ী, প্রলোভনকে কালমেঘ, পাপকে ঘূর্ণায়বাত, সংসারকে সমুদ্র, এবং আত্মাকে আরোহী বলা এক প্রকার আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি কোন এক জাতীয়-সমিতিকে মানব-দেহের সহিত তুলনা করিতে হইলে, সভাপতিকে হৃদপিণ্ড, সম্পাদককে পদ, (সমিতির সেবক বলিয়া) সভ্যগণের মধ্যে শিক্ষিতবর্গকে মস্তক, (সমিতির পরিচালক বলিয়া) অশিক্ষিতগণকে ষড়রিপু, (সমিতির সদুদ্দেশ্য সাধনের কণ্টক বলিয়া) ধনী-বৃন্দকে উদর, (সমিতির পোষক বলিয়া) এবং কার্য্যকরী সভাকে হস্ত, (সমিতির আদেশ প্রতিপালক বলিয়া) জাতীয় সংবাদপত্রকে বিবেক, (সদসৎপথ প্রদর্শক বলিয়া) ও উৎসাহকে রুধির বা জীবন স্থানীয় বলাই সঙ্গত।

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদের "উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতির" কলেবর সুস্থ কি অসুস্থ বা বাক্যান্তরে ইহার প্রাণ কণ্ঠে না ওষ্ঠে।

বলা বাহুল্য যে আমি এই সমিতির পদ-স্থানীয় অর্থাৎ অনুগত ভৃত্য। পক্ষাঘাত রোগ-পীড়িত যুবক প্রভুর অসাড় পা দুখানি নিজ জঙ্ঘাদেশে স্থাপন করিয়া প্রভুভক্ত দাস যেমন "এখনও প্রাণ আছে কি না" দেখিবার জন্য প্রভুর মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে অশ্রু-তৈল মৃদুভাবে লেপন করিতে থাকে এবং চিকিৎসকের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতে থাকে, আজ আমার ঠিক সেই দশা। মৃতবৎ অসাড় ও শীতল পা দুখানি কোলে করিয়া কাঁদিতেছি, পেটমোটা ডাক্তারদিগকে যদেচ্ছা গালি দিতেছি, কেননা তাঁহাদের আর অবসর হইল না। এদিকে প্রভু কণ্ঠরোধ অবস্থায় নিস্পন্দভাবে পতিত! এসুখের সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া (কারণ এখনও জ্ঞান শূন্য হন নাই) চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন—জীবনের উচ্চাশা সকল সাধন করিবার অবসর হইল না বলিয়া মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, আর হতভাগা প্রভুভক্ত আমি চমকিয়া উঠিতেছি ও বলিতেছি "এখনও আশা" আছে। আবার ভাবিতেছি, না সে দুরাশা মাত্র। প্রভুর যথোপযুক্ত সুশ্রূষা হইল না বলিয়াই কি এই অকাল মৃত্যু? এই অগ্নিময় ভাব

এক একবার মনে উদয় হইতেছে, আর আমার সমস্ত বক্ষ গহ্বরস্থ শোণিত বাষ্পাকারে চক্ষুদ্বার দিয়া বহির্গত হইতে গিয়া বাহ্য জগতের শীতল বায়ুস্পর্শে অশ্রুধারায় পরিণত হইয়া আবার বক্ষপ্রাচীরেই নিপতিত হইতেছে। হায় প্রভোঃ! যদি যথা সময়ে উপযুক্ত সম্পাদক ভৃত্য নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে এই মরিবার দিনেও কোমল শয্যায় একটু আরাম পাইতেন! এখনও বলি, হে স্বজাতি হিতৈষীগণ! এ হতভাগাকে (আমাকে) পদাঘাতে দূর করিয়া আপনারা কেহ ভৃত্যের আসন গ্রহণ করুন ও সমগ্র জাতির জীবন স্বরূপ মৃতপ্রায় সমিতিকে, যদি পারেন, তবে কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করুন। আমি মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, আমি দাসের উপযুক্ত পাত্র নহি। যে জাতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উপাধীধারীর অভাব নাই, তথায় আমার মত অশিক্ষিত ব্যক্তির সম্পাদকের পদগ্রহণ কোন মতেই শোভা পায় না। দাম্ভিক জগতে নামে অনেক কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। এখনই যদি প্রচার হয়, ছোটলাট বাহাদুর "উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতির" অমুক তারিখের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণে মতদান করিয়াছেন, দেখিবেন ভিড়ের ঠেলা! তখন আর কোন সভ্যের "শরীর অসুস্থ" হইবে না। কাহারও "কার্য্যানুরোধ" ঘটিবে না। সম্মুখ স্থান অধিকার করিবার জন্য নিরূপিত সময়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সকলেই হাজির। তাই বলি এখনও যদি নাম জাদা লোক মদীয় আসন গ্রহণ করেন তবে সমিতির এই ওষ্ঠাগত প্রাণ ফিরিয়া হৃদপিণ্ডে যাইবার সম্ভব।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, হঠাৎ এরূপ অবৈধ অবতরণিকার প্রয়োজনীয়তা কি? উত্তর সুদূরে নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি "উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতি" এক্ষণে পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত—স্পন্দহীন ও অসাড়। এ রোগ না কি হটাৎ হয়, তাই সংবাদ পাঠকবর্গের শ্রবণ বিবরে এখনও পঁহুছে নাই। সমিতির জন্ম বৃত্তান্ত হইতে যৌবন দশা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ "প্রতিনিধির" প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস সাঁই মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ বৃথামাত্র। তদনন্তর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহারই বর্ণনা প্রয়োজন। *

এ কথা নিশ্চয় যে, "ছাত্রনীতি সমিতির" ন্যায় ইহার প্রতি সপ্তাহে অধিবেশন হওয়া অসম্ভব ও অনাবশ্যক। তাই বলিয়া যে, বৎসরান্তে ইহার কার্য্যকরী সভার অধিবেশন হইবে না, ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্যই আমি সভ্যগণকে যথা বিহিত সম্মান পুরঃসর এক এক খানি পত্র লিখি। তাহার প্রধান মর্ম্ম এই যে, কোন্ তারিখে, কোন্ সময়ে, কোন স্থানে "উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতির" কার্য্যকরী সভা আহূত হইলে তাঁহাদিগের উপস্থিত হইবার সুবিধা হয়। যদিও সকল সভ্যের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর লিপি পাই নাই, তথাপি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছিলাম যে, অধিকাংশ সভ্যেরই ইচ্ছা, সেক্রেটরি দ্বারা কলিকাতায় কোন এক রবিবারে

* যদি কোন কার্য্য বর্দ্ধমানে হইয়া থাকে, তথাকার সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া "প্রতিনিধিতে" প্রকাশ করিবেন।

সভা আহূত হয়। আরও শুনিয়াছিলাম যে, "কতকগুলি 'ভাঙ্গামঙ্গল-চণ্ডীর' উপদ্রবে বর্দ্ধমানে কোন কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে হইবার যো নাই।" সুতরাং ব্যস্ত হইয়া আমি ৭ই ভাদ্র রবিবার দিন ধার্য্য করিয়া সভ্যগণকে রামকান্ত মিস্ত্রীর গলিতে ২২ নং ভবনে সমবেত হইতে সানুনয়ে আহ্বান করি। দূরস্থানবাসী (বীরভূম প্রভৃতি) সভ্যগণ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া সময় থাকিতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন; আর নিকটস্থ "জ্ঞানবানদল" নিস্তব্ধ রহিলেন দেখিয়া বুঝিলাম, তাঁহারা যথাকালে উপস্থিত হইবেন। ক্রমে যথাকাল উপস্থিত। ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া প্রভুর "রোগ বিবরণ" তালিকা হস্তে লইয়া আমি বসিয়া আছি। নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হয় হয় এমন সময়ে নিম্নলিখিত সহৃদয় সভ্যগণ উপস্থিত হইলেন। যথা শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন তা (সহকারী সভাপতি), শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস সাঁই, শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যনারায়ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র হুই। যথাকাল চলিয়া গেল কিন্তু যথা পরিমাণ সভ্য (অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ) সমবেত হইলেন না। সুতরাং অযথা হইবে বলিয়া কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করা হইল না। পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত সমিতি অসাড় নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল।

পাঠক মহাশয়! একবার আমাকে ক্ষমা করিবেন; এই স্থলে একটু অনধিকার চর্চ্চা করিতে স্বতই ইচ্ছা হইতেছে, কতকটা সুযোগও পাইয়াছি। আপনার বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, এই "উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধিতেই" শিক্ষাভিমানী উগ্রক্ষত্রিয়েরাই "প্রকৃত শিক্ষিত কে" এই বিষয় লইয়া তুমুল বাদ প্রতিবাদ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বাদ প্রতিবাদকারী মহোদয়দিগের মনে শিক্ষাভিমান না থাকিলে 'শিক্ষিত' শব্দ লইয়া অত বাক্‌বিতণ্ডা করিতেন না। অহো শিক্ষাভিমানী স্বসমাজ হিতৈষি (?) বাদপ্রতিবাদকারিগণ! বলুন দেখি আপনারা কি কেহ এই কার্য্যকরী সভার সভ্য? যদি হয়েন, তবে কি উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব শিক্ষাভিমানিত্বের গৌরব রক্ষা করা উচিত ছিল না? কেবল কি শিক্ষাভিমানেই অন্ধ!

কোন জাতি বা সম্প্রদায়ে প্রকৃত শিক্ষিত লোক আছে কি না তাহা জানা অতি কঠিন ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুৎকারে যাহাদের মস্তিষ্ক বিস্ফারিত হইয়াছে, তাহাদিগকে অনেকে শিক্ষিত বলেন না। এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তির হৃদয় প্রশস্ত, উদার ও স্বজাতি প্রেমে মুগ্ধ হয় এবং যিনি স্বজাতির মঙ্গল কামনায় স্বার্থ বিসর্জন দিতে শিখিয়া থাকেন, তাঁহাকেই মহাজনেরা বলেন "শিক্ষিত"। যাক্ একথা লইয়া আমার এস্থলে অধিক আলোচনার আবশ্যক নাই। কেবল শিক্ষিত দলের হৃদয়-ছবি তাঁহাদিগের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। দোষগুণ বিচারের আমি যোগ্য পাত্র নহি।

শ্রীকুমুদবিহারী সামন্ত
"উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতির" সম্পাদক।

সতরঞ্চ-বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা-পূরণ। *

সাদা—	কাল—
১। নৌকা জ৮ হইতে ক৮।	১। রাজা ঙ৭ হইতে ঘ৬।
২। গজ ক৭ হইতে খ৮ (কিস্তী)।	২। রাজা ঘ৬ হইতে গ৫।
৩। নৌকা ক৮ হইতে ক৪।	৩। রাজা গ৫ হইতে খ৬।
৪। ঘোড়া ঙ৫ হইতে ঘ৭ কিস্তী মাৎ।	

অথবা

সাদা—	কাল—
১।————	১।————
২।————	২। রাজা খ৬ হইতে ঙ৭।
৩। বড়ে জ৫ হইতে জ৬।	৩। রাজা ঙ৭ হইতে যাহাই চালুক।
৪। গজ খ৮ হইতে ঘ৬। ওটসার কিস্তী মাৎ।	

—*—

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা-পূরণ। *

সাদা—	কাল—
১। মন্ত্রী ঙ৫ হইতে চ৪।	১। রাজা গ৯ হইতে গ৫।
২। মন্ত্রী চ৪ হইতে খ৮।	২। রাজা গ৫ হইতে গ৪।
৩। মন্ত্রী খ৮ হইতে খ৪। কিস্তী মাৎ।	

* জেলা বর্দ্ধমান, পোঃ সাহেবগঞ্জ, সাং রামপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রথমে এই দুইটী প্রতিজ্ঞার বিশুদ্ধ পূরণ পাই। সুতরাং তিনিই আমাদিগের উপহার প্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র।

আমরা আহ্লাদের সহিত আরও প্রকাশ করিতেছি যে, জেলা বর্দ্ধমান পোঃ বনপাশ সাং মোহনপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর খাঁ মহাশয়ের নিকট হইতেও এই দুই প্রতিজ্ঞার যথার্থ পূরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

অথবা

সাদা—	কাল—
১।————	১। রাজা গ৪ হইতে খ৫।
২। গজ ঙ৪ হইতে খ৭।	২। রাজা যাহাই চালুক।
৩। মন্ত্রী চ৪ হইতে খ৪ কিস্তী মাৎ।	

অথবা

সাদা—	কাল—
১।————	১। রাজা গ৪ হইতে গ৩।
২। গজ ঙ৪ হইতে ঘ৫।	২। রাজা গ৩ হইতে { খ২ বা ঘ৩
৩। মন্ত্রী চ৪ হইতে { গ১ বা ঘ২ কিস্তী মাৎ।	

অথবা

সাদা—	কাল—
১।————	১। রাজা গ৪ হইতে খ৩।
২। গজ ঙ৪ হইতে ঘ৫ (কিস্তী)।	২। রাজা খ৩ হইতে { খ২ বা গ৩ বা ক৩
৩। মন্ত্রী চ৪ হইতে { গ১ বা ঘ২ বা খ৪ কিস্তী মাৎ।	

পঞ্চম প্রতিজ্ঞা।

(বনপাশ মোহনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যুগোলকিশোর খাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত)।

কালর দিক।

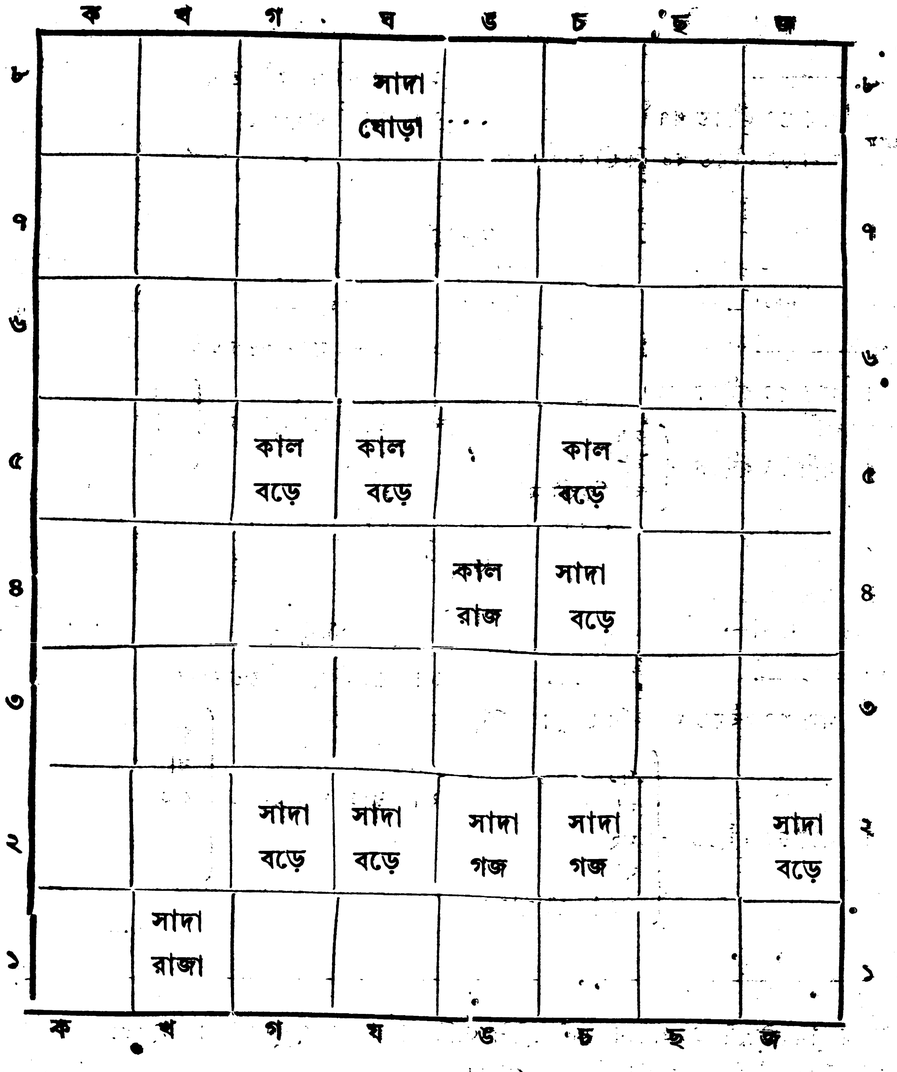

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	
৮				সাদা ঘোড়া					৮
৭									৭
৬									৬
৫			কাল বড়ে	কাল বড়ে		কাল বড়ে			৫
৪					কাল রাজ	সাদা বড়ে			৪
৩									৩
২			সাদা বড়ে	সাদা বড়ে	সাদা গজ	সাদা গজ		সাদা বড়ে	২
১		সাদা রাজা							১
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	

সাদার দিক।

সাদা প্রথম চালিয়া কালকে তৃতীয় চালে মাৎ করিবে।

শ্রী কুঞ্জবিহারী সামন্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমরা সম্প্রতি সিটি থিএটারে "সরলা" ও "তাজ্জব ব্যাপারের" অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম; এই সম্প্রদায়ের অভিনয় নৈপুণ্যের বিষয় নূতন করিয়া বলা অনাবশ্যক; অভিনেতা, অভিনেত্রীগণ সকলেই পুরাতন ও উপযুক্ত। সরলার অভিনয়ে দেখিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে। নীচমনা, অর্থ পিশাচী রমণীগণ কিরূপে তাহাদের স্বামীকে বোকা সাজাইয়া, কুপরামর্শ দিয়া স্নেহের সহোদরকে ত্যাগ করাইয়া সুখের সংসারকে দুঃখময় করিয়া তুলে তাহা প্রমদার চরিত্রে বিশেষরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্য দিকে পতিব্রতা, ক্লেশসহিষ্ণু লক্ষ্মী রূপা সরলার ধৈর্য্য, স্বামীভক্তি, কাতরতা দেখিয়া কাহার হৃদয় হর্ষে ও দুঃখে বিগলিত না হয়! বঙ্গীয় গৃহস্থের গৃহে যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে "সরলার" অভিনয়ে তাহা বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে। গদাধরচন্দ্র ও নীলকমলের অভিনয়ে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। শশিভূষণের ও শিশু গোপালের অংশ অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া ছিল। "তাজ্জবব্যাপারের" সকল ব্যাপারই তাজ্জব। সরলার সহিত তাজ্জবব্যাপারের একত্র অভিনয় সোণায় সোহাগা। মোটের উপর সরলার অভিনয় দর্শনে ও সেক্রেটারি নিলমাধব বাবুর ভদ্রতা ব্যবহারে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমরা আশা করি এই কোম্পানীর দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হউক।

গতবারে আমরা গভর্ণমেণ্টের বিরূদ্ধাচরণ অপরাধে সহযোগী "বঙ্গবাসীর" হাইকোর্টের দায়রা সোপরদ্দ হওয়ার কথা পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছিলাম। উক্ত আদালতের প্রধান বিচারক জুরিদিগের বিভিন্ন মত দেখিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিয়া আগামী সেশনে বিচারের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে আসামী চতুষ্টয় নানারূপ উদ্যোগ চেষ্টা করিয়া ছোটলাট বাহাদুরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া তৎসমীপে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন এবং সেই আবেদন পত্রের প্রতিলিপি নব-গঠিত "সম্পাদক সমিতি" এবং "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েসনের নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত সভাদ্বয়ের সেক্রেটরীরা আবার "বঙ্গবাসীর" দুঃখে দুঃখিত হইয়া গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ প্রার্থনা করায়, দয়াদ্রচিত্ত ছোটলাট বাহাদুর ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট বঙ্গবাসীকে এ ক্ষেত্রে অব্যাহতি দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখেন। বড়লাট তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কাগচ পত্র পাঠ করিয়া ছোটলাট বাহাদুরের মতে আনন্দের সহিত

সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গবাসীর মোকর্দ্দমা আর সেশেনে উঠিবেনা। আমরা সহযোগীকে বিপদমুক্ত হইতে দেখিয়া আন্তরিক সুখী হইলাম। আরও সুখের কথা এই যে, সহযোগীর মোকর্দ্দমা উপলক্ষে প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের সম্পাদক লইয়া একটী "সম্পাদক সমিতি" গঠিত হইয়াছে। সম্পাদক সমিতির উদ্দেশ্য মন্দ নহে। গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধীয় কোন বিষয় লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতে হইলে কিরূপ ধরণে চলিতে হইবে, "সম্পাদক সমিতি" সভা আহ্বান করিয়া পূর্ব্বেই তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। এরূপ যুক্তি পরামর্শ করিয়া যদি দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ পরিচালিত হয়, তাহা হইলে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দীর্ঘ স্থায়ী হইবে বলিয়াই বোধ হয়। সহযোগীর মোকর্দ্দমায় অনেক দেখা গেল অনেক শিখা গেল!

বিলাতে আলেকজেণ্ডার জ্যাকুইস্ নামক একব্যক্তি ৫০ দিন উপবাস করিব বলিয়া বাজী রাখিয়াছে। ৩৩ দিন উপবাসের পর তাহার দেহের প্রায় ।০ সের ওজন কম হইয়াছে। তাহার নাড়ী শরীরের উত্তাপ ইত্যাদি সমস্ত ঠিক আছে। এরূপ কঠোর পণে অর্থ উপায়ের চেষ্টা কেন?

পঞ্চমবর্ষীয় বালক চুড়াচন্দ্র ইংরাজ কর্ত্তৃক মণিপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। দুধের ছেলে কি প্রকারে রাজ্যশাসন করিবে তা পাঠক বুঝিতেছেন কি? ইংরাজ নাকি তার হর্ত্তাকর্ত্তা, অথচ ইংরাজ খেলোয়ার ভাল তাই "কাণা কড়িতেও খেলিতে পারিবে।" পাঠকের মনে থাকে যেন মণিপুর মাহারাণীর রাজ্যভুক্ত করা হয় নাই। লাভ নাই!

আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদল আপনাদের গুণের সম্প্রতি আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছেন। বিবিধ প্রকার গ্যাস পরিপূর্ণ বেলুন (ডিনামাইট্) পরিস্কার আকাশে ছাড়িয়া দিবার পরই মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন ও ব্রজাঘাতের ন্যায় কড় কড় শব্দ হইয়া গুড় গুড় শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় এরূপ বিজ্ঞানের বিকাশ পুরাকালেও ছিল, তবে তাহা রূপকে বর্ণিত।

আমরা নিম্নলিখিত পুস্তক ও সংবাদ পত্রগুলি, সমালোচনা ও বিনিময়ের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এবারে স্থানাভাবে পুস্তকাদির সমালোচনা প্রকাশিত হইল না। আগামীবারে প্রকাশ করিবার কামনা রহিল।

(১) শুভঙ্করী ও মানসাঙ্ক শ্রীরামশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। (২) প্রণয়ী-যুগল। শ্রীবাসুদেব চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। (৩) হিতবাদী। (৪) ইউনিটি এণ্ডদি মিনিস্টার। (৫) জন্মভূমি, (ভাদ্র সংখ্যা)। (৬) নব্য-ভারত (ভাদ্র সংখ্যা)। (৬) চিকিৎসা সম্মিলনী (৮) তত্ত্বকৌমুদী। (৯) চারুবার্ত্তা। (১০) বর্দ্ধমানসঞ্জীবনী। (১১) রংপুরদিক্‌প্রকাশ। (১২) হিতকরী। (১৩) হিন্দুরঞ্জিকা। (১৪) বামাবোধিনী-পত্রিকা।

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

প্রথম খণ্ড।

বিবাহে পণ গ্রহণ বা পুত্র কন্যা বিক্রয়।

মহামতি বল্লাল সেন সমাজে গুণবান্ ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দিবার জন্যই কৌলিন্য-প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কাল মাহাত্ম্যে গুণগত কৌলিন্য, বংশগত কৌলিন্যে পরিণত হওয়ায় তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এদেশবাসীগণকে শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়েই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। কি জানি কি কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষা চরিত্রগত না হইয়া পাশগত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মহৎ উদ্দেশ্যও বিফল হইয়া যাইতেছে। চরিত্রহীনতা ও নৈতিক শিক্ষার অভাবই কৌলিন্য ও শিক্ষা বিভ্রাটের একমাত্র কারণ। শিক্ষায় লোকের চরিত্র সংগঠন হয়, শিক্ষায় লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিতা হয়, শিক্ষায় লোকের হিতাহিত জ্ঞান জন্মে, শিক্ষার বলেই লোক ক্ষুদ্র স্বার্থবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া পবিত্র নিস্বার্থ ব্রত গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, শিক্ষায় অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয়, এক কথায় শিক্ষায় লোকের পশুত্ব ঘুচিয়া মনুষ্যত্ব জন্মে। শিক্ষায় লোক অন্ধকার হইতে আলোকে গমন করে বলিয়া শিক্ষার এত আদর—শিক্ষিতের এত সম্মান!

আমরা শিক্ষিত বলিলে, সাহিত্য-গণিত-বিজ্ঞানাদি বিদ্যায় পারদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধিৎসু, মাতৃভাষায় অধিকারী, শাস্ত্রজ্ঞ, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, বিলাসত্যাগী, স্বদেশপ্রেমিক, বিনীত ও চরিত্রবান্ ব্যক্তিকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের "শিক্ষিত" শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। মাতৃভাষায় যাহার বর্ণাশুদ্ধি বোধ নাই অথচ ইংরাজীভাষায় স্বপ্ন দেখা যাহার অভ্যাস, শাস্ত্রের সহিত যাহার অহি-নকুল সম্বন্ধ অথচ মন্বাদি ঋষিগণের শ্রাদ্ধ করিতে যিনি মজবুত, ধর্ম্মশব্দের ব্যাখ্যাও যাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই অথচ যিনি মাতৃ-দুগ্ধের গন্ধ মুখ হইতে যাইতে না যাইতেই আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন, যিনি যুক্তির কোন ধারই ধারেন না অথচ প্রকাশ্য সভা সমিতিতে কথায় কথায় তর্কজাল বিস্তার করতঃ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক বক্তৃতা দিতে মুক্ত-

জিহ্ব, যিনি গোপনে মদ মুরগী মারেন অথচ প্রকাশ্যে "গোঁড়া হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দেন, পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে অশ্রুনীরে ভাসাইয়া যিনি বারবিলাসিনীর শয়ন কক্ষে প্রতি রজনী যাপন করিয়া থাকেন এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও কূট তর্ক বলে মিথ্যা প্রবঞ্চনাকে নিয়ত সত্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পান অথচ লোক সমাজে আপনাকে চরিত্রে ভীষ্ম ও ধর্ম্মে যুধিষ্ঠিরের আসনে বসাইতে কুণ্ঠিত হ'ন না, যিনি অবশ্য প্রতিপাল্য আত্মীয় স্বজনকে গলগ্রহ ভাবিয়া স্বাবলম্বন নীতির অনুসরণ করিতে পরামর্শ প্রদান করেন অথচ "অসার খলু সংসারে সার শ্বশুর নন্দিনী" এবং তদাত্মীয় স্বজনের সেবার জন্য "কলুর চোক বাঁধা বলদের মত" আমরণ সংসারক্ষেত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবনপাত করিতে কৃতসঙ্কল্প, ভিক্ষুক উচ্চকণ্ঠে এক মুষ্টি তণ্ডুল প্রার্থনা করিলে যিনি তাহাকে শান্তি ভঙ্গ অপরাধে জেলে দিতে প্রস্তুত অথচ সুদূর আইসল্যাণ্ডবাসী দিগের দারিদ্র্য-দুঃখে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না, সোদরপূরণ ও বাবুগিরি ব্যতীত অপর কোন কার্য্যই যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না অথচ সর্ব্ব বিষয়ে মৌখিকতাই যাহার সম্বল—মোটের উপর এক কথায় মনুষ্যোচিত অন্যান্য গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, "যেন তেন প্রকারেণ" আজি কালিকার কালে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের "পাশ" প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই শিক্ষিত বলিয়া গণ্য। আবার সমাজে এইরূপ শিক্ষিতেরই সম্মান অধিক। নৈতিক শিক্ষা এখন আর শিক্ষার অঙ্গীভূত নহে—চরিত্র সংগঠন এখন আর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নহে। এই সব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি বিজ্ঞ লোকের দিন দিন শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতেছে। কৌলিন্য ও শিক্ষার দশা সমান দাঁড়াইয়াছে। গুণগত কৌলিন্য যখন বংশগত হইয়া পড়িল, তখনই সমাজে একটী ভয়ানক কুপ্রথার প্রতিষ্ঠা হইল। তাহার নাম বহুবিবাহ। পাশ্চাত্য শিক্ষাও নীতি ও চরিত্রগত না হইয়া "পাশগত" হওয়ায় সমাজে আর একটী গুরুতর কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। সেটীর নাম "বিবাহের পণ প্রথা।" আমরা অদ্য পণ প্রথার অনিষ্টকারিতা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বর্ষাকালে যখন নদী পূর্ণ হইয়া যায়, তখন সাগর পানে একটানা স্রোত বহিতে থাকে। সেই স্রোতে মানুষ গরু, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, তৃণ বল্লরী যাহা পড়ে তাহাই ভাসিয়া যায়। তন্মধ্যে অধিকাংশ সমুদ্রে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই বিনষ্ট হয়, অবশিষ্ট যাহারা সাগরে গিয়া পড়ে তাহাদের আর দুর্গতির সীমা থাকে না। চেতন জীব এতকাল অসাড় নিস্পন্দের ন্যায় স্রোতের অনুকূলে গা ভাসাইয়া যখন সাগরে গিয়া পড়ে, তখন তাহার কথঞ্চিৎ অসাড়তা ঘুচিয়া যায়—কিয়ৎ পরিমাণে চেতনার সঞ্চার হইতে থাকে। তখন সে অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে চাহিয়া দেখে অকূল সমুদ্রের চতুর্দ্দিকেই কেবল অসীম নীলাম্বু রাশিতে উত্তাল তরঙ্গরাশি উত্থিত হইতেছে! কূল নাই, কিনারা নাই, তাহার উপর আবার শরীরে শক্তি নাই, সুতরাং জীবনের আশাও নাই। এরূপ অবস্থায় ভয় ও অঙ্গশিথিলতার জন্য অনেকেই প্রাণ বিসর্জ্জন করে,

কেহ বা কদাচিৎ অনুকূল বায়ুর প্রসাদাৎ কেহ বা দৈবাগত কাষ্ঠখণ্ডের আশ্রয়ে তীর প্রাপ্ত হয়। আমাদের বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের দশাও অবিকল ঐরূপ। এই সমাজে যখন কোন নূতন প্রথার প্রচলন হয়, তখন তাহার একটানা স্রোত বহিতে থাকে। বিচার নাই আচার নাই, শিক্ষিত নাই অশিক্ষিত নাই, সকলেই সেই স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন। নব প্রবর্ত্তিত প্রথার বাহ্য চাকচিক্যে প্রথম প্রথম এমন মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, উপস্থিত বা ভবিষ্যৎ বিপদের প্রতি কেহই লক্ষ্য রাখেন না বা রাখিবার শক্তিও থাকে না। বলা বাহুল্য অত্যল্প কাল পরেই প্রবর্ত্তিত প্রথার গুণভাগ অদৃশ্য হইয়া পড়ে, শূন্য স্থান অচিরেই দোষ পূর্ণ হইয়া উঠে। স্থান শূন্য থাকিতে পারে না ইহা প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়ম। দোষগর্ভ প্রথার পরিণাম সামাজিক অধঃপতন। জগতের ইতিহাস ইহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসিতেছে; প্রত্যক্ষ প্রমাণও অননুভূত নহে। যাহা হউক যাহারা এই স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় তাহারা অধঃপতনের সান্নিধ্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আর কিছুতেই চেতনা লাভ করিতে পারে না। ভাগ্যক্রমে যাহারা যত পূর্ব্বে চেতনা লাভ করিতে পারে, তাহারা সেই পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়। আর যাহাদের কিছুতেই চৈতন্য হয় না তাহারা অধঃপতনের তলস্পর্শ করিয়া তবে ক্ষান্ত হয়। তখন চক্ষু ফুটে কিন্তু আর ফলোদয় হয় না। কারণ তখন জীবনী-শক্তি এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে, আর কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকে না। কেহ হস্ত ধরিয়া তুলিতে গেলেও আর দাঁড়াইয়া দিতে পারে না। এইরূপেই আমাদের বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের অধঃপতন ঘটিতেছে।

কৌলিন্য প্রথায় এইরূপ সামাজিক অধঃপতন ঘটিয়াছিল। দারিদ্র্য, ব্যভিচার, বহুবিবাহ তাহার চরম ফল। এক্ষণে লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে কিন্তু সম্যক্ প্রকারে ঐ ত্রিবিধ পাপের তিরোভাব হয় নাই। আবার সমাজ মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার একটানা স্রোত চলিয়াছে; সকলেই সে স্রোতে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছেন। ইহারও চরম ফল অনেক গুলি দাঁড়াইয়াছে। এই সকল ফলের মধ্যে "বিবাহে পণ প্রথা" একটী। আমাদের মতে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাজপীড়ক হইয়া উঠিয়াছে।

তবে কি "কৌলিন্য" ও "পাশ্চাত্য শিক্ষা" অতি অপকৃষ্ট পদার্থ? কৌলিন্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে সমাজের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে তাহা কি কৌলিন্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে, না উহার ভিতর আর কিছু আছে? প্রকৃত পক্ষে কৌলিন্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা অপকৃষ্ট পদার্থ নহে। প্রকৃত কুলীন ও প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা কখন অধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। তাহা হইলে আর তাহাদের কৌলিন্য ও শিক্ষার গৌরব থাকিল কোথা? সেই কুলীন ও সেই শিক্ষিতের দ্বারাই পাপ প্রথা সমর্থিত হয়, যে কুলীন ও যে শিক্ষিত চরিত্রহীন। চরিত্র-পরিশূন্য কৌলিন্য ও শিক্ষা অতি ভয়ানক পদার্থ। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সমাজে চরিত্রের আদর বড় কম। যে সমাজে অতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও প্রকৃত গুণবিশিষ্ট কুলীনের চতুর্দ্দশ অথবা

ততোধিক সংখ্যক বংশধর হেতু কুলীন এবং লিপিকুশলতা ও বাক্ পটুতা গুণে শিক্ষিত বলিয়া গণ্য ও আদৃত সে সমাজের মঙ্গল কোথায় বলিতে পারি না। যত দিন চরিত্রের আদর সমাজে না হইতেছে তত দিন কোন রূপ মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে না। শিক্ষিতই হউন আর ধনবানই হউন, কুলীনই হউন আর পরম রূপবানই হউন, আমরা চরিত্রহীন ব্যক্তিকে আদর করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের শাস্ত্রও চরিত্রহীন ব্যক্তিকে আদর করিতে উপদেশ দেন না। মহাভারতে যক্ষ যুধিষ্ঠির সংবাদে যক্ষ ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—"হে রাজন্! কুল, চরিত্র, বেদ পাঠ ও বেদার্থের অবধারণ কিসের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব হয়?" ধীমান যুধিষ্ঠির কহিলেন "হে তাত যক্ষ! কুল, বেদ পাঠ বা বেদার্থের অবধারণ ব্রাহ্মণত্বের প্রতিকারণ নহে। একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের প্রতিকারণ সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের বিশেষ রূপ যত্ন সহকারে চরিত্র রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কারণ যাহার চরিত্র ক্ষীণ না হয়, সে কিছুতেই ক্ষীণ হয় না, যে চরিত্রাংশে হত হয় সে বাস্তবিকই হত। চতুর্ব্বেদবেত্তা ব্যক্তিও দুশ্চরিত্র হইলে শূদ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত হয় না।" শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন;—

"বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষেদ্বিত্তমেতি চ যাতি চ।
অক্ষীণো বিত্ততঃ ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতোহতঃ॥
শীলং প্রধানং পুরুষে তদ্যস্যেহ প্রণশ্যতি।
ন তস্য জীবিতেনার্থো ন ধনেন ন বন্ধুভিঃ॥"

অর্থাৎ যত্ন সহকারে চরিত্র রক্ষা করিবেক। ধনের আগম ও নির্গম নিরন্তর হইয়া থাকে। ধন বিষয়ে ক্ষীণ হইলে ক্ষীণ বলা যায় না; যে ব্যক্তি চরিত্র বিষয়ে হত হয়, সে বাস্তবিকই হত হয়। চরিত্রই পুরুষের প্রধান গুণ। ইহলোকে যে ব্যক্তির উহা নষ্ট হইয়াছে তাহার জীবন, ধন ও বন্ধুতে কিছু লাভ নাই।" চরিত্র সংরক্ষণের প্রতি অমনোযোগই আমাদের সামাজিক অধঃপতনের প্রধান কারণ। চরিত্রের আদর করিলেই সমাজে কোন প্রকার কদাচার থাকিতে পারে না। আমরা এই নীতিরই পক্ষপাতী। সমাজকেও সকাতরে এই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি।

চরিত্রহীনতা বশতই আমাদের এই অধঃপতিত সমাজ বিধাতার কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে। সেইজন্যই বহুকাল যাবৎ এই সমাজ হইতে শান্তি সুখ অন্তর্হিত হইয়াছে। পাপের প্রশ্রয় দিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। যদি কাল মাহাত্ম্যে বল্লাল সেনের সৃষ্ট কৌলিন্য প্রথায় পাপ প্রবেশ করায় উহার আদর দিন দিন কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় রূপ বল্লাল সেন, পাশ্চাত্য শিক্ষারূপ কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়া আবার সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কৌলিন্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া যেমন শত শত মোহান্ধ ব্যক্তি, মৌলিকের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র থাকিতেও, কুলীনের সহিত সম্পর্ক জনিত গর্ব্বে গর্ব্বিত হইবার আশয়ে, মূর্খ বিত্তহীন বরে স্বর্ণ প্রতিমা কন্যা রত্ন সম্প্রদান করিয়া "যদি কিঞ্চিদ্বরে দোষা কিং কুলেন ধনেন বা" এই মহদ্বাক্যের মস্তকে পদাঘাত করত অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাণসমা দুহিতাকে চির দুখার্ণবে নিক্ষেপ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিত, সেইরূপ আজি কালিকার কালে সকলেই

পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে উন্মত্ত হইয়া, চরিত্র ও নীতির প্রতি ভ্রমেও লক্ষ্য না রাখিয়া আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত শিক্ষিত অথবা তৎ তৎ বিষয়ে যাহারা "কপচাইতেছে" এরূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছেন। যথা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াও, গুরুতর ঋণভার স্কন্ধে লইয়াও যদি ইংরেজী এলেমওয়ালা জামাতারত্ন লাভ করিতে পারা যায়, তবেই আজি কালিকার দিনে দুর্লভ মানব জন্ম গ্রহণ সার্থক হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট কুলীন মহোদয়দিগকে কন্যাদান করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইলেও শ্বশুর মহাশয় লোক সমাজে "চড়কে হাসি" হাসিয়া বলিয়া থাকেন "ধন্যোহহং কৃতকৃত্যোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।" আর শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীদিগেরত কথাই নাই, তাঁহারা এরূপ জামাতা লাভে অষ্ট প্রহর আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া বসিয়া থাকেন। কালে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এ আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। আমরা এবম্প্রকারে কন্যা সম্প্রদান করিয়া অনেক শ্বশুর শ্বাশুড়ীকেই অশ্রুমুখে বলিতে শুনিয়াছি;—

"সুখের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিনু
আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি সেবিতে দারিদ্র্য বেড়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসানু সাগর বাঁধিনু
মাণিক পাবার আশে।
সাগর সুখাল মাণিক লুকাল
হামার করম দোষে॥
বিধি রে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ পেখি॥
পিয়াস লাগিয়ে জলদে সেবিনু
পাইনু বজর তাপ।"
কবি কহে খেদে আগে না বুঝিয়ে
পাছে কেন করহ অনুতাপ॥

এই অবসরে আমরা "কুলীনসন্তান" ও "শিক্ষিত" মহোদয় দিগের কোপ হইতে আত্ম রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ সাফাই গাওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেছি। প্রাণের কথা বলিতে গেলে আমরা বংশগত কৌলিন্য প্রথার পক্ষপাতী না হইলেও সমাজের মঙ্গল কামনা করিয়া উহার উচ্ছেদ কামনা করি না। আমাদের সমাজে বর্ত্তমানে যে সকল প্রথা প্রচলিত আছে, আমরা তাহার উচ্ছেদ কামী নহি; কিন্তু সমাজের হিতের জন্য উহার দূষিত অংশের সংস্কার ইচ্ছা করিয়া থ কি। আমরা কুলীনসন্তানদিগকে তাঁহাদের কৌলিন্য বা মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিতে বলি না বা মৌলিকদিগকেও তাঁহাদের সে মর্য্যাদার হানী করিতে উপদেশ দেই না। আমরা বলি তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে গুণে আত্ম মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সেই আত্ম মর্য্যাদার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিয়া চলুন। আর যাঁহাদের প্রাপ্ত মর্য্যাদায় তাঁহারা পুরুষানুক্রমে সম্মানিত সুতরাং উপকৃত, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিয়া সহোদরের ন্যায় বিবেচনা করুন। কুলীনদিগের সহিত মৌলিকদিগের সেই খানেই

বিরোধ, সেখানে কুলীনগণ বৃথা আভিজাত্য গর্ব্বে অহংকৃত হইয়া মৌলিকদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। অন্য কর্ত্তৃক আপনাকে অবজ্ঞার চক্ষে দৃষ্ট হইতে দেখিলে কাহার মনে প্রতিহিংসা না জন্মে? অগত্যা সেই স্থলেই মৌলিক কুলীনের বিপক্ষবাদী হইয়া উঠে। কেবলি কুলীন মৌলিকের মধ্যে কেন আধুনিক ব্রাহ্মণ শূদ্র ও রাজা প্রজার মধ্যেও এই ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা মাহাত্ম্যে সকলেই গুণবানের আদর করিতে শিখিয়াছে। এখন আর নির্গুণকে কেহ আদর করিতে চাহেনা। গুণ ব্যতীত বাপ বড় বাপের দোহাই দিয়া এখন আর বংশ মর্য্যাদার গৌরব করা চলেনা। আবার তার উপরে যদি অহংকারের বাড়াবাড়ি হয়, তবে কি আর এ বাজারে "কল্‌কে মিলো" শাস্ত্রে স্ব স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার উপদেশ আছে কিন্তু পদমর্য্যাদা জনিত অহংকার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য একথা শাস্ত্র বারংবার বলিয়াছেন। আমাদের কুলীনসন্তানগণের নিকট এই অনুরোধ তাঁহারা তাঁহাদের পদমর্য্যাদার মস্তক হইতে ঘৃণিত অহংকারের টুপিটি খুলিয়া তৎস্থলে উদারতা রূপ কিরীটি পরাইয়া দিউন। দেখাবেও ভাল, আর সব অন্তর্বিদ্রোহও চুকিয়া যাইবে কুলীন মহাশয়দিগের সতত মনে রাখা উচিত, যেখানে ঘৃণা, যেখানে অকারণ আধিপত্য সেইখানেই বিদ্বেষ। আমরা আমাদের মনের কথা প্রকাশ করিলাম, ভরসা করি আমাদের এই সাফাইতেই কুলীনমহোদয়গণ সন্তুষ্ট হইবেন।

বলা বাহুল্য যে, আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিপক্ষ নহি। কিন্তু আমরা যেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় ভাবের অভাব দেখি, চরিত্র সংগঠন ও নৈতিক শিক্ষার অভাব উপলব্ধি করি, সেই খানেই আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি খড়্গহস্ত হই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের কোনই উপকার নাই, পাশ্চাত্য শিক্ষায় কেবল অবিমিশ্র অমঙ্গল আনিয়া দিতেছে, একথা যাহারা বলে তাহারা একদেশদর্শী সত্যের অপলাপকারী বা মতলবী। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের অন্ধপ্রায় চক্ষুকে দৃষ্টি শক্তি প্রদান করিয়াছে, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অস্বীকার করিবেন না। এক কথায় বলিতে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের চসমা স্বরূপ। ঐ চসমা চক্ষে দিয়া যদি আমরা বিজাতীয় বিষয় দর্শন না করিয়া জাতীয় বিষয় দর্শন করি, তবেই পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের পক্ষে মধুর অন্যথা বিষবৎ। আমাদের গৃহ নানাবিধ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ। বহুকাল হইতে আমরা শিক্ষার অভাবে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম; পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের দর্শন শক্তি জন্মিয়াছে। এক্ষণে যদি আমরা দর্শন শক্তি লাভ করিয়া গৃহের মণিকাঞ্চন পরিত্যাগ করতঃ পরের কাচ দর্শন করিতে যাই, তবে কি আমাদের অন্ধ থাকাই ভাল ছিল না? পাশ্চাত্য শিক্ষারূপ চসমা চক্ষে দিয়া যাহারা গৃহের মণি কাঞ্চনে অবহেলা করিয়া পরের কাচ দর্শন করিয়া বেড়ায়, আমরা তাহাদেরই বিপক্ষ। আর যাহারা স্বগৃহের রত্নোদ্ধারে জীবনকে উৎসর্গ করিয়া থাকেন তাহারাই আমাদের ভক্তির পাত্র। বোধ হয় আমাদের এই কৈফিয়তেই শিক্ষিতবর্গ পরিতৃপ্ত হইবেন।

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা যাউক। কন্যার পণ গ্রহণ পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল নহে। শিক্ষিত ব্যক্তি কখনই কন্যার বিক্রয় করেন না। বরং তাঁহারা কন্যা বিক্রয়কারীকে ঘৃণাই করিয়া থাকেন। এই ঘৃণার পরিমাণ যত অধিক হইবে, সমাজ হইতে ততই কন্যা বিক্রয় প্রথা উঠিয়া যাইবে। সমাজের অতি অপকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরাই কন্যা বিক্রয়রূপ কষাইবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। শিক্ষিত ও ভদ্র শ্রেণীদ্বারা এই প্রথা সমর্থিত নহে বলিয়া এ সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই। তবে সমাজ হইতে যাহাতে এই ঘৃণিত প্রথা উঠিয়া যায়, সেবিষয়ে সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত। অশিক্ষিত নীচাশয় ব্যক্তিগণ কন্যা বিক্রয়রূপ মহাপাপ অর্জ্জন করে বলিয়া আমাদের তত ক্ষোভের কারণ নাই। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা "বর বিক্রয়" রূপ পাপ অর্জ্জিত হইতেছে ভাবিলে মনে বড় কষ্টের উদয় হয়। চোরের মিথ্যা এজাহারে কোন কষ্ট হয়না, কিন্তু ব্যবহারাজীবদিগের মিথ্যা ব্যবহারে বড়ই দুঃখের উদ্রেক হইয়া থাকে। "বর বিক্রয় প্রথা" পাশ্চাত্য সমাজ হইতে আমদানি হয় নাই; উহা এদেশ-বাসীগণের পাশ্চাত্য শিক্ষা জনিত স্বার্থপরতা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষায় যদি চরিত্র ও নৈতিক শিক্ষার অভাব না হইত, তাহা হইলে কি এই সমাজ পীড়ক পাপ "বর বিক্রয় প্রথার" এত আধিক্য হইত? কখনই না।

প্রকৃত নবগুণবিশিষ্ট কুলীনের দ্বারা যেমন অধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য হইতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারাও নীতি বিরুদ্ধ প্রথা সমর্থিত হয় না। শিক্ষিত ব্যক্তি কখনই কন্যার পিতাকে পীড়ন করিয়া তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারেন না। নির্গুণ কুলীন মহাশয়দিগের দ্বারা যেমন সকল প্রকার অধর্ম্মই প্রশ্রয় পাইয়াছিল; সেইরূপ আধুনিক শিক্ষিত অর্থাৎ পাশকরা কুলীন মহাশয়দিগের "ডাকাতিতে" সমাজ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। কিন্তু এমনি দুর্ব্বল চিত্ত কুসংস্কারাপন্ন সমাজ যে, মুখে চীৎকার করিতেছে কিন্তু কার্য্যে ক্ষান্ত হইতেছে না এবং কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্টাও করিতেছে না। এখন দেখিতেছি কুলীনত ছিল ভাল, সামান্য রায়েই তাঁহাদের নিকট নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত কিন্তু হালী কুলীনদিগের কাছে সামান্যে এড়ান নাই। শ্বশুর বেচারী কাল কি খাবে তার সংস্থান নাই, কিন্তু ইংয়াজীজানা জামাতাকে পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি কি দুষ্কৃতির ফলে জানিনা, কন্যাদান করিতে হইলে তাঁহাকে ভিটা মাটি বিক্রয় করিয়া অথবা পেটে না খাইয়াও আজন্ম কেরাণীগিরিলব্ধ বহু আয়াসে সঞ্চিত ধন বিসর্জ্জন দিয়াও জামাতা বাপাজীর পাশ পাইতে যে খরচ হইয়াছে, তাহার সুদ সমেত (অবশ্য চক্র বৃদ্ধি অনুসারে) নগদ কোম্পানী ৫০০ হইতে কত উর্দ্ধ জানিনা,—পণ, চেন ঘড়ি, রূপার-দান, কন্যাভরণ ইত্যাদি আরও কতকি প্রদান করিতে হইবে। প্রিয় পাঠক মহোদয়গণ! ভাবুন দেখি কন্যাদায়গ্রস্তের কত বিপদ! জামাতারূপ পূর্ব্ব জন্মের উত্তমর্ণদিগের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকেই কন্যা প্রার্থনা করেন না। কিন্তু বিধাতার লিখন কে খণ্ডন করিবে?

ধনী এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর কথা আমরা ধরিনা। কারণ ধনীদিগের কোনরূপ ব্যয় ভার বহন করিতে কষ্ট নাই। আর শ্রমজীবিরাও শিক্ষিত (?) জামাতার খর্পরে যাইতে রাজী নহে, তাহারা সমানে সমানে কার্য্য করিয়াই পরিতৃপ্ত হয়। যত বিপদ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক লইয়া। ধরিতে গেলে সমাজে ইহাঁদের সংখ্যাই বেশী এবং ইহাঁদিগকে লইয়াই সমাজ। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় পোণেষোলআনা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকের অবস্থা ভাল নহে। বুনিয়াদি বলিয়া সমাজে ইহাঁদের মান সম্ভ্রম পূর্ব্বের ন্যায় বজায় আছে অথচ বিষয় বৈভব তাদৃশ নাই। এই শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তিই ঋণভার গ্রস্ত এবং অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সামাজিক পীড়া ইহাঁদিগকেই পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে হয়। ইহাঁরা আপনার কন্যাটীকে মূর্খ পাত্রে বা নীচবংশে প্রদান করিতে পারেন না। অগত্যা মানের দায়ে এবং কন্যার ভবিষ্যত সুখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাঁদিগকে "শিক্ষিত" জামাতার পদ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে হয়। শিক্ষিতের বাজারে কন্যার সুখ ক্রয় করিতে গেলে, শিক্ষার পরিমাণানুসারে দর দিতে হয়। এ বাজারে দয়া নাই, মায়া নাই, চক্ষু লজ্জাও নাইই, আছে কেবল শিক্ষাভিমানের আস্ফালন ও দর হাঁকাহাঁকি। হে দুর্ভাগ্য কন্যাদায় গ্রস্ত! তোমার কন্যাটী তিলোত্তমা সদৃশই হউক আর তোমার অবস্থা যতই কেন হীন হউকনা এবং তুমি যতই কেন ভদ্র ও বিনীত হওনা, তুমি এ বাজারে জামাই খরিদ করিতে আসিলেই তোমার নাকের জলে চক্ষের জলে এক হইয়া যাইবে; তোমার পানে কেহ চাহিবে না। এ বাজারে সকলের যে পিত্তলের চক্ষু! হা বিধাতঃ! কবে এই কষাইবৃত্তি সমাজ হইতে তুলিয়া দিয়া সমাজকে একটু শান্তি সুখ প্রদান করিবেন?

আমরা পণ প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী। যদি কেহ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া জামাতাকে যথা সর্ব্বস্ব দান করেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু পাশরূপ "ওয়ারান্ট" জারি দ্বারায় কন্যার পিতাকে পীড়ন করতঃ বিবাহে পণ গ্রহণ করাকে আমরা ঘৃণিত ব্যবসায় বলিয়া মনে করি। কন্যার পণ গ্রহণ করিলে যদি মহামাংস বিক্রয় হেতু নিরয়গামী হইতে হয়, তবে পুত্রের পণ গ্রহণ করিলে, শুক্র বিক্রয় জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না কেন? সাম্যময় ভগবানের বিধান সকলকেই সমান ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা জানি;—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা॥"

অর্থাৎ কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় পালন করিবে। এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে এবং ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবে। আমরা বুঝি পুত্র ও কন্যা সমান স্নেহের সামগ্রী। তবে পুত্র সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হইবে, আর কন্যা বিবাহ কালীন কিছু পাইবে না এ কেমন বিধি? আমরা বলি পাইবে না কেন? অবশ্য পাইবে। শাস্ত্রেও সে বিধি রহিয়াছে। কিন্তু বরপক্ষীয়েরা জুলুম করিয়া কন্যাকর্ত্তার ভিটামাটি বেচিয়া লইবে এ বিধিত, কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যাহার সংস্থান আছে সে অবশ্যই ঝি জামাইকে [illegible] অবস্থানুসারে যৌতুক প্রদান করিবে, তাহাতে ত কাহার আপত্তি হইবে না; বরং না দিলে লোকে তাহাকেই নিন্দা করিবে। কিন্তু যে গরিব ব্যাচারার কিছু মাত্র সংস্থান নাই, দিন আনে দিন খায় অথবা পৈতৃক সামান্য ভূসম্পত্তির আয় হইতে কথঞ্চিৎ সপরিবারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার কন্যাটীকে বিবাহ করিতে হইলে; শিক্ষিত তুমি, তাহার সমুদয় ভিটামাটি বেচাইয়া, অথবা তাহার স্কন্ধে গুরুতর ঋণভার চাপাইয়া রুধির শোষণ করতঃ তাহার কুল পবিত্র করিবে এ তোমার কিরূপ নীতি? ইহাকে কি প্রকারান্তরে ডাকাতি বলিতে পারি না? এই কি তোমার শিক্ষা? এই কি তোমার স্বজাতিপ্রেমিকতা? ভাই শিক্ষিত! তুমি বাহিরে নিস্বার্থ দেশহিত ব্রতের ধূয়া ধরিয়া গলা বাজিতে গগন ফাটাইয়া দাও, আর ছাই বিবাহ কালীন কি দুশ পাঁচশ না হয় হাজার দেড় হাজার টাকার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পার না? বিবাহ দ্বারা অর্থলাভ করিয়া কই কোন কালে কাহাকেও ত বড় লোক হইতে দেখি নাই? তবে আর কেন লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া ডাকাতের ন্যায় এক বেচারার গলায় ছুরি বসাও? ছি! শীঘ্র এ কষাইবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়বানের পরিচয় দাও—শিক্ষার গৌরব রক্ষা কর, সমাজের বক্ষ হইতে একটী শল্য উদ্ধার করিয়া দুহ কন্যাকর্ত্তাগণের আশীষভাজন হও।

হে শিক্ষিত পাশধারীগণ! জানি আপনার ঐ পাশাস্ত্র সংগ্রহ করিতে অনেক [illegible] অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। জানি আপনাদের পাশাস্ত্র অধিকাংশ স্থলেই চাকরীদাতা প্রভুর প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহাতে আপনাদের ক্ষোভ ক্রোধ উভয়ই জন্মে, জানি আপনাদের অভিভাবকগণ কেবল মাত্র ব্যবসাদারির জন্যই আপনাদিগকে পাশাস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া কি অভিভাবকের প্ররোচনায় বিপন্ন কন্যাদায়গ্রস্তের নিকট পাশের দাম আদায় করা উচিত না চাকরীদাতা প্রভু কর্ত্তৃক উদ্দীপিত ক্রোধানলে তাহাকে ভস্মীভূত করা কর্ত্তব্য? অস্ত্র প্রবলের উপরই নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত; দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলাস্ত্র নিক্ষেপ কাপুরুষের কার্য্য! আপনাদের "পাশ" খানি যথার্থই পাশ। ও পাশে যে একবার পড়ে, সে আর কিছুতেই পাসাইতে পারে না। পাশাকর্ষণে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া শলভের ন্যায় অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প দিয়া পড়ে আর প্রাণ হারায়। তাই বলিতেছিলাম দুর্ব্বল কন্যাদায়গ্রস্তের প্রতি ভয়ঙ্কর পাশাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অস্ত্রের অমর্য্যাদা করিবেন না। দুর্ব্বল পীড়ন বীর ধর্ম্ম নহে।

আমাদের সমাজের বিষয় ভাবিলে দুঃখও ধরে হাসিও আসে। জীবনের দুই যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, অনেক দেখিয়াছি শুনিয়াছি বুঝিয়াছি, কিন্তু আমাদের সমাজে নিত্য সংঘটিত একটী সমস্যার রহস্য আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা ভেদ করিতে আজিও সমর্থ হই নাই। পাঠকগণ কি এ রহস্য উদ্ভেদ করিয়া দিতে পারেন? বিবাহ মজলিসে পাত্র ও পাত্রপক্ষীয়েরা আসীন। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুন যেরূপ ভীষ্মকে [illegible]

[illegible] বরকে সম্মুখে বসাইয়া কন্যাকর্ত্তার জীবন হরণে উদ্যত হইয়াছেন। জামাতার দর পূর্ব্বেই চুকিয়া গিয়াছে। এখন বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার নিকট কলিকাতার বড়বাজারের দালাল, অথবা মিউনিসিপাল মার্কেটের কষাই কিম্বা ভিনিস দেশীয় য়িহুদি সাইলকের ন্যায় দাম আদায় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কন্যাকর্ত্তা স্ত্রী পুত্রের অলঙ্কার বন্ধক দিয়া এবং কতক জমি বেচিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সমুদয় আনিয়া হাজির করিয়াছেন, কিন্তু মূল্যের টাকার কিছু কমতি আছে। গহনার সোনা, রূপা, চেন, ঘড়ি, অপরাপর দান সামগ্রী রীতিমত যাচাই হইয়া গেলে, সোনা রূপার খাঁটিত্ব ও দান সামগ্রীর লঘুত্ব লইয়া অনেক বাক বিতণ্ডার পর টাকা গণিবার পালা আসিয়া পড়িল। টাকা কিছু কম আছে, কন্যাকর্ত্তা বেচারা গলায় কাপড় দিয়া মলিন মুখে, বর ও বরকর্ত্তার নিকট অবশিষ্ট টাকা একটা নির্দ্ধারিত সময়ে দিবার অঙ্গীকার করিয়া বরকে স্ত্রী আচারের জন্য লইয়া যাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। বর (শিক্ষিত (?)) লজিকের ভাষাতে এবং বরকর্ত্তা সুদখোর মহাজনের কায়দাতে তাঁহার সে প্রার্থনা উড়াইয়া দিয়া টাকা হাজির করিবার পক্ষে বিশেষ জুলুম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শিক্ষিত পাত্র স্বপক্ষীয় কর্ত্তার ইঙ্গিত মতে আসন হইতে উঠিয়া পালকীতে চাপিতে গেলেন; মেয়ে মহলে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কন্যাকর্ত্তা বেচারা সমস্ত দিন উপবাসের পর বুভুক্ষা এবং উপস্থিত বিপদে কাতর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কন্যা [illegible] কর্ত্তার [illegible] কোবালাকিতা [illegible] বায়না নামা লেখাইয়া লইয়া টাকা কয়টা আনিয়া দিলেন। বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। বেচারা ভাবিতে অবকাশ পাইল না যে, আমার জামাই কিনিতে সব ভাল জমি গুলি গেল, আমার সংসার চলিবে কিসে? শ্বশুরের এ হেন বিপদে জামায়ের মন একটুকুও গলিল না। কি বিড়ম্বনা! আমাদেরও যে দারুণ ভুল! যে গলায় ছুরী দিয়া হত্যা করিতে পারে, হত ব্যক্তির মৃত দেহ দেখিয়া কি তাহার হৃদয় গলিবার সম্ভব! যাহা হউক পর দিন হইতেই কষাই জামাতা শ্বশুর শাশুড়ীর "প্রাণের ব্যথিত" হইয়া দাঁড়াইলেন। শ্বশুর শাশুড়ীর দুঃখে তখন জামাতা বাবাজির হৃদয় দ্রবীভূত হইতে থাকিল। শ্বশুর পিতাঠাকুর, শাশুড়ী মা, পিশেষ পিশি মা, খুড় শেস, খুড়ি মা হইয়া দাড়াইলেন, সব চুকিয়া গেল—জামাতার বিবাহ রাত্রির নৃসংশ ব্যবহার একেবারে সকলের স্মৃতিপথ হইতে চলিয়া গেল! এরূপ ব্যাপারের পর পরস্পরের মানসিক ভাবের কিসে পরিবর্ত্তন হইয়া যায় আমরা তাহা কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না! যক্ষ বেশধারী ধর্ম্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কিমাশ্চর্য্যম্?" যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন;—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরম্।
শেষায় স্থিরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

অর্থাৎ নিয়তই ভূত সকল যমালয়ে গমন করিতেছে, তাহা দেখিয়াও জীবিতেরা "আমি চিরকাল থাকিব" এই স্থির করে, ইহার বাড়া আর আশ্চর্য্য কি?" আমরা [illegible] হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত [illegible] পাত্র [illegible] করিয়া বলিতাম "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"।

পণ প্রথা যে অতি ঘৃণিত ব্যবসায়, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। তবে কি না পুত্রের বিবাহ কালীন ও কথাটা মনে থাকে না, কিন্তু কন্যার বিবাহের সময় সকলেরই চৈতন্য হইয়া থাকে। যাহা হউক যাহাতে এই ঘৃণিত প্রথা সমাজ হইতে উঠিয়া যায়, সে বিষয়ে সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত। আর এক কথা আমরা যদি স্বয়ং পণ প্রথা নিবারণে সচেষ্ট না হই, তাহা হইলে যখন সমাজে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া উঠিবে (আর বাড়িতে বড় বেশী বিলম্ব নাই) তখন আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন ইহা নিশ্চয়। রাজস্থানে রাজপুতদিগের ও বোম্বায়ে কাদবা জাতির মধ্যে বিবাহ ব্যয়ের বড় বাড়াবাড়ি ছিল। গবর্ণমেণ্ট তথায় প্রকারান্তরে হস্তক্ষেপ করিয়া বিবাহের ব্যয় অতি সংক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন। আমরাও যদি পূর্ব্ব হইতে সতর্ক না হই, তাহা হইলে আমাদের উপরও যে রাজদণ্ড পরিচালিত হইবে না কে বলিল? সম্মতি আইনের ফল ভাবিয়া বিজ্ঞ সমাজপতিগণ অগ্র হইতেই সতর্ক হউন।

প্রবন্ধের উপসংহারে "উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের" নিকট আমাদের কিছু নিবেদন আছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, উগ্রক্ষত্রিয় ও কায়স্থ জাতিই উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সংখ্যা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ অপেক্ষা অনেক অল্প বলিয়া এবং এই জাতির বাস বঙ্গদেশের কেবলমাত্র ২।১টী জেলায় নিবদ্ধ হওয়ায় এবং উগ্রক্ষত্রিয় জাতি বঙ্গদেশের আদিমবাসী নহে বলিয়া, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের ন্যায় সমাজের সর্ব্বত্র পরিচিত নহে। বৈদ্য ও কায়স্থ অপেক্ষা উগ্রক্ষত্রিয় জাতি জাত্যংশে হীন না হইলেও সামাজিক বিষয়ে উহাদিগের সমকক্ষ নহে একথা সত্য। ইহার কয়েকটী কারণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইলেও শিক্ষার অভাবই উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সামাজিক অপ্রসিদ্ধির প্রধান কারণ। বর্ত্তমান সময়ে উগ্রক্ষত্রিয়গণ মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উপাধিকারী থাকিলেও এবং রাজকীয় সমুদয় বিভাগে এই জাতি দৃষ্ট হইলেও, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের তুলনায় নিতান্ত অল্প। শিক্ষা বিষয়ে যে উগ্রক্ষত্রিয় জাতি উক্ত জাতিত্রয় অপেক্ষা হীন তাহার দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ বর্দ্ধমান জেলাতে প্রায় পোণেষোলআনা উগ্রক্ষত্রিয়ের বাস। শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, শিক্ষা বিষয়ে বর্দ্ধমান বঙ্গের অধিকাংশ জেলা অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। বর্দ্ধমান জেলা ধরিয়া তুলনা করিতে গেলে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য অপেক্ষা উগ্রক্ষত্রিয় জাতির শিক্ষিতের সংখ্যা কম নহে। কিন্তু উক্ত জাতিত্রয় বঙ্গের সমস্ত জেলাতেই রহিয়াছেন এবং সংখ্যায় অধিক বলিয়া মোটের উপর উগ্রক্ষত্রিয় জাতির শিক্ষিতের সংখ্যা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক গুণে অধিক। দ্বিতীয় কারণ মুসলমানদের আমল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দেশে যে শিক্ষার প্রচলন হইয়া আসিতেছে, সে শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে অর্থকরী। রাজসম্মান প্রাপ্তি ও চাকরীর আশাতেই অধি-

অংশ লোক রাজভাষা শিক্ষা করে। হিন্দু সন্তানের জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য পারস্য বা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। সেই জন্য যাহারা চাকরীর আশা রাখে না, তাহারা প্রায়ই রাজভাষা শিক্ষা করে না। বিশেষতঃ স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি বিজাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী নহে। উগ্রক্ষত্রিয় জাতি পশ্চিম দেশবাসী, এবং বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয় জাতির বীর্য্যে এই জাতির জন্ম বলিয়া এবং সৈনিক বৃত্তি এই জাতির জাতীয় বৃত্তি বলিয়া ইহারা স্বভাবতই কিছু স্বাধীনতা প্রিয়। সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে, যখন মহারাজা মানসিংহ বঙ্গবিজয়ে বহির্গত হন, তখন অনেক উগ্রক্ষত্রিয় সৈন্য তাঁহার সহিত এদেশে আইসেন। সেই সময় হইতে অনেকে এদেশে বাস করিতে লাগিলেন। এতদ্দেশীয় বর্ত্তমান উগ্রক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদেরই বংশধর। স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি মাত্রেই চাকরীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে। উগ্রক্ষত্রিয় জাতি প্রথম প্রথম এদেশে আসিয়া স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য জাতি যখন অর্থকরী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া রাজকীয় সম্মান এবং উচ্চ পদ সকল অধিকার করিয়া খ্যাতি লাভ করিতেছিলেন, তখন উগ্রক্ষত্রিয় জাতি স্বাধীনতাপ্রিয়তার গুণেই হউক বা অপরিণামদর্শিতার ফলেই হউক রাজভাষা শিক্ষার প্রতি ততটা আস্থা প্রদর্শন করে নাই। এই অপরিণামদর্শী জাতি তখনও বুঝিতে পারে নাই যে, বঙ্গদেশ স্বাধীনতার লীলাভূমি নহে, বঙ্গদেশে স্বাধীনতার সম্মান নাই, দাসত্বই বঙ্গদেশের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়, স্বাধীনতা অপেক্ষা দাসত্বের সম্মান এখানে অধিক। বঙ্গদেশের আবহাওয়ার গুণে, উগ্রক্ষত্রিয় জাতি ক্রমশঃ পৈতৃক গুণ হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল। শূন্য স্থান অচিরাৎ মাতৃগুণে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। *

* বৈদ্য ও কায়স্থের ন্যায় উগ্রক্ষত্রিয়ও সঙ্কর জাতি। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রানীর গর্ভে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির জন্ম। শাস্ত্রে 'সঙ্কর জাতি মাতৃবর্ণের সংস্কার গ্রহণ করিবে' লিখিত থাকিলেও পশ্চিমদেশবাসী উগ্রক্ষত্রিয়গণ অদ্যাপিও এবং বঙ্গদেশীয়েরা বহুকাল পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের আচার ব্যবহারানুসারে চলিয়া আসিতেছিল। স্বাধীন নেপাল রাজ্যে অনেক উগ্রক্ষত্রিয়ের বাস। তাঁহারা যদিও তথায় ক্ষত্রিয়ের নিম্নেই সামাজিক সম্মান প্রাপ্ত হন তত্রাচ তাঁহাদের আচার ব্যবহার সংস্কারাদি সমুদয়ই ক্ষত্রিয়ের ন্যায়। রাজদরবারে সম্মানও যথেষ্ট আছে এবং অনেকেই সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের উগ্রক্ষত্রিয়গণের মধ্যেও অনেকেই ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারানুসারে চলিয়া থাকেন। তাহাদের ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উপনয়ন, দ্বাদশদিনে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সমুদয়ই হইয়া থাকে। অবশিষ্টেরা মাতৃজাতীয় শূদ্রের আচারানুসারে চলিয়া থাকেন। এই কারণে জানা ও সুত ভেদে বঙ্গদেশীয় উগ্রক্ষত্রিয়গণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। জানা ও সুতের মধ্যে জন্মগত কোন পার্থক্য নাই; কেবল মাত্র সংস্কারগত পার্থক্য থাকায়, ইঁহাদিগকে দুই শ্রেণী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জানারাই পৈতৃক সংস্কারানুসারে (এই সংস্কার উপনয়ন ও দ্বাদসাহে শ্রাদ্ধ। ইহাও এক্ষণে উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ ভাবে আচরিত হইতেছে, তাহাতে অনুমান শীঘ্রই ইহার লোপ হইবে) চলিয়া থাকেন। সুতমহোদয়গণ কোন্ সময় হইতে কি কারণে পৈতৃক সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া মাতৃ সংস্কারানুসারে চলিতে থাকিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যদিও বঙ্গদেশীয় উগ্রক্ষত্রিয়গণের উভয় শ্রেণীই পৈতৃক বৃত্তি ও গুণ চ্যুত হইয়াছেন, যদিও উভয় সম্প্রদায়ই আচার ব্যবহারে প্রায় তুল্য হইয়া পড়িয়াছেন, তত্রাচ জানা দিগের উপনয়ন প্রথা ও অশৌচান্ত বিধি দ্বারা এবং নেপালী উগ্রক্ষত্রিয়গণের ক্ষত্রিয়োচিত আচার ব্যবহারে ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, উগ্রক্ষত্রিয় জাতির আচার ব্যবহার বৃত্তি ও সংস্কার সকলই পৈতৃক জাতির অনুরূপ।

স্থান মাহাত্ম্যে, উগ্রক্ষত্রিয় জাতি দাসত্বের সম্মান বুঝিতে বাধ্য হইল এবং সেই সময় হইতেই দাসত্বলাভের একমাত্র উপায় আধুনিক অর্থকরী বিদ্যা লাভের জন্য লোলুপ হইয়া উঠিল। হইলে কি হইবে? ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য জাতি বহুপূর্ব্ব হইতেই শিক্ষা বিষয়ে উন্নত হইয়াছে; এ জাতি কি আর সহজে তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে?

সংখ্যার অল্পতা, এক প্রদেশে বাস, শিক্ষার অভাব, অধিকাংশ স্থলেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের সংশ্রবহীনতা এবং সত্যকথা বলিতে গেলে, আত্ম পরিচয়ে অনভিজ্ঞতাই এদেশে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সামাজিক অপ্রসিদ্ধির কারণ। উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে বৎসর বৎসর যেরূপ শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আনন্দের কারণ ও আশার সঞ্চার হইলেও এই জাতির সামাজিক বিষয়ে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যের সমকক্ষ হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে। কিন্তু এমন একটী উপায় উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে যে, যাহা অবলম্বন করিলে এই জাতি অচিরেই সমগ্র বঙ্গীয় সমাজের মধ্যে সুপরিচিত হইয়া উঠিতে পারে। সংখ্যার আধিক্য, শ্রেণীর পার্থক্য এবং বিভিন্ন দেশে বাস বশতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের যে বিষয়ে কৃত কার্য্য হইবার আশা নিতান্ত অল্প, সংখ্যার অল্পতা, বর্ণগত অসম্প্রদায়িকতা এবং এক প্রদেশ বাস হেতু আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সে স্থলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। আজ যদি চেষ্টা দ্বারা সমাজ হইতে পুত্র কন্যা বিক্রয় প্রথা উঠাইতে পারাযায়, তবে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের চেষ্টা যত বলবতী হইবে, আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় জাতির চেষ্টা তদপেক্ষা অধিক ফলবতী হইবে। অতএব হে উগ্রক্ষত্রিয়গণ মহোদয়গণ! আপনারা সমাজের দুরবস্থা ও নিজের উন্নতির বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া এই ঘৃণিত পাপ প্রথা সমাজ হইতে উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করুন। আজ যদি আপনারা সমাজ হইতে পণ প্রথা উঠাইয়া দিতে সক্ষম হয়েন, দেখিবেন বঙ্গের সমুদয় জাতি আপনাদের সমাজকে আদর্শ সমাজ বলিয়া মানিবে, আপনাদের অপ্রসিদ্ধি ঘুচিয়া যাইবে—সর্ব্বত্রই সুযশ ঘোষিত হইবে। বিবাহ কালীন যদি সামান্য অর্থের স্বার্থ পরিত্যাগ করিলে সমাজের হিত হয়, তবে কি সে স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে? কুলীন সন্তানগণ! আপনারা কি আপনাদের পূর্ব্ব-

পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ উদারতা অবলম্বন করিয়া নীচ স্বার্থবৃত্তি বিসর্জ্জন দিবেন না? দিলে আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি ব্যতীত হানী হইবে না। আপনারা জাতীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া আপনাদের মনে মনে অভিমান আছে। থাকুক তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যদি আপনারা উচ্চ-বংশীয়ের ন্যায় ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন তবেই আপনাদের অভিমান করা সার্থক হইবে—মহত্বের পরিচয় দেওয়া হইবে। নচেৎ ভূমিশূন্য রাজা, বুদ্ধিশূন্য পণ্ডিতের ন্যায় আপনাদের মহত্বশূন্য আভিজাত্যের অভিমান কেবল উপহাসের পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবে। আর স্বজাতীয় শিক্ষিতগণ! এইখানেই এবার আপনাদের শিক্ষার পরিচয় হইবে। এইবার যদি আপনারা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ হইতে পণ প্রথা উঠাইয়া দিতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলেই আপনাদের শিক্ষার মাহাত্ম্য বজায় থাকিবে! বিবাহকালীন পণ গ্রহণ না করিলে শিক্ষার অবমাননা হয় না! বরং গৌরব অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। সমাজ হইতে পণপ্রথা উঠাইতে হইলে কোনই আড়ম্বরের প্রয়োজন হইবে না। সমাজের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে কুলীন, শিক্ষিত ও পদস্থ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা যদি সকলেই প্রতিজ্ঞা করেন, "আমি পুত্র বা কন্যার বিবাহে পণ গ্রহণ বা দান করিব না" তাহা হইলেই অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারিবে। সমাজে ২।১০ জন আদর্শ হইলেই সকলেই ক্রমে সেই পথ অনুসরণ করিবে ইহা স্থির কথা। প্রকৃত বড়লোক সেই, যে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে। দধিচি মুনি দেহাস্থি প্রদান করিয়া দেব সমাজের হিত সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, আর আমরা ঘৃণিত কষাইবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সমাজের সেবা করিতে পরিব না? হে কুলীন সন্তানগণ! হে শিক্ষিতবর্গ! হে পদস্থ মহোদয়বৃন্দ! আপনারা কি এই অধম আমাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া স্ব স্ব মহত্ব প্রদর্শন করিবেন না? যদি না করেন, তাহা হইলে বুঝিব, আপনাদের কৌলিন্যের কোন মাহাত্ম্য নাই, আপনাদের শিক্ষা নীতি ও চরিত্রহীন আপনাদের পদ ও মান কেবল স্ব স্ব অন্তপুরেই নিবদ্ধ।

অসমুদ্রোত্থিত রত্ন।

১৬

চল্‌তি চক্কি দেখ্‌ কর্‌,
দিয়া কবীরা রো।
দো পাটন্‌ কি বীচ্‌ আ,
সাবিৎ বচা না কো॥

চল্‌তি চক্কি সব কোই দেখে,
কীল্‌ দেখেনা কোই।
যো কীল্‌ কো পাকড়্‌কে রহে,
সাবেৎ রহা হেয়্‌ ওই॥

ভাবার্থ—সাধক কবীর একদিন পথিমধ্যে

যাইতে যাইতে কোনস্থলে একটী ঘূর্ণায়মান পেষণী যন্ত্র (জাঁতা) দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "হায়! এই জাঁতার ভিতর যত শস্য প্রবিষ্ট হইতেছে, সে সকলই চূর্ণিত হইয়া যাইতেছে, কেহই আস্ত থাকিতেছে না। জীব সকলও ত সেইরূপ ভ্রাম্যমান জগত জাঁতার স্বর্গ ও মর্ত্তরূপ দুই পাটের ভিতর পড়িয়া নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইবে, কাহারও ত পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই।" নিকট দিয়া আর একটী সাধু যাইতেছিলেন, তিনি কবীরের ভাব দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"ঘূর্ণিত জাঁতা হইতে পেষিত শস্য নির্গত হইতেই সকলে দেখে, কেহ কীলক অর্থাৎ জাঁতার খোটার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। জাঁতার ভিতর চতুর্দ্দিকে যে সকল শস্য পড়িতেছে তাহারাই পেষিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু যাহারা কীলকের সন্নিহিত হইয়াছে, কৈ তাহারাত চূর্ণিত হইতেছে না। সেইরূপ যাহারা এই জগত জাঁতার কীলক স্বরূপ ভগবানের নিকট হইতে দূরে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহারাই নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে। আর যাহারা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে তাহাদের পেষিত হইবার কোন ভয় নাই।

১৭

পরোঽপি হিতবান্‌ বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ।
অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধং॥

অর্থাৎ পরও হিতকারী বন্ধু হয় এবং আত্মীয় ব্যক্তিও পর হয়। যেমন শরীর জাত রোগে অহিত হয়, বন্য ঔষধ হিত সাধন করে।

১৮

কুলীনঃ কুলীনো বা মর্য্যাদাং যো ন লংঘয়েৎ।
ধর্ম্মাপেক্ষী মৃদুর্হ্রীমান্‌ স কুলীনশতাদ্বরঃ॥

অর্থাৎ—অকুলীনই হউন আর কুলীনই হউন, যিনি মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, যিনি ধর্ম্মাপেক্ষী, মৃদু ও লজ্জাশীল, তিনি শত কুলীন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

১৯

রথং শরীরং পুরুষস্য দুষ্টং
আত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যাহুরশ্বান্‌।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলী সদশ্বৈ-
র্দ্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ॥

অর্থাৎ পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব স্বরূপ। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া বশীকৃত সদশ্ব যোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরম সুখে বিচরণ করিবে।

২০

হ্রিয়তে বধ্যমানোঽপি নরো হারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
বিমূঢ়সংজ্ঞো দুষ্টাশ্বৈরুদ্‌ভ্রান্তৈরিবসারথিঃ॥

যেমন দুষ্ট অশ্ব সারথীকে কুপথে লইয়া যায়, সেই রূপ ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্ত চেতা মনুষ্যকে কুপথ গামী করে।

শ্রীনৃসিংহমুরারি পাঁজা।

বর্ণাশ্রম-বিবেক। (২)

[ব্রাহ্মণ-বিচার]

(জনৈক পূজ্যপাদ পরমহংসের বিবৃতি)

ব্রাহ্মণ—মহাশয়, আপনি বলিলেন যে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনরূপ সাধন দ্বারা যাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে তিনিই ব্রাহ্মণ। কিন্তু মনুর শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কর্ম্ম দ্বারাও ব্রাহ্মণ হয়। যথা;—

স্বাধ্যায়েন জপৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া-সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈর্বা ব্রাহ্মীয়ং ক্রীয়তে তনুঃ॥

অর্থাৎ বেদের পঠন পাঠন দ্বারা, তপস্যা বা মনের নিগ্রহ দ্বারা, অন্তর্যাগ বা সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে প্রাণরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান দ্বারা, সাম, যজু, ঋক্ বেদের অর্থ সুনিশ্চয় করণার্থ জ্ঞানী গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ দ্বারা, দর্শপৌর্ণমাসাদি ইষ্টি বিশেষ বা ইড়া-পিঙ্গলা উভয় নাড়ীকে সুষুম্নাতে ঐক্য করণ দ্বারা, বিধিপূর্ব্বক সবর্ণাভার্য্যাতে সৎ-পুত্রোৎপাদন দ্বারা, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ, বল বৈশ্বদেবযজ্ঞ এবং অতিথি সেবাদি-রূপ মহাযজ্ঞের দ্বারা এবং অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ (যাহাতে চতুর্ব্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের সমাবেশ আবশ্যক) অর্থাৎ সৎপুরুষের সঙ্গ দ্বারা মনুষ্য শরীরকে ব্রাহ্মণ করিতে পারা যায়।

বৃহস্পতি—আচ্ছা, যাহারা উক্তবিধ কর্ম্ম সমূহ না করিবে তাহাদিগকে তুমি কি বলিবে?

ব্রা—কেন, আমি তাহাদিগকে কেবল মনুষ্য বলিব।

বৃ—আর যাহারা কেবল স্কন্ধে সূত্র, মস্তকোপরি শিখা এবং কপালে তিলক ধারণ করিয়া বেড়ায় এবং লোকের কাছে পরিচয় দেয় আমরা ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে তুমি কি বলিবে?

ব্রা—তাহারা নামে ব্রাহ্মণ।

বৃ—নামে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণে কি প্রভেদ আছে?

ব্রা—ওঃ দিনরাত্রের প্রভেদ।

বৃ—কেমন করে?

ব্রা—দেখুন, একজন প্রকৃত চক্রবর্ত্তী মহারাজ, যাঁহার শাসনে অসংখ্য প্রজা পুঞ্জ অবস্থিতি করিতেছে এবং যাঁহার আদেশ সকলে শিরোধার্য্য করিতেছে; আর একজনের নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যাহার কথা তাহার স্ত্রী পুত্রেরাও শুনে না। অথবা আর এক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। অন্নপূর্ণা নামে যে ঐশ্বরিক শক্তি আছে তদ্দ্বারা গর্ভস্থ শিশুর ও আহার পানের সতত ব্যবস্থা হইতেছে আর একজন স্ত্রীলোকের নাম অন্নপূর্ণা যাহার সমস্তদিন ভিক্ষাটনে দিনপাতও হয় না। এ সকলের মধ্যে যে প্রভেদ, নামে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণে সেইরূপ প্রভেদ। অথবা যে চন্দ্রসূর্য্যের আলোকে সমস্ত জগতের অন্ধকার অন্তর্হিত হয়, সেই চন্দ্রসূর্য্য যদি গৃহ ভিত্তিতে চিত্রিত থাকে তাহাতে যেমন সেই গৃহই আলোকিত হয় না তদ্রূপ প্রভেদ বুঝিবেন।

বৃ—ঠাকুর, এখন যে বুদ্ধির জড়তা ঘুচিয়াছে দেখিতেছি। এখন যে আর কথা বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছ। এ পরিবর্ত্তটুকু কোথা হইতে হইল?

ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বৃহস্পতিকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদেই এরূপ মনোবৃত্তি লাভ করিয়াছি। মহাত্মাদিগের সঙ্গতি প্রভাবে ঘোর পাপীর পাপরাশী এবং মহা অজ্ঞানীর তিমিরপুঞ্জ নিমেষেই বিনষ্ট হয়। আপনার প্রসাদেই আমার এ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে।

বৃ—এখন পূর্ব্বকথার অনুসরণ করা যাউক। তুমি মনুর যে এক শ্লোক ইতি পূর্ব্বে আবৃত্তি করিয়া ছিলে তাহাতে অষ্ট-প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে যজ্ঞ এক ক্রিয়া ছিল। কিন্তু সেই ক্রিয়াতে চতুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের সমাবেশ প্রয়োজন। যদি শুদ্ধ হবিঃ সমিধ দগ্ধ করাই উক্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে ত একজন মহামূর্খ লইয়াও সে কাজ করা যাইত। তবেই বুঝিতে হইবে এখান-কার হবিঃ সমিধ অলৌকিক সামগ্রী।

ব্রা—অলৌকিক হবিঃ সমিধ কিরূপ?

বৃ—দেখুন, কাষ্ঠবৎ কঠিন দুঃখজনক কর্ম্ম সমূহ আর তাহাদের কণ্টকময় ফলই সমিধ আর ঘৃতবৎ তরল অর্থাৎ স্নেহময় সংসা-রাসক্তিই হবিঃ। এ উভয়কে জ্ঞানরূপ অগ্নিতে আহুতি দিয়া দগ্ধ করিতে হইবে। যখন এই ব্যাপার ঘটে তখন শরৎকালীন পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় জ্ঞানচন্দ্র উদিত হইয়া অজ্ঞান-রূপ নিশার তমোরাশিকে একেবারেই বিদূ-রিত করিয়া দশ দিশারূপ ইন্দ্রিয়গণকে নিজ জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ করিয়া লয়। সুতরাং শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের যে ফল তাহাই এ যজ্ঞের দ্বারা উৎপন্ন হইবে। এখানে কর্ম্ম ও উপাসনার তবে প্রভেদ কই রহিল?

ব্রাহ্মণ তখন বৃহস্পতির পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন প্রভো! আমার মোহ কাটিয়াছে; আপ-নার কৃপায় এখন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছি। কিন্তু এক প্রশ্ন আমার মনে অতঃপর উদয় হইতেছে।

বৃ—কি প্রশ্ন?

ব্রা—পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবিদ্‌জনের গৃহে যদি পুত্র হয় আর সেই পুত্র যদি বেদাদি অধ্যয়ন কিছুই না করিয়া আপনাকে লোক সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাকে কি বলা যাইবে? আর তাহাকে দানাদি দিলেই বা কি ফল হয়?

বৃ—তাহাকে বঞ্চক, প্রতারক, শঠ বলিতে হইবে আর বঞ্চনাতে যে ফল উক্ত ব্যক্তিকে দান করিলেও সেই ফল। যথা মনু—

যথা খণ্ডোঽফলঃ ক্লীবে যথা গৌ-গবিচাফলা।
যথা চাজ্ঞে অফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচো-ঽফলঃ॥

যেমন ক্লীব ব্যক্তি স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ, গাভী যেমন গাভীতে সন্তান উৎপাদনে অসমর্থা, তেমনি বেদবিহীন ধর্ম্মহীন পাষণ্ডকে বিপ্র বলা নিষ্ফল আর আত্ম জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকে দানে কোনই ফল নাই। আরও মনু কি বলিতেছেন শুন—

যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে দ্বিজ বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া অন্যান্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। সেই দ্বিজ এই জীবিতাবস্থাতেই বংশের সহিত তৎ-ক্ষণাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। আর মৃত্যুর পর যে তাহার কি দশা ঘটিবে তাহা মনুও বলিতে

পারেন নাই। এই সকল প্রমাণ দ্বারা এখন এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে যেমন অশ্ব, হস্তী, গো, গর্দ্দভ, কাক প্রভৃতির সন্তানেরা স্ব স্ব জাতিগত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় মনুষ্যের সেরূপ ব্যবস্থা নহে, মনুষ্যের জাতির ব্যবস্থা গুণ কর্ম্মানুসারে। যথা মনু—

শূদ্রঃ ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈব শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥

যে মনুষ্যকে বেদাদি অনধ্যয়ন হেতু শূদ্র বলা যাইত সে যখন বেদাদি অধ্যয়ন এবং সৎসঙ্গ ঈশ্বরারাধনারূপ সৎকর্ম্ম শীল হয় তখনি সে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হয়, আর যে মনুষ্য বাল্যকালে অধ্যয়নাদি সৎশিক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছে, সে যদি পরে বঞ্চনারূপ নীচ ব্যবসা অবলম্বন করে তখনই সে শূদ্রাধম হয়। যেহেতু শূদ্রের ত একটা অবলম্বিত ধর্ম্ম থাকে; উহার তখন কোন ধর্ম্মই নাই, আছে কেবল পাপবৃত্তি। সেইরূপ ক্ষত্রিয় জাতি হইতে উৎপন্ন ব্যক্তি যদি ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত গুণকর্ম্ম ধারণে অসমর্থ হয় অথবা বৈশ্যজাতি হইতে উৎপন্ন ব্যক্তি যদি বৈশ্যের উপযোগী গুণকর্ম্মে বঞ্চিত হয় তাহারাও শূদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে।

ব্রা—একটা যে সংশয় উঠিতেছে। স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজবন্ধুগণের ত বেদপাঠে অধিকার নাই, তবে মনুর উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য কি?

বৃ—স্ত্রী শূদ্রাদির যে বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই তাহার প্রমাণ কি? উঁহারা কি ভগবানের সৃষ্ট জীব নহে?

ব্রা—স্ত্রী শূদ্রাদি ভগবানের সৃষ্ট জীব বটে কিন্তু উহাদের বেদাধ্যয়ন বিরুদ্ধে যে প্রমাণ রহিয়াছে।

বৃ—কি প্রমাণ আছে?

ব্রা—প্রমাণ যথা—

স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়তোমিতি (শ্রুতি।)

বৃ—এ তোমার ঘরগড়া প্রমাণ। বল দেখি কোন্ বেদের সংহিতাতে এই প্রমাণ বচন আছে? আমি বরং উহাদের বেদাধ্যয়নের অনুকূল প্রমাণ দেখাইতেছি শ্রবণ কর। যজুর্ব্বেদী সংহিতাতে আছে।

যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি জনেভ্যঃ ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বীয় চারণায়।

বেদকর্ত্তা স্বয়ম্ভু নিজ শিষ্যদিগকে কহিতেছেন—যেমন আমি মঙ্গলময়ী বেদবাণী তোমাদিগকে বলিলাম তেমনি তোমারাও ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত্রিয়দিগকে শূদ্রকে বৈশ্যকে আত্মীয়-স্বজনদিগকে (ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রীগণ আসিতেছে) এবং চারণ দিগকে অর্থাৎ অতি শূদ্রদিগকে (যাহাদের জল অস্পৃশ্য) বেদ পড়াইবে। এই দেখ শূদ্রাদির বেদ পড়িবার অধিকার বেদেই প্রদত্ত হইয়াছে। আর স্মরণ থাকিবে ইতিপূর্ব্বে আমি মহাভারত হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে পৈলবাদি শূদ্র, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীগণ ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের ন্যায় পরমসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আর একথা কি এখনও তোমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে মনুষ্য দ্বারা মনুষ্যের জাতি কল্পিত হইয়াছে। প্রমাণ চাও ত তাও দিতে পারি মনু বলিয়াছেন—

আচার্য্যস্তস্য যাং জাতিং বিধিবৎ বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সাচতত্ত্বাজরামরা॥

বেদপারগ আচার্য্য ক্ষত্রিপুত্র বালকের

গায়ত্রী উপদেশ দ্বারা জাতি উৎপাদন করেন; সেই জাতি তাহার পক্ষে চিরস্থায়ীর ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এই প্রমাণ দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিধিবৎ সংস্কার দ্বারা মনুষ্যের জাতি উৎপাদনে সমর্থ হয়। কিন্তু মনুষ্যের জাতি কি? মনুষ্যত্বই। ব্রাহ্মণাদি জাতি নহে। যদি ব্রাহ্মণাদি জাতি হইত তাহা হইলে উহার কখন নাশ হইত না। গরুর গোত্ব কি কখন বিনষ্ট হয়? সে যে দেশেই থাকুক, যাহাই আহার করুক, যে কাজেই খাটাও, তাহাকে যে অবস্থাতেই রাখ না কেন, তাহার গোত্ব কিছুতেই ঘুচিবে না, সে কখন হস্তী বা অশ্ব হইবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি জাতি সম্বন্ধে ত সেরূপ নয়। আজ একজন ব্রাহ্মণ মসজিদে মোল্লার কাছে কলমা পড়িয়া মুসলমান হইল, কাল আবার গির্জ্জায় গিয়া পাদরী কর্তৃক জলসিঞ্চিৎ হইয়া খৃষ্টান হইল; তৎপরে হয় ত মেথরের সহবাসে মেথর হইল। তাই বলিতেছি যে যদি ব্রাহ্মণাদি জাতি গোত্বের ন্যায় বিধাতার বিধান হইত, তাহা হইলে তাহার কোনকালেই কোন প্রকারেই বিনাশ হইত না।

জাতি বিচার সমাপ্ত।

বিজয়ার আলিঙ্গন।

ঢাল, ঢাল, সিদ্ধি ঢাল! মা আসিয়াছিল, চলিয়া গেল,—ঢাল, ঢাল, সিদ্ধি ঢাল। কোথায় সেই বিমল আনন্দ উচ্ছ্বাস, কোথায় সেই অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ; কোথায় সেই মনলোভা, কোথায় সেই স্থির সৌদামিনীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল অতুলন আভা, কোথায় সেই কমনীয় কান্তি, কোথায় সেই শান্তিময়ী মূর্ত্তি, হায় হায়, সে সকল কোথায় চলিয়া গেল! মনের কথা বলিতে না বলিতে, মর্ম্মব্যথা জানাইতে না জানাইতে মা আমাদের চলিয়া গেল; প্রাণভ'রে দেখিতে না দেখিতে, নয়ন মেলিয়া চাহিতে না চাহিতে চপলা মেয়ে যেন পলকে মিশাইয়া গেল! ভাই রে, মাকে আমরা বিসর্জ্জন দিয়াছি; সেই সৌন্দর্য্যের সমষ্টি, সেই সোণার প্রতিমা মাকে আমাদের দুঃখের গীতি গাহিতে গাহিতে, নেত্রনীরে ভাসিতে ভাসিতে, অতল গভীর জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি। ঢাল, ঢাল, সিদ্ধি ঢাল! বঙ্গভূমি অন্ধকার, মন্দির শূন্য, গৃহ শ্মশান; শ্মশানবাসীর সর্ব্বস্ব, নীলকণ্ঠের কণ্ঠহার অগাধ জলে বিসর্জ্জন করিয়া, শক্তিরূপিনী, ভক্তিভাবিনী, মুক্তিদায়িনী মাকে আমরা বিদায় দিয়া সেই গৃহ শ্মশানে ফিরিয়া আসিয়াছি; কেমন করিয়া শ্মশান মাঝে বাস করিব! ঢাল, ঢাল, সিদ্ধি ঢাল। ভৈরবগণের ভীষণ হুহুঙ্কার, পিশাচগণের আকাশভেদী চীৎকার সহ হয় না,—সহ্য হয় না;

ঢাল, ঢাল, সিদ্ধি ঢাল! মাতৃবিরহ সহিতে হইবে, অন্তরের অনন্ত বেদনা ভুলিতে হইবে; ঢাল, ঢাল, সিদ্ধি ঢাল!

মা আমাদের আসিয়াছিল কিন্তু চলিয়া গেল। আমরা অধম, আমরা অকৃতী, আমরা কুসন্তান, মায়ের আমরা আদর করিতে জানি না, মায়ের আমাদের অসীম মাহাত্ম্যের কণামাত্রও আমরা বুঝিতে পারি না, তাতেই মা আমাদের চলিয়া গেল! আমাদের মত এমন মা আর কার আছে। ভাই! এমন মুখভরা নাম, এমন বুকভরা ঠাম, এমন দালানভরা প্রতিমা, এমন জগৎভরা মহিমা আর কার মায়ের আছে, ভাই! জ্ঞানশক্তি, গণশক্তি, ধনশক্তি, পণশক্তি—সেই সর্ব্বশক্তির আধারভূতা আদ্যাশক্তি মা আমাদের; পদতলে দানবশক্তি ও পাশবশক্তি বিদলিত;—আমাদের মত এমন মা আর কার আছে ভাই! কিন্তু কুমতি আমরা, সেই মাকে আমরা ডাকিতে পারি না, সেই মাকে আমরা আদর করি না, সেই মাকে আমরা ভক্তি করিতে জানি না; তাতেই এত দুর্গতি, তাতেই এত লাঞ্ছনা, তাতেই এত বিড়ম্বনা! হা ধিক্ আমাদের অভিশপ্ত জন্মে, হা ধিক্ আমাদের সন্তপ্ত জীবনে!

আমরা মাকে ভুলিয়াছি, কিন্তু মা আমাদিগকে ভুলিতে পারে না। আমরা কুসন্তান, মা আমাদের স্নেহের নিধান, মা আমাদিগকে ভুলিতে পারে না। তাতেই সম্বৎসর পরে আশ্বিনে একবার অম্বিকা আসিয়া দেখা দিয়া গেল, তিন দিন, তিন রাত্রি বাস করিয়া মা আমাদের চলিয়া গেল। আহা! তিনদিন তিনরাত্রি মাকে দেখিয়া মাতার নিকটে থাকিয়া কি আনন্দই পাইয়াছিলাম! ভুলিয়াছিলাম অসহ্য মর্ম্মান্তিক বেদনা, পাশরিয়াছিলাম আধি ব্যাধির ভীষণ যম-যাতনা, শুকাইয়া ছিল অবিরল নেত্রজল, নির্ব্বাপিত হইয়াছিল জলন্ত মনের অনল, উঠিয়া ছিল তৃণবল্লরী বিবর্জ্জিত মরুভূমিতে আনন্দের তরঙ্গ, হইয়াছিল অমানিশার অন্ধকার রাশি-সমাচ্ছন্ন আকাশতলে চন্দ্রিকা-জ্যোতি উদ্ভাসিত! হায় হায়, মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই সকল ফুরাইয়া গেল! ঘোর অন্ধকার, অকপট আর্ত্তনাদ, অনন্ত বিষাদ, কেমন করিয়া সহ্য হইবে, ভাই! কর কর, মুখ ভরা মধুর সম্ভাষণ, দাও দাও, বুক ভরা গাঢ় আলিঙ্গন! ঐ শোন, মা বলিয়া গেল, বৈরতা, খলতা, ভুলিয়া যাও, বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হও, ভাই ভাই একত্রিত হও, প্রাণ ভোরে আলিঙ্গন কর; সকল দুঃখ বিদূরিত হইবে! রাখ ভাই, মায়ের কথা রাখ, বৈরি ভাব ভুলিয়া যাও, স্বার্থ ত্যাগ কর, ভাই ভাই একত্রে মিলিত হও, জয় জগদম্বে স্বরে বুক ভোরে আলিঙ্গন কর, সকল দুঃখ দূর হইয়া যাইবে!

এস তবে ভাই সকল, এস তোমরা বন্ধুগণ, দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, অভিমান বিস্মৃত হইয়া একবার আলিঙ্গন করি, এস এমন দিন আর পাইব না, এমন ভাব আর থাকিবে না, এই অভাবনীয় ভাবের আবির্ভাবে কুটিল স্বভাব ত্যাগ করিয়া কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি পণ্ডিত কি মূর্খ সকলে এস, সকলে একবার সাদরে আলিঙ্গন করি! আজ বঙ্গ গৃহ শূন্য, আমারও হৃদয় শূন্য। এই শূন্য হৃদয় আজ পূর্ণ করিতে হইবে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব

আমার এই হৃদয়-প্রাঙ্গণে ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ কর দেখি, দেখি ঐ অপূর্ণ হৃদয় পূর্ণ হয় কি না, পারিলে না—তোমরা পূর্ণ করিতে পারিলে না! তবে এস তোমরা স্বদেশবাসী কি প্রবীন, কি নবীন, কি বালক, কি বনিতা,—সমগ্র ভারতবাসী একত্রে আমার এই হৃদয়াধারে অধিষ্ঠিত হও দেখি; শূন্যপূর্ণ হইয়া যাউক। কই, কই, তোমরাও যে পূর্ণ করিতে পারিলে না। নিখিল পৃথিবীবাসী জীবগণ,—কি তৃণ, কি তরু, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি পশু, কি পক্ষী, এস সকলকে এ হৃদয় মন্দিরে অবরুদ্ধ করি। না, না কিছুতেই কিছু হইল না; এ শূন্য পূর্ণ হইবার নয়,—অনন্ত, অসীম! স্বর্গের সহিত মর্ত্তের, দেবতার সহিত দানবের, পাপের সহিত পুণ্যের মিলন না হইলে শূন্য কি কখন পূর্ণ হয়! তবে আয় রে তোরা বাল্যকালের সহচরগণ! আয় তুই রে শৈশবের প্রিয়সঙ্গিনি! একবার স্বর্গের সেই নিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া আয় দেখি আমার এই শূন্যময় হৃদয় মাঝারে! ভয় নাই, বিভীষিকা নাই, এক দিন যে হৃদয়ে শ্মশানের বিকট ছায়া প্রতিফলিত হইত, এখন সে স্থান স্বর্গীয় অনুপমা শোভায় সুশোভিত হইয়াছে! পূর্ব্বে যাহা ভূত পিশাচের লীলা-ক্ষেত্র ছিল, এখন সেখানে সদা শান্তি বিরাজ করিতেছে, শ্মশান এখন নয়নানন্দ নন্দন কাননে পরিণত হইয়াছে; অহর্নিশি নয়নজলে প্রক্ষালিত হইয়া সেখানকার অমোচ্য কালিমা কলঙ্ক পর্য্যন্ত বিধৌত হইয়া গিয়াছে। এখন সেখানে প্রেম-পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ভক্তি-মন্দাকিনী মলয়সমীর ভরে তরল তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত হইতেছে! আয়, আয় তবে, ক্ষণেকের তরে নন্দন বিহার-আনন্দ তুচ্ছ করিয়া আয় তবে আমার এই হৃদয় মাঝারে! জয় মা জগদম্বে, শূন্যস্থান পূর্ণ হইল, স্বর্গে, মর্ত্তে আলিঙ্গন হইল, স্বপ্নের সাধ সফল হইল!

গুরুগণ, প্রণাম করি; আশীর্ব্বাদভাজনগণ, আশীর্ব্বাদ করি; বন্ধুগণ, সম্ভাষণ করি; সকলে সাদরে গ্রহণ কর হতভাগ্যের এই বিজয়ার আলিঙ্গন।

শ্রীধনকৃষ্ণ সেন।

জন্মভূমির "বিবাহ"।

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া কেবল 'বঙ্গবাসী'ই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতেছিল। এখন আবার দেখিতেছি 'জন্মভূমি'ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার কার্য্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। হইতেই পারে, কেন না ইহা 'বঙ্গবাসী'র, নামান্তরিত মাত্র; সেই আড্ডা, সেই প্রেস, বোধ হয় লেখকও সেই; কেবল আকার ভিন্ন এবং নাম ভিন্ন। ইহার হাব ভাব বা যুক্তি তর্ক সম্বন্ধে কিছু বলা না বলা সমান, কেন না ইহার অধ্যক্ষগণ আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ। শিষ্টাচারের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক খুব কম—বরং শত্রুতার ভাগই

বেশি। সুতরাং তাঁহারা যে আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন এমত আশা করা যায় না। তবে জন্মভূমির নামে যাঁহাদের রসনায় লালার সঞ্চার হয়, যাঁহারা জন্মভূমির কোনও দোষ দর্শন করিতে পান না, যাঁহারা জন্মভূমির প্রত্যেক বাক্যকেই অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া মনে করেন তাঁহাদিগের অবগতির জন্যই আমাদের এ প্রস্তাবের অবতারণা। বিগত ভাদ্রের সংখ্যার জন্মভূমিতে "বিবাহ" শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা কতদূর নীতি ও যুক্তি সঙ্গত, পাঠকগণ একবার পাঠ করিয়া বিচার করিবেন। যেমন ভাষার বিশুদ্ধি এবং পারিপাট্য, যুক্তিসমাবেশও ততোধিক। প্রবন্ধের সূচনাতেই ত ইয়ুরোপীয় জাতি নিচয়ের বিবাহ প্রথার উপর অবথা শ্লেষ এবং ব্যঙ্গোক্তি। তদনন্তর লেখক ব্রহ্ম, পারস্যাদি দেশের নরাকার পশুদিগের পশ্বাচার সম্বন্ধীয় ক্ষণস্থায়ী চুক্তিকেও তৎ তৎ দেশের বিবাহ পদ্ধতি বলিয়া ধরিয়া লইয়া কেবল নিজের কুরুচি এবং আভ্যন্তরিক অশ্লীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আজি কালিকার দিনে পর নিন্দাই সম্প্রদায় বিশেষের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরকুৎসানুসন্ধান এবং তাহাতে অপরিসীম তৃপ্তিলাভ মনুষ্য চরিত্রের গূঢ়তম লক্ষণ—নিরক্ষর মুদী বা অর্দ্ধশিক্ষিত কেরাণীবৃন্দের ত কথাই নাই। সুতরাং পরনিন্দা প্রকটন ভিন্ন সংবাদ পত্র ব্যবসায়ীদিগের উপায়ান্তর দৃষ্ট হয় না। কাজেই লোকপরিতৃপ্তি হেতু জন্মভূমিকেও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পেটের দায় বড় দায়।

এইবার একবার লেখক মহাশয়ের যুক্তি বাজের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। বাল্য বিবাহ সমর্থনের অন্য যুক্তি না পাইয়া সন্দর্ভ লেখক বলিয়াই বসিলেন "বাল্যকালে বিবাহ হইলে, রমণী শ্বশুর কুলের পোষমানে ভাল।" আহা! লেখক মহাশয়ের কি আর্য্যোচিত ভাব, আর্য্যরমণীর প্রতি কি সম্মান প্রদর্শন! আর্য্যপদবীর আকাঙ্ক্ষী ভিন্ন অবলা বালিকাদিগের প্রতি এরূপ ভাব আর কোথায় সম্ভবে? যে আর্য্য জাতি অনূঢ়া বালিকাকে গৌরীতুল্য জ্ঞানে পূজার বিধি দিয়াছেন, সেই আর্য্য জাতির সন্তানেরাই এখন তাঁহাদিগকে গৃহপালিত পশু পক্ষীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া বাল্যবিবাহের দ্বারা পোষ মানাইবার বিধি দিতেছেন। ইহা অপেক্ষা অধঃপতনের আর কি দৃষ্টান্ত হইতে পারে?

তার পর, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি রাজির বিরাজ দেখিলাম, তাহাতে আমাদের ঐকমত্য না থাকিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু পুরুষের বহুবিবাহ সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, তাহা এতই অসার এবং অযৌক্তিক যে তাহা পাঠ করিলে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। তাই একবার তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক দিগের সম্মুখে ধরিতে চাই। স্ত্রীলোকের বহুবিবাহে "পরাক্রান্ত ব্যক্তিদ্বয়ের সঙ্ঘর্ষে হত্যা মারামারি প্রভৃতি সতত ঘটতে পারে" কিন্তু "পুরুষের বহুবিবাহে ততদূর গড়াইবার সম্ভাবনা খুব কম।" কেন, লেখক মহাশয় কি বিলাত হইতে আসিলেন? দুই সতীনের কথা কি তিনি অবগত নহেন? তাঁহার "পরাক্রান্ত"

পুরুষদ্বয় না হয় সম্মুখীন হইয়া কাঁটাকাটি করিবে, আর অবলা দুর্ব্বলা ব্রীড়াকুণ্ঠিতা রমণীগণ বিষ প্রয়োগাদির দ্বারা সপত্নী সন্তান দিগের নিধন সাধন করিবে। অবশ্য আমরাও স্ত্রীলোকের যুগপৎ বহুবিবাহ সমর্থন করি না, এবং কেহই তাহা করিতে পারে না। তবে কেবল লেখক মহাশয়ের যুক্তির দৌড় দেখাইবার জন্যই ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

বহুবিবাহ প্রচলন পক্ষে লেখকের দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে এই যে, যদি স্ত্রীলোকের বৈধব্যের ন্যায় পুরুষেরও বৈদার্য্য বা রণ্ডাবস্থার নিয়ম করা যায় তাহা হইলে লোক স্থিতির সমূহ ক্ষতি হইবে এমন কি "মনুষ্যের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে পারে।" কে বাপু! তোমায় রণ্ডাবস্থার ব্যবস্থা স্থাপিত করিতে সাধিতেছে? তুমি সচ্ছন্দে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া সুখ সম্ভোগ কর, কিন্তু অসহায়া দুর্ব্বলা অবলাদিগকে কেন সে সুখে বঞ্চিত কর?

প্রবন্ধ প্রণেতার তৃতীয় যুক্তি বাস্তব বিষয় মূলক, কল্পনা বা যুক্তি তর্কের অন্তর্ভূত নহে। সেই জন্য আমরা লেখক মহাশয়কে গত সনের আদম সুমারী তালিকার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিয়া অদ্যকার মত বিদায় লইলাম।

কেনচিৎ উগ্রক্ষত্রিয়েণ।

কবিতা।

হরিনাম।

গাও রে জগাই গাও রে মাধাই,
হরি নাম আজ গাও দুই ভাই;
তোদের বদনে, হরি নাম শুনে,
প্রেম মদে আজ মাতিবে নিতাই।
সুধা পানে তোরা ছিলি মাতোয়ারা,
হরি প্রেমে আজ হও জ্ঞান হারা;
হরি নাম গেয়ে, চল দুই ভেয়ে,
কাঁপায়ে গগন কাঁপায়ে ধরা।

মৃদঙ্গ শিঙ্গা করতাল করে,
চল রে জগাই যাই ঘরে ঘরে;
পায়ে ধরে সেধে, বল্‌ব কেঁদে কেঁদে,
উঠ ভাই আর কেন ঘুম ঘোরে।

বৃথা মদে আর কেন রে পাগল,
কেন সুধা ভ্রমে সেবিছ গরল;
দিন গেল চলে, দেখ আঁখি মেলে,
কেন আর মিছে মোহ কোলাহলে।

দ্বারেতে দাঁড়ায়ে ভিখারীর বেশে,
প্রেম ভিক্ষা যাচে পরমেশ এসে ;
এখনও কি হায়, অচেতন প্রায়,
কাটাইবি দিন শুধু হেসে হেসে ?

হৃদয়ের দ্বার কর উন্মোচন,
লও গৃহে ডেকে হৃদয়ের ধনে ;
ফিরা'ও না তারে, ডেকে দ্বারে বারে,
যদি সে এসেছে বিনা সম্বোধনে।

সমুদ্র কল্লোলে গিরি নদী বনে,
ফল মূল আর তারকা তপনে ;
তন্ন তন্ন করে, খুঁজিয়াছ ওরে,
ব্যথায় ব্যথিত প্রিয়তম জনে।

অচেতন তারা ঘোর ঘুম ঘোরে,
নীরব নিস্পন্দ প্রকৃতির কোলে ;
কেহ জাগিল না, কথা কহিল না !
তাই সে এসেছে অভিমান করে।

তাই সে এসেছে তোদের ভবনে,
তাই সে ডাকিছে এত প্রাণ পণে ;
কোথা সে দাঁড়াবে, কার মুখ চাবে,
তোরা যদি তারে স্নেহে ডাকিবিনে।

বড় সবাকার প্রিয়তম হরি,
বড় যে দয়ালী আহা মরি মরি !
তার মুখ পানে, কেহ চাহিলিনে,
কেহ না ডাকিলি তার কথা স্মরি ?

ভাবিতে পরাণ শিহরিয়া উঠে,
শত শেল যেন হৃদয়েতে ফুটে ;
মানব সন্তান, অন্নারত প্রাণ,
কামের সেবনে পশুবৎ ছুটে !

পাপীর দুর্গতি করি দরশন,
কাঁদিতেছে প্রাণ কাঁদিতেছে মন ;
অবোধের তরে, সদা আঁখি ঝরে,
কেন জগদীশ করিলে এমন !

এস হে গৌরাঙ্গ প্রেম চূড়ামণি,
দেখাও জগতে প্রেম রত্নখনি ;
কাঁদায়ে ভিখারী, রত নর নারী,
হরি নাম-ধনে সবে কর ধনী।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

হাসিলে কাঁদিতে হয়।

১

হাসিলে কাঁদিতে হয় তাকি তুমি জাননা ;
"চিরদিন সুখে রব" ইহা মনে করোনা।
অই দেখ সরোবরে,
কমল মৃণালোপরে
হেসেছিল, নেচেছিল, দুলিয়া দুলিয়া রে।
দিনমণি অস্তগতে ফুরায়েছে সব রে।

২

অই দেখ নীলাকাশে,
কুমুদ-বান্ধব হাসে।
কুমুদিনী নাথে হেরে হাসিয়া অধীর রে।
রজনী প্রভাতা হ'লে কোথা হাসি রবে রে।

৩

অই যে কুসুম-ধনি প্রাণ খুলে হাসিছে।
সমীরণ সনে সুখে কত কথা কহিছে।
পোহাইলে এই নিশি,
ভূমিতে পড়িবে খসি,
ফুরাবে মধুর হাসি, শুখাইয়ে যাবে রে !
সমীর কাঁদিবে আসি "হন্ সন্" স্বরে রে।

৪

কৌমুদী বসন পরি,
তারা-রত্ন শিরে ধরি
হাসিছে যামিনী-সতী মনসুখে ভাসিয়া।
কালি পুনঃ কাঁদিবে রে তমোবাস পরিয়া।

৫

আজি শত তরুপাশে,
হাসিতেছে প্রেমাবেশে,
ধিয়াছে তরুবরে প্রেম-ডোরে কসিয়া।
ায় লুটাবে কাল ভূমিতলে পড়িয়া।

৬

তটিনী মনাবেগে দুই কুল ভাসা'য়ে,
াসিয়া চলেছে আজ কল গীত গাইয়ে।
সময়েতে সে তটিনী,
করিয়া অস্ফুটধ্বনি,
কেঁদে কেঁদে মন দুঃখে মরমতে মরিয়া,
াদাইয়া দুই কুলে যাবে ধীরে বহিয়া।

৭

প্রণয়ী যুগল-প্রাণে,
সুখের মিলন গানে,
ত যে আনন্দ-ঢেউ অবিরত উঠিছে।
য়ে হৃদয় বেঁধে প্রেম-নীরে ডুবিছে।
ন্তু এ সুখের দিন কত কাল রহিবে !
চিরে বিরহানলে মন-প্রাণ দহিবে।
আনন্দাশ্রু যে নয়নে
বহেছিল সেইদিনে,
আঁখি বিষাদ-নীরে দিবানিশি ভাসিবে।

৮

মধুর যৌবন কালে,
কত সুখ-আশা ছলে,
সে সবে সুখভরে উৎসাহেতে মাতিয়া।
কিন্তু সে যৌবন হায় !
যখন ফুরা'য়ে যায়,
সুখ চলিয়া যায় আঁখিনীরে ভাসিয়া।

৯

য়-পিঞ্জর মাঝে অতিশয় যতনে,
ষেছিনু পাখী এক ধরেছিনু বিপিনে।
মিলাইয়া প্রাণে প্রাণে,
হাসিতাম তার সনে,
পালা'ল নিঠুর পাখী ত্যজি মোরে কেমনে !
তারি তরে কাঁদি তাই সুখ নাই জীবনে।

১০

এ ভারত একদিন হেসেছিল কতরে !
উড়েছিল কীর্ত্তি-ধ্বজা হিমালয় শিরেরে !
শুনে স্বাধীনতা গান,
আনন্দে নাচিত প্রাণ,
ছুটিত শোণিত, বেগে ধমনী ভিতরে রে।
ভারত মাতার জয় গাইত সকলে রে।

১১

নাহিরে সে দিন আর সব ঘুচে গিয়েছে !
হাসি বিনিময়ে এবে অশ্রুধারা গলিছে।
অধীনতা বেড়ি প'রে,
এ ভারত-কারাগারে,
দেখরে ভারত মাতা কত ক্লেশ সহিছে।
তারত সন্তান কিন্তু সুখে নিদ্রা যাইছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দত্ত।

শক্তিসাধন।

১

নিবিড় নীলিম নীরদ কোলে
ঘন ঘন অই বিজলী খেলে,
মরি কি ছটা !
মরি রে ! মরি রে ! তাহার কোলে
নীল সৌদামিনী সঘনে দুলে,
কি রূপ ঘটা !

২

খেলিছে চঞ্চলা, সুনীল চপলা
থাকিয়া তাহার কোলে,
অপূর্ব্ব প্রভায় অদ্ভুত ছটায়
হেলিয়া হেলিয়া দুলে !

৩

দামিনীর কোলে সৌদামিনী দুলে,
একথা শুনিলে, হাসিবে সবে!
হাসিবে? হাসুক, করিবে কৌতুক?
করুক, করুক, তায় কি যাবে!

৪

স্বচোকে দেখেছি, বিহ্বল হ'য়েছি,
তবে কি হেতু
হৃদয়ে গোপনে রাখিব যতনে
সুখের সেতু?

৫

উচ্চে শতবার বলিব আবার,
তাহাতেও যদি কেহ না শুনে,
আপনি শুনিব, আপনি গাইব,
আপনা আপনি মাতিব প্রাণে!

৬

কিসের আশঙ্কা? কাহারে বা শঙ্কা?
প্রকাশিব সত্য অবশ্য জোরে!
পাগল বলিয়া, করতালি দিয়া,
হাসিয়া না হয়, উপেখি মোরে

৭

দিবে তাড়াইয়া সকলে মিলিয়া
সমাজ হইতে, তায় কি দুখ?
মানব সমাজে এ জনম মত
নাহি হয় আর না দেখাব মুখ!

৮

পাগলে পাগল বলিলেই কিবা,
আমিত পাগলই!
পাগলের সুখ পাগলেই জানে,
অন্যে তা জানিবে কি?

৯

ঘোর অকৃতজ্ঞ, ঘোর স্বার্থপর,
কলহ, কৌটিল্য ক্রোধের আকর,
স্বজাতির রক্তে লোলুপ অন্তর,
কৃতঘ্ন মনুষ্য-সংসার হইতে
বিদায় লইতে অনিচ্ছা কার?
পশিয়া বিপিনে পাগল পরাণে
বেড়াইব সুখে যেখানে সেখানে,
মনোপ্রাণ খুলে পশুপক্ষিগণে
অন্তরের কথা নিরাতঙ্ক মনে
শুনাব যতনে,—গোপনে গোপনে
হৃদে রাখি বিষ, অনলের শিখা,
দগধ হইতে হ'বে না আর!

১০

শূন্যবিহারিণী দামিনীর কোলে,
মরি কিবা নীল সৌদামিনী খেলে!
আহা! কে কামিনী,
নীলাম্বরধরণী,
না জানি স্বরূপ!
পদতলে পড়ি
ধবল শিখরী,
মরি! মরি! মরি!
মোহন মাধুরী
কি অপরূপ!

১১

চিনেছি চিনেছি চিনেছি এবার,
হর-হৃদে নাচে শ্যামা মা আমার,
অই শুন ঘোর বিকট হুঙ্কার,
যা শুনি কাঁপিল দানব সব!
পুনঃ শুন অই
'মা ভৈ'! 'মা ভৈ'!'
মরি কি গভীর মধুর রব!

১২

বরাভয়প্রদ চারুযুগ্ম কর,
আর দুই হস্তে নৃ-মুণ্ড খর্পর,
দৈত্যমুণ্ডমালা দুলিছে গলে!

কিবা 'থেই' 'থেই' 'তাধিয়া' 'তাধিয়া'
নাচে উন্মাদিনী অধীরা হইয়া,
মরিরে কি শোভা গগনতলে!

১৩

নিথরি নিটোল শ্যামল ললাটে
বিন্দু বিন্দু স্বেদ যেন মুক্তাফল?
নিদারুণ শ্রমে শ্রীঅঙ্গ হইতে
বহে ঘর্ম্মবারি বহে অনর্গল?

১৪

নবীন নীরদ সঙ্কাশ বরণ,
নীলোৎপলনিভ প্রফুল্ল আনন,
অধর তরুণ তপন সম!
আমরি কি শোভা কখন দেখিনি,
নীল দামিনীতে জড়িত দামিনী
অচঞ্চলা, শোভা কি অনুপম!

১৫

নরকরকাঞ্চী কটীতে বেষ্টিত,
সৃক্কনী বহিয়া পড়িছে শোণিত,
রক্তজবানেত্র হ'তেছে ঘূর্ণিত,
লেলিহান জিহ্বা, বিমুক্ত কেশ
দুই অংসোপরে হ'য়ে দ্বিধাকৃত,
দুলিতেছে পৃষ্ঠে নিতম্ব-চুম্বিত,
অলকারগুচ্ছ ঈষদান্দোলিত,
আসবে উন্মত্তা, উলঙ্গী বেশ!

১৬

উরে ধরি শ্যামা যুগল চরণ,
যোগে নিমগন মুদিত নয়ন,
যোগাসনশায়ী যোগীন্দ্রচূড়া!
শিরে বিরাজিতা পতিতপাবনী,
জগদুদ্ধারিনী ভবনিস্তারিণী,
বদ্ধ জটাজূটে ভুজঙ্গ-বেড়া!

১৭

রুদ্রাক্ষের মালা শোভিছে গলে,
ধক্ ধক্ বহ্নি জ্বলিছে ভালে,
ভাতে অর্দ্ধচন্দ্র ললাট তলে,
নীল কণ্ঠদেশ গরল পানে!
শুভ্রাঙ্গে সুশুভ্র বিভূতিবিভা,
কটীতটে কিবা অজিন শোভা,
রজতনিন্দিত দেহের প্রভা,
ধুতুরার ফুল শোভে দুকাণে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সোম

উগ্রক্ষত্রিয় প্রেস্ কোম্পানী লিমিটেড্।

গত ভাদ্রের সংখ্যায় এই "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধিতে" উক্ত প্রেস্ কোম্পানী সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া উহার বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য অনেকেই আমাদিগকে পত্রাদি লিখিয়াছেন। তাঁহাদের এবং প্রতিনিধির সাধারণ গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকদিগের অবগতির জন্য আমরা অদ্য উহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব।

কোম্পানী বা যৌথ কারবার দ্বারা ব্যবসা করিবার কি সুবিধা অসুবিধা তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

আজি কালিকার দিনে ইংরেজের দেখা দেখি সকলেই ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু মূল ধনের অভাবে অনেকেই ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু সকলে একত্রিত হইয়া যদি কোম্পানী খুলিয়া ব্যবসা করা যায় তাহা হইলে বোধ হয়—বোধ কেন-নিশ্চয়ই মূল ধনের অভাব হয় না। আমরা ত দরিদ্র আমাদের ত কথাই নাই, ইংরেজরা এত যে ধনী তাহারাও একা কেহ ব্যবসা করে না. সকলে সমবেত হইয়া কোম্পানী খুলিয়া ব্যবসা করে। তাহার ফল প্রত্যক্ষ, লিখিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই। ইংরেজের দেখা দেখি ভারতের প্রায় সমুদায় জাতিই কোম্পানী খুলিয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাতে বেশ লাভবানও হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় জাতিকে কোম্পানী বান্ধিয়া ব্যবসা করিতে দেখা যায় নাই। ব্যবসা জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতার মূল। তাই আমরা "উগ্রক্ষত্রিয় প্রেস্ কোম্পানি লিমিটেড্" নাম দিয়া একটী ব্যবসা আরম্ভ করিতে মনন করিয়াছি। এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন এত উপায় থাকিতে প্রেস্ করা হইবে কেন? তাহার উত্তর এই যে অল্প টাকায় অন্য কোন ব্যবসায় সুবিধা হইবার উপায় নাই। দুই হাজার টাকায় একটী প্রেস হইতে পারিবে এবং প্রেস যে খুব লাভ জনক ব্যবসা তাহা যাঁহারা বঙ্গবাসী প্রভৃতি ছাপা খানার বিষয় অবগত আছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে খরচ খরচা বাদে ন্যূনকল্পে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা হিসাবে লাভ দাড়াইবার খুব সম্ভাবনা।

ইহার অপর উদ্দেশ্য প্রতিনিধির সাহায্য। প্রতিনিধি আমাদের জাতীয় পত্রিকা। ইহার দ্বারা উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বিশেষ উপকার সংসাধিত হইতেছে এবং হইবে। সে সকল উপকার কি এবং কি প্রকারে সাধিত হইতেছে তাহা এস্থলে বলিবার নয় এবং বলিবার আবশ্যকতাও দৃষ্ট হয় না। যদি কেহ বলেন যে, যখন কোন ব্যক্তিবিশেষ ইহার সত্বাধিকারী তখন ইহাকে সাহায্য করিলে সেই ব্যক্তিকেই সাহায্য করা হইবে। তদুত্তরে আমরা এই বলিব যে উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নহে। সত্যবটে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র তা সত্বাধিকারী বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু তিনি যে বিশেষ অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বোধহয় অনেকেই অবগত নহেন। আজকাল সংবাদপত্রের ব্যবসা করিয়া যে কি লাভ তাহা কোনও বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তির অবিদিত নাই।

শ্রীশ বাবু সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে, কেবল স্বজাতির মঙ্গলকামনায় এই গুরুভার বহন করিতেছেন। তিনি যে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া আর বেশী দিন এ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারিবেন এমত বোধ হয়না। যদি প্রতিনিধির তাদৃশ আয়ের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও না হয় বলা যাইত তিনি স্বার্থের অনুরোধেই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহাতে সে আশা নাই। কষ্টে সৃষ্টে কোন রকমে প্রতিনিধিকে চালাইতে হইলে একটী মুদ্রাযন্ত্রের নিতান্ত আবশ্যক। কথা হইতে পারে,

প্রেস্ কোম্পানী বিনা মূল্যে প্রতিনিধি ছাপাইবে কেন? কথা সঙ্গত বটে এবং যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে উগ্রক্ষত্রিয় ব্যতীত অপর জাতীয় লোকও ইহার শেয়ার হোল্ডার (অংশীদার) হইতে পারেন এবং হইবেন। প্রতিনিধির সহিত তাঁহাদের কোনও সহানুভূতি না থাকিতে পারে। কিন্তু প্রেস্ কোম্পানীর সমস্ত কার্য্য যখন অবৈতনিক লোক দ্বারা সম্পাদিত হইবে তখন তাঁহাদের পরিশ্রমের প্রতিদান স্বরূপ প্রতিনিধির মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সমাধা করিলে নিশ্চয়ই কোম্পানীর লাভ ব্যতীত লোকসান হইবে না। বলা বাহুল্য যে, যাঁহারা এই উগ্রক্ষত্রিয় প্রেস্ কোম্পানীর অবৈতনিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই উগ্রক্ষত্রিয়। সুতরাং "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" বিনামূল্যে মুদ্রিত হইলে তাঁহারা নিজ নিজ পরিশ্রমকে যথেষ্ট পুরস্কৃত মনে করিবেন।

এতদ্ব্যতীত সমগ্র উগ্রক্ষত্রিয় জাতির চেক দাখিলা, পুস্তক পুস্তিকা প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কনোপযোগী সমস্ত কার্য্য এই প্রেসে যথা-সম্ভব স্বল্প মূল্যে মুদ্রিত হইলে একটী জাতীয় হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ উগ্রক্ষত্রিয় নাম সম্বলিত একটী মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে নিশ্চয়ই জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি হইবে। প্রথমে উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি, তৎপরে উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি, তারপর আবার উগ্রক্ষত্রিয় প্রেস এইরূপে দিন দিন সমবেত চেষ্টা দ্বারায় যতই সাধু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে ততই জাতীয় একতা বদ্ধমূল এবং সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইবে। এই-জন্যই আমাদের বিনীত নিবেদন যে সকলেই যেন অনুগ্রহ করিয়া একবার প্রেস কোম্পানীর দিকে কৃপা দৃষ্টি করেন।

যাঁহারা উক্ত কোম্পানির অংশ গ্রহণেচ্ছু হইবেন তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবিহারী সামন্ত মহাশয়ের নিকট আলিপুর লক হাঁসপাতালে পাঠাইবেন। নাম রেজিষ্টারী করিবার সময় প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারকে (অংশীদারকে) ১৲ টাকা করিয়া অগ্রিম দিতে হইবে। তদনন্তর কোম্পানী আইনানুসারে রেজিষ্টারী হইলে প্রত্যেক অংশীদারকে তিন কিস্তিতে অবশিষ্ট ৯৲ টাকা প্রদান করিতে হইবে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় কুমুদ বাবুর নিকট পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীহরিদাস সাঁই।
মেম্বার "প্রেস্ কোম্পানী লিমিটেড্।"

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়!

প্রতিনিধি যেরূপ নিরপেক্ষ ও উদারভাবে সম্পাদিত হইতেছে, তাহাতে ভরসা করি নিম্নলিখিত পত্রখানি আপনার জাতীয় হিতকর পত্রিকার একপার্শ্বে মুদ্রিত করিয়া বাধিত করিবেন।

"যত্নেন কিম্‌সাধ্যম" কথাটি বড়ই সত্য। আজ কয়েক বৎসর হইতে জনকয়েক

সমাজ হিতৈষি মহাত্মার আন্তরিক চেষ্টায় নিদ্রিত উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ জাগরিত হইয়া আত্মোন্নতির চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সভাসমিতি, রিপোর্ট রেজলিউসন, আন্দোলন আলোচনা, বাদ প্রতিবাদ যথেষ্টই চলিতেছে। আবার বড়ই সুসময়ে "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিনিধির উদ্দেশ্য মহৎ এবং সাধু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির ও উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধির কর্ত্তব্য পৃথক। সমাজ সংস্কার উভয়েরই উদ্দেশ্য হইলেও কার্য্য ও পরামর্শ ভেদে উভয়ের কর্ত্তব্য বিভিন্ন। অর্থাৎ সমাজে যে সকল প্রথা দূষণীয়, প্রতিনিধি তাহা সন্তর্পণে নির্দ্দেশ করিয়া তাহার দোষগুণ বুঝাইয়া দিবে, আর সমিতি তাহার অবস্থানুসারে প্রতিবিধান করিবে। আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে উভয়েরই এইরূপ কর্ত্তব্য বুঝি। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয় "সমিতি" ও "প্রতিনিধির" নিকট সমাজ আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইতেছেনা। প্রতিনিধিকে শিশু বলিয়া মাপ করিতে পারা যায় কিন্তু প্রবীণ সমিতির উদাসীনতা অমার্জ্জনীয়। ইতিপূর্ব্বে উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির নিম্নলিখিত খ্যাতনামা সভ্য ও মান্যবান ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া বিবাহের পণ প্রথার একটা সংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বাবু কালিদাস চৌধুরী, বাবু নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী, বাবু বনয়ারিলাল হাটী, বাবু রজনীকান্ত কোঙার, বাবু নৃসিংহমুরারি পাঁজা, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী, বাবু দেবদাস রায়, বাবু রাধাগোবিন্দ মণ্ডল, বাবু ভুবন মোহন চৌধুরী, বাবু হারাধন তা, বাবু রামেশ্বর যশ, বাবু রাধিরতন চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণকে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখিয়া সকলেরই মনে বড় আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। এই সকল মহাত্মাগণ একমত হইয়া পণের একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া ছিলেন। কুলীন, সৎগৃহস্থ ও মৌলিকভেদে তিন রকম পণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কুলীন ৩০০৲ সৎগৃহস্থ ২০০৲ ও মৌলিক ১০০৲ টাকা পাইবে। ইহার বেশী কেহ লইতে বা দিতে পারিবেনা; যদি কেহ লয় বা দেয় তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যদিও এই ব্যবস্থা সুন্দর হয় নাই তত্রাচ মন্দের ভাল বলিতে হইবে। "নাই মামা অপেক্ষা কাণা মামাও ত ভাল"। যাহা হউক এই ব্যবস্থা প্রচার হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন সময়ে প্রতিনিধিতে "সমাজ সংস্কার" নামে যে এক প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহাতে বংশগত কৌলিন্য প্রথার উপর আক্রমণের আভাস থাকায় নাকি সকলে চটিয়া ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে সমাজসংস্কার প্রবন্ধে চটিবার কোন কথা নাই, উহা কোন সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া লেখা হয় নাই। উহা অতি সুন্দর যুক্তি প্রমাণে পরিপূর্ণ এবং সারগর্ভ। ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহারা কেন চটিয়া গেলেন বুঝিতে পারিতেছি না। * তবে যখন তাঁহারা প্রস্তাবিত কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন তখন

* বিবাহের পণ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আপনি যাহা অন্তরায় বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। আপনি হয় ত কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়া থাকিবেন যে, সমাজ সংস্কার প্রবন্ধ লেখাতেই সকলের মনে

তাঁহাদের মনে কোন খট্‌কা লাগিয়াছে ইহা সত্য। যাহা হউক আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের মনের খট্‌কা ভঞ্জন করিয়া দিবেন এবং যাহাতে তাঁহারা পণ সম্বন্ধে একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করেন তজ্জন্য অনুরোধ করিবেন নিবেদন ইতি

বর্দ্ধমান শ্রী—
১১ই আশ্বিন ১২৯৮।

খট্‌কা লাগিয়াছে। আপনার মনে যখন ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোন খট্‌কা লাগে নাই, তখন তাঁহাদের মনেই বা লাগিবে কেন? যে সকল ব্যক্তির নাম আপনি উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সদ্বিবেচক ও প্রতিনিধির হিতৈষি। যদি ঐ প্রবন্ধে কোন দোষ দৃষ্ট হইত তবে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন সন্দেহ নাই। আর ইহাও অতি অসঙ্গত কথা যে প্রতিনিধিতে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল আর তাঁহারা তাহাতেই চটিয়া তাঁহাদের সাধু সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। এ কথা আপনার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি যে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্য! ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের পর তাঁহাদের অনেকেরই সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে কৈ তাঁহারা ত কোন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন নাই! আপনার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির ঐরূপ অসার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অতগুলি মান্যগণ্য ভদ্রলোকের প্রতি অমূলক সন্দেহ করা উচিত হয় নাই। আপনি অনুসন্ধানে জানিবেন বিবাহের পণ নির্দ্ধারণ বিষয়ে অন্য কোন প্রবল প্রতিবন্ধক আছে।

উ, প্র, স।

মান্যবর শ্রীযুক্ত উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়!

অন্তঃপুর-বাসিনী রমণী হইয়া আজ আপনাকে গুটাকতক কথা বলিতে যাইতেছি শুনিয়া মনে কিছু করিবেন না। আপনারা বলিয়া থাকেন যে, মেয়ে মানুষের কথা শুনিয়া কাজ করিলে পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু সে দোষ মেয়ে মানুষের নয়। আপনারা কথা শুনিয়া বিচার না করিয়া কাজ করেন কেন? যা তা কথা না শুনিলেই চলিতে পারে। তাহা হ'লে, আপনাদেরও বাধা বিঘ্ন ঘটে না, আমাদিগকেও এরূপ কলঙ্কের ভাগিনী হইতে হয় না। আমাদের দোষ কি, যে নাচ্‌বে, তাকে নাচাইয়া একটু আমোদ করিতে পাইলে ছাড়িব কেন? না নাচিলেই ত হইতে পারে; কিন্তু বাজ্‌না না বাজিতে বাজিতেই যে আপনারা নাচিয়া উঠেন! যাক্, বাজে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। স্ত্রীলোকের এই কথা গুলি যদি শুনিবার মত হয়, তবে শুনিবেন; না হয় সুদূরে নিক্ষেপ করিবেন, দুঃখিতা হইব না।

"উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" যখন প্রথম বাহির হয়, তখন মনে বড়ই আশা হ'য়েছিল। আশা হয়েছিল যে, আমরা আমাদের জাতীয় "প্রতিনিধি"র দ্বারায় অনেক দেখ্‌ব, অনেক শুন্‌ব, অনেক শিখ্‌ব, ; কিন্তু এখন যেন সে আশায় এক একবার নিরাশা দেখা দিতেছে!

"প্রতিনিধির" উদ্দেশ্য কি? আপনিই আপনার "উক্তি"তে ব'লেছিলেন যে,

আমাদের সমাজের সাধারণের মধ্যে যাতে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার হয়, প্রাণপণে "প্রতিনিধি" তার চেষ্টা করবে। কিন্তু আপ্‌নার সে আশ্বাস বাক্যে যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন ক'রেছিলেম, সেই অটল বিশ্বাস এখন যেন এক একবার টলমল ক'রে উঠ্‌ছে! পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, "প্রতিনিধি"র কাছে অনেক দেখিবার অনেক শুনিবার, অনেক শিক্ষা করিবার আশা ক'রেছিলেম; কিন্তু "প্রতিনিধি" আমাদিগকে যাহা ব'লে, তাহা আমরা শুনিতে পারি না; অথবা শুনিয়াও বুঝিতে পারি না। "প্রতিনিধি" যেরূপ শিক্ষা প্রদান করছেন, সে শিক্ষা ধারণার শক্তি সাধারণের সম্পূর্ণই অভাব। আপ্‌নাদের ওরূপ সংস্কার আবিষ্কার, ভেদ অভেদ, কয়জন লোকে বুঝিবে বা বুঝিতে পারে বলুন দেখি? তাতেই বলি এ ভাবে "প্রতিনিধি"র প্রধান উদ্দেশ্য কিছুতেই সাধন হবে না! তবে যদি কয়েকজন বি, এ, ও এম, এ, র,—আধুনিক ভাষায় যাঁহাদিগকে শিক্ষিত বলে, তাঁদের পড়িবার জন্য, বিদ্যার পরিচয় দিবার জন্য কিম্বা লেখক নাম কিনিবার জন্য "প্রতিনিধি" বাহির হইয়া থাকে, তবে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে।

বলুন দেখি, আপনাদের এফ্, এ, র অপরিস্ফুট ফাল্গুলত্ব, বি, এ, বিকারীর প্রলাপ-তত্ত্ব, এবং এম্, এ, র মহান্ মস্তিকের মহৎ সত্য সত্য সত্যই কি চোকে আঁধার দেখিয়ে দেয় না? বলুন দেখি, ছাত্রমণ্ডলীর দণ্ডমুণ্ডের বিধান কর্ত্তা পণ্ডিতটীর প্রকাণ্ডকাণ্ড বঙ্গভাষার সপিণ্ডকরণে শিক্ষিতেরও হৃদ্‌পিণ্ড কি শুষ্ক হ'য়ে যায় না? তাতেই বলি, উপাধির মুখচাওয়া ধন আপনাদের সমাজের শিরোভূষণ গুটীকতককে বৈতরণীর পরপারে যেতে বল্‌বেন এবং হমোজিনিয়াস্, হিটারোজিনিয়াস্ কতকগুলীকে প্রেতপুরে পাঠিয়ে দিবেন? আমরা গৃহে বোসে রামনাম জপ করব! যদি তাতে "প্রতিনিধির" অঙ্গহানি হয়, তবে আমরা না হয়, ঠাকুর মায়ের "ব্যাঙ্গমা" "ব্যাঙ্গমীর" গল্প লিখে পাঠিয়ে দিব; তাও বোধ হয়, বুলবুলের কচ্‌কচানি চেয়ে মিটুনি হ'তে পারে!

রাগ করিবেন না। আপনাদের ভাষা লেখার বলিহারি যাই! আপনাদের হাতে পড়িয়া আজ্ বঙ্গভাষা সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা, একটু ইংরাজি, একটু উর্দ্দু, একটু সংস্কৃত, একটু হিব্রু! যেন সকের সাড়ে আঠার ভাজা, জিনিষটা বড় মন্দ নয়, বেশ মুখ রোচক, তবে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে; কিন্তু ভদ্রলোকের তাতে পেটের পীড়া জন্মে যায় যে! বাঙ্গালীর দেশে বাঙ্গালীর পত্রিকায় বাঙ্গালীর সন্তানের বিশুদ্ধ বাঙ্গলা লেখাটায় কি কোনরূপ মানের হানি হয়, না, উপাধিতে দোষ অর্শে?

মেয়ে মানুষ হয়ে অনেক বলিলাম, নিজগুণে ক্ষমা করবেন। আমরা অবলা জাতি কি বলিয়া বাড়াইতে হয় জানি না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা আপনাদের সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক। আর ভবিষ্যতে যেন প্রতিনিধিকে সরল ও সুপাঠ্য করিয়া আমাদের ন্যায় সাধারণ পাঠক পাঠিকার উপকার করা হয়—ইহাই করযোড়ে প্রার্থনা।

খাঁড় গ্রাম
৩১শে আশ্বিন ১২৯৮।

শ্রীমতী—

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

প্রথম ভাগ।

আমাদের উদ্দেশ্য কি?

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়া বিগত আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াই বন্ধ হইয়া ছিল। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ গত, অথচ এই তিন মাসের পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত হয় নাই। বলিতে গেলে প্রতিনিধির এখন শৈশব অবস্থা! সুন্দর সুন্দর উপাদানে কলেবর পূর্ণ করিয়া অভিনব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নির্দ্ধারিত সময়ে হাঁসিতে হাঁসিতে পাঠক পাঠিকার করতলগত হইয়া তাঁহাদের মনে সন্তোষ প্রদান ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করাইবার প্রতিনিধির পক্ষে এই প্রকৃত সময়। এক কথায় বলিতে গেলে প্রতিনিধির এবার পরীক্ষার বৎসর। এ সময়ে প্রতিনিধি অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইলে চলিবে কেন? এই তিন মাস প্রতিনিধি প্রকাশিত না হওয়ায় অনেকেই হয়ত প্রতিনিধির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন, হইবার কথা বটে। বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ সংবাদ ও সাময়িকপত্রের অবস্থা দেখিয়া পাঠকবর্গের মনে এ সন্দেহ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যখন সাধারণ সম্পাদক ও প্রকাশকগণের দ্বারা নিত্যই এবম্বিধ অভিনয় অভিনীত হইতেছে, তখন আমাদের দ্বারাতেই বা না হইবার কারণ কি? কিন্তু পাঠক ও গ্রাহকবর্গের মনে যে ভাবেরই উদয় হউক না কেন, প্রতিনিধির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের অন্তকরণে যেন কোনই সন্দেহ স্থান না পায়।

আমাদের বাক্যের উপর তাঁহাদের আস্থা স্থাপন করাইবার জন্য অন্য বাগাড়ম্বর না করিয়া "আমাদের উদ্দেশ্য কি?" এইটী বিশদভাবে বুঝাইলেই গ্রাহক ও পাঠক মহাশয়গণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন প্রতিনিধির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আছে কি না এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে বিলম্বে প্রকাশের কারণও অবগত হইতে পারিবেন। কেবলই ইহাও নহে আমাদের উদ্দেশ্য কি ভাঙ্গিয়া বলিলে কতকগুলি গ্রাহক ও পাঠকের মনের অপরাপর অমূলক সন্দেহও দূরীভূত হইতে পারে। এই সকল কারণে আজ আমরা সরল অন্তঃকরণে আমাদের উদ্দেশ্য কি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

স্বাধীনতা উচ্চ সম্মান ও অর্থ এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে হইলে সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়। ইহাই সাধারণ এবং অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা। দেশ কাল পাত্র ভেদে এ ধারণা ঠিক নহে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় পত্রিকা সম্পাদকের যেরূপ স্বাধীনতা, সম্মান ও আয় এ দেশে সেরূপ নহে। স্বাধীনতা ও সম্মানের পরিমাণ লইয়া দেশীয় ও বিদেশীয় সম্পাদকের মধ্যে কথঞ্চিৎ তুলনা করিতে পারি বটে, কিন্তু পত্রিকার আয় সম্বন্ধে ঠিক বিপরীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিলাতে ও মার্কিনে সংবাদপত্রের আয়ে সম্পাদকের বাবুগিরি করিয়া চলে, এদেশে সংবাদপত্রের খরচ কুলাইতে সম্পাদককে স্কন্ধে ঝুলি গ্রহণ করিতে হয়। অন্যোপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা অধিকাংশ সম্পাদককে সম্পাদিত পত্রিকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়, পত্রিকার আয় হইতে যাঁহাদের কাগজ চলে তাঁহারা ভাগ্যবান সন্দেহ নাই। শিক্ষিত ও অর্থশালী এই উভয় গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকটেই সংবাদপত্রের আদর। বিলাত ও মার্কিনের তুলনায় আমাদের দেশে এই উভয় গুণ বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা খুব কম। দ্বিতীয়তঃ সংবাদপত্র সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির প্রধান অবলম্বন ইহা যেমন ইয়ুরোপ ও আমেরিকার লোক বুঝেন এমন আমাদের দেশের লোক বুঝেন না। এই কারণে ইয়ুরোপ ও আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশে সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা অতিশয় ন্যূন হইলেও সুচারুরূপে চলে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও বিশেষতঃ সঙ্কীর্ণ ও দরিদ্র উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া যে আমরা অর্থ লালসায় প্রতিনিধি প্রকাশে ব্রতী হই নাই ইহা বোধহয় বুদ্ধিমান গ্রাহক ও পাঠক মহোদয়গণকে আর কষ্ট স্বীকার করিয়া বুঝাইতে হইবেনা। বাঁকী থাকিল স্বাধীনতা ও সম্মান। ইহা বোধহয় উল্লেখ করাই বাহুল্য যে, দরিদ্র ব্যক্তি উদরান্নের সংস্থান না করিয়া কেবল মাত্র স্বাধীনতা ও সম্মান প্রাপ্তির আশয়ে কোন কার্য্যে কখনই হস্তক্ষেপ করেনা। পূর্ব্বেই বারংবার বলিয়াছি আমরা দরিদ্র; ঘর হইতে ক্ষতিপূরণ করিবার ক্ষমতা যখন আমাদের নাই তখন আমরাও যে রুগ্ন স্বাধীনতা ও সম্মানের লোভে প্রতিনিধি সম্পাদন কার্য্যে ব্রত হইনাই তাহাও কি আর বলিতে হইবে? তবে আমরা কোন উদ্দেশ্য পরিচালিত হইয়া প্রতিনিধি সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছি? যদি আমরা মান যশঃ অর্থ কিছুরই প্রত্যাশা করিনা, তবে কি কেবল মাত্র সমাজের হিতকল্পে নিস্বার্থ ভাবে এ গুরু ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছি? না তাহা ঠিক নহে। তাহা বলিলে কতকটা ভণ্ডামির পরিচয় দেওয়া হয়। প্রতিনিধি প্রকাশের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ১ম সংখ্যায় "সম্পাদকের নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদরূপে বুঝান গিয়াছে। উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের হিতকল্পেই যে প্রতিনিধির জন্ম তাহা কেবলই আমরা কেন ২।৪ জন সুবিজ্ঞ সম্পাদক এবং শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। পাঠকগণ ভণ্ডামিই বলুন আর যাহাই বলুন, জাতীয় সমাজের উন্নতি কামনারূপ উদ্দেশ্য পরিচালিত হইয়াই যে আমরা এ গুরুভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে যেন কাহারও তিলমাত্র সন্দেহ না থাকে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, যখন

আমরা প্রথমতঃ একার্য্যে হস্তক্ষেপ করি তখন আমাদের মনে এ স্বার্থের আশার উদয় হইয়াছিল যে, জাতীয় সমাজ হইতে অন্তত দুটা ধন্যবাদ এবং প্রতিনিধির সমুদায় ব্যয় অনায়াসে প্রাপ্ত হইব। কিন্তু আজ কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি, উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ প্রতিনিধির প্রতি মহানুভূতি প্রকাশ করিতে একরূপ উদাসীন। আমরা উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের নিকট যেরূপ উপকার প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলাম, এখন বুঝিয়াছি তাঁহাদের নিকট সেরূপ উপকার প্রাপ্তির আশা নিতান্ত অল্প। যে জাতির জনসংখ্যা লক্ষাধিক সে জাতির নিকট একখানি জাতীয় পত্রিকার অন্যূন সহস্র গ্রাহক আশা করা আমরা প্রথমতঃ অসম্ভব মনে করিতে পারিনাই। কিন্তু আমরা আজ কয়েক মাস যেরূপ পরিশ্রম উদ্যম ও অর্থ বিনিময়ে যে পরিমাণ গ্রাহক সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহাতে সহস্র গ্রাহক হইতে এখনও বহু বিলম্ব। আমরা পূর্ব্বাপর কখনই ব্যবসার আশয়ে প্রতিনিধি প্রচার করিনাই সুতরাং সে হিসাব ধরিব না। সংখ্যা শিক্ষা অর্থ এই ত্রিবিধ বিষয়ে আমাদের সমাজ রীতিমত সম্পন্ন নহে সুতরাং আমরা ঘরে ঘরে প্রতিনিধিকে বিরাজিত দেখিতে আশা রাখি না। প্রত্যেক উগ্রক্ষত্রিয়ের গ্রামে একখানি করিয়া প্রতিনিধি দেখিলেই আমাদের আশা পূর্ণ হইতে পারে। দরিদ্রভাবে প্রতিনিধি চালাইতে গেলেও, অন্তত ১২ মাসে ১২০০ শত টাকা না হইলে প্রতিনিধির ন্যায্য ব্যয় সঙ্কুলান হইবে না। অতএব ৬০০ শত গ্রাহক হইলেই প্রতিনিধির উভয় উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে আমরা ভাবিয়াছিলাম লাভের আশা থাকুক বা না থাকুক প্রতিনিধির ২।৪ সংখ্যা প্রকাশ হইবা মাত্র ইহার আত্মব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অন্ততঃ ৬০০শত গ্রাহক উৎসাহের সহিত ১২০০শত টাকা প্রদান করিয়া আমাদিগকে আর্থিক চিন্তার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবেন। ৬০০শত গ্রাহক হওয়া দূরে থাকুক আমরা সমাজ হইতে আশানুরূপ উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছি না। কোথায় আর্থিক চিন্তায় নিশ্চিন্ত হইয়া প্রতিনিধির উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হইব না তাহার বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। বৈশাখ মাস হইতে প্রতিনিধি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একবারও প্রতিনিধি প্রকাশিত হয় নাই। ইহার কারণ কি? অর্থ বিভ্রাট। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি প্রকাশ করিনাই। (কারণ সে পথ এদেশে রুদ্ধ) যদি তাহা করিতাম তাহা হইলে ঘর হইতে অথবা ঋণ করিয়া পরিমিত টাকা মূল ধন লইয়া প্রতিনিধি প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিতাম। প্রতিনিধিও রীতিমত নির্দ্ধারিত সময়ে প্রকাশিত হইত এবং বড় বড় সংবাদপত্রে আড়ম্বরময় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়া সমাজের মধ্যে একটা হৈচৈ পড়িয়া যাইত। আমরা লাভের আশার উৎফুল্ল হইয়া রং বেরংয়ে প্রতিনিধিকে সাজাইয়া পাঠকের সমীপে, হাজির করিতাম। সমাজের যেরূপ অবস্থা, কালের যেরূপ গতি তাহাতে, বর্ষ শেষে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিদিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইত। আমাদের অবস্থা দেখিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও আর কোনকালে কেহ এ পথে পদার্পণ করিতে সাহসী হইতেন না; একটী সাধু অনুষ্ঠান বহুদিনের মত অননুষ্ঠিত থাকিয়া যাইত। আমরা

ভগবৎ কৃপায় এই ভবিষ্যত ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের বিষয় পূর্ব্ব হইতেই ভাবিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তাই আমরা ব্যবসানীতির দিকে গিয়া প্রতিনিধিকে আড়ম্বরময় করিয়া তুলিতে পারি নাই। সহযোগী বর্গ যাহাই মনে করুন, পাঠক ও গ্রাহকগণ যাহাই ভাবুন, আমরা চক্ষুলজ্জা ও খ্যাতি প্রশংসার অনুরোধে বা নিন্দার ভয়ে আমাদের প্রাণসম প্রতিনিধির স্কন্ধে ঋণ ভার চাপাইয়া উহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিব না—আমরা প্রতিনিধিকে দু দশ দিনের জন্য হঠাৎ বাবু সাজাইয়া পরে শ্মশানের চিতানলে স্বহস্তে দগ্ধ করিতে পারিব না। যাহাতে প্রতিনিধি কোনরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, ইহাই আমাদের কামনা, ইহাই আমাদের আন্তরিক চেষ্টা। আমরা সেই চেষ্টাতেই প্রাণপণে নিযুক্ত রহিয়াছি। উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ জাতীয় পত্র প্রতিনিধিকে স্থায়ীরূপে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম কিনা এবং প্রতিনিধি সম্বন্ধে সমাজের মতামত কিরূপ এই সমুদয় তথ্য অবগত হইবার জন্য আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে সমাজের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হয়। যাহাতে প্রতিনিধি আগামী বর্ষে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে জাতীয় সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারে, এবারে আমাদিগকে সেই চেষ্টায় ফিরিতে হইতেছে বলিয়া প্রতিনিধির মুদ্রণ ও প্রকাশ-কার্য্য যথা সময়ে ঘটিয়া উঠিতেছে না। ইহা প্রতিনিধির মৃত্যু লক্ষণ নহে, দীর্ঘ জীবন লাভের হেতু। যে করুণাময়ের কৃপা কটাক্ষে প্রতিনিধির জন্ম হইয়াছে, তাঁহারই অসীম কৃপায় প্রতিনিধি পরমায়ু পরিমিত কাল দুঃখে কষ্টে অথবা তাঁহার ইচ্ছা হইলে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিবে ইহা সকল কথার সার কথা। তারপর ভগবান ইচ্ছা করিয়া যাঁহাদের হস্তে প্রতিনিধির লালন পালন ভার অর্পণ করিয়াছেন, বিদ্যা বুদ্ধি ও অর্থে নিতান্ত দরিদ্র হইলেও উক্ত ত্রিবিধ সম্পদে সম্পন্ন অধিকাংশ ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহারা স্বসমাজের কল্যাণেচ্ছু এবং প্রতিনিধির অকপট বন্ধু সুতরাং তাঁহারা বরাবর সাধ্যানুসারে প্রতিনিধিকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিবেন। আর যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে সমাজে প্রতিনিধির এমন অনেক অপরিচিত সদাশয় বন্ধু আছেন যাঁহাদের প্রদত্ত সাহায্যেপ্রতিনিধির ভরণ পোষণমোটামুটি নির্ব্বাহিত হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম প্রতিনিধির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তবে যখন ধনী ও শিক্ষিতবর্গ প্রতিনিধির দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগকে আশানুরূপ উৎসাহ দানে বিমুখ, তখন ইহাকে রক্ষা করিতে আমাদিগকে অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে। তাই পাঠক ও গ্রাহক সমীপে আমাদের বিনীত নিবেদন, প্রতিনিধি প্রকাশ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমাদের যে কোনরূপ ত্রুটী হইবে, আমাদের অবস্থা ভাবিয়া তাঁহারা যেন তাহা মার্জ্জনা করেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন "যদি প্রতিনিধি প্রতিপালনে মান যশঃ অর্থ এই তিনেরই কোন প্রত্যাশা নাই পরন্তু বিড়ম্বনা যথেষ্ট আছে, বিশেষতঃ যখন আপনাদের অপেক্ষা সমাজে বিদ্যা বুদ্ধি ধন সম্পন্ন ব্যক্তি অনেক রহিয়াছেন তাঁহারা যখন প্রতিনিধিকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন তখন আপনাদেরও এ বিড়ম্বনা ভোগ কেন?" কথা সত্য বটে। কিন্তু ধনবান কৃপণ হইবে বলিয়া কি দরিদ্রের কৃপণ হওয়া উচিত? না মহতে যদি সাধুকার্য্য না করে, তবে ক্ষুদ্রে কি তাহা করিবে না? জগতে যখনই কোনরূপ

বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখনই প্রয়োজন বশত মহত লোক জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আবার অধিকাংশ মহত ব্যক্তির জন্মই দরিদ্রের কুটীরে। সেই কুটীরেই তাঁহারা লালিত পালিত হইয়া জগতকে আলোকিত ও মোহিত করিয়া গিয়াছেন। যখনই উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে আন্দোলন আলোচনা প্রবেশ করিয়া সুষুপ্ত সমাজকে জাগরিত করিয়া একটা হৈ চৈ উৎপাদন করিয়াছিল, তখনই প্রতিনিধির জন্মের আবশ্যকতা হইয়াছিল। ঐশ্বরীক বিধানে দরিদ্র আমাদের কুটীরেই প্রতিনিধির জন্ম হইয়া গেল। আমরা লালন পালন ভার বহন করিতে পারিব না বলিয়া শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের করে নবজাত শিশুকে অর্পণ করিতে গেলাম, তাঁহারা ইহাকে আশ্রয় দিলেন না। সুতরাং আমাদিগকেই অগত্যা ইহার প্রতি পালন ভার লইতে হইল। তদবধি দরিদ্রের কুটীরেই ইহা লালিত পালিত হইয়া আসিতেছে, যতদিন কোন উপযুক্ত এবং ইহার অকপট হিতৈষি বন্ধুর হস্তে ইহাকে অর্পণ করিতে না পারিব, ততদিন প্রতিনিধি দুঃখে কষ্টে আমাদের আশ্রয়েই প্রতিপালিত হইবে। কর্ত্তব্য বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া প্রতিনিধিকে আশ্রয় দিয়াছি; ভগবৎ কৃপায় যতদিন কর্ত্তব্য বুদ্ধি থাকিবে ততদিন প্রতিনিধিকে আশ্রয় চ্যুত করিব না।' স্থূলকথা প্রতিনিধি যাঁহার ইচ্ছাতে জন্মিয়াছে আবার তাঁহারই ইচ্ছায়ত মৃত্যু মুখে পতিত হইবে তাহার জন্য চিন্তা কি? ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই সমুদয় জাগতিক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে বটে কিন্তু সদসৎকার্য্যের জন্য জীব সকল নিমিত্তের ভাগী হইয়া আসিতেছে। তিনিই প্রতিনিধির স্রষ্টা ও পালক এবং তিনিই ইহার সংহারক হইবেন। কিন্তু আমাদের যত্নে ইহা প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া সমাজের নিকট আমরা প্রশংসার পাত্র হইয়াছি এবং যখন আমাদের হস্তে ইহার আয়ুশেষ হইবে তখন আমরা যে নিন্দার হাত এড়াইতে পারিব এরূপ বোধ হয় না। সেইরূপ আমাদের সমাজও যদি ইহাকে পালন করিতে উদাসীন হন, তাহা হইলে ভিন্ন সমাজের নিকট তাঁহাদেরও যে কলঙ্ক রাখিতে স্থান হইবে না—ধনীর ধন গৌরব, শিক্ষিতের শিক্ষাভিমান, সমাজহিতৈষির হিতেচ্ছা যে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

আমাদের উদ্দেশ্য সমাজের উন্নতি সাধন। উপদেশ ও অনুষ্ঠান ভেদে দ্বিবিধ উপায়ে সামাজিক উন্নতি সংসাধিত হইয়া থাকে। জাতীয় সভাসমিতি ও ধনী সম্প্রদায়ের দ্বারা কার্য্যতঃ উন্নতি হইবে। আর জাতীয় পত্রিকা উপদেশ দ্বারা সদসৎকার্য্যের ভেদ বুঝাইয়া দিবে এবং লোকের প্রবৃত্তি লওয়াইবেন প্রতিনিধি শেষোক্ত ভার গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিনিধির কার্য্যও ত্রিবিধ। জাতীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ। সমাজ-সংস্কার অর্থাৎ যে সুপ্রথা উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে অননুষ্ঠিত রহিয়াছে তাহার অনুষ্ঠান, যে কুরীতি সমাজে প্রচলিত থাকিয়া সমাজের প্রকৃত পক্ষে অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহার পরিহার, উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে যে সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ রহিয়াছে সেই অনিষ্টকারী ভেদাভেদ উঠাইয়া একতা সংস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ প্রদান প্রতিনিধির দ্বিতীয় কার্য্য। প্রতিনিধির তৃতীয় কার্য্য উগ্রক্ষত্রিয় সাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ। প্রতিনিধি এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় কার্য্য করিতে সাধ্যমত ত্রুটী

করে নাই, কিন্তু প্রথম কার্য্যে অর্থাৎ জাতীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহে প্রতিনিধি আজিও কৃতকার্য্য হয় নাই। এজন্য ২।১ জন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং অপরাপর ২।৪ জনে আমাদের প্রতি কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতেন এ কার্য্যটী কত গুরুতর তাহাহইলে তাঁহারা অকারণ বিরক্ত হইতেন না। আজকাল কল্পনা বলে বা কিম্বদন্তীর সাহায্য লইয়া জাতীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করা বড় কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু আমাদের ত পাঠক ভুলান ইচ্ছা নাই। যাহাতে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির প্রকৃত ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হয় আমাদের তাহাই বাসনা রহিয়াছে! কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হওয়া কি বড় সহজ? একেত কোন জাতিরই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিবৃত্ত হইতে পারে কি না সন্দেহ। বঙ্গদেশের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতি সর্ব্বজাতি অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই সভ্য। আবহমান কাল হইতে ইহাঁদের সমুদয় বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদের যে পঞ্চজন আদিপুরুষ এদেশে আসিয়া ছিলেন, যাঁহাদের নামাবলম্বনে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্ত রচিত হইয়াছে, গ্রন্থান্তরের কথা মানিতে গেলে ঐ নামের ব্রাহ্মণ এদেশে কেহ আসেন নাই; তাঁহাদের নাম ঐ পঞ্চ নাম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।* যাঁহারা আপনাদের অবস্থা লিখিয়া পড়িয়া রাখিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের দশাই যদি এইরূপ, তবে আমাদের জ্ঞাতির যখন কোনই লিখিত বিবরণ এ পর্য্যন্ত আমাদের কিম্বা আমাদের পরিচিত কোন বন্ধুবান্ধবেরই চক্ষুগোচর হয় নাই, তখন ভাবুন, আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস সংগ্রহ কত কঠিন ব্যাপার! আমাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইলে কতকগুলি মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ক্রয়, প্রাচীন রাজসংসারের দপ্তরখানা তল্লাস, উগ্রক্ষত্রিয় জাতির আদিম বাসস্থানে গমন করিয়া তথ্য অনুসন্ধান ইত্যাদি কত ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ কার্য্যের প্রয়োজন তাহা একবার সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রতিনিধির সেরূপ অর্থ ও সময় আজিও হয়নাই। পাঠকবর্গ একটু ধীর হইয়া সময় প্রতীক্ষা করুন, যদি প্রতিনিধি জীবিত থাকে, তবে জাতীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে অবশ্যই প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। আরও ইতিবৃত্ত সংগ্রহ অভাবে প্রতিনিধির মূল উদ্দেশ্যের কোনই ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। তখন অত উদ্বিগ্ন হইলে চলিবে কেন?

আশ্বিনের প্রতিনিধি পূজার বন্ধের পর কার্ত্তিকের শেষভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। তার কিছুদিন পরেই আমরা পশ্চিমাঞ্চলে পানাগড়, দুর্গাপুর, ফরিদপুর, এসেনসোল প্রভৃতি স্থানে গমন করি। পানাগড়ের বাবু ত্রৈলোক্যনাথ পাল, বাবু আপালচন্দ্র কুণ্ডার, দুর্গাপুরের বাবু কৈলাশ চন্দ্র মণ্ডল (ইনি কাশীপুরী থাকের উগ্রক্ষত্রিয়) ফরিদ পুরের বাবু বিপিন বিহারী মণ্ডল (ইনি পশ্চিম তরফের উগ্রক্ষত্রিয়) এবং এসেনসোলের বাবু বারাণসী রায়, বাবু রামলাল রায় (ইহাঁরাও কাশীপুরী থাকের উগ্রক্ষত্রিয়) প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রতিনিধির উন্নতিকল্পে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা ভাবিলে অন্তঃকরণে প্রকৃতই আনন্দের ও আশার উদ্রেক হয়। উল্লিখিত মহোদয়গণ সকলেই আমাদিগকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বিপিন বাবু ও ত্রৈলোক্য বাবুর অমায়িক ভাব ও উদার ব্যবহার কখনই ভুলিবার নহে।

আমাদের মফস্বল ভ্রমণের উদ্দেশ্য কেবল গ্রাহক সংগ্রহ নহে। উগ্রক্ষত্রিয়সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সামাজিক আচার ব্যবহার পরিজ্ঞাত হওয়াও আমাদের অপর উদ্দেশ্য। উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ ঘুচাইয়া একত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক সামাজিক বল বৃদ্ধি করাই আমাদের মূল মন্ত্র। সেই মন্ত্র সাধন করিতে হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া ও সকলের মিলনের আশা ও ইচ্ছা কিরূপ তাহা অগ্রে না অবগত হইয়া কোন মতামত প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা মফঃস্বল পরিভ্রমণ কালে যাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছি তাঁহারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। তাঁহারা সকলেই পরস্পর মিলিত হইবার জন্য আমাদের নিকট যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের মূলমন্ত্র সিদ্ধির অনুকূল বলিয়া আশা হয়। আমাদিগের উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে যে কয়েকটী সম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তি মহোদয়গণকে আমরা এ বিষয়ে যত্ন লইতে অনুরোধ করি। এখন পাঠকগণ বুঝিলেন আমাদের উদ্দেশ্য কি? আপনারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন আমাদের উদ্দেশ্য সফল হউক — জাতীয় সমাজের উন্নতি হউক।

* এ সম্বন্ধে আমাদের জনৈক বন্ধু একটী বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন তাহা সময়ে প্রতিনিধিকে প্রকাশ হইবে।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী (৪)

[বঙ্গদেশের বিবরণ।]

ভারতবর্ষের যে খণ্ডে আমাদের নিবাস ইহারই নাম বঙ্গদেশ এবং ইহার অধিবাসীরা যে ভাষায় কথোপকথন বা লিখিত গ্রন্থাদি প্রকাশ করে, তাহারই নাম বঙ্গভাষা। উহারই অপভ্রংশে বাঙ্গালা ভাষা নাম হইয়াছে। বঙ্গদেশ কতটুকু, উহা কোন কোন সীমার অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে অনেক মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কোন দেশ যে চিরকালই এক সীমার অন্তর্নিবিষ্ট থাকিবে, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে; তজ্জন্য বঙ্গদেশও হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজদিগের সময়ে বিভিন্ন বিভিন্ন সীমার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, অতি প্রাচীনকালে সোমবংশীয় বলি নামক নৃপতির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি ক্ষেত্রজপুত্রগণ এক এক দেশে রাজ্য স্থাপন করত ঐ ঐ স্থান স্ব স্ব নামে অভিহিত করেন, তদবধি সেই সকল দেশ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নামে খ্যাত হয়। ইহাতেই নিশ্চিত প্রতীতি হইতে পারে, যে, যে দেশে বঙ্গনামা বলিপুত্র রাজ্য করিয়াছিলেন তাহাই বঙ্গদেশ। যদিও এইরূপে বঙ্গদেশের সত্তা স্থিরীকৃত হইল, কিন্তু উহার সীমানা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে লিখিত আছে—'রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে। বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ, অর্থাৎ দক্ষিণ সমুদ্রের কুল হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত

বলিপুত্র বঙ্গের রাজ্য, ইহা সর্ব্বসিদ্ধি-দায়ক। শাস্ত্রীয় এই বচনে আমরা কেবল মাত্র বঙ্গদেশের উত্তর দক্ষিণ দুই দিকের সীমানা পাইলাম। পূর্ব্ব পশ্চিমের কোনরূপ সীমার নির্দ্দেশ হইল না। যদি আমরা বঙ্গদেশকেই পূর্ব্বসীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করি, তাহা হইলেও পশ্চিম সীমার পক্ষে গোলযোগ রহিল। এখন শাস্ত্রে যে ব্রহ্মপুত্রের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই ব্রহ্মপুত্রকেই পশ্চিমসীমা নির্দ্দেশ করিলেও করা যায়; কারণ ব্রহ্মপুত্র গৌহাটী, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থান দিয়া পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইয়া ধুবড়ি পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তৎপরে ধুবড়ী হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া রঙ্গপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাব্না প্রভৃতি কয়েকটী জেলা পশ্চিমে রাখিয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুরের মধ্যে মেঘনার সহিত মিলিয়া সাগরে সঙ্গত হইয়াছে। যদি ইহাকেই শাস্ত্রোক্ত বঙ্গের চতুঃসীমা ধরা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, যে, বর্ত্তমান চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দুরঙ্গ, নওগাঁ, শিবসাগর প্রভৃতি জেলা এবং গারো, খস, জয়ন্তিয়া, নাগা, কুকী প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিদিগের বাসস্থানগুলিই উক্ত বঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের আর একটী শাখা বগুড়ার পূর্ব্ব হইতে প্রবাহিত হইয়া ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জের নিকট দিয়া দক্ষিণ পশ্চিম মুখে আগমন করত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বলে। যদি আমরা এই পুরাতন ব্রহ্মপুত্রকে পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে আরও দুই একটি জেলা কমিয়া যায়। যাহা হউক, প্রথম কথিত স্থানগুলিই আমরা পূর্ব্বকালের বঙ্গ বলিয়া স্থির করিলাম। এক্ষণে এই সীমান্তর্গত বঙ্গের লোক যে ভাষা কহে, তাহারই নাম বাঙ্গালা ভাষা বলিতে গেলেই, আমাদের মূল অভিব্যাপ্তিতেই দোষ ঘটে। সুতরাং এ বঙ্গ আমাদের বক্তব্য নহে।

আমরা সংক্ষেপেই শাস্ত্রীয় বঙ্গের সীমা নির্দ্দেশ করিলাম। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের শাস্ত্রীয় সীমানির্দ্দেশ করিতে হইলে আরও অনেক লেখা যায়, কিন্তু তাহাতে অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। তৎপরবর্ত্তী কালে হিন্দুদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গের সীমা পশ্চিমে আরও বিস্তৃত হইয়া ভাগীরথী পর্য্যন্ত আইসে। তাহাতে খুলনা, যশোহর, পাবনা, রঙ্গপুর, কুচবেহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রাজসাহী, মুরশিদাবাদ, নদীয়া ও চব্বিশপরগণা বঙ্গীয় সীমার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। এই সময়েই বোধহয় গৌড় রাজ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। আমাদের শাস্ত্রে এবং বিজাতীয়দিগের ইতিহাসে গৌড়দেশ ও গৌড় রাজধানীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা উক্ত রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। শাস্ত্রে লিখিত আছে—'সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলোৎকলাঃ। পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥ কার্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ। আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়া পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥' এই শ্লোকদ্বয়ে উৎকলকে (উড়িষ্যা) বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎকলকে বিন্ধ্যের দক্ষিণবর্ত্তী বলই সঙ্গত; গুর্জ্জরকে (আধুনিক গুজরাট) দক্ষিণদিকবর্ত্তী

বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা দক্ষিণবর্ত্তী নয়, বরং উত্তরবর্ত্তী। ইহাতে স্বতই এইরূপ ধারণা হয়, যে, উক্ত দুই স্থানের স্থিতির কিছু ইতরবিশেষ হইয়া থাকিবে। আমাদের বোধ হয়, আদিকালে প্রাচীন ঋষিগণ ভারতবর্ষের যে দুই বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রথমভাগে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ গৌড় এবং দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটাদি পঞ্চ দ্রাবিড় হইতে পারে। মনুসংহিতাতে আর্য্যাবর্ত্তের এইরূপ বিবরণ আছে।—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ। তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরায্যাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥

অর্থাৎ সমুদ্রের পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং হিমালয়ের দক্ষিণ ও বিন্ধ্যের উত্তর, এই স্থানকে পণ্ডিতগণ আর্য্যাবর্ত্ত বলেন। অমরকোষে লিখিত আছে—

আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্ম্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ।

অর্থাৎ, হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী পুণ্যভূমিই আর্য্যাবর্ত্ত। কিন্তু অনেক স্থলে উড়িষ্যাকে দক্ষিণ-দিক-মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, এবং তাহাই করা উচিত। তবে উহাকেও আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে ধরিতে হইলে, বিন্ধ্যপর্ব্বতকেও পশ্চিম সমুদ্রকুল হইতে গণ্ডওআনার নিম্ন দিয়া ভুবনেশ্বর অথবা পুরীর নিকট বঙ্গোপসাগরে মিলিত এইরূপ কল্পনা করিতে হইবেক *। তাহা হইলেই সারস্বত প্রদেশ, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকল, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানই গৌড়দেশ। তাহাতে আমাদের পূর্ব্বকথিত বঙ্গ এবং সারস্বত প্রদেশ ও কান্যকুব্জের পূর্ব্বদিকবর্ত্তী ভূভাগই গৌড় নামে খ্যাত হইতে পারে। পাশ্চাত্য কোবিদবর Monier Williams অনুমান করেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা ও দীল্লি প্রদেশ গৌড় নামে আখ্যাত হইত। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট আপনাকে গৌড়ীয় নন্দনবাসীনামক কুলজাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে গৌড়ের সীমাবিষয়ে কোন গোলযোগ মিটিবার নহে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগঃ শিবে। গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥

অর্থাৎ, বঙ্গদেশ হইতে ভুবনেশ পর্য্যন্ত গৌড়দেশ। এখন ভুবনেশ কোথায়? উৎকলদেশে ভুবনেশ্বর বলিয়া একস্থান আছে। উহা পুরীর কিঞ্চিৎ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। যদি আমরা সেই ভুবনেশ্বর ধরি, তাহা হইলেত আদৌ গৌড়ের সীমা-নির্দ্দেশই হইল না। কেন না, কোথায় গৌড় আর কোথায় ভুবনেশ্বর। তবে বোধ হয়, পূর্ব্বে ভুবনেশ নামে অন্য কোন স্থান ছিল।

পালবংশীয় রাজাদিগের পরে ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন কোন মহাত্মা দিনাজপুরের রাজবাটীতে বিরূপাক্ষ দেবের এক মন্দির প্রস্তুত করান, উহার একটী স্তম্ভে—

'কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং প্রাসাদো নিরমায়ি'

* হইলার সাহেব তদীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিন্ধ্য পর্ব্বতকে পূর্ব্বসমুদ্রকুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইত্যাদি লিখিত আছে। উক্ত শ্লোকে 'গৌড়পতিনা' লিখিত থাকায় অনুমান হয়, এই সময়ে গৌড়রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। তৎকালে উহার রাজধানী দিনাজপুর। আদিশূরের সময়ে বিক্রমপুর রাজধানী হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, ভাগীরথীর পূর্ব্বপার বঙ্গ ও পশ্চিম পার গৌড়। তাঁহাদের এ ধারণা নিতান্ত অসঙ্গত নয়; কারণ,প্রথমতঃ ভাগীরথী পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্য স্থাপিত হইলে, হুগলীর সন্নিহিত সপ্তগ্রামই উহার রাজধানী হয়। এককালে এই সপ্তগ্রাম গৌড়েশ্বরের হর্ম্ম্য-মালায় সুশোভিত ছিল; এককালে সহস্র সহস্র বাণিজ্যপোতে উহার কাঞ্চী উদ্ভাসিত থাকিত; এককালে সুদূর ইউরোপেও উহার বাণিজ্যের কথা উঠিয়াছিল। এখনও স্থানে স্থানে অনেকানেক ভগ্নাবশেষদ্বারা উহার ভূত ঐশ্বর্য্যের স্মরণ করাইয়া দেয়।

কোন স্থানের সীমা কিছু চিরদিনই একরূপ থাকে না। তজ্জন্যই বোধ হয়, পরবর্ত্তী কালে গৌড়ের সীমা দিনাজপুর ও বিক্রমপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই অগ্রসরের সময়, আমাদের বোধ হয়, বল্লালসেনের রাজত্ব বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বকাল। কারণ, যৎকালে ভরদ্বাজাদি পঞ্চগোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণের ছাপ্পান্ন পুত্র রাজদত্ত ছাপ্পান্ন গ্রামে সুখসচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে বল্লালসেন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র দুই বিভাগ করেন। যাঁহারা রাঢ় অর্থাৎ অনুগঙ্গ প্রদেশ সকলে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয়, আর যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমে অর্থাৎ পদ্মানদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারাই বারেন্দ্র হইলেন। ইহাতেই স্পষ্ট জানা যায়, যে, আদিশূরাদির কালের গৌড় ও রাঢ় একই স্থান, নামান্তর ভেদ মাত্র। এই সময়েই বঙ্গ ও রাঢ় বা গৌড় মিলিয়া বাঙ্গালা নামে খ্যাত হয়।

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইল, যে, আদিশূরাদির রাজত্বকালে বঙ্গ ও গৌড় মিলিয়া বাঙ্গালা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গ হইতে বাঙ্গালা কি প্রকারে হইল, সহজেই এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। অগ্রে আমরা সেই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। দুই উপায়ে আমরা 'বঙ্গালা' বা 'বাঙ্গালা' শব্দ সিদ্ধ করিতে পারি। প্রথমতঃ, সংস্কৃত-ব্যাকরণ-ঘটিত-সূত্র দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ, অধিকারীবাচক হিন্দি 'ওআলা' শব্দ দ্বারা। 'বঙ্গ এবাং নিবাসঃ' ইতিবাক্যে 'লোপো বহুবচনে' এই সূত্রদ্বারা প্রত্যয়ের লোপ হইয়া 'বঙ্গাঃ' এই পদ সিদ্ধ হইতে পারে। তৎপরে 'বঙ্গা বিদ্যন্তে অস্মিন্' এই বাক্যে 'চূড়ার্দ্দেলঃ'এই সূত্রে বঙ্গ+ল হইয়া 'নাম্ন্যন্ত্যর্থে অচোর্দ্ধ্যঃ' এই সূত্রে দীর্ঘ হইয়া 'বঙ্গাল্' এই পদ সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ বঙ্গরা যে দেশে থাকে, তাহাই বঙ্গাল দেশ। তৎপরে ঐ বঙ্গাল শব্দ হইতেই বাঙ্গালা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ঘাটাল শব্দও এইরূপে সমুৎপন্ন। অধিকারীবাচক 'ওআলা' (১) শব্দ হইতেও বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন

(১) এস্থলে ইহাও বক্তব্য, যে হিন্দি 'ওআলা' শব্দ সংস্কৃত 'বল্' প্রত্যয়েরই অপভ্রংশ। অস্ত্যর্থক হিন্দি 'ওআলা' শব্দ 'বালা' এইরূপে লিখিত হয়। অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণ 'ওআ' এইরূপ। সুতরাং 'বালা' হইতেই 'ওআলা' দাঁড়াইয়াছে। হিন্দি 'বালা' সংস্কৃত 'বল্' প্রত্যয় হইতে গৃহীত। ব্যাকরণ-সূত্র 'রজঃ আদেলর্বঃ' অর্থাৎ রজঃ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে বল প্রত্যয় হয়। যথা, কৃষি আছে যার=কৃষীবল; দন্ত আছে যার=দন্তাবল। শিখা আছে যার=শিখাবল। ইহাদেরই হিন্দি হইল, কৃষিবালা, দন্তবালা, শিখাবালা, পুত্রবালা ইত্যাদি। ইহাদেরই 'কৃষিওআলা', 'দন্তওআলা'; 'শিখাওআলা' 'পুত্রওআলা' এইরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে।

হইতে পারে। যথা বঙ্গ+ওআলা=বাঙ্গালা। এইরূপ গো+ওআলা=গোআলা কিম্বা গয়লা। অনেকে বলেন, আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে, পূর্ব্বকালীন রাজগণ দেশের নিম্ন প্রদেশে ১০ হস্ত উর্দ্ধ ও ২ হস্ত প্রশস্ত এক এক আল বা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেই বঙ্গ+আল বা বঙ্গাল হইতে বাঙ্গালাদেশ নাম হইয়াছে। আমরা এ সিদ্ধান্তকে সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না। কারণ, নিম্ন ভূমিতে আল দিবার প্রথা অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে, উহা ভেড়ী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যখন সহস্র সহস্র স্থানে আল দিবার প্রথা দেখা যাইতেছে, তখন একমাত্র বঙ্গদেশই আল-যুক্ত বলিয়া বাঙ্গালা নাম ধারণ করিল, আর কোন স্থান করিল না কেন? আল যুক্ত বলিয়া বঙ্গদেশের বাঙ্গালা নাম হইলে আরও দুইচারিটী স্থানের তদ্রূপ নাম শ্রুতিগোচর হইত।

এস্থলে আরও একটি গুরুতর আপত্তি এই যে, সাধারণ বিশেষণ দ্বারা কাহাকেও বিশেষ করা যায় না। 'হাতওআলা মানুষকে ডাক,' 'চারপেয়ে গরু আন' এইরূপ বলিলে যেমন এক বিশেষ ব্যক্তি বা গো'র বোধ জন্মে না, তদ্রূপ সাধারণ বিশেষণ 'আল' দ্বারা বঙ্গের কি বিশেষ জানা যাইবে। যদি কেবল বঙ্গেরই আল থাকিত, তাহা হইলে 'আল-যুক্ত' বঙ্গ এরূপ বলার কতক স্বার্থকতাও সম্পাদিত হইতে পারিত। সুতরাং, আইন-ই-আকবরীর মতে আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না। অধিকন্তু, আমরা দেখিতেছি, আকবরের অনেক পূর্ব্বে কোন কোন লোকের নামও 'বাঙ্গাল' ছিল। ধ্রুবানন্দমিশ্রিধৃত কুলজীর বচনে দৃষ্ট হয়, যে বল্লালসেন চট্টবংশীয় বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাচ জনকে কুলীন করেন*। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আদিশূরাদির রাজত্বকালে বঙ্গদেশের বাঙ্গালা নাম হইয়াছে; সুতরাং, তৎকালে কেহ কেহ 'বাঙ্গাল চন্দ্র' এইরূপ নাম ধারণ করিয়া থাকিবে; সেই 'বাঙ্গাল চন্দ্রই' বল্লালের নিকট কেবল 'বাঙ্গাল' নামে কথিত হইয়াছে। অদ্যাপিও 'বাঙ্গাল চন্দ্র', 'নবদ্বীপচন্দ্র' ইত্যাদি নাম শুনা যায়। এই সমস্ত যথাযথ বিবেচনা করিয়া আমরা একরকমে 'বাঙ্গালা' শব্দের মূল স্থির করিলাম। আমাদের সিদ্ধান্ত কতদূর সঙ্গত, তাহা বিজ্ঞ পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

হিন্দুদিগের রাজত্বকালের বঙ্গদেশের বিবরণ আমরা যথাসাধ্য বিবৃত করিলাম, এক্ষণে মুসলমান ও ইংরাজদিগের সময়ের বঙ্গের কথা কিছু বলা আবশ্যক। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে ফার্সী এবং আরবীভাষার বহুল প্রচার হইয়াছিল। সমগ্র ইউরোপ যখন অমানিশার ঘোর তামসীতে সমাচ্ছন্ন; যখন ইদানীন্তন সুসভ্য ব্রিটিস্‌জাতি ধনুর্ব্বাণ হস্তে বনে বনে মৃগয়া করিয়া আমমাংসভক্ষণ এবং পশুচর্ম্মে কথঞ্চিৎ লজ্জানিবারণ করতঃ স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া মৃত্তিকার নিম্নে অধিবাস করিত, তাহারও অনেক পূর্ব্বে আরবীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিয়াছিল। পারস্য ভাষায়ও সাহিত্য ইতিহাসের অসদ্ভাব নাই, তবে দুঃখের বিষয় এই যে সকল গুলিই আধুনিক। অতি

অতএব মুলানুসন্ধান করিতে গেলে হিন্দি বা বাঙ্গালা 'ওআলা' শব্দ সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন বলিলেও বলা যায়।

* বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥

প্রাচীনকালের উক্ত ভাষার কোনরূপ গ্রন্থাদি ছিল না,একথা বলা যায় না, তবে কোন প্রকারে সে রত্নগুলি লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আজকাল যে গুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের সকলগুলিই মুসলমানরাজত্বকালে বিরচিত। তারিখ-ই-ফিরিস্তা নামক ইতিহাসে হিজরী ৩৮৩ অব্দ হইতে আকবারের মৃত্যু ১০২৩ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরীনামক গ্রন্থও মুসলমানদিগের ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয়। ইহাতে কেবল আকবরের সমকালের রাজ্যের অবস্থা, আয়ব্যয় এবং রাজসংক্রান্ত সকল বিষয়ই বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। তৎকালে সমগ্র রাজ্য অষ্টাদশ সুবায় বিভক্ত ছিল। এই সকল সুবারও সম্পূর্ণ বিবরণ উহাতে বিবৃত আছে। আইন-ই-আকবরীতে ভারতের প্রাচীন কথা অত্যধিক লিখিত হয় নাই।

ইবন-বটুআ নামক জনৈক আফ্রিকাদেশীয় পর্য্যটক মুহম্মদ-বিন-তোগলকের রাজ্যকালে দিল্লীর প্রাড্‌বিবাক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অবশেষে চীনদেশের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিতে ভারতের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ঐ গুলির নামমাত্রই কেবল অস্তিত্ব বজায় করিতেছে, মূলগ্রন্থ অনেক অনুসন্ধানেও দৃষ্টিগোচর হয় না।

গজনীনগরাধিপতি মামুদ প্রাচীন পারসীক ভূপালদিগের ইতিবৃত্ত লিখিবার নিমিত্ত তাৎকালিক কোবিদবর ফারদুসীকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে সাহনামানামক কাব্য বিরচিত হয়। সাহনামা ইতিহাস না হইয়া পুরাণের ন্যায় অলৌকিক অসম্বন্ধ বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অধিকন্তু, ইহাতে মহম্মদ বা কোরাণের বিষয় কিছুই লিখিত না হওয়ায়, মামুদ যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হন, এবং গ্রন্থকারকে অঙ্গীকৃত স্বর্ণমুদ্রাস্থানে রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করেন। এই ক্ষতিতে ফারদুসী এরূপ অবসন্ন হইয়াছিলেন, যে, সেই অবসাদেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। শুনা যায়, সুলতান আক্ষেপ করিয়া অবশেষে অবশিষ্ট স্বর্ণগুলি পুনঃ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু, তৎকালে কবিবরের স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়ায়, মুদ্রাগুলি তদীয় কন্যার হস্তে অর্পিত হয়। পাঠকমহোদয়গণ! সাহনামার রস্তমের হিকমত শুনিয়াছেন; সে জন্মিয়াই দশটী গাভীর দুগ্ধ পানকরিয়াছিল; তিন বৎসর বয়সের সময় অদ্বিতীয় অশ্বারোহী হয়, এবং দশ বৎসরের সময় অসমকক্ষ যোধা হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত তারিখ-ই-য়াসীনা, তাজ-উল-মআসির; তবকাত-ই-নাসিরীনামক আরও কয়েক খানি ইতিহাস আছে। আমরা এই সকল গ্রন্থ হইতে মুসলমানদিগের বঙ্গাধিকারের স্থূল স্থূল বিবরণ প্রকাশ করিব।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে গজনীনগরাধিপতি সবকতাজিন-পুত্র মামুদ উপর্য্যুপরি ষোড়শ কি সপ্তদশ বার ভারতের নানাভাগ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গে প্রবেশ করেন নাই। তৎকালে ভারতের নানা দেশে হিন্দু ভূপালগণ রাজত্ব করিতেন। মামুদের আক্রমণে কাহারও স্বাধীনতার হানি হয় নাই। অর্থগৃধ্নু মামুদ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া, তাহাতে সহস্র সহস্র মনুষ্যের উত্তপ্ত শোণিত আহুতি দিয়া এবং শত শত নরমুণ্ড সেই যজ্ঞে বলিদান করত উপযুক্ত দক্ষিণা পাইলেই, 'এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া, অকামীর ন্যায় যাহার রাজ্য তাহাকেই পুনরর্পণ করিতেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অর্থাৎ মামুদের মৃত্যুর পর একশত চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ অনেকবার অনেক বিজাতীয় বীরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সম্যক্ অধিকৃত হয় নাই। কান্যকুব্জাধিপতি আপনাকে রাজাধিরাজ বলিয়া আখ্যাত করিতেন। অভিষেকাদিকালে অন্যান্য রাজারা আসিয়া তাঁহার সেবা না করিলে, তাঁহার মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ থাকিত না। তদীয় অভিষেক-সময়ে নানাদিগ্দেশাগত নৃপতিবৃন্দ বিবিধ শুশ্রূষা করিল, কিন্তু দিল্লীশ্বর আসিল না। ইহাতে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া দিল্লীশ্বরের এক মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া, দ্বারবানের দ্বারদেশে স্থাপন করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তদীয় কন্যার স্বয়ম্বরোপলক্ষে রাজন্যবর্গ সমাহূত হইলে, রাজকন্যা বরমাল্য হস্তে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও মনোনীত না করিয়া, দ্বাররক্ষকের স্বরূপ মৃন্ময় দিল্লীশ্বরের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিল। ইত্যবসরে প্রকৃত দিল্লীশ্বরও কোথা হইতে আসিয়া নিমেষমধ্যে রাজকন্যাকে লইয়া পলায়ন করিল। সভাস্থ সমস্ত নৃপতি অবমানবোধে দিল্লীশ্বরের পশ্চাদ্ ধাবিত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। এই বিস্ময়াবহ-ব্যাপার-দর্শনে কান্যকুব্জরাজ যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেন এবং স্বয়ং প্রতীকারে অক্ষম হইয়া গিজনীপতি সুলতানকে দিল্লী আক্রমণের অভিপ্রায় জানাইলেন। তদনুসারে এক উদ্দণ্ড সৈনিকব্যূহ দিল্লী অবরোধ করিল। অধিপতি বিভীষিকাপূর্ণ-হৃদয়ে ভার্য্যার নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু সেই নবোঢ়া বধূ কাঞ্চীশোভিত কমনীয় নিতম্বে ভীষণ তরবারি আলম্বিত করিয়া বীরোচিতস্বরে—'মৃতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং' বলিয়া স্বামীকে সমরোন্মুখ করিল। কিন্তু লক্ষ্মী চিরকালই নীচগামিনী। তাই নিরামিষভোজী স্বাত্ত্বিক হিন্দুপতি পরিত্যাগ করত মদ্যমাংসাহারী পলাণ্ডুলশুনপ্রিয় রাজসিক যবনের করতলগত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। দিল্লীশ্বর সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিলেন; তৎপত্নীও জলন্ত চিতায় আরোহণ করিল। এই সময় হইতেই দিল্লীর তখতে যবনাধিকার বদ্ধমূল হয়।

উর্দ্দুতে একটী প্রবাদ আছে—'জিন্‌হোনে জাল ঔরোঁ কে লিয়ে বিছায়া বহ (Pr ওঃ) আকসর খোদ ফাঁসতে হৈ। ইহারই ঠিক অনুরূপ ইংরাজি 'Men are often to get caught themselves in the snare they set for others.' আমরাও বলি, 'পরের মন্দ করতে গেলে, আপনার মন্দ আগে হয়।' কনোজাধিপতির তাহাই ঘটিল। বিজয়দৃপ্ত আফগান সৈন্য অবিলম্বে কনোজ আক্রমণ করিল। তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। তদীয় রাজ্য যবনের করলিত হইল। যবনসেনানীরা দিল্লী ও কনোজের স্থানে স্থানে বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণকরাইয়া তাহাতে—

'বিস্‌মোল্লা হের্ রহমা নের্ রহিম—

আইস আমরা পরম দয়ালু ঈশ্বরের নামে এই কার্য্য আরম্ভ করি।

এল্লেল্লাহ আলাকুল্লে শেইন কদীর—

বাস্তবিক ঈশ্বর সকল বস্তুর উপরেই ক্ষমতাবান।

আল্লাহো নুরুছুমাবাতে বলা আরদে—

ঈশ্বর আকাশ এবং পৃথিবীর আলোক।

আল্লাহো আহদ আল্লাহো ছমদ—

বল, যে ঈশ্বর এক এবং পবিত্র। তাঁহার জন্মদাতা নাই।

লাএলাহ এল্লেল্লাহ হোআল হেয়ল কয়ুম—ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি অনন্তকাল জীবিত এবং স্থির থাকিবেন ইত্যাদি লিপি করিল এবং হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ প্রয়াগক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া, উহার নাম রাখিল 'আল্লা আবাদ' অর্থাৎ খোদার স্থান। ঐ আল্লা-আবাদ এখনও ইংরাজিতে Allahabad লিখিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই প্রকৃত উচ্চারণটী করেন না। উল্লখিত শব্দটীর উচ্চারণ দেখুন, Allah—আল্লা; abad=আবাদ। এইরূপ উচ্চারণ বৈষম্যে কত শব্দের নাম যে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলিবার যো নাই।

লাক্ষ্মণেয়ের অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে অর্থাৎ ১২০২ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার (বখত—ভাগ্য; এক্তিয়ার বশীভূত; যাহার ভাগ্য বশীভূত) খিলজি বাঙ্গালা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই বেহার অধিকার করেন। স্থবির লাক্ষ্মণেয় অন্তিমে গঙ্গাতীরে বাসকরত শান্তিসুখভোগ করিবার বাসনায় নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে যবনচমূর আক্রমণ-বার্ত্তাশ্রবণে ভীত হইয়া পলায়নপর হইলেন। (১) লাক্ষ্মণেয় শব্দটী আমরা লক্ষ্মণশব্দের উত্তর অপত্যার্থক ফেয় প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন করিলাম, অর্থাৎ আদিশূর হইতে নবম পুরুষোদ্ভব লক্ষ্মণের বংশজাত বলিয়া আমরা ইহার নাম লাক্ষ্মণেয় ধরিলাম। এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণও তাঁহাকে লাক্ষ্মণেয় নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কুলপঞ্জিকাগ্রন্থে (২) ও তবকাত-ই-নাসিরী নামক মুসলমানী ইতিহাসে তাঁহাকে লক্ষ্মণসেন লিখিয়াছে; আর আইন-ই-আকবরীতে ২য় লক্ষ্মণসেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। জয়দেবও লক্ষ্মণের সভার পঞ্চরত্নের মধ্যে একজন ছিলেন (৩)। অস্মদ্দেশে একবংশে দুই জনের একনাম কখনই হয় না। বিশেষতঃ পঞ্চম পুরুষের মধ্যে হইলে পিণ্ডদোষ জন্মে। ইংরাজদিগের মধ্যে একই নাম পুত্রপৌত্রাদিক্রমে চলিতে পারে; কেবল ভেদজ্ঞাপনার্থ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি এক একটী বিশেষণ পূর্ব্বে দিলেই চলিয়া যায়। আমাদের দেশে এ প্রথা ছিলও না এবং অদ্যাপিও নাই। এই সমস্ত যথাযথ বিবেচনা করিয়া, আমরা ২য় লক্ষ্মণসেনকে লাক্ষ্মণেয় বলিলাম। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গের ইতিহাস লেখক মার্সমান সাহেব তাঁহাকে লাক্ষ্মণাউ বলিয়াছেন (৪)।

বখতিয়ার খিলিজী বাঙ্গালা অধিকার করিয়া গৌড়নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। বখতিয়ারের পর খিলিজিবংশীয় আরও কয়েক জন ভূপতি বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে গয়াসুদ্দিন বঙ্গেশ্বর হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করিলে, সুলতান আলটমাস জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির উদ্দিনকে পাঠাইয়া,তাহার বিনাশসাধন করেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত নসিরুদ্দিনের হস্তেই বঙ্গের শাসনকার্য্য থাকে; কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তওগান খাঁ বাঙ্গালার মসনদে উপবেশন করেন। এইসময়ে উড়িষ্যারাজা গৌড় নগর অবরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়াতে প্রত্যাগত হন।

ইহার পর আরও দুই একজন রাজা বঙ্গসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে সমস-উদ্দিন আলটমাস দ্বিতীয় পুত্র নাজির-উদ্দিন মামুদকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করেন। কোন কোন ইতিহাসে (কোন কোন কেন, প্রায় সমস্ত ইংরাজি ইতিহাসেই) সমস-উদ্দিন আলটমাসের দুই পুত্রই নাসিরুদ্দিন নামে অভিহিত হইয়াছে। মার্সমান সাহেব নাজির-উদ্দিনই লিখিয়াছেন। অন্যান্য দুই একখানি ইংরাজি ইতিহাসেও নাজির-উদ্দিন দেখা যায়। উক্ত দুইটি নামের অর্থগত অনেক পার্থক্য আছে। নাজিরউদ্দিনের অর্থ—মজহব দেখনে বালা—যে ধর্ম্ম দেখে। কিন্তু নসির-উদ্দিনের অর্থ—দিন মদত করণে বালা—যে ধর্ম্মের সাহায্য করে। ফিরিশতায় নাজির-উদ্দিনই লিখিত আছে। নাজির শব্দটী ইংরাজিতে 'Z' দিয়াই লিখিতে হয়। কিন্তু কোন স্থলে 'S'রও 'Z'র ন্যায় উচ্চারণ হইয়া থাকে; যেমন Civilisation. বোধ হয়, এই জন্য কোন কোন ইংরাজি ইতিহাস লেখক নাজিরকে ইংরাজিতে Nasir লিখিয়াছেন! তাঁহাদের অভিপ্রায়, যে লোকে 'S' কে 'Z'র ন্যায় পাঠ করিবে। ইহার আরও একটী প্রমাণ এই যে, কেহ কেহ 'Nasir' লিখিয়া 'a'র মস্তকের উপর দীর্ঘস্বরব্যঞ্জক রেফের ন্যায় ' এইরূপ এক চিহ্ন দিয়া থাকেন। তাহাতে 'না' এইরূপ উচ্চারণ হইলে, নাজিরই পঠিত হইতেপারে; কারণ, পারস্যভাষায় নসির ও নাসির শব্দের অর্থগত কোন পার্থক্য নাই; নাজির শব্দেই আছে। সুতরাং, নাজির-উদ্দিন স্থলেই বোধ হয়, ইংরাজিতে 'Nasir-uddin' লিখিত হইয়া থাকিবে। তাহাই এক্ষণে পারস্যভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় ইতিহাসবেত্তৃদিগের নিকট নাসির-উদ্দিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মৃত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পারস্যভাষায় ব্যুৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তিনিও নাসিরউদ্দিন লিখিয়া স্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। যাহা হউক, আমরা আলটমাসের দ্বিতীয় পুত্র নাজির উদ্দিনকেই বঙ্গেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলাম। মার্সমান সাহেব তাঁহাকে আলটমাসের Yrandson বলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে পৌত্র কি দৌহিত্র কিছুই বুঝা যায় না। মেডোজ টেলার সাহেব দ্বিতীয় পুত্রই বলিয়াছেন। ইনি রাজ্যেশ্বর হইয়া বিমাতা কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন, কিন্তু ভ্রাতৃপুত্র মসুদসাহায্যে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ফিরিশতা গ্রন্থে তাঁহার অনেক গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে, তিনি একাধিক দারপরিগ্রহ করেন নাই! এই স্ত্রীই স্বহস্তে তাঁহার খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া না দিলে তিনি আহার করিতেন না। এক দিবস রাজ্ঞী খাদ্য প্রস্তুত করিতে হাত পোড়াইয়া তাঁহার নিকট বিজ্ঞাপন করিলে, তদুত্তরে তিনি বলেন 'সহ্য কর, ঈশ্বর তোমাকে পরিষ্কৃত করিবেন'। কারাবাসকালে নাজির কোরাণের সংশোধন করেন। তাঁহার সন্তানাদি ছিল কি না, তদ্বিষয়ে কিছু স্থিরতা নাই; মুসলমানদিগের ইতিহাসে তাহার কোনরূপ উল্লেখ দেখা যায় না।

তৎপরে তুগ্রল খাঁ নামক জনৈক মুসলমান বঙ্গেশ্বর হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করত বিদ্রোহী হইলে দিল্লীশ্বর তদ্বিরুদ্ধে

---

(১) কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, যে লক্ষ্মণসেন পলাইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে আশ্রয় লন, এবং তথায়ই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

(২) বল্লাল নৃপের পুত্র নামেতে লক্ষ্মণ।
মাধব তাহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
কেশব ভূপতি হন মাধব তনয়।
তার সুত গুণযুত লক্ষ্মণ সে হয়॥

(৩) গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥

(৪) Abridgement History of India; History of Bengal, By Marshman. তদীয় বৃহৎ ইতিহাসে লক্ষ্মণসেনই লিখিত আছে।

যাত্রা করেন এবং তাহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বপুত্র বগরা খাঁকে অভিষিক্ত করত প্রত্যাগত হন। তিনি কিছুকাল রাজত্ব করিয়া গতাসু হইলে, তদীয় দ্বিতীয় পুত্র কয়কাউস পিতৃস্থান অধিকার করে। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে কয়কাউসের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সাহেব উদ্দিন গৌড় সিংহাসন সুশোভিত করেন। এই সময়ে তদীয় ভ্রাতা বাহাদুর সাহ সুবর্ণগ্রামের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু উভয়েই অচিরকাল মধ্যেই নিহত হইলে ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে ফকির-উদ্দিন সুবর্ণ গ্রামে স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। তৎকালে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজ্যের তৃতীয়বর্ষে ইনি মোবারেক-কর্ত্তৃক নিহত হইলে, মোবারেক আলাউদ্দিন নাম গ্রহণ করত দুই বৎসর রাজত্ব করেন। ফিরিশতা ইহাকে অতি সামান্য নৃপতি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছে। তৎপরে হাজিইলিআস সমসউদ্দিন নামে রাজপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্য-বিস্তৃতি করায় সম্রাট ফিরোজ সাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া একদালার দুর্গে আশ্রয় লন। দিলীশ্বর কৃতকার্য্য হইতে না পারায় প্রত্যাগত হওয়ায় তদবধি বঙ্গদেশ প্রায় শতাব্দী ব্যাপিয়া স্বাধীনাতসুখ ভোগকরিয়াছিল। সমসউদ্দিনের পর আরও কয়েকজন যবন রাজা রাজত্ব করেন। তৎপরে ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা কংস বঙ্গসিংহাসন অধিকার করতঃ ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তৎপুত্র জিৎমল ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া জেলালউদ্দিন নাম ধারণপূর্ব্বক সপ্তদর্শ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৪০৯)। তৎপুত্র আমেদও অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্যভোগ করেন। তৎপরে ১৪২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৩ পর্য্যন্ত আট দশ জন ভূপতির রাজ্যকাল!

দিল্লীশ্বর আকবরের পিতামহ বাবর তৈমুর ও জেঙ্গিসের বংশোদ্ভূত। উক্ত বংশীয়েরা সমরকন্দ, বোখারা বলখ প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিতেন। উত্তরাধিকারী-সূত্রে বাবরেরও উহাতে স্বত্ব বর্ত্তে। ৯৩০ হিজরীতে তদীয় অন্তঃকরণে রাজবিস্তারের ইচ্ছা বলবতী হয়, তদনুসারে তিনি ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়া বেহার ও লাহোর হস্তগত করেন। অনন্তর দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইয়া ইব্রাহিম লোদীর সম্মুখীন হন। ৯৩২ হিজরী, ৭ই রজবে পানিপাতের যুদ্ধে ইব্রাহিম পরাস্ত ও নিহত হইলে বাবরই দিল্লীর পাদসাহ-পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে নসরতসাহ বাঙ্গালার মসনদে বিরাজমান ছিলেন। বাবর তদ্বিরুদ্ধে উপস্থিত হইলে তিনি বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া নিষ্কৃতি পান। মোগলকুলতিলক আকবরসাহ দিল্লীশ্বর হইয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা কুত্রাপি বিক্রম প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। তৎকালে দাউদ ও মনিম খাঁ বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন। এই সময়ে জায়গীরদারদিগের উপদ্রব হওয়াতে পাঠানেরা বাঙ্গলার কিয়দংশ অধিকার করেন। তাহাদিগের বিদ্রোহ নিবারণের জন্য সম্রাট মানসিংহের হস্তে বাঙ্গালা ও বিহারের রাজ্যভার প্রদান করেন। কবিকঙ্কণ স্বরচিত চণ্ডীকাব্যে মানসিংহের গুণ গান করিয়াছেন; যথা—

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল সমীপে।
বিধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে
খেলাত পায় মামুদ সরীফে॥

শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ।

রাজা ও প্রজা। (১)

বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত, লিখিত ও অলিখিত প্রমাণ সকলের সমন্বয় ও গবেষণা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় অতি প্রাচীনকালে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও পূর্ণাঙ্গ রাজপদ বিদ্যমান ছিল না। তদানীন্তন জনগণ স্বীয় স্বীয় গৃহস্বামীর বশীভূত হইয়া তৎপ্রদর্শিত বিধির বাধ্য হইতেন। জ্ঞাতিগণ সেই অভিজ্ঞ জ্ঞাতিবৃন্দের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য প্রণালীর অনুসরণ করিতেন বলিয়া তাহার নাম কুলতন্ত্রতা-শাসন-প্রণালী বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন কুলের সকলেই আবার এক সমাজপতির অধীনে পরম সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাই তত্তৎ কালীন সামাজিক রাজ্য প্রণালী এবং ভাবী রাজ শাসনের আদর্শ।

অধিক পরিবার হইলেই বহু বিধির প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন ক্রমশঃ লব্ধপ্রসর হইলেই গ্রামণী প্রথার অঙ্কুর উদ্ভব হয়। আবার গ্রামণী পঞ্চক সমবেত হইলেই পঞ্চ গ্রামাধিপের উৎপত্তি। এইরূপ বিস্তার উন্মুখ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আপন ক্ষমতা সামন্ত শাসনে পরিণত করে; একাধিক সামন্ত সমবায়ে এক এক চক্র গঠিত। কালক্রমে সেই চক্রের সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণই চক্রবর্ত্তী বা সম্রাট নামে বিশ্রুত হন। এই রূপ ক্রমবর্দ্ধন ও বিবর্ত্তন দ্বারা বর্ত্তমান কালের রাজপদের আবির্ভাব হইয়াছে।

রাজ শাসনের অভাব হইলেই অরাজকতা উপস্থিত হয়। অরাজকতা অতি সঙ্কট অবস্থা। অরাজকে অমূল্য জীবনের মূল্য নাই। অরাজকে আত্ম-স্বজনের স্নেহ ভক্তিতে জলাঞ্জলি দিতে হয়। অরাজকে পার্থিব বা অপার্থিব কোন পদার্থেই স্বত্ব থাকে না। সংসার লোকারণ্য হইয়াও নির্মনুষ্যের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অরাজক হইলে কি অত্যাহিত ঘটে তাহার কতক আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"নারাজকে জনপদে বীজমুষ্টিঃ প্রকীর্য্যতে।
নারাজকে পিতুঃ পুত্রো ভার্য্যা বা বর্ত্ততে বশে॥
নারাজকে ধনং নাস্তি নাস্তি ভার্য্যাপ্যরাজকে।
* * * কুতং সত্যমরাজকে॥
নারাজকে জনপদে কারয়ন্তি সভাং নরাঃ।
উদ্যানানি চ রম্যাণি হৃষ্টাঃ পুণ্য গৃহানি চ॥
নারাজকে জনপদে যজ্ঞশীলা দ্বিজাতয়ঃ।
নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টা নট নর্ত্তকাঃ॥
নারাজকে জনপদে সিদ্ধার্থা ব্যবহারিণঃ।
কথাভিরভিরজ্যন্তে কথাশীলাঃ কথাপ্রিয়ৈঃ॥
নারাজকে জনপদে উদ্যানানি সমাগতাঃ।
সায়াহ্নে ক্রীড়িতুং যান্তি কুমার্য্যো হেমভূষিতাঃ
নারাজকে জনপদে ধনবন্তঃ সুরক্ষিতাঃ।
শেরতে বিবৃত দ্বারাঃ কৃষিগোরক্ষ জীবিনঃ॥
নারাজকে জনপদে বাহনৈঃ শীঘ্রবাহিভিঃ।
নরা নির্য্যান্ত্যরণ্যানি নারীভিঃ সহকামিনঃ॥
নারাজকে জনপদে বদ্ধঘণ্টা বিষাণিনঃ।
অটন্তি রাজমার্গেষু কুঞ্জরাঃ ষষ্ঠি হায়নাঃ॥
নারাজকে জনপদে বণিজো দূরগামিনঃ।
গচ্ছন্তি ক্ষেমমধ্বানং বহুপণ্য সমাচিতাঃ॥
নারাজকে জনপদে চরত্যেক চরো বশী।
ভাবয়ন্নাত্মনাত্মানং যত্র সায়ং গৃহো মুনিঃ॥
নারাজকে জনপদে যোগক্ষেমং প্রবর্ত্ততে।
নচাপ্যরাজকে সেনা শত্রূন্ বিষহতে যুধি॥
নারাজকে জনপদে নরাঃ শাস্ত্রবিশারদাঃ।
সংবদন্তোপতিষ্ঠন্তি বনেষুপবনেষু বা॥

যথাহনুদকা নদ্যো যথা বাপ্যতৃণং বনম্।
অগোপালা যথা গাব স্তথা রাজ্যমরাজকম্॥

* * * *

নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ।
মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্॥"

রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। ৬৭অ।

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই, অরাজকে কেহ কর্ষিত শস্যক্ষেত্রেও বীজমুষ্টি বপন করে না, পুত্র পিতার এবং পত্নী পতির অবশ হয়, ধন ও ভার্য্যা রক্ষা করা বিষম দায় হয়। সত্যের আদর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়, জ্ঞানিসমবায়ের সমিতি, পবিত্র গৃহাদি কেহ কর্ত্তব্য বোধে নির্ম্মাণ করে না, ধর্ম্মমূল দেবযজ্ঞাদি সমূলে নির্ম্মূল হয়, নটাদি স্বকার্য্য সম্পাদন জন্য উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হয় না, বহু বিঘ্ন হেতু ব্যবহারাজীব সূক্ষ্ম মীমাংসা করিতে সমর্থ হন না, মনোহর সংলাপে শ্রবণযুগল পরিতৃপ্ত হয় না, সায়ংপ্রাতে হেমভূষিতা কুমারীগণ নিশঙ্কভাবে বহিরাঙ্গণে ক্রীড়া করিতে ভীতা হয়, ঐশ্বর্য্যশালী দারুণ ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিতে পারে না, কৃষি পশুজীবীগণ অনর্গলে কালযাপন করিতে সঙ্কুচিত ও শঙ্কিত হয়, ভোগবিলাসী নর বাহনাদি যোগে বহির্বায়ু সেবনে অন্তরায় শূন্য হইয়া বৃক্ষবাটিকায় হর্ষে গমন করিতে সমর্থ হয় না, শিবিকা, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সজ্জীভূত যানবাহন কাহারও স্থায়ী সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয় না, পণ্যজীবীগণ বহুমূল্য বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া দূর ভ্রমণে ভীত ও বিরত হয়। তত্ত্বপরায়ণ যতী ইষ্টচিন্তা ত্যাগ করিয়া আসন্ন বিপদ চিন্তায় মগ্ন হন, অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা হয় না, সেনা রণে দেহপাত বা শত্রুপরাজয় করে না। শাস্ত্রী ত্রাসে ও আকুল চিত্তে শাস্ত্রচিন্তা পরিহার পূর্ব্বক বনে বা উপ বনে বাস করে। সংক্ষেপতঃ অরাজক রাজ্য জলশূন্য নদীর ন্যায়, তৃণাদি হীন বনের ন্যায়, অরক্ষিত গোধনের ন্যায় অবস্থাপন্ন হয়। বস্তুতঃ অরাজকে আপনার বলিতে কিছুই থাকে না, কেহই অনাকুল চিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, মানবগণ মৎস্যের ন্যায় একোদ্যমে পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করিতে থাকে।

পরিচালকের অভাব হেতু এই সুখজনক ধরণী কেবল অসুখই প্রসব করে। রাজার অভাবেই এই সমস্ত অনিষ্ট হইতে ভুবন সমূহ অরক্ষিত হয়। সর্ব্বদেশীয় শাস্ত্রেই অনধিক পরিমাণে অলৌকিক উপাখ্যান এই অরক্ষিত কালের প্রমাণরূপে বিদ্যমান আছে।

অভাবই উপায়ের অব্যবহিত মূল কারণ। অভাবের প্রাবল্যে অনুসন্ধিৎসাও প্রবলতা হইতে থাকে। তৎফল স্বরূপ কোথাও স্বজ কোথাও বা পরোক্ষভাবে সেই অভাব দূরীভূত হয়। কোথাও মানুষী যত্নে কোথাও অমানুষী নিয়তি ফলে কালচক্রের আবর্ত্তনে সেই অভাবের আশু বিনাশ ঘটিয়া থাকে। রাজাভাবও ঐ দৈবের অধীন।

বিকাশ উন্মুখ সমাজকে স্থিরভাবে উন্নত করিবার জন্য তাহার প্রথম স্থাপয়িতাই বিধির উপায় অবধারণ করেন। শাস্ত্রেও তাহার সমীচীন মীমাংসা সঙ্কলিত আছে। যুক্তি সহিত অবিরোধ হইলেও আমরা সেই শাস্ত্র মীমাংসিত বিবরণ গ্রহণ করিব, যেহেতু শাস্ত্রের বচনই সকলের গ্রাহ্য ও মান্য। মহাভারতও অন্যতম শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আমরা মহাভারত হইতে রাজার উৎপত্তির তাৎপর্য্য মাত্র গ্রহণ করিলাম। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে

হুতাশনানল দশ-উন অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর বলি গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বাপিত হইলে, গোষ্ঠীকথা প্রসঙ্গে রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তাহা এইরূপে মীমাংসিত হয়, যে, প্রথম সৃষ্টিতে রাজা ছিলেন না, সকলেই স্বেচ্ছাচার দ্বারা শাসন করিতেন। তাহাতে সমাজ উচ্ছেদ দশায় উপনীত হইতে লাগিল। সৃষ্টিকর্ত্তা সেই বিষম অবস্থা বিজ্ঞাপিত হইয়া, ব্রহ্মাদির মন্ত্রণায় মানসোদ্ভব বিরজাকে শাসন ভার অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাহাকে সন্ন্যাসব্রতের অনুরাগী দেখিয়া তাহার তনয় কীর্ত্তিমানই শাস্তারূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। কীর্ত্তিমানকে তাহাতে বীতরাগ দেখিয়া কীর্ত্তিমানের প্রিয়াত্মজ কর্দ্দমকেই সেই অলঘু ভার অর্পণ স্থিরীকৃত হইল। মহামতি কর্দ্দম সেই গুরুভার বহনে অনাস্থা প্রদর্শন করিলে, সাধুশীল দণ্ডনীতি বিশারদ কর্দ্দম তনয় অঙ্গদ শাসকপদে মনোনীত হইলেন, কিন্তু সেই অমিতবল প্রভুত্বে পরাঙ্মুখ হইলে তৎপুত্র অতিবলই সেই গুরুত্বের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হন। কিন্তু তিনি নিরতিশয় ব্যসনী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায় অতিবল উরসজাত ও মৃত্যুকন্যা সুনীথা গর্ভসম্ভূত বিজ্ঞ বেণকে ঐ পদে বরণ করা হয়; কিন্তু তিনি সেই প্রভুত্বে বিরাগ প্রদর্শন করিলেন। এইজন্য তদীয় নরকান্তকারী বংশধর সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পৃথুবিক্রম পৃথুই ঐ পদে অভিষিক্ত হন। তিনিই প্রথমে ভূরি পরিমাণে উচ্চাবচ ভূমি ভেদকরতঃ সমতল এবং ক্ষেত্রের উপযুক্ত ভূমির বহুলতা সম্পাদন করেন। তিনিই মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া কর্ষণাদি দ্বারা ধরিত্রীর দোহন করেন এবং ক্ষত হইতে রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয় এবং প্রজাপালন জন্য রাজা নামে খ্যাত হন।

রাজপদ এইরূপ বহু যত্নে অবধারিত হইলে অভিষিক্ত রাজাকে কার্য্য বিশেষে বিশেষ বিশেষ শক্তি প্রদত্ত হয়। সেই অক্ষুণ্ণ প্রভুতা পরিচায়ক অসংখ্য বিধিও শাস্ত্রের স্তরে স্তরে নিহিত আছে; কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রকায় প্রতিনিধিতে সে সকলের সবিস্তার আলোচনা সম্ভবপর নহে। এজন্য আমরা তাহার আলোচনায় নিরস্ত হইলাম। কেবল দিঙ্মাত্র প্রদর্শনার্থে কয়েকটী মাত্র আলিখিত হইল।

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন সর্ব্বত্র বিদ্রুতে ভয়াৎ
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজান মসৃজৎ প্রভুঃ॥
ইন্দ্রানিলমর্কানামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রানির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাংমাত্রাভ্যো নির্ম্মিতোনৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষুংষি চ মনাংসি চ।
নচৈনংভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্॥
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কসোমুঃ স ধর্ম্মরাট্
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥
বালোপিনাবমন্তব্যো মনুষ্যইতি ভূমিপঃ।
মহতীদেবতাহ্যেষ নররূপেণ তিষ্ঠতি॥"

৩—৮। ৭ অ। মনু

ইহার ফলিতার্থ এই অরাজকের ভয় হইতে প্রকৃতিপুঞ্জকে নিরাপদে রক্ষার জন্য ইন্দ্র, অনিল, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের প্রভৃতি দেবাংশে সর্ব্বপ্রভু রাজার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি ত্রিদশভাগ, এজন্য সর্ব্বপ্রাণীকেই অমিত তেজে পরাভব করিতে সমর্থ, পৃথিবীতে কেহই তাঁহার অপরিভব প্রতাপকে পরিভব করিতে পারে না। অগ্নি যেমন ক্ষণকাল মধ্যে সকল ধ্বংশ করিতে সমর্থ, তিনিও তদ্রূপ বাক্যমাত্র ব্যয়ে সমস্ত বিনাশ করিতে

BLEED THROUGH

পারেন। বায়ুর যেমন সর্ব্বত্র অবাধ গতি, তিনিও সেইরূপ চারাদি আকারে নিরঙ্কুশে সর্ব্বত্রগ। প্রভাকর যেমন স্বকীয় আলোকে তুল্যরূপে জগৎ উদ্‌ভাসিত করেন, তিনি সেইরূপ অবদানে জগৎ প্রকাশ করিতে সমর্থ। সোম যেমন স্নিগ্ধকর ও প্রিয়দর্শন, তিনিও তদ্রূপ তাপ নাশক, স্পৃহণীয় ও অসেচনক। কুবের যেমন অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, তিনিও সেইরূপ অপরিমিত কোষবন্ত। মহেন্দ্রের প্রতাপ যেমন সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ, তাঁহার প্রতাপও তদ্রূপ অসীম, ধর্ম্মরাজ যেমন দ্বেষ্যাদ্বেষ্য ভেদ না করিয়া পাপ পুণ্যের ন্যায় বিচার করেন, তিনিও সেইরূপ দোষাদোষের নিষ্পক্ষ বিচারক ও ধর্ম্মের অদ্বিতীয় রক্ষক। রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে অপমান করিতে নাই, তিনি মানবদেহধারী মহতী দেবতারূপে বিরাজমান।

শ্রীরামশঙ্কর রায়।

বিধবা-বিবাহ-বিচার।

[প্রথম প্রস্তাব।]

বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে, অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ শাস্ত্রের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া, সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবা বিবাহের অনুকূলে যে সকল শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে প্রতিকূল শাস্ত্রের খণ্ডন হয় নাই। যে সকল ব্যক্তি, বিধবা-বিবাহের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তিনি কেবল তাঁহাদেরই প্রদর্শিত যুক্তি তর্কাদি মাত্র খণ্ডন করিয়া, আপনার মত সমর্থন করিয়াছেন। তাহাতে প্রকৃত শাস্ত্রীয় রহস্য কিছুমাত্র প্রকাশিত হয় নাই। তবে কতকগুলি শাস্ত্রান্ধ ব্যক্তি তাঁহার লেখনীর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন মাত্র। সুতরাং বিচক্ষণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ বিধবা বিবাহের প্রতি আস্থাবান হইতে পারেন নাই। বরং বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ এই বিশ্বাসই তাঁহাদের দৃঢ়তর হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিধবা বিবাহের অনুকূলে সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র পরাশর সংহিতা। কারণ, মহর্ষি পরাশরই কলিকালের একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা। সেই পরাশরই যখন বলিয়াছেন,—

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ (১)

পতি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, পতিত হইলে, স্ত্রীলোকদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র সম্মত।

তখন বিধবাগণের দ্বিতীয়বার বিবাহ কোন ক্রমেই ধর্ম্মাচার বিরুদ্ধ নহে। বিশেষতঃ এটি কেবল পরাশরের বিধি নহে, নারদ সংহিতাতেও এই বচনটি আছে। নারদসংহিতা লক্ষশ্লোকময় বৃহৎমনুর সারভাগমাত্র! অত-

(১) পরাশরসংহিতা চতুর্থ অধ্যায়। নারদসংহিতা দ্বাদশ বিবাদ পদ।

পরাশরের বিধবা বিবাহ প্রতিপাদক বিধি মনুরও বিধি হইতেছে। এই নিমিত্ত মাধবাচার্য্য পরাশর ভাষ্যে "নষ্টে মৃতে" এই বচনকে স্পষ্টতঃ মনুর বচন বলিয়াছেন। মনু সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক ঋষিগণের নামের উল্লেখ করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে মনুরই নামের উল্লেখ করিতে হয়। এহেন মনুর বাক্যে যাহার আস্থা নাই, সে যে অতি নরাধম, হিন্দু নামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সুবিধা ছাড়িবেন কেন? তিনিও "নষ্টেমৃতে" এই বচনকে মনুর বিধি বলিয়া, যথাসাধ্য স্বপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন (২)। আমরাও এবিষয়ে সম্পূর্ণ এক মত। এই বচনে যে, বিধবার বিবাহ বিহিত হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করি না। ইহা যে মনু, নারদ ও পরাশরের বিধি তাহাও স্বীকার্য্য। বরং ইহাকে ব্যাসের বিধি বলিতেও প্রস্তুত আছি। কারণ, অগ্নিপুরাণেও উক্ত বচনটি অবিকল এইরূপই দৃষ্ট হয় (৩)। অতএব বিধবা বিবাহ ব্যাসেরও অভিমত। তথাপি আমরা যে বর্ত্তমান সময়ে বিধবা বিবাহের অনুমোদন করিতে পারিতেছি না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। যদি সেই কারণ জিজ্ঞাসা করেন ত বলিব যে, যে মনু বা যে নারদ বিধবা বিবাহের বিধি দিয়াছেন, তাঁহারাই আবার একবারমাত্র কন্যা সম্প্রদানের বিধি দিয়া বিধবার বিবাহের পথ এক প্রকার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যথা—

সকৃদংশোনিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রিণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥ (৪)

বিষয়ের অংশ একবার মাত্র হয়; কন্যাদান একবারমাত্র করিতে হয়; "দিলাম" এই বাক্য একবার মাত্র বলিতে হয়; এই তিন এক একবার।

এই বচনটি (৫) কেবল মনু বা নারদের নহে; ইহা বৃহস্পতি ও কাত্যায়নের বচন বলিয়াও প্রসিদ্ধ। সুতরাং "নষ্টে মৃতে" এই বচনের সমান মান্য ও প্রামাণ্য। কাজেই কন্যার পুনঃ সম্প্রদান হইতে নিবৃত্ত হইতে হইয়াছে। বিধবার বিবাহ দিতে গেলেই দ্বিতীয়বার কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ একবার বৈ কন্যাদানের বিধি দেন না; তখন উপায় কি? আপনা হইতেই বিধবা বিবাহের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হয়! দ্বিতীয়বার কন্যা সম্প্রদান করিলে, পারলৌকিক দণ্ডও অল্প নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যমদূত স্বয়ং বলিয়াছে;—

পুনর্দাতা চ কন্যায়াঃ
ক্রিমিরেবোপজায়তে॥

দত্তা কন্যার পুনঃ সম্প্রদান করিলে, ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

অতএব বলুন দেখি, কোন্ মূঢ় ব্যক্তি ক্রিমির বংশ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করেন?

যদি বলেন, প্রকারান্তরে যখন বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধই হইতেছে, তখন বিধবা বিবা-

(২) স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহোদয় প্রণীত "বিধবা বিবাহ" পঞ্চম সংস্করণ ৬৮ পৃষ্ঠা।

(৩) অগ্নিপুরাণ ১৫৪ অধ্যায়।

(৪) মনুসংহিতা নবম অধ্যায় ৪৭ বচন। "সকৃৎ সকৃৎ" স্থানে "সতাং সকৃৎ" পাঠও দৃষ্ট হয়। তাৎপর্য্যাংশে কোনও ভেদ নাই।

(৫) স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত দায়ভাগতত্ত্ব ধৃত মনু, নারদ, বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন বচন।

হেতু বিধি প্রণয়নেরই বা কি প্রয়োজন ছিল। ইহার উত্তর এই যে, প্রয়োজন না থাকিলে, মনু প্রভৃতির মত অভ্রান্ত পুরুষগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? কন্যার পুনঃ সম্প্রদান নিরোধ করিলেও বিধবার বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, এমন অনেক বিবাহ আছে, যাহাতে সম্প্রদানের নাম গন্ধ মাত্র নাই। যেমন গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ। এই ত্রিবিধ বিবাহে বিবাহিতা কন্যা বিধবা হইলে, "নষ্টে মৃতে" এই বিধি অনুসারে পুনর্ব্বার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। ইহাই শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়। এই নিমিত্তই মনু পরাশর প্রভৃতির বিধবা বিবাহ বচন সঙ্কলিত হইয়াছে।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন;—

ব্রাহ্মো দৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥(৬)

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ।

আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়াঃ ব্রাহ্মো ধর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতঃ॥৬

যে বিবাহে বরকন্যাকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন ও অলঙ্কার দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিদ্যাচার সম্পন্ন আহূত পাত্রকে স্বয়ং কন্যা দান করিতে হয়, তাহা ব্রাহ্মবিবাহ।

যজ্ঞে চ বিততে সম্যগ্ ঋত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥ (৬)

প্রবৃত্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে অলঙ্কৃতা কন্যাদানের নাম দৈব বিবাহ।

একং গোমিথুনং দ্বেবা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥ (৬)

বর হইতে ধর্ম্মার্থ এক বা দুই গোমিথুন গ্রহণ করিয়া, যথাবিধি কন্যাদানকে আর্ষ বিবাহ বলে!

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥৬

"উভয়ে ধর্ম্মাচরণ কর" বাক্যদ্বারা এই প্রকার নিয়ম করিয়া, অর্চ্চনাপূর্ব্বক কন্যা দানকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়াশ্চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥(৬)

কন্যার জ্ঞাতিগণকে ও কন্যাকে শক্তি অনুসারে ধন দান করিয়া, স্বচ্ছন্দতাক্রমে কন্যা গ্রহণকে আসুর বিবাহ বলে।

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ (৬)

বরকন্যার পরস্পর ইচ্ছাপূর্ব্বক সংযোগকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। এরূপ দাম্পত্যকে কামজ বলিয়া জানিবে।

হত্বা ছিত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসোবিধিরুচ্যতে॥ (৬)

হনন করিয়া, ছেদন করিয়া, বা ভেদ করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাহরণকে রাক্ষস বিবাহ বলে।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাংবা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥(৬

নিদ্রাভিভূতা, মদ্যপানেবিহ্বলা, অনবহিতা কন্যাতে নির্জ্জনে উপগমনকে পৈশাচ বিবাহ বলে। এই অষ্টম বিবাহ পাপিষ্ঠ ও যারপর নাই অধম।

(৬) মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায় ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪' বচন।

এক্ষণে অকটু অনুধাবন করিলেই পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে কন্যাদানের কোনও সম্পর্ক নাই। অতএব এই ত্রিবিধ বিবাহের কন্যা বিধবা হইলে, তাহারই অন্য পতি বিধান, নারদ পরাশর প্রভৃতির অভিপ্রেত। অন্যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য বা আসুর বিবাহের বিধবাকে পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিতে হইবে, এই প্রকার স্ববচনবিরুদ্ধ বিধি মনু প্রভৃতির কখনই অনুমত হইতে পারে না। যাহারা পরাশরের বিধবা-বিবাহ বিধায়ক বচনকে বিধবা মাত্রের ঘাড়ে চাপাইতে চাহেন, তাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহে সক্ষম হন নাই, বুঝিতে হইবে।

কেহ কেহ এই আপত্তি করিতে পারেন যে, পুনঃ সম্প্রদান যদি শাস্ত্রকারগণের অনভিমত হয়, তবে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও আসুর বিবাহের বিধবারা গান্ধর্ব্ব রাক্ষস বা পৈশাচ বিবাহে আবদ্ধ হইলেও ত পুনঃ সম্প্রদান জন্য পাপের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। অতএব এতাদৃশ বিধবাদেরও গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি ত্রিবিধ বিবাহ শাস্ত্র সম্মত বলিতে হয়।

ইহার উত্তরে মনু বলিয়াছেন;—

যস্মৈদদ্যাৎপিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রুষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥(৭

পিতা বা পিতার অনুমতিক্রমে ভ্রাতা যাহাকে কন্যা দান করিবেন, সেই স্বামী যত দিন জীবিত থাকিবেন, স্ত্রী ততদিন তাঁহার শুশ্রূষা করিবেন। স্বামী মরিলেও তাঁহাকে অতিক্রম করিবেন না।

অতএব পরাশরের বিধবা-বিবাহের বিধি, কেবল গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ-বিবাহের বিধবাদিগের অন্য পতি বিধান করিতেছে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য বা আসুর বিবাহে উঢ়া কন্যা বিধবা হইলে, তাহাদের পক্ষে এ বিধি নহে।

শ্রীহৃষীকেশ ব্যাকরণ সরস্বতী।

(৭) মনুসংহিতা পঞ্চম অধ্যায় ১৫১।

বাঙ্গালির শিক্ষা।

আজকাল বঙ্গদেশে শিক্ষা স্রোতটা কিছু খরতর বেগে বহিতেছে; তাহাও আবার নানা ভাবের নানা মূর্ত্তিতে—ধর্ম্ম শিক্ষা, কর্ম্ম শিক্ষা বা নীতিশিক্ষা, টেকনিক্যাল শিক্ষা, প্রাকটিক্যাল শিক্ষা বা যোগশিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারী বা ওকালতি শিক্ষা, ডাক্তারি বা ধাত্রীশিক্ষা, বালিকা বা যুবতী শিক্ষা আরও কত প্রকার তন্ত্রমন্ত্র শিক্ষা—এত শিক্ষার হুড়াহুড়ীতে বাঙ্গালি কতদূর প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হইল তাহাই আমরা দেখিবার চেষ্টা করিব। আরও দেখিতে হইবে, এই যে শিক্ষাস্রোত, ইহা পাশ্চাত্যই হউক বা প্রাচ্যই হউক, ইহা কি গিরিকন্দরোত্থিত উৎস নির্ঝরিত পূত সলিল প্রবাহ? না গলিত শবদেহবাহী প্রাবৃটের

কর্দমিত নদী তরঙ্গের ন্যায় পঙ্কিল বারিপ্রবাহ ? ইহা পার্ব্বতীয় নিঝর্ণিণীর স্বচ্ছ প্রবাহের ন্যায় তৃষিত জগৎজীবের ভোগ-তৃষ্ণা দূর করিয়া কি শান্তিপ্রদান করিতেছে ? না ইহার পঙ্কিল অস্বাস্থ্যজনক প্রবাহ জগজ্জন শরীরে অশান্তির বীজ বপন করিয়া জন সমাজে নানাবিধ ব্যাধির উৎপাদন করিতেছে ? আরও দেখা উচিত এই বিভিন্ন ভাবের বিভিন্ন শিক্ষা-স্রোত কিরূপভাবে মানব-জীবন প্রবাহের সহিত মিশিয়া অনন্তের দিকে—অপার, অসীম জলধির উদ্দেশে প্রধাবিত হইতেছে।

এই যে আমাদের দেশে দিন দিন নানাবিধ শিক্ষার বহুল প্রচার হইতেছে, প্রথমতঃ ইহার উদ্দেশ্য (Motive) কতক পরিমাণে জানা আবশ্যক। উদ্দেশ্যানুসারেই কার্য্যের প্রকৃতি ভেদ হয়, প্রকৃতিভেদে ফলভেদ হইয়া থাকে। ইহা জানাও দূরূহ ব্যাপার নহে। কারণ আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালাদেশের জলবায়ুতে বর্দ্ধিত ও বাঙ্গালির অস্থিমজ্জায় গঠিত এবং আমরা বঙ্গভূমে বসিয়া "সাত সমুদ্র তের নদীপারে" থাকিয়া সুদূর ইংলণ্ডের রাজনীতির আলোচনায় প্রবৃত্ত নই—আমরা ঘরে বসিয়া ঘরের কথা যদি অকপট হৃদয়ে বলিয়া ফেলি তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল, আমাদের অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও চতুষ্পাঠী বা গ্রাম্য-পাঠশালার প্রাচ্যশিক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা বঙ্গভূমিকে সমাচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। ইহার শীতল ছায়ার মধ্যে থাকিয়াও কখন বা সংবাদপত্রের সম্পাদক মণ্ডলী কখন বা ধর্ম্মোপদেষ্টারা কাতরকণ্ঠে বলিতেছে যে, "এই প্রলয়ঙ্করী শিক্ষায় দেশ ভাসিয়া গেল, দেশ মধ্যে সুশিক্ষার আদৌ প্রচার নাই, দেশের লোক ধর্ম্মে আস্থাবান নহে—অবিশ্বাসী, নাস্তিক হইয়া যাইতেছে—কেবল কুশিক্ষার বিস্তার, প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি বা প্রতিভাশালী লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।" বাস্তবিকই, ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ বড় অধিক দূরে নাই, একটু অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আপাততঃ আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "হস্তি-মূর্খের" ন্যায় একটা প্রকাণ্ড ভুল ধারণা করিয়া ফেলিয়াছি। এই ভুল ধারণাই যত অনর্থের মূল হইয়াছে এবং এইরূপ ভুল সিদ্ধান্ত যে বহুবিধ কারণ সমষ্টি হইতে হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এখন দেখা যাউক এ উদ্দেশ্যটা কি ? এ শিক্ষাস্রোতের সীমা কোথায় ? এই খরতর স্রোতস্বতী কল্লোলিনী কল্ কল্ নাদে কোন্ মহাসাগরের উদ্দেশে তীরভূমি প্লাবিত করিয়া প্রধাবিত হইতেছে ?

এ মানবজীবন, মানবচরিত্র বা মানবশক্তি সকলই ঘটনা বা অবস্থার অধীন। এমন মানব-প্রকৃতি নাই যাহা ঘটনা বা অবস্থার অস্পৃশ্য। আবার এই মানব-প্রকৃতি প্রবৃত্তি জন্য, প্রবৃত্তি সকলও শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় এবং এই শিক্ষাও ঘটনানুযায়ী ভিন্ন, ভিন্ন উদ্দেশ্যানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফলপ্রদান করিয়া থাকে। অতএব শিক্ষাই মানবচরিত্রের বিকাশ ও উন্নতির মূল। ধর্ম্মবল বলুন আর নৈতিকবল বলুন শিক্ষাই সকল বলের মূল। সুশিক্ষায় মানুষকে দেবতা করে আর কুশিক্ষার মানুষকে পশুরও অধম করিয়া ফেলে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এতদূর অনুভব করেন যে, তাঁহাদের অনেকেই বলেন, মানুষ মাত্রেই উপযুক্ত শিক্ষা [illegible] বৃত্তি [illegible] করিতে পারিলে [illegible] মানসিক [illegible] এককেন্দ্রীভূত করিতে পারিলেই অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন হইতে পারেন। [illegible] সাধারণ মনুষ্যত্ব [illegible] চেষ্টা করিলে [illegible] অলৌকিক প্রতিভাশালী হইতে [illegible]। [illegible] পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দিগের [illegible] সম্পূর্ণ অনুমোদক নহি। [illegible] অবস্থা-[illegible] আমাদের দেশে [illegible] শিক্ষার উদ্দেশ্য ভেদ হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হয়ত কোন পুত্রবতী মাতা স্বীয় স্নেহের পুতলি দুগ্ধপোষ্য বালকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করিতেছেন "পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিবে এবং আমরাও নানাবিধ ঐশ্বর্য্যভোগ ও দাসদাসী পরিবেষ্টিত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিব" এবং তৎসঙ্গে ইহাও মনে মনে করিতেছেন যে, "যখন আমার ছেলে পাশ করিতে পারিবে তখন দেখা যাবে কার ছেলে কত টাকা পায় ; অমুকের কালপেঁচার মত ছেলে, সে একটা পাস করিয়াছিল বলিয়া এত টাকা পাইল আর আমার এমন সোণার চাঁদ ছেলে যদি পাস করিতে পারে, তবে তাহার দুইগুণ টাকা যদি না লই তবে আমি বাপের বেটী নই" ইত্যাদি ইত্যাদি। পুত্রের পিতাও মনে মনে সেই প্রকার বা ততোধিক আশা করিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ-জীবন ও ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্বন্ধে জ্যামিতির সংজ্ঞা নিরূপণের ন্যায় একপ্রকার চতুর্দ্দিক আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। শিক্ষা না হইতে হইতেই শিক্ষাদাতাদিগের উদ্দেশ্য দেখিলাম [illegible] শিক্ষা ধনাভিমুখগামিনী।

পঞ্চম বর্ষে বালকদিগকে যথারীতি গ্রাম্য পাঠশালায় মাতৃভাষা শিখিবার জন্য দেওয়া হইল। যদি কোন বালক কোন প্রকারে প্রথমভাগ শেষ করিল, অমনি হয়ত তাহার মাতা ধরিয়া বসিলেন, আর আমার বাছাকে বাঙ্গালা পড়ান হইবে না, সে একখানা বই শেষ করিয়াছে। আজকাল সাহেবের মুলুক, সাহেবের চাকরী করিতে হইলে, ও ছাই বাঙ্গালাগুলো কোন কাজেরই নয়, ইংরেজী ভাষা শিখা চাই, তবে বড় সাহেবের বড় চাকরী মিলিবে (অভাগিনী মাতা ভাবে নাই যে, এখন বড় সাহেবের বড় চাকরি করিতে হইলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির আবশ্যক ও চাকরি করিয়া বড়লোক হওয়া কঠিন ব্যাপার)। গৃহিণী আপনার এই প্রকার যুক্তিপূর্ণ স্থির সিদ্ধান্ত অধর প্রান্তে ঈষদ্ধাস্য সহযোগে একটু "নতনাস্তার" সহিত কর্ত্তার নিকট পেস করিল ; কর্ত্তাও মন্ত্রপূতের ন্যায় গৃহিণীর সাংসারিক যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি শিরোধার্য্য করিলেন ও মনে মনে গৃহিণীর বুদ্ধি প্রখরতার শত ধন্যবাদ দিলেন। যথাসময়ে পুত্রকে ইংরাজী স্কুলে দেওয়া হইল। ষষ্ঠবর্ষে শ্রীমান মাতৃভাষার আদ্যশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া চাকরি-আশায় সাহেবের ভাষা শিখিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিল।

কোন বালক বা অর্থাভাব প্রযুক্ত দৈবভাষা ইংরাজী শিক্ষা করিতে না পারিয়া মনঃদুখে দুইচারিখানি বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়াই চাকুরির চেষ্টায় বাকৃদেবীর সহিত চিরবিচ্ছেদের যোগাড় করিতে লাগিল। কোন সম্পন্ন ব্যক্তির পুত্রেরা কিছু বাঙ্গালা

BLEED THROUGH

কিছু ইংরেজী শিখিয়া মনে মনে আপনাকে একজন পণ্ডিত বিবেচনা করতঃ গোপনে গোপনে বিদ্যাসুন্দরের রসাস্বাদনে নিযুক্ত হইল। কখন বা নিধুবাবুর টপ্পা অভ্যাস প্রয়াসী হইয়া ও বিদ্যাসুন্দরের বাহ্য চাকচক্যে মজিয়া, সুন্দরের ন্যায় ভালবাসার অভিনয় করিতে যাইয়া অবিদ্যার বিকৃত প্রণয়-কূপে আপনার দেহ মন বিসর্জ্জন করিল। কোন ব্যক্তি বা নিজ পুত্রকে "বিয়ে পাস" পড়া পর্য্যন্ত স্কুলে রাখিয়া যথারীতি কন্যাভারগ্রস্থ ব্যক্তির গলদেশে ছুরিকা বসাইবার কোন প্রকার ক্রটী করিলেন না ও তদুপরে পুত্রের পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। বিদ্যা অর্থকরী, অতএব যেন তেন প্রকারেণ সেই কার্য্যটা সিদ্ধ হইলেই হইল। কোন যুবক বা স্বীয় পরিশ্রম ও উদ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিল। সুচরিত্রগত মহানুভাব সকল তাহার হৃদয়কে সতত আন্দোলিত করিতে লাগিল এবং সে সেই সকল মহতী ইচ্ছা-স্বদেশ-হিতৈষিতা, স্বজাতিপ্রেম, পরোপকারিতা, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু এমনই সংসারের আবর্ত্ত যে, তাহার মধ্যে সুশিক্ষার ফল স্বরূপ চরিত্র টুকু বজায় রাখা তাহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইল। এ সংসারে অনবরত ধ্বনিত হইতেছে, "অর্থ চাই"। তুমি বিদ্বান্ হও, ধার্ম্মিক হও, উদারচেতা কিংবা সরস্বতীর পুত্র হও কিন্তু তুমি যদি চঞ্চলা কমলার কৃপার পাত্র না হইলে, 'বড় চাকুরে' না হইলে, প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে না পারিলে, তাহা হইলে তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান উদারতা সবই বৃথা

হইল, তুমি সংসার আবর্ত্তে বুদ্বুদ ঘা[illegible] লাগিলে, পিতা মাতার স্নেহ হারাই[illegible] বসিলে, বন্ধুবর্গও তোমাকে সাদর সম্ভা[illegible] হইতে বঞ্চিত করিল। অচলের ন্যায় ধী[illegible] ভাবে সবই সহ্য করিলে কিন্তু যখন তো[illegible] প্রিয়তমা ষোড়শী ভার্য্যা নিদাঘান্ত-নবী[illegible] নীরদ-কোলে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় বিষাদে[illegible] ঈষৎ হাস্য করিয়া ও বসন্তানিলান্দোলি[illegible] ফুল্লারবিন্দ দল সদৃশ সতত চঞ্চললোচ[illegible] তোমার উপর কটাক্ষপাত করতঃ অলঙ্কার[illegible] আব্দার করিয়া বসিল, তখন আর কি তোমা[illegible] রক্ষা আছে, তুমি সেই মোহিনী মায়া[illegible] মোহিত হইলে, তোমার মস্তক ঘুরিয়া গে[illegible] হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইল, কিংকর্ত্ত[illegible] বিমূঢ়ের ন্যায় চারি দিক তমোময় দেখি[illegible] লাগিলে; হৃদয়ের মহানুভাব সকল বজ্রাহ[illegible] মহীরুহের ন্যায় পড়িয়া রহিল, জীব[illegible] স্রোতও শিক্ষা-স্রোতের সহিত মিসিয়া তরু[illegible] ভার্য্যার বাসনা-সাগরে নিপতিত হইল এবং তুমি অর্থোপার্জ্জনের জন্য চঞ্চলার উপা[illegible] সনায় জীবন অর্পণ করিয়া হয়ত, বীণা[illegible] পাণির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলে। এই[illegible] রূপ কতশত মানবহৃদয় মরুভূমি সদৃশ হইয়া যাইতেছে। কেহ বা পূর্ব্ব সুকৃতি[illegible] বলে ওকালতী, ডাক্তারি করিয়া কিম্বা অন্য কোন রকম বড় চাকুরি করিয়া সংসার[illegible] মধ্যে বহুত "বাহবা' লইতেছে ও আপনা[illegible] দের বিদ্যাশিক্ষা সার্থক হইল বিবেচনা করিয়া মনে মনে গৌরবান্বিত হইতেছে এবং সংসারী লোকও তাহাদের ভুয়সী প্রশংসা করিতে ক্রটী করিতেছে না। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশই নিজ পেসা উপ[illegible] যোগী পড়াশুনা ব্যতীত অন্যরূপ বিদ্যা[illegible]

[illegible]র আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা বিবে[illegible] [illegible] করিতেছেন না।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতে [illegible]ড় চাকরি হয় না, তজ্জন্য এ পথে বিদ্যা[illegible]র্থীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইতেছে। [illegible] যদি লাট বাহাদুর হুকুম জারি করেন [illegible], যে কোন ব্যক্তি বি, এ, কিম্বা এম, এ, [illegible]রীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে অমনই তাহার [illegible] এক শত বা ২০০ দুই শত টাকা [illegible]হিনার চাকরি হইবে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট [illegible]ারাণ্টি রহিল। "অমনই দেখিবেন এ পথের [illegible]ড় ঠেলা ভার হইবে। এই সকল দেখিয়া [illegible]নিয়া সকলেই বুঝিতে পারেন যে, একমাত্র [illegible]র্থই অমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য অন্য কোন [illegible]হৎ লক্ষ্য আমাদের নাই। যিনি অর্থ উপায় [illegible]রিতে পারিলেন, তিনিই এ সংসারে মান[illegible]র হইলেন, তাঁহারই লেখাপড়া সার্থক [illegible]ইল। তিনি নরপিশাচই হউন আর স্বদেশ[illegible]দ্রোহীই হউন, তিনি কাম ক্রোধাদি রিপুর [illegible]ীতদাসই হউন অথবা যাহাই হউন, [illegible]আমাদের তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। [illegible]র্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্যত বাতুলের প্রলাপ মাত্র; [illegible]দেখিব কতটাকা তিনি উপায় করিলেন। যে হেতু বর্ত্তমান যুগে অর্থই শিক্ষার পরি[illegible]মাপক। এই জন্যই জর্ম্মানেরা ইংরেজ জাতির শিক্ষাকে উপহাস করিয়া বলিয়া থাকে; 'Bread study' অর্থাৎ রুটী উপা[illegible]য়ের শিক্ষা। বস্তুতঃ জীবিকা উপায়ের শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

শুনা যায় পুরাকালে শিক্ষিত হিন্দু 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' দেখিয়া জগৎপ্রেমে [illegible]প্লুত হইতেন। আধুনিক বাঙ্গালীও সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখে বটে কিন্তু একটু প্রকার

[illegible]ভেদে—'আমিই সব' 'সোঽহং' অহং শিবঃ নিজের পূজা করিলেই সকলের পূজা করা হইল আর এক উদররূপী মহাশিব আছেন তাঁহার পূজাটার বিশেষ আবশ্যক "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট"। কিন্তু যখন এই সদাশিবোপরি নৃত্যপরা লোলরসনা নৃমুণ্ড মালিনী ভার্য্যারূপিনী বামা রোষ কষায়িত লোচনে পদতলে লুণ্ঠিত সদাশিবের উপর সরোষে কটাক্ষপাত করিতেছেন, "তখন কুণ্ঠিত হইয়া সদাশিব বলিতেছেন, "না, না, কেবল স্বোদররূপী মহাশিবের পূজা করিলে চলিবে না, "ভবভয়হরা" কালভৈরবীরও ষোড়শোপচারে পূজা হওয়া চাই তাহা হইলেই "তস্যাম তুষ্টায়াম্ জগৎ তুষ্ট" তাঁর তুষ্টি হইলেই জগতের লোক তুষ্ট হইবে।" এইত আমাদের শিক্ষার চরম সীমা। ইহা কি সেই শিক্ষা নয়, যাহাতে 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" নীতি শিক্ষা দেয়? যাহাতে চীর বাস আতুর ভিক্ষুককে একমুষ্টি ভিক্ষা না দিয়া উপদেশের সহিত বহিঃকরণ, কোথাও বা অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বহিঃকরণ করিতে শিক্ষা দেয়? ইহা কি সেই শিক্ষা নয়, যাতাতে অতিথি অভ্যাগত বাটীতে প্রবেশাধিকার পাইবে না বা দরিদ্র হইলে নিজ আত্মীয় বর্গের সহিত আলাপ করাও অসভ্যোচিত? না ইহা সেই শিক্ষা, যদ্দ্বারা মনুষ্যত্ব-ব্যঞ্জক চরিত্র গঠিত হয় বা যদ্দ্বারা লোকের মনে ধর্ম্মানুরাগ ও সত্যানুরাগ জন্মে, অথবা যাহাতে লোক আপনা ভুলিয়া পরকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করে? পাঠক বিবেচনা করিবেন এ শিক্ষার কোন্ উদ্দেশ্য। শিক্ষার বা মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি কেবল অর্থোপার্জ্জন? মানুষের পশুত্বভাব সকল

BLEED THROUGH

শিক্ষার পোষণে পোষিত করিয়া মনুষ্যত্ব বজায় রাখাই শিক্ষার উদ্দেশ্য—কামনা শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য পালনই শিক্ষায় বা জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কয়জন ইহার প্রতিপোষক?

দেশের সামাজিক অবস্থাত এইরূপ, তাহার উপর বঙ্গবাসীপ্রমুখ সংবাদপত্র মণ্ডলীর উচ্চ শিক্ষার উপর, ও ইহার (তাঁহাদের মতে) "পল্লব গ্রাহিতার" উপর তীব্র বিদ্রূপাত্মক বাক্য প্রয়োগ, উচ্চশিক্ষার অসারতা এবং টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতিপাদনে অদম্য উৎসাহ, পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর অযথা গালি বর্ষণ, ইহাতে আর কি রক্ষা আছে। বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়দিগকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করি, "পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কি আমাদিগকে মানুষ হইতে শিক্ষা দেয়না, না কেবল দর্শন বিজ্ঞান কাব্য সাহিত্যাদির "পল্লব" গ্রহণ করিতেই সদা উপাদেশ দিতেছে? সত্য বটে, কেবল মাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সকল উত্তীর্ণ হইলেই যে তিনি "বিদ্যাদিগগজ" হইলেন এমন কোন কথা নাই, পাশ্চাত্য শিক্ষাও তাহা বলে না। আমরা আপনা হইতেই আপনাকে একটী "বিদ্যাভুরভুরী" জ্ঞান করিয়া ধরাকে সরা খানার ন্যায় দেখিতে থাকি। সে দোষ কাহার; বিশ্ববিদ্যালয়ের না আমাদের অহং-কারিতার। এমন শোচনীয় অবস্থাতেও পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে সমাজ মধ্যে দুই চারিজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছি।

বুভুক্ষা-পীড়িত বঙ্গদেশে বিদ্যা অর্থকরী স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থাপেক্ষা আর এক অনিষ্টকারী লক্ষ্য আমাদের এই শিক্ষায় আছে; সেটী উচ্চাশা, অনধিকারী হইয়া যশের আকাঙ্ক্ষা—সমাজে গণ্য মান্য হইবার আশা। কেহ বা "প্রাংশুলভ্যে ফলে বামনের ন্যায় হাত বাড়াইয়া কবি বা লেখক হইবার আশা করিয়া থাকেন, কেহ বা বহু কষ্টে দুই একটা কবিতা কপচাইতে শিখিয়া রাতারাতি হঠাৎ কবি গোবর্দ্ধন হইয়া বসেন। কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বঙ্গভাষার এমনই দুরবস্থা যে, যে লেখে সে পড়ে না এবং যে পড়ে সে লেখে না, তজ্জন্যই বঙ্গভাষায় সারবান গ্রন্থের বড়ই অভাব। কথাটা যে সত্যমূলক তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—"Fools rush in where angels fear to tread" অর্থাৎ যেখানে স্বর্গের দেবতারা যাইতে কুণ্ঠিত হন সেখানে নির্ব্বোধ লোকেরা হুড়মার করিয়া গিয়া পড়ে। সেইরূপ আমাদের দেশে কোন কোন লোক একটু আধটু ইংরেজী শিক্ষা করিয় ইংরেজ জাতির সামাজিক দোষ প্রদর্শন জীবনের ব্রত করিয়াছেন, কেহ বা কিছু সংস্কৃত শিখিয়াই সংস্কৃত শাস্ত্রের দোষ-গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হন, পরছিদ্রান্বেষণ তাহাদের একমাত্র ব্যবসা হইয়া থাকে। এইত দেখা গেল শিক্ষার উদ্দেশ্য। যাহার অঙ্কুরেই দোষ তাহার ফল যে নির্দোষ হইবে এরূপ আশা করা যায় না। অতএব দেখা যাই-তেছে যে, বঙ্গদেশ প্লাবনকারী এই শিক্ষা-স্রোত আষাঢ়ের বন্যার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও পঙ্কিল। অধিকাংশ স্থলেই জন সমাজের অহিতকারী, কদাচ দুই এক স্থলে দুই এক খণ্ড ভূমি উর্ব্বরা করে মাত্র।

উপসংহারে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা উল্লেখ করিয়াই অদ্যকার মত ক্ষান্ত হইব। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যক ছিলনা; কারণ সাধারণতঃ হিন্দু সমাজে বিশেষতঃ আমাদের ক্ষুদ্র উগ্র-ক্ষত্রিয় সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন তত নাই, তথাচ উন্নতিশীল ব্রাহ্ম সমাজের ও বঙ্গীয় খৃষ্টান সমাজের দেখাদেখি অপাততঃ হিন্দু সমাজেও কতক পরিমাণে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবেশাধিকার পাইয়াছে; এ শিক্ষায় অমৃত-ময় ও বিষময় দুই রকমেরই ফল ফলি-তেছে; তবে বিষময় ফলের ভাগটা কিছু অধিক। সে দিন "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধির" ষষ্ঠ সংখ্যায় কোন শ্রীমতীর "নিবেদন পত্র" পড়িয়া বিশেষরূপ আহ্লাদিত ও কিঞ্চিত বিস্ময়ান্বিত হইলাম। আহ্লাদের বিষয় আমাদের এ অধঃপতিত উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে শ্রীমতী মহোদয়া জ্ঞান পিপাসু হইয়াছেন ও সমাজের হিত চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন; আর শ্রীমতী যে উগ্র-ক্ষত্রিয়াণী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাহাতেই আজ আমাদের আহ্লাদ ও গৌরব; কিন্তু অন্তঃপুরাবরুদ্ধা হিন্দুমহিলা সমাজের হিত কামনা করিয়াই হউক বা নিজ শিক্ষার পরিচয় দিবার জন্যই হউক প্রকাশ্যে মুখ ফুটাইয়া গুরু গম্ভীর ভাবে একটু "মিঠে কড়া" সুরে সম্পাদক বরাবর উপদেশচ্ছলে "নিবেদন পত্রিকা" প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সম্পাদক মহাশয়ও বোধহয় তাঁহার শ্রীমুখ বিনি-র্গত উপদেশ মত কার্য্য করিতে ত্রুটী করি-বেন না এবং তাঁহার লেখক ও পাঠকগণও সে বিষয়ের সহায়তা করিতে সাধ্যমত সচেষ্ট হইবেন। পাঠকগণও আশা করিতেছেন হয়ত একদিন আমরা তাঁহার 'মিটুনি' গোছের দুই একটা ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প শুনিতে পাইব। কিন্তু শ্রীমতীর গুরুগম্ভীর-ভাব ও উপাধিগ্রস্ত বাবুদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত দেখিয়া লেখিকা, শ্রীমতী কি শ্রীমান্ তদ্বিষয়ে মনে একটু খটকা হয়, কিন্তু সে কোন কাজের নয়। আপাততঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবেই হউক বা সমাজের অবস্থানুসারেই হউক বঙ্গদেশে "ভ্রমর" * প্রকৃতির শ্রীমতীদিগের প্রাদুর্ভাব কিছু অধিক ও "সূর্য্যমুখী" * প্রকৃতির শ্রীমতী-দিগের সংখ্যা বড়ই কম দেখিতে পাওয়া যায়; ফলও ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতেছে। নব্যা শ্রীমতীরা শান্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পরি-ত্যাগ করিয়া দুর্দ্দান্ত ইউরোপীয়-চিকিৎসার পক্ষপাতিনী। শ্রীমতী মহোদয়ারা আমার উপর রুষ্টা হইবেন না, আমি তাঁহাদের অযথা নিন্দাবাদ করিতেছি না, কেবল বলিতেছি যে, তাহারা নরম গরম দুই রক-মেই চিকিৎসা জানেন; তবে গরমের দিকে ঝোঁকটা কিছু বেশী।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র দুই।

---

* বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "বিষবৃক্ষ" দেখ।

বর্ণাশ্রম-বিবেক। (৬)

[শাস্ত্র-বিচার।]

(জনৈক পূজ্যপাদ পরমহংসের বিবৃতি।)

ব্রাহ্মণ,বৃহস্পতির শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, আপনার শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক হইয়াছে। আজ আপনি জাতি বিষয়ে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা আমাকে যেরূপ নিঃসন্দেহ করিয়াছেন তাহাতে আমি চির উপকৃত হইলাম এবং আপনার শাস্ত্রার্থে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইলাম। আপনার মত শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি জগতে সুদুর্ল্লভ। আপনারাই প্রকৃত শাস্ত্রাচার্য্য এবং ভারতের অত্যুজ্জ্বল রত্ন ও গৌরব।

বৃহস্পতি কহিলেন, ব্যুৎপত্তি বা জ্ঞান লাভ কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলেই হয় না। জ্ঞানময় পরমেশ্বর কি মনুষ্যকে প্রস্তরাদির ন্যায় জ্ঞানশূন্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ?

ব্রা—বেদাধ্যয়ন না করিলে মনুষ্য কি যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

বৃ—যাঁহারা বেদশাস্ত্র নির্ম্মাতা তাঁহারা কিরূপে বেদশাস্ত্র রচনার উপযোগী জ্ঞানলাভ করিয়া ছিলেন ? সাংখ্যকার কপিল কাহার নিকট সাংখ্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন; কণাদ, গৌতম, পতঞ্জলি, বাল্মীকি, বেদব্যাস, ব্রহ্মা, শিব, ইহাঁরা স্ব স্ব শাস্ত্র রচনার পূর্ব্বে কাহার নিকট সেই সেই শাস্ত্রের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ?

ব্রা—বেদ কি তবে মানুষের রচনা ?

বৃ—মনুষ্যের বুঝিবার উপযোগী ভাষা কি তবে পশু পক্ষীরা তৈয়ার করিয়াছে ?

ব্রা—তা নয়, আমার বিশ্বাস, যিনি জগতের কর্ত্তা, তিনিই বেদের কর্ত্তা। ঈশ্বর অনন্ত শক্তিময়। তিনি যেমন সমুদ্রে অসংখ্য রত্নাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, আকাশে অগণ্য নক্ষত্র রাজি সৃজন করিয়াছেন, জগতের অন্ধকার নিরাকরণের জন্য যেমন রবি শশীর উদয় করিয়াছেন, তেমনি তিনি মনুষ্যকে নিজ স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বেদাদি রচনা করিয়াছেন।

বৃ—এখন তুমি আমাকে আবার শাস্ত্রাদি মন্থনে নিয়োজিত করিলে দেখিতেছি, তোমকে এখানে গোটাকতক কথা প্রশ্ন-চ্ছলে বলিব মাত্র। প্রথম, আচ্ছা, ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহা কি কোন শ্রেণী বিশেষের কল্যাণের জন্য করিয়াছেন ? এই যে রবি কিরণ বা জ্যোৎস্না এ কি কেবল মনুষ্যের সেবা করিবার জন্যই জগতে রহিয়াছে ! দ্বিতীয়, ঈশ্বরের এমন কোন সৃষ্ট পদার্থ আছে কি যাহা মনুষ্যের সাহায্যাভাবে বিনষ্ট হইতে পারে ? এই যে আকাশ, মেঘ, বারি, বায়ু প্রভৃতি ঈশ্বরের সৃষ্ট-পদার্থ রহিয়াছে এ সকল কি মানুষের সাহায্যে রহিয়াছে ? কিন্তু বেদের পক্ষেত সেরূপ বলিতে পার না। অধিক কি যদি শত বৎসর ধরিয়া বেদের চর্চ্চা লোপ পায় তাহা হইলে বেদশাস্ত্র কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। কেমন করিয়া তবে বেদকে ঈশ্বর-সৃষ্ট বলিতে পার ? তৃতীয়, আচ্ছা বল দেখি, বেদের

এক স্থানে যদি দুর্বুদ্ধি নীচকর্ম্মা ব্রাহ্মণের সুখ্যাতি থাকে, অন্য স্থানে সৎবুদ্ধি ধর্ম্মানুরাগী শূদ্রের অখ্যাতি থাকে, সে বেদশাস্ত্রকে ঈশ্বরের রচিত শাস্ত্র বলিলে তাঁহাকে কি পক্ষপাত দোষে দূষিত হইতে হয় না ? অথচ তিনি সকলেরই পিতা। এ কথাটা একটু ভাব। চতুর্থ, বেদেই আছে পরমেশ্বর নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী, শরীর ও ইন্দ্রিয় রহিত, তবে তিনি কিরূপে শ্রুতিবাণী ব্যক্ত করিলেন ? পঞ্চম, যে সংস্কৃত ভাষাতে জগৎ কর্ত্তা দয়া করিয়া আদিতে মনুষ্যকে সকল প্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় উপদেশ দিলেন, সেই সংস্কৃত ভাষাই. তবে পৈতৃক ভাষা, সেই পৈতৃক ভাষা মনুষ্য কেন পরিত্যাগ করিল ?] পশু পক্ষীরাও ত আপনাদের পৈতৃক ভাষা কখন পরিত্যাগ করে না। আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, সংস্কৃতই যদি কেবল একমাত্র দেবভাষা হইল তবে জগতের আর যত ভাষা সব কি দানব সম্ভূত ? ষষ্ঠ, জগৎকর্ত্তার মুখের সংস্কৃতবাণী নবজাত মানব সহজেই একেবারে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল আজ কেন কি অপরাধে সেই বেদবাণী বুঝিতে তাঁহাদের বংশধরগণকে এত প্রয়াস স্বীকার করিয়া ব্যাকরণ-শিক্ষা-কল্পাদি বিবিধ শাস্ত্র বহুকাল ধরিয়া অগ্রে অধ্যয়ন করিতে হয় ? সপ্তম, বেদের কর্ত্তারই বা ঠিক কই ? তুমি বলিতেছ জগৎ কর্ত্তা, কেহ বলিতেছে স্বয়ম্ভু, কেহ বলিতেছে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, কেহ বলিতেছে পঞ্চানন মহাদেব। এ সম্বন্ধে আরও কথা বলিবার আছে পরে বলিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বেদকর্ত্তা সম্বন্ধে এত মতভেদ কেন ? অষ্টম, বেদোক্ত বিধিই যদি ঈশ্বরের বিধি হয় তাহা হইলে সে সব বিধির পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন পরবর্ত্তী ঋষি মহাত্মাগণ কেন করেন ? নবম, যত জ্ঞানী ভক্ত জনে কেন শুদ্ধ বেদবাণীর উপরই নির্ভর না করিয়া নিজ নিজ কথায় ভগবৎ প্রেম ও আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ?

ব্রা—বেদকর্ত্তা সম্বন্ধে আর কি বলিবেন বলুন না।

বৃ—তবে শুন—

শ্রুতিতেই রহিয়াছে—

ঋক্‌বেদোঽগ্নে রজায়ত যজুর্ব্বেদো বায়োরজায়ত সামবেদ আদিত্যাদজায়ত।

মনুও বলিতেছেন—

অগ্নির্বায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃ সাম লক্ষণম্

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যজ্ঞরূপ ক্রিয়ার সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য হইতে সনাতন বেদত্রয়কে দোহন করিয়াছিলেন।

ব্রা—আচ্ছা মনু যে বলিতেছেন অগ্নি বায়ু সূর্য্য হইতে ব্রহ্মা বেদত্রয়কে দোহন করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি উঁহারা কি গাভী ছিল ?

বৃ—উহা কল্পিত কথা মাত্র।

ব্রা—কল্পিত কেন ?

বৃ—কল্পিত না হইলে কি এত মতান্তর হয় না অসম্ভব ঘটনা পূর্ণ হয়। আবার শ্রুতিই একস্থানে বলিয়াছেন। পর ব্রহ্মই বেদ সৃজন করিয়াছেন। এ সকল কথা তোমার খুব ভাবিবার বিষয়।

অসমুদ্রোত্থিত রত্ন

২১

সর্ব্বহিংসানিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

যাহারা সকল প্রকার হিংসা হইতে নিবৃত্ত হয়, যাহারা সকল সহ্য করে, আর যাহারা সকলের আশ্রয় হয়, সে সকল লোক স্বর্গে গমন করে।

২২

রূপমব্যঙ্গতামায়ুর্ব্বুদ্ধিং সত্ত্বং বলং স্মৃতিং।
প্রাপ্তুকামৈর্নরৈর্হিংসা বর্জ্জিতা বৈ মহাত্মভিঃ

যাহারা রূপবান্ অবিকলাঙ্গ দীর্ঘায়ু বলশালী ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাহাদিগের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্তই আবশ্যক।

২৩

ন ভক্ষয়তি যো মাংসং ন চ হন্যান্ন ঘাতয়েৎ
তন্মিত্রং সর্ব্বভূতানাং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥

স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশু হিংসা ও মাংস ভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে সর্ব্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

২৪

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি বৈ তথা,
আত্মৌপম্যেন মন্তব্যং বুদ্ধিমদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ॥

আপনার প্রাণ যেরূপ প্রিয়, সকল প্রাণীরও প্রাণ সেইরূপ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার তুলনায় উহা যথাবৎ প্রতীতি করিবেন।

২৫

শরণ্যং সর্ব্বভূতানাং বিশ্বাস্যঃ সর্ব্বজন্তুষু।
অনুদ্বেগকরো লোকে ন চাপ্যুদ্বিজতে সদা॥

অহিংসক ব্যক্তি সর্ব্বভূতের শরণ্য বিশ্বাসপাত্র ও শান্তিজনক হইয়া নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়েন।

২৬

অনেকক্রয়িকো হন্তি খাদকশ্চোপভোগতঃ।
ঘাতকো বধবন্ধাভ্যামিত্যেষ ত্রিবিধো বধঃ।

যে ব্যক্তি কোন জন্তুরে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংস ভোজন করে, উহাদের তিনজনেরই এক এক প্রকারে ঐ জন্তুকে বধ করা হয়।

২৭

অখাদন্ননুমোদংশ্চ ভাবদোষেণ মানবঃ।
যোঽনুমোদতি হন্তব্যং সোপি দোষেণ লিপ্যতে।

যে মনুষ্য স্বয়ং মাংস ভোজনে বিরত হইয়াও কোন জন্তুর বধকার্য্যে অনুমোদন করে, তাহাকেও ঐ পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

২৮

অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানামায়ুষ্মান্নীরুজঃ সুখী।
ভবত্যভক্ষয়ন্মাংসং দয়াবান্ প্রাণিনামিহ॥

যিনি প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্, মাংস ভোজনে পরাঙ্মুখ, তিনি দীর্ঘায়ু, রোগবিহীন ও সর্ব্বভূতের অধৃষ্য হইয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

২৯

অহিংসা পরমো ধর্ম্মস্তথাহিংসা পরো দমঃ।
অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম দম, অহিংসা পরম দান এবং অহিংসাই পরম তপস্যা।

৩০

অহিংস্রস্য তপোঽক্ষয্যমহিংস্রো যজতে সদা
অহিংস্রঃ সর্ব্বভূতানাং যথা মাতা যথা পিতা।

অহিংসক ব্যক্তির অক্ষয় তপস্যা হয়, অহিংসক ব্যক্তির সর্ব্বদা যজ্ঞ করা হয়, অহিংসক ব্যক্তি সর্ব্বভূতের পিতামাতা স্বরূপ।

শ্রীনৃসিংহমুরারিশর্ম্মা।

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

প্রথম ভাগ।

নেপোলিয়নের শেষ জীবনী।

নেপোলিয়ন মহাপুরুষ। তিনি বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় দেবতা, তেজোময়ী রাজশক্তির পূর্ণাবতার। তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা, অদম্য উৎসাহ, অবিচলিত চেষ্টা ও অলৌকিক কার্য্যকুশলতার গৌরবময়ী প্রতিকৃতি মানব হৃদয়ের উচ্চতম প্রদেশে উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮২১ অব্দের পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিবসে এই মহাপুরুষ জীবনের খেলা শেষ করিয়াছেন, আর আজ এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। কিন্তু তাঁহার যশোভাতি অদ্যাপি সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত রাখিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যতদিন মানব সমাজ বিলুপ্ত না হইবে, যতদিন প্রভূশক্তির অস্তিত্ব জগতীতলে স্বীকৃত ও সম্মানিত হইবে, যতদিন প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জন ক্রিয়া লোভনীয় ও স্পৃহনীয় বস্তু বলিয়া সমাদর পাইবে, যতদিন রণদুন্দুভীর বিজয় নিনাদ মানব-কর্ণে অস্ফুট অব্যক্ত ধ্বনিতে পরিণত না হইবে এবং যতদিন অতুল বীরত্ব ও অনুপম ঔদার্য্যের মনোরম ছবি ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ তুলিকাতে চিত্রিত হইয়া মানব হৃদয়ের পূত প্রদেশে ষোড়শোপচারে সংপুজিত হইবে—ততদিন মহাত্মা নেপোলিয়নের লোকোত্তর কীর্ত্তিকলাপ অবিনশ্বরভাবে ধরাধামে বিরাজমান রহিবে এবং মানব হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তি সমভাবে আকর্ষণ করিতে থাকিবে।

পুরুষসিংহ নেপোলিয়ন ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে অরাতিবর্গের সমবেত চেষ্টা ও ষড়যন্ত্রে পর্য্যুদস্ত হইয়া অবিলম্বে স্বীয় রাজধানী পারিসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গ্রীষ্মের রমণীয় রজনীর মনোরম ছায়া তাঁহাকে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইল। মেঘনির্ম্মুক্ত গগনতলে হিমাংশু সমুদিত; শুভ্র কিরণ জালে দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত। বীরপুঙ্গব নেপোলিয়ন কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সহ অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান হইলেন। রজনী নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে অনুসরণকারী অরাতি সেনার বিকট বজ্রনাদ নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চতুর্দ্দিক চমকিত করিতেছে। ধরিত্রী প্রাণের ভয়াবেগ

সংবরণ করিতে না পারিয়া প্রতিধ্বনিচ্ছলে মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট প্রলাপোক্তি করিতেছে। কিন্তু স্থির রহিয়াছেন কেবল একজন হৃদয়বান্ পুরুষ—অচল অটল কিন্তু গম্ভীর নৈরাশ্যময় সৌম্যভাব। নেপোলিয়ন স্থির চিত্তে চলিতেছেন। আর মনোমধ্যে চিন্তা চক্র অবিরত আবর্ত্তনে রত রহিয়াছে। দুর্ব্বিষহ মানসিক যন্ত্রণার সহিত অলৌকিক মহত্ত্বের কি অপূর্ব্ব সমাবেশ!

পরদিবস রজনী দ্বিপ্রহর কালে নেপোলিয়ন পারিসে উপস্থিত হইলেন। নিশার এই গভীর সময়ে তিনি রাজবর্ত্মের স্তিমিত ও নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। বিশ্বস্ত বন্ধু কোলেন কোর্ট (Coulain court) সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। ক্লান্তি ও ক্ষোভে তিনি নিতান্ত অবসন্ন। চিরপ্রসন্ন বদন মণ্ডল আজ গভীর কালিমার রেখাতে অঙ্কিত—পরিচ্ছদ অসংলগ্নভাবে গাত্রোপরি সংবিষ্ট। যে মস্তক কদাপি কাহারও নিকট অবনত হয় নাই, আজ তাহা বিষাদের ভারে নমিয়া পড়িয়াছে। তিনি আর উপবিষ্ট থাকিতে পারিলেন না—পার্শ্বস্থ খট্টোপরি শয়ন করিলেন; বক্ষস্থলে হস্ত নির্দ্দেশ করতঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন "উঃ! আমার যাবতীয় যন্ত্রণা আজ এইখানে পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। আমার সৈনিকগণ অনুপম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। ঈদৃশ বীরত্ব সত্বেও পরাভূত হইলাম—ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যদিও পরাজিত হইয়াছে তথাপি তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যে প্রকার রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছে—কই বারংবার বিজয়ী হইয়াও ত কখনও কোথায়ও ঈদৃশী রণ-চাতুরী দেখাইতে সক্ষম হয় নাই।" এই বলিতে বলিতে তিনি যাতনার আবেগে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন—তাঁর বাক্যস্ফুরণ হইল না। কিছুক্ষণ পরে উষ্ণশ্বাস সহকারে 'আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না" এই বলিয়া তিনি সন্নিহিত নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন এবং তথায় নির্জ্জন চিন্তায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া স্নান কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। স্নানান্তে বিশ্রাম লাভ প্রত্যাশায় শয়ন করিলেন; কিন্তু সর্ব্ব সন্তাপ-নাশিনী নিদ্রা আজ তাঁহার প্রতি বিমুখ। যিনি দিবসদ্বয় পূর্ব্বে অতুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, যাঁহার নামে ইউরোপীয় নরপতিবৃন্দ ত্রাসঃসমাকুলিত হৃদয়ে কম্পান্বিত থাকিত, আজ তিনিই তাহাদের হস্তে পরাভূত হইয়া বন্দী হইতে যাইতেছেন; এই চিন্তা হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল, তিনি শয়ান রহিতে পারিলেন না—শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। উপবেশনানন্তর তিনি (Coulain court) কোলেন কোর্টকে নিজ প্রকোষ্ঠে আহ্বান করিয়া ধীর এবং কাতরস্বরে ফ্রান্সের গভীর দুর্দ্দশার দারুণ চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিলেন। কথন-কালে নেপোলিয়নের বদনমণ্ডল আরক্তিম ভাব ধারণ করিল। তিনি কিয়ৎকাল গম্ভীর তুষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। পরিশেষে পুনরায় কহিতে লাগিলেন—"আমি মন্ত্রী সভাদ্বয় একত্র সমবেত করিয়া তাঁহাদের সমীপে সৈনিকদিগের দুঃখ কাহিনী যথাযথ বর্ণনা করিব এবং স্বদেশ রক্ষণোদ্দেশে অর্থ সাহায্যের প্রার্থনা করিব

তৎপরে পুনর্ব্বার আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব।

পরদিন (২১ জুন ১৮১৫) উভয় মন্ত্রী সভা সমাসীন হইল। নেপোলিয়ন দেখিলেন এই আসন্ন বিপদ কালে পরস্পর বিরোধ ভাবাপন্ন এই সভাদ্বয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া কোন কর্ম্ম সম্পাদনের চেষ্টা বৃথা। যে প্রকার সময় উপস্থিত তাহাতে কর্ত্তব্য সম্পাদনে ক্ষিপ্রকারীতার বিশেষ প্রয়োজন; সুতরাং সমগ্র রাজকীয় ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় উদ্ভাবনে তিনি অসমর্থ হইলেন। কিন্তু এতাদৃশী ক্ষমতা উক্ত সভাদ্বয়ের অনভিমতে গ্রহণ করিতে তিনি নিতান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন। অধিকাংশ সভ্য তাঁহার মতের সমনুমোদন করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার শত্রুপক্ষীয় সভ্যেরা ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। এ দিকে পারিসের জন সাধারণ নেপোলিয়নের পার্শ্বে সমবেত হইয়া বিপক্ষ পক্ষীয়দিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। সমস্ত পারী-নগরী ঘোর আন্দোলনে আন্দোলিত। কিন্তু যাঁহার বুদ্ধিশক্তি ভীষণ আহবের অগণ্য বিপদের মধ্যে স্থির-ধীর-শান্তভাবে কার্য্য করিয়াছে, সেই নেপোলিয়নের গভীর হৃদয় বিন্দু মাত্রও বিচলিত হইল না। তিনি গগনভেদী অথচ প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, ;—"আমি কি পারী-নগরীতে আমার অন্তর্ব্বিপ্লবের সূচনা করিতে আগমন করিয়াছি?—কদাপি নহে। সভ্যগণ! আপনাদের সদসদ্বিবেক যে প্রকার কার্য্যাবলম্বনে অভিমর্তি প্রকাশ করে আপনারা তদ্রূপ কার্য্য সম্পাদনে প্রস্তুত হউন। আমি অপর কিছুর প্রার্থী নহি। আমার সাহায্যের জন্য আপনাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। তজ্জন্য আমি স্বয়ং যথেষ্ট শক্তি ধারণ করি। স্বদেশোদ্ধারের জন্য আমি আপনাদের সাহায্যের প্রার্থী। আসুন আমার অভীপ্সিত কার্য্যে আপনারা সহায়তা করুন। ফ্রান্সের জন্য আমি যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আত্মগৌরব বা আত্মরক্ষার নিমিত্ত আমি পরকীয় সাহায্যের ভিখারী নহি।"

এই প্রকারে ২১ জুন দিবাভাগ অতিবাহিত হইল। রাত্রি সমাগত; মন্ত্রী সভাদ্বয় সমস্ত রজনী বাদানুবাদে প্রবৃত্ত রহিল। নেপোলিয়ন রাত্রির শেষভাগে নিদ্রালাভাশায় সভাস্থল ত্যাগ করিয়া বাস-ভবনাভিমুখে গমন করিলেন; কিন্তু নিদ্রার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। সে রাত্রিতে নিদ্রা পারীনগরীতে প্রবেশাধিকার পায় নাই।

পরদিন (২২শে জুন) প্রাতঃসূর্য্য নবরাগে রঞ্জিত হইয়া পারীনগরীর পূর্ব্ব গগনে সমুদিত হইলেন। অষ্টম ঘটিকার সময় পুনরায় মন্ত্রীসভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। নেপোলিয়নের শত্রুবর্গ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য চীৎকার আরম্ভ করিলেন। আজ নেপোলিয়নের হৃদয় আন্দোলনে আকুলিত, কর্ত্তব্যাবধারণে অক্ষম। যিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে অভিনব সৈন্য সমাবেশ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া, বহুতর বিশাল-অনীকিনীকে নিমেষ মধ্যে জয় করিয়াছেন, আজ তিনি কর্ত্তব্যের দ্বারে দারুণ সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত—কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। রজনীযোগে সংবাদ পাইয়াছেন—মার্শাল গ্রোশী (Marshal grouchy) বিপক্ষ পক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া

TIGHT BINDING

চল্লিশ সহস্র সৈন্য সহ পারিসাভিমুখে তাঁহার আদেশ-পালনে অগ্রসর হইতেছেন এবং পারীনগরীতেও যাবতীয় জন-সাধারণ তাঁহার আজ্ঞাপালনে সমবেত হইয়াছে। তিনি কি এই বিপুল সৈন্য শ্রেণীদ্বারা পুনরায় স্বদেশোদ্ধারে প্রয়াসী হইবেন? ভীষণ প্রশ্ন—ঘোর সন্দিগ্ধস্থল। যদি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়েন, তাহা হইলে ফ্রান্স অরাতি-কবলে নিপতিত হইবেই হইবে। আর যদি এই সকল সৈন্য লইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তাহা হইলে বল প্রকাশ পূর্ব্বক উভয় মন্ত্রী সভার ধ্বংস-সাধন প্রয়োজন এবং শতসহস্র স্বদেশ-বাসীর প্রাণসংহার কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে পরন্তু ভীষণ আহারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ স্বদেশের বক্ষ হইতে বহুনগর সমুৎপাটিত করিতে হইবে।

গম্ভীর এবং বিষণ্ণভাবে বহুক্ষণ চিন্তার পর তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি মন্ত্রীসভার মীমাংসানুযায়ী কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মন্ত্রীসভাও এদিকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তদ্-জ্ঞাপনার্থ নেপোলিয়ন সন্নিধানে কতিপয় সভ্যকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "সম্প্রতি সমবেত রাজন্যবর্গ যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নহে। পরন্তু তাঁহারা আপনারই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি তাঁহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেই ফ্রান্স উদ্ধার পাইবে"। মহামতি নেপোলিয়ন কোনও দ্বিরুক্তি না করিয়া অমনি তাঁহাদের মীমাংসাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সমাগত সভ্যগণকে বলিলেন;—"আপনাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুখী হইলাম। আপনাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, আমার পদচ্যুতি হেতু ফ্রান্সের কোন প্রকার অসুখ বা অমঙ্গল সংঘটন না হয়। কিন্তু আমার আশা কতদূর ফলবতী হইবে বলিতে পারি না। আমার অভাবে ফরাসী রাজ্য মস্তকহীন হইবে এবং রাজনৈতিক জগতে ইহার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। আমাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার জন্য আপনাদের যে সময় ব্যয়িত হইল, সেই সময়ের মধ্যে ফ্রান্স অনায়াসে শত্রু-কবল হইতে রক্ষিত হইতে পারিত। মন্ত্রীসভার নিকট আমার শেষ নিবেদন—তাঁহারা অবিলম্বে পুনরায় সৈন্য সমাবেশ করতঃ শত্রু সম্মুখীন হউন। শান্তিলাভের ইচ্ছা থাকিলে যুদ্ধ ঘোষণা করুন। এই বিরাট জাতিকে পরপদ দলিত করিবেন না, শত্রু দ্বারা প্রতারিত হইবেন না। আমি যেখানে যে ভাবেই জীবন যাপন করি না কেন, ফ্রান্সের সুখে আমি সর্ব্বদাই সুখী হইব। আমার পুত্রকে ফ্রান্সের হস্তে সমর্পণ করিলাম। আশা করি আপনারা বিস্মৃত হইবেন না যে, আমি তাহারই জন্য এবং ফরাসী জাতীর মঙ্গলোদ্দেশে সিংহাসন ত্যাগ করিলাম। আমার বংশধরগণ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট ফ্রান্স সুখ ও স্বাধীনতা পাইবে না।"

ন্যায়ের নিকট—কর্ত্তব্যের নিকট স্বার্থ বিসর্জ্জনের কি জলন্ত দৃষ্টান্ত! যে সভার জীবন মরণ তাঁহার সামান্য ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিতেছে, তিনি ন্যায়ের অনুরোধে

সভার নিকট অনায়াসে আপনার স্বার্থ—প্রিয়তম জীবনকে জন্মের মত বলি দিলেন। কি মহান্ ঔদার্য্য! কি অদ্ভুত ন্যায়পরতা! কি নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেমিকতা!

এই ঘটনার পর দুই দিবস চিন্তা ও বিষাদের নিবিড় ছায়াতে অতিবাহিত হইল। অনন্তর ২৫ শে জুন নেপোলিয়ন প্রচ্ছন্ন-বেশে নগরীর সন্নিহিত জনপদ ম্যালমেসনে (Malmaison) প্রস্থান করিলেন। গমন-কালে তিনি করুণবাক্যে বিশ্বস্ত বন্ধু কোলেন কোর্টকে (Coulain corut) বলিলেন "বন্ধু-বর! এ জীবনে এই তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ। আমার সমস্ত আশাভরসা শেষ হইয়াছে। তুমি কায়মনোবাক্যে ফ্রান্সের সেবাতে রত থাকিও, তাহা হইলেই আমার সেবা হইবে; আমি সুখী হইব।"

ম্যালমেসনে (Malmaison) অবস্থান কালে তিনি আমেরিকা যাত্রার সংকল্প করিলেন, এবং তদুপযোগী আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজসভা বিপক্ষ পক্ষকে বাধা দিয়া ফ্রান্সের অনুকূলে সন্ধি সংস্থাপনাশায় অশীতি সহস্র সৈন্য সমবেত করিয়াছেন। নেপোলিয়ন সৈনিকবর্গের নিকট একখানি পবিত্র স্নেহ পূর্ণ পত্র প্রেরণ করিলেন। উক্ত পত্রে তিনি স্বীয় বিপন্নাবস্থা বিস্মৃত হইয়া যাহাতে ফ্রান্সের মঙ্গল হয় তদুদ্দেশে ফরাসী সৈন্য শ্রেণীকে নবীন অনুরাগ ও ভক্তির সহিত নব প্রতিষ্ঠিত রাজ সভার আদেশ পালনের জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিলেন। সৈন্য সমূহের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি আমেরিকা যাত্রার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন এবং নূতন রাজসভাকে দুইখানি অর্ণবপোত সজ্জিত করিবার আদেশ করিলেন। অর্ণবপোত প্রস্তুত হইল বটে কিন্তু ইংরেজ সৈনিক ওয়েলিংটন উক্ত জলযানদ্বয়ের নির্ব্বিঘ্নে যাত্রার ব্যাঘাত উৎপাদন করিলেন। নেপোলিয়ন শুনিয়া কহিলেন "লুক্কায়িত ভাবে পলায়ন করা আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ; পরিশেষে সমুদ্র বক্ষে ধৃত হইলে ভীরু ও নীচাশয় বলিয়া বিশেষ লাঞ্ছিত হইব। ঈদৃশ অপমান আমার সহ্য হইবে না; অতএব শত্রুপক্ষের বিনা সম্মতিতে আমি সমুদ্র যাত্রা করিব না

এ দিকে এই প্রকার আয়োজন চলিতেছে অপর দিকে অরাতি সেনা সগর্ব্ব-পাদ-বিক্ষেপে পারিসাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। একদা নেপোলিয়ন স্বীয় বাসভবনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; এতদবস্থায় অদূরে আগ্নেয়াস্ত্রের বজ্রনির্ঘোষ-ধ্বনি শ্রুত হইল। অমনি তাঁহার বীর-ধমনীতে বীর-শোণিত নৃত্য করিয়া উঠিল, সমগ্র দেহ নব বলে বলীয়ান হইল, অন্তঃকরণ পূর্ব্বোচিত বীর-রসে আপ্লুত হইয়া সৌম্যভাব ধারণ করিল —সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে তাঁহার মৃতপ্রাণে কে যেন চেতনার সঞ্চার করিয়া দিল। ভাবিলেন তিনি আজ ভীষণ সমর প্রাঙ্গনে সমাসীন সদর্পে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রিয় অনুচর জেনারেল বেকরকে General (Becker) আহ্বান পূর্ব্বক বীরভাবে বিভোর হইয়া কহিতে লাগিলেন:—"অরাতি দল সমাগত। আগামী প্রত্যুষেই তাহাদের রণ-ডঙ্কার ভীষণ রব নগরীর দ্বারদেশে শ্রুত হইবে। রাজসভা কি এখনও মোহ নিদ্রায় অভিভূত। সে নিদ্রার কি অবসান হইবে

TIGHT BINDING

না ? তাঁহাদের সৈন্য শ্রেণী কোথায় ? আমি তাঁহাদের আজ্ঞাধীনে সৈন্য সঞ্চালনে প্রস্তুত আছি। রণভীরু দুরাচার অরাতি বর্গের ধ্বংস সাধন দ্বারা ওয়াটালু-ক্ষেত্রের পাপোপনোদন করতঃ ফ্রান্সের সমর-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিব। আমি অভয় প্রদান করিতেছি তাঁহাদের প্রভুত্ব নাশের কোন আশঙ্কা নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি শত্রুকুলের বিনাশ সাধনের পর মুহূর্ত্তেই আমি ফ্রান্স পরিত্যাগ করিব। বেকর তুমি সভাস্থলে গমন করিয়া তৎসমীপে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর।”

এই বীরোচিত পরম তেজোময় বাক্যাবলীর অবসান হইলে বেকর (Becker) কিয়ৎক্ষণ মৃণ্ময় মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে রহিলেন। অতঃপর বৃথা বাক্যব্যয় করিতে সাহসী না হইয়া তিনি সভা সমীপে গমন করিয়া নেপোলিয়নের বীর বাক্য ব্যক্ত করিলেন। অদূরদর্শী শত্রুভাবাপন্ন সভ্যগণ নেপোলিয়নের অভিলাষ অবগত হইয়া উহা সমনুমোদন করিলেন না। নেপোলিয়ন সভ্যদিগের প্রত্যুত্তরের অসারতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা অবধারণ করিয়া, বীরভাবে বলিলেন “এই অদূরদর্শীতার নিমিত্ত রাজ সভাকে শীঘ্রই পরিতাপ করিতে হইবে”। এই বলিয়া তিনি ত্বরায় তাঁহার আমেরিকা যাত্রার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। এতদবসরে তিনি আদি জীবনের লীলাভূমি ম্যালমেসনে স্বীয় স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিনী যোসেফাইনের (Josephine) গৃহে উপবিষ্ট হইয়া অবিরল অশ্রুজল বিসর্জ্জনে পবিত্র প্রেমের গভীর ঋণ পরিশোধ করিয়া, প্রাণের পুত্তলী স্নেহ মমতার সজীব প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপা আত্মজা হর্টেন্সের (Hortense) নিকট অতি করুণ ও কাতর স্বরে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। সে মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিলে বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়—পাষাণও বিগলিত হয়।

নেপোলিয়ন মানব জীবনের এই সাধু ও পবিত্র কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত রহিয়াছেন, ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল শত্রুপক্ষীয়েরা পারিসাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, নেপোলিয়নের আর নিষ্কৃতি নাই। ওয়েলিংটনের ফরাসী রণতরীর নির্ব্বিঘ্ন গমনাদেশ প্রদান করিবার কোন ক্ষমতা নাই সুতরাং তিনি নেপোলিয়নের জলপথে আমেরিকা গমনের বাধা উত্থাপন করিলেন। অগত্যা নেপোলিয়নকে আমেরিকা গমনাশা ত্যাগ করিতে হইল। শত্রুর মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল।

পাঠক এই ঘটনা চক্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখ উহার অভ্যন্তরে জঘন্য খলতা ও বিশ্বাস ঘাতকতা, গভীর ষড়যন্ত্রের সহিত কেমন মৈত্রীভাবে বাস করিতেছে। সরল ঔদার্য্য কুহকিনী প্রতারণার দুর্ভেদ্য পাশে কি প্রকারে আবদ্ধ হইয়াছে। মহাত্মা নেপোলিয়নের নীচাশয় শত্রুমণ্ডলী রাজ ক্ষমতায় অলঙ্কৃত হইয়া কি নিদারুণ ঘটনার সূচনা করিল! দুরাত্মাগণ সংগোপনে বিপক্ষপক্ষের সহিত সংবাদাদি আদান প্রদান করতঃ আজ নরকেশরী নেপোলিয়নকে বন্দী করিতে প্রস্তুত। ভক্তি কৃতজ্ঞতা ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, ঘোর স্বার্থে অন্ধ হইয়া, নীচাশয়তা ও বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে আজ পাষণ্ডগণ স্বদেশের গৌরব-নিদান, জগতের বিজয়-কেতু মহাপুরুষ নেপোলিয়নকে চিরশত্রুর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছে। ধিক্ ইহাদের জন্মে! শতধিক ইহাদের কর্ম্মে!! আমরা বারান্তরে মহাত্মা নেপোলিয়নের অন্তিম জীবনীর অবশিষ্টাংশ প্রতিনিধির পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিব।

শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী।

কবিতা ও সঙ্গীত।

শক্তি-সাধন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৮

আয় মা, আয় মা, ভারত শ্মশানে
শ্মশান-বাসিনি!
পূজিব সাদরে মনোপ্রাণ ভ'রে
রাঙ্গা পা দুখানি।

১৯

দেখ্ মা, ভারত বিকট শ্মশান,
জ্বলে সারি সারি ঘোর চিতানল!
ভারত সন্তান পুড়িয়া উহাতে
হয় ভস্মরাশি, ফাটে বক্ষঃস্থল!

২০

দেখ্ মা, প্রেতের প্রভুত্ব কেমন,
দেখ্ পিশাচের পাপ ব্যবহার!
দেখ্ মা, কেমন হাসিতে হাসিতে
মাতৃক্রোড় হ'তে আহা সুকুমার—

২১

শিশুগণে ল'য়ে (শিহরে শরীর!)
জ্বলচ্চিতানলে দেয় গো ফেলিয়া!
অবোধ শিশুর সম্মুখে আবার
(দেখ্ মা, দেখ্ মা, দেখ্ মা চাহিয়া!)

২২

ধরি জননীরে করে অপমান!
প্রায়োপবেশিতা, আহা! নিরাহারা,
বিশীর্ণা মলিনা, দীনা, হীনা, ক্ষীণা
রমণী-রতনে ধরি পাপাত্মারা

২৩

দেখ্ মা, কি করে!—সহেনা যে আর!
সন্তান হইয়া আর সহি কত?
দে মা, অসি মোরে অসিত বরণে!
তুইও জননী অতীব তৃষিত—

২৪

লক্ লক্ জিহ্বা করিয়া বিস্তার,
দাঁড়া দিগম্বরি, দাঁড়া একবার!
পিশাচ-শোণিতে পূজি ও রসনা,
শিখাই পিশাচে ঘোর অত্যাচার—

২৫

ঘোর নৃশংসতা বলে কারে!—কিম্বা
যদি তা না পারি, নিজ গলদেশে
বসাইয়া অই খরশাণ অসি,
দি মা উষ্ণরক্ত, পান কর হেঁসে!

২৬

দিবি না মা, অসি অশক্ত সন্তানে?
শক্তীশ্বরি এই তব সাধনায়
বসিলাম আজি মৃত ভ্রাতৃবুকে,
হয় দে মা অসি নতুবা বিদায়!

২৭

ব্রাহ্মণ অবধি চণ্ডাল পর্য্যন্ত
বিংশতি কোটিক শবের উপর
একে একে বসি করিব সাধনা,
যাবৎ জীবন তাবৎ বৎসর!

২৮

হৃৎপিণ্ড চিরি, বিন্দু বিন্দু করি
লোহিত রুধিরে পূজিব মা তোরে,
পদনখ হ'তে কেশাগ্র পর্য্যন্ত
অণু অণু ছেদি, অম্লান অন্তরে

২৯

দিব ক্রমে ক্রমে তব তৃপ্তি হেতু,
রক্তবিন্দু মোর হবে রক্তজবা!

অণু অণু দেহ হ'বে নরবলি,
আর গো জননি, কোথা পাব কিবা!

৩০

দেখাইয়া ভয় অধম সন্তানে
যোগ সাধনায় করিবি বিরত?
মনেও তা স্থান দিস্ না জননি,
মৃত্যু যার মিত্র সে কি হয় ভীত?

৩১

গর্জ্জুক গম্ভীরে আকাশে অশনি,
কম্পিত করিয়া বিশ্ব চরাচর
অটল অচল এই পুত্র তোর
রহিল মা, ধ্যানে নির্ভয় অন্তর!—

৩২

একগাছি কেশও হ'বেনা কম্পিত!
খেলুক দামিনী ঘন ঘন কোলে,
ধাঁধুক মুহূর্ত্তে নিখিল ভুবন,
সে দিকে কে চায়, কেবা চক্ষু মিলে!

৩৩

নাচুক ডাকিনী, প্রেতিনী, পিশাচী,
হাসুক শাঁখিনী খিল্ খিল্ খিল্!
বেড়াক কবন্ধ পশারিয়া বাহু
তাল-তরু-দীর্ঘ, কভু এক তিল

৩৪

আশঙ্কা অন্তরে না পাইবে স্থান,
ভূত, প্রেত, দানা করুক চিৎকার!
ঘোর কৃষ্ণতনু রক্ত-জবা-চক্ষুঃ
প্রকাণ্ড শরীর কাতারে কাতার

৩৫

পিশাচের দল আসুক নিকটে
বিস্তারিয়া বক্ত্র, বিকাশি দশন!
উগ্র 'উদ্দীপনা' মহাসুরাপানে
হইয়া বিহ্বল, মুদিয়া নয়ন,

৩৬

'ত্রাহি মে ভৈরবি' জপিব কেবল!
এইরূপে ভয় হ'ল অপগত,
চক্রপর চক্র ভেদ করি ক্রমে,
দিব্য 'মণিপুরে' হ'য়ে উপনীত,

৩৭

'কুলকুণ্ডলিনী' করি উদ্বোধন,
'অনাহত চক্রে' আরোহণ করি,
'ভাবনা' 'কামনা' আদি নায়িকার
করি' ধর্ম্মনষ্ট হ'য়ে 'বামাচারী',

৩৮

পরে 'বীরাচারে' মহাশক্তি ধ্যানে
হইব প্রবৃত্ত, ত্যজি অন্তরূপ;
চণ্ড মুণ্ড খণ্ডা 'চামুণ্ডা' মূরতি
ভাবিব হৃদয়ে, মহা 'ক্রোধ'-যূপ

৩৯

স্থাপিয়া অন্তরে 'দয়া' 'মায়া' আদি
সমস্ত কোমল প্রবৃত্তি অজায়
'প্রতিহিংসা' খড়্গে দিব বলিদান,
কঠিন পাষাণে বাঁধিব হিয়ায়!

ক্রমশঃ

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সোম।

সঙ্গীত।

রাগিণী—জয় জয়ন্তী।
তাল ঝাঁপতাল।

হায় হায় কি উপায় কি হবে আমার।
কেমনে হইব পার, অপার ভব জলধি না
জানি সাঁতার॥
কোথা হতে এসেছিলেম কোথা যেতে হবে,
কি কাজে কাটালাম দিন আসিয়ে এ ভবে;
হলোনা হলোনা, পরম সাধনা,
অনিত্য ভাবনায় মন আছে অনিবার॥
পদ্ম পত্রে যথা বারি করে টলমল,
সেরূপ জীবন এই সতত চঞ্চল,
মায়ার বিকারে, ভুলায়ে রাখেরে,
অসার সংসার মাঝে সকলি অসার॥

শ্রীধনকৃষ্ণ সেন।

বর্দ্ধমান-রাজ-কলেজ *।

বর্দ্ধমানাধিপতি স্বর্গীয় মহাত্মা মহাতাপ চাঁদ বাহাদুরের অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপ ও বিবিধ সদনুষ্ঠানের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ঘোর পাষণ্ডহৃদয়ও অকপট কৃতজ্ঞতা ও অকৃত্রিম ভক্তিভাবে আপ্লুত হইয়া যায়। শুদ্ধ বর্দ্ধমান অঞ্চলে নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া তদীয় অক্ষয় কীর্ত্তি-কলাপ সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর এ জগতে আর নাই, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আজিও বিলুপ্ত হয়নাই, কখন হইবারও নহে। তিনি যশঃস্বরূপে হৃদয়ের অতি

---

* বর্দ্ধমান রাজ-কলেজ বর্দ্ধমান মহারাজের অতুল কীর্ত্তি। দরিদ্র সন্তানদিগকে সমার্থভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রদানই এ কলেজ সংস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণে বহুব্যয়সাধ্য উচ্চ শিক্ষায় বিনা ব্যয়ে সুশিক্ষিত হইতে পারে, তজ্জন্য উপযুক্ত বেতনে অধ্যাপক ও শিক্ষক নিয়োগ করিতে—কলেজকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে বর্দ্ধমানরাজের ধনাগার চিরদিনই উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে কলেজের শিক্ষাদান কার্য্য যেরূপ বিশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছে, তাহাতে কলেজের স্থাপয়িতা মৃত মহারাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। মহারাজের এই অনুপম কীর্ত্তির সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য আজিও সর্ব্বস্বং, সেই ভবিষ্যদ্দর্শী মহারাজের দান ক্রমেই রাজ অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। কে কেন স্বর্গীয় মহারাজের অভিপ্সিত সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইতেছেনা? কেন তাঁহার এই শরচ্চন্দ্রনিভ বিমল কীর্ত্তিতে শিক্ষাদান সম্রাট রূপ কলঙ্ক কালিমা আলেপিত হইতেছে? সুযোগ্য অধ্যক্ষ রাম-নারায়ণ বাবুর পদত্যাগের পর হইতেই বর্দ্ধমান রাজ-কলেজের এইরূপ কলঙ্কের কথা শুনা যাইতেছে। এখন এই কলঙ্কের জন্য দায়ী কে? আমরা বলিব বনবিহারী বাবু দায়ী। যেহেতু বর্ত্তমান মহারাজ নাবালক। যাঁহারা ভিতরের খবর জানেন না, তাঁহারাই বনবিহারী বাবুকে বেতন ভোগী ম্যানেজার বলিয়া জ্ঞান করেন। আমরা কিন্তু সেরূপ করিনা। সত্য বটে বনবিহারী বাবু বেতন-ভোগী রাজকর্ম্মচারী কিন্তু বর্দ্ধমান রাজ-ষ্টেটে তাঁহার কেবলমাত্র কর্ম্মচারীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করিয়া নিষ্কৃতি নাই। বৃদ্ধ মহারাজ মহাতাপচাঁদের রাজষ্টেট সম্বন্ধে যেরূপ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ছিল, তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর হইতেই বনবিহারী বাবুর স্কন্ধে সেই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভার পড়িয়াছে এবং আমাদের বিশ্বাস তিনি জীবিতমানে এ দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন না। যদিও বর্দ্ধমান রাজ বংশের সহিত ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিলনা, তথাপি তাঁহার প্রতি বৃদ্ধ মহারাজের অকপট স্নেহ এবং তাঁহার এই দীর্ঘকাল রাজসংসারের সহিত সংস্রব হেতু বর্দ্ধমান রাজষ্টেটের মঙ্গল কামনা করিতে তিনি একরূপ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। তিনিও সেইরূপ আপনাকে মনে করেন, লোকেও তাহাই জানে। বর্ত্তমানে তিনিই বর্দ্ধমান রাজসংসারের রাজপ্রতিনিধি। সুতরাং রাজষ্টেট সম্বন্ধে যাহা কিছু যশ অযশ ঘটিবে তাহা তাঁহারই উপরই বর্ত্তিবে। বিশাল রাজষ্টেটের নানাবিধ কার্য্যের গুরুতর চিন্তায় তাঁহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, এই জন্যই তিনি কলেজটীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করিতে অবসর প্রাপ্ত হন না বলিয়াই কলেজটীর অবনতি ঘটিতেছে বলিয়া বোধ

পবিত্র পূজ্য সামগ্রী হইয়া এ জগতে বিরাজ করিতেছেন। দুঃখীর দুঃখ মোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, নিঃসহায়কে সাহায্যদান, প্রার্থীকে অর্থদান, শরণাগতকে আশ্রয় দান, পীড়িতকে ঔষধ দান তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুধর্ম্মে, হিন্দু শাস্ত্রে, হিন্দু দেবদেবীতে তাঁহার বিশেষ আস্থা ও অচলা ভক্তি ছিল। তিনি স্বয়ং গুণগ্রাহী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং সাধারণ্যে বিদ্যাদান তাঁহার জীবনের একটী মহৎ ব্রত ছিল।

মহাত্মা মহাতাপচাঁদ বাহাদুর লোকহিতব্রতে ব্রতী হইয়া যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে বর্দ্ধমান রাজ কলেজ সকলের শীর্ষস্থানীয় বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় বর্দ্ধমানে একটী সামান্যরূপ গভর্ণমেণ্ট স্কুল ব্যতীত বিদ্যাশিক্ষার বিশেষতঃ ইংরেজী ভাষা ও তাৎকালিক উচ্চশিক্ষার উপায়ন্তর ছিল না। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর সেই অভাব ও অসুবিধা নিরাকরণাভিপ্রায়ে বিনা ব্যয়ে বিশেষতঃ স্থানীয় নিঃস্বসন্তানগণের তৎকালোপযোগী বিদ্যাশিক্ষার উপায় স্বরূপ একটী মধ্যশ্রেণীর ইংরেজী-বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই বর্ত্তমান রাজকলেজের অঙ্কুর স্বরূপ। দুর্ভাগ্য বশতঃ মহানুভব মহাতাপচাঁদ বাহাদুর স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষ কালক্রমে পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইতে ও সময়ে প্রভূত মূল্যবান সুফল প্রদান করি দেখিয়া তাঁহার সেই সদিচ্ছার চরিতার্থ লাভ করিতে অধিকারী হইলেন না।

ব্রিটিশ রাজত্বের ক্রমোন্নতির সহি রাজভাষার প্রতি লোকের অনুরাগ যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ইংরাজী ভাষা শিক্ষ প্রয়োজনীয়তা যতই উপলব্ধ হই লাগিল, তখন ওরূপ একটী সামান্য স্কু দ্বারা সাধারণের বিবৃদ্ধমান বিদ্যোপার্জ স্পৃহা পরিতৃপ্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব হ উঠিল। বলাবাহুল্য যে গভর্ণমেণ্ট-স্কু অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক ছিল মহাতাপচাঁদ বাহাদুর নিজ স্কুলের স্পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া আর স্থির থাকি পারিলেন না। গভর্ণমেণ্ট স্বীয় স্কু উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইবার পূ মহারাজবাহাদুর নিজ স্কুলের কলেবর ও উন্নতি সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া বি ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন।

সত্বরেই রাজ-স্কুলটি এনট্রান্স স্কু আকার ধারণ করিল। সুতরাং অপর স্কু টীর অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হ উঠিল। বিনা ব্যয়ে সুচারুরূপে রাজ শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে গভর্ণমে স্কুলটীর প্রতি লোকের আস্থা একেবা কমিয়া আসিল। অবৈতনিক রাজ বর্ত্তমানে অন্য স্কুলের অনাবশ্যকতা উপ করিয়া গভর্ণমেণ্ট নিজ স্কুলটী বর্দ্ধমান হই উঠাইয়া দিলেন।

স্কুলটী প্রকৃত প্রস্তাবে এনট্রান্স হইলেও মহারাজ আদর করিয়া তাহ

হয়। বনবিহারী বাবু বিবিধ গুণালঙ্কৃত এবং যথেষ্ট কার্য্যকুশল। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তিকে রাজকলেজের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে উদাসীন দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়। ভরসা করি তিনি আমাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া রাজকলেজের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলতা ঘুচাইতে মনযোগী হইবেন।

উ, প্র, স।

সজ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। রলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা (এন্ স) পরীক্ষা দেওয়ানই স্কুলটীর একমাত্র দেশ্য ছিল না। উহার চারিটী বিভাগ ল। ১ ইংরাজী বিভাগ; ২ বাঙ্গলা বিগ; ৩ পারশী বিভাগ; ৪ সংস্কৃত বিভাগ। রাজী বিভাগে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত তে এনট্রান্স পর্য্যন্ত এবং বাঙ্গলা বিভাগে লা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়া হইত। মুসলন ছাত্রদিগের পার্শী ও উর্দ্দু শিক্ষার সুবির জন্য পার্শী বিভাগ রাখা হইয়াছিল; ং যে সকল শুদ্ধাচারী ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ নয় যাবনিক ভাষা শিক্ষা আচার-বিরুদ্ধ ান করিয়া ইংরাজী স্কুলের ফল ভোগের ধিকারী হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের শুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষার সদুপায়স্বরূপ সংস্কৃত ভাগ অর্থাৎ টোল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন মহারাজ স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যাহাতে হিন্দু গৃহস্থ কন্যাগণ বিশুদ্ধ হিন্দুভাবে শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থা য় তজ্জন্য একটী অবৈতনিক বালিকাবিদ্যালয়ও সংস্থাপন করেন।

মহারাজ এইরূপে সাধারণ্যে শিক্ষাদান রূপ গুরুভার ও দায়িত্ব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজস্কন্ধে লইয়া একদিনের জন্যও কর্ত্তব্য কার্য্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। যাহাতে শিক্ষা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য তিনি অধিক বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং শিক্ষার্থীদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য প্রত্যেক শ্রেণীতেই বাৎসরিক পরীক্ষার ফলানুযায়ী পুরস্কার বিতরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল ছাত্র রাজ স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে (এল্, এ, পড়িতে) ইচ্ছা করিত তাহাদিগের মধ্যে অবস্থা ও পারদর্শিতা দেখিয়া ৩।৪টী ছাত্রকে দুই বৎসর কাল মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া দেওয়া হইত। এইরূপে স্কুলটীকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও নিঃস্ব সন্তানদিগের বিদ্যা শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য মহারাজ যত্ন ও চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

স্কুলটীকে এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া মহাত্মা মহাতাপচাঁদ বাহাদুর অবশ্যম্ভাবী নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান। সময়ের আবশ্যকতা অনুসারে স্কুলটীর ক্রমোন্নতি সাধন মহারাজের দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল। স্কুল স্থাপনের সময় হইতেই প্রায় তাঁহার মনোমধ্যে স্কুলটীকে ভবিষ্যতে কলেজে পরিণত করিবার ইচ্ছা অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই তিনি একটী বৃহদট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল নিকট হইয়া আসিল —তিনি তাঁহার সেই মহতীচ্ছার, চরিতার্থতা লাভ করিতে অবসর পাইলেন না।

মহারাজের পরলোকান্তে, তদীয় উত্তরাধিকারী কুমার আপতাপচাঁদ বাহাদুর বর্দ্ধমান রাজ সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। কুমার বাহাদুরও লোকহিতব্রতে ব্রতী হইয়া পৈতৃক কীর্ত্তি সকল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বরং যাহাতে তাহাদের উন্নতি সাধন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে স্কুলটীর উপরই অগ্রে তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি পতিত হইল। বৃথা কালক্ষেপণ না করিয়া অসম্পূর্ণ কলেজ প্রাসাদটীর নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধান্তেই আপতাপচাঁদ বাহাদুর সেই প্রাসাদে ১৮৮৯

TIGHT BINDING

খৃষ্টাব্দে কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কলেজে আপাততঃ এল, এ, ক্লাশ পর্য্যন্ত খোলা হইল বটে কিন্তু কলেজটীর প্রতি আপতাপচাঁদ বাহাদুরের বিশিষ্ট অনুরাগ ও তাহার উন্নতি সাধন বিষয়ে আগ্রহাতিশয় দেখিয়া মনে বড়ই একটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে অল্পদিন মধ্যে কলেজটী সাধারণের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার সোপান স্বরূপে পরিণত হইবে। সে আশা বড় দুরাশা নহে। কিন্তু কালের কুটিল রহস্য মানবের অভেদ্য! আপতাপচাঁদ বাহাদুর স্বীয় মাহাত্ম্য ও ঔদার্য্যের পরিচয় দিবার অবসর পাইতে না পাইতেই তাঁহাকে কালের করাল কবলে নিহিত হইতে হইল।

আপতাপচাঁদ বাহাদুরও তদীয় স্বর্গীয় পিতা মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের ন্যায় গরীবের মা বাপ ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার কলেজের নিঃস্ব ছাত্রগণকে তিনি নিজ পুত্রের ন্যায় দেখিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গরীব সন্তানদিগের বিদ্যোপার্জ্জনের সোপান স্বরূপ শুদ্ধ একটী অবৈতনিক কলেজ খুলিয়াই মহারাজের দয়ালু হৃদয় পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইলে কাহাকেও বিমুখ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইত না। দুঃখ জানাইলেই মহারাজ অকাতরে গরিব বালকদিগের অশন বসন ও পাঠ্য-পুস্তকের ব্যয় ভার পর্য্যন্ত বহন করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। এমন কি যে সকল বালকের পরীক্ষার ফিয়ের টাকা পর্য্যন্ত সংগ্রহ হইত না, মহারাজ সমীপে অসমর্থতা জানাইলে মহারাজ অকাতরে তাহাদের সাহায্য করিতেন।

স্কুলটী কলেজে পরিণত হইবার পূর্ব্বে এনট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে অবস্থা ও পারদর্শিতানুসারে চারিটী ছাত্রকে এল এ, পড়িবার সাহায্যের জন্য যে চারিটী পাঁচ টাকার করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইত, এল, এ, ক্লাশ খুলিবার পর আর সে চারিটী বৃত্তির আবশ্যকতা রহিল না; কারণ বিনা বেতনে রাজ কলেজেই এল,এ, পড়া চলিতে লাগিল। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চারিটী পাঁচ টাকার বৃত্তি উঠাইয়া দিয়া এল, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে অবস্থা ও পারদর্শিতানুসারে দুইটী ছাত্রকে বি,এ পড়িবার সুবিধার জন্য দুই বৎসর কাল মাসিক দশ টাকা করিয়া বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইল। এইরূপে বর্দ্ধমান রাজকলেজ কেবল মাত্র স্থানীয় বালকদিগের নহে, নানা স্থানের শিক্ষার্থী দিগের উচ্চ শিক্ষার অশেষবিধ আশাতীত সুবিধার আকর হইয়া দাঁড়াইল।

স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষের প্রতি রোপণ কর্ত্তা যেরূপ আন্তরিক যত্নও স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, জনক-হৃদয়ে অকৃত্রিম অপত্য-স্নেহ-স্রোত যেরূপ সকল অবস্থাতেই সমভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে, অন্য কাহারও হৃদয়ে অবিকল সেরূপ পরম পবিত্র ভাবের উদ্রেক হওয়া সম্ভবপর নহে; ইহা একটী নৈসর্গিক নিয়মরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; আর হইলেও সেরূপ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। দুঃখের বিষয় এই, মহারাজ আপতাপচাঁদ বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তির পর হইতে কলেজটী একরূপ অনাথ হইয়া পড়িয়াছে। যেরূপ পিতৃমাতৃহীন শিশু কোনরূপে বাঁচিয়া থাকে, তাহার ভাবী উন্নতি যেরূপ সম্পূর্ণরূপ অন্যের ইচ্ছা, দয়া

অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে; আজ অনাথ রাজকলেজের অবস্থাও তদ্রূপ প্রায়। পূর্ব্বে অধ্যাপক নির্ব্বাচনের ভার এ বিষয়ের বিশেষ যোগ্যপাত্র শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের হস্তে ন্যস্ত ছিল; তাহাতে যে নির্ব্বাচন কার্য্য নিরপেক্ষভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত জ্ঞানবান হইয়া কে তাহা অস্বীকার করিতে সাহসী হইবেন! এখন সে ভাবের অভাব হইয়া পড়িয়াছে, সে উপাদেয় অবস্থার ব্যভিচার ঘটিয়াছে। ফলতঃ অধুনা কলেজ বিভাগে যেরূপ অধ্যপক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং যে প্রণালীতে সমগ্র কলেজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তাহা কৃতবিদ্য সাধারণের বিশেষ সন্তোষপ্রদ নহে, হইতেও পারে না।

কিন্তু এ অভাব ও তজ্জনিত দুঃখ এখন কাহাকে জানাইব, কেই বা তাহাতে কর্ণপাত করিবে। আমাদের একমাত্র ভাবী আশা ভরসার স্থল কুমার আপতাপ বিজয়চাঁদ বাহাদুর এখন অপ্রাপ্তবয়স্ক। বর্দ্ধমান রাজষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন; বহুদর্শী, কার্য্যকুশল, বিচক্ষণ, লোকপ্রিয়, দয়া-দাক্ষিণ্য গুণালঙ্কৃত, বিজ্ঞবর লালা বনবিহারী কপূর রাজষ্টেটের ম্যানেজার। সুতরাং আশা করি কোর্ট অব ওয়ার্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা স্থানীয় কমিসনর সাহেব বাহাদুর ও ম্যানেজার বনবিহারী বাবু কলেজটীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি সাধন হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

এখন কুমার আপতাপ বিজয়চাঁদ বাহাদুরই আমাদের একমাত্র আশা ভরসার স্থল। কুমার এখন শৈশবাবস্থায়; কিন্তু কি জানি কেমন করিয়া এখন হইতেই আমাদের মনোমধ্যে এইরূপ আশার সঞ্চার হইতেছে যে, মহারাজ বিজয়চাঁদ বাহাদুর কালক্রমে সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া পৈতৃক কীর্ত্তিকলাপ অক্ষুন্ন রাখিয়া তাহাদের উন্নতি সাধনে কদাপি পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমাদের একান্ত ভরসা, যথাসময়ে রাজকার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া পরম পবিত্র পৈতৃক কীর্ত্তি রাজকলেজটীর বর্ত্তমান অসম্পূর্ণতা দূরীকরণান্তর উহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম উপাধি লাভের অনায়াসারূঢ় সোপান স্বরূপে পরিণত করতঃ মহারাজ কুমার বিজয়চাঁদ বাহাদুর তদীয় রাজ্যাভিষেক মহোৎসব চিরস্মরণীয়, তাঁহার স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের মুখোজ্জ্বল, ও নিজ নাম প্রাতঃস্মরণীয় করিতে কিছুমাত্র ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন না।

শ্রীরজনীকান্ত কোঙার।

রত্নখনি।

৫০

নির্ম্মলী পাত্রস্থিত জলকে নির্ম্মল করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইলে, সেই জল বিশুদ্ধ হয়। সেইরূপ বিদ্যা জীবের সমুদয় অবিদ্যাকে নাশ করিয়া নিজে নষ্ট হইলে, সেই জীব বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ লাভ করে।

TIGHT BINDING

৫১

মহিষের মস্তকে একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট থাকে। মহিষ যখন জল মগ্ন হয়, তখন ঐ কীটগুলি উপরে ভিন্ ভিন্ করিয়া উড়িতে থাকে; মহিষ মস্তক উত্তোলন করিবামাত্র আবার উহারা মাথায় বসিয়া পড়ে। সেইরূপ অবিশ্বাসী পাপীরাও যতক্ষণ তীর্থক্ষেত্রে অবস্থান বা হরিনাম উচ্চারণ করে, ততক্ষণ পাপ তাহাদের শরীর হইতে অন্তর্হিত হয়, আবার পর ক্ষণেই পাপ আসিয়া উহাদের শরীর আক্রমণ করে।

৫২

সংসারী মানব অপেক্ষা গর্দ্দভও বুদ্ধিমান। গর্দ্দভের পৃষ্ঠে ভার চাপাইয়া দিলে সে অতি কাতর হয়; যেই সে ভারটী নামাইতে পায় অমনি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠে, আর সহসা ভার লইতে চায় না। শাস্ত্রকারেরা বলেন, "স্ত্রী পুত্র, ধন, রত্ন এ সকল মানবের পক্ষে ভার স্বরূপ।" সংসারাসক্ত মানব যতক্ষণ ঐ সকল ভার স্কন্ধে না লইতে পায় ততক্ষণ ব্যাকুল হইয়া বেড়ায় এবং যেই এক একটী করিয়া ভার স্কন্ধে উঠে অমনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকে। আবার যেই একটী ভার করিয়া যায় অমনি কান্দিয়া আকুল হয়; যতক্ষণ সেই ভারটী স্কন্ধে আসিয়া না উঠে ততক্ষণ আর কিছুতেই শান্ত হয় না।

৫৩

অর্দ্ধসের পা[illegible] যেমন একসের পদার্থ আঁটে না; সেইরূপ সামান্য ব্যক্তিকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিলে সে কিছুতেই উহা ধারণা করিতে সক্ষম হয় না।

৫৪

মনুষ্য অপেক্ষা জড় পদার্থে অধিক মহত্ত্ব লক্ষিত হয়। মধুপ্রবর্ত্তিকা স্বয়ং দগ্ধ হইয়াও অলোক প্রদান করতঃ নিস্বার্থ আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে; বৃক্ষ কর্ত্তিত হইলেও ছায়া হরণ না করিয়া আশ্রিত প্রতিপালকের চরম আদর্শ স্থানীয় হয়। আর মনুষ্য স্বার্থ পরিচালিত হইয়া কি জঘন্য কার্য্যই না করিতেছে? এই মনুষ্য আবার জ্ঞানের গর্ব্ব করিয়া থাকে!

৫৫

মোহান্ধ মানব সকল পশুর সমান। কুক্কুর যখন পুতি গন্ধময় অতি অপবিত্র মৃত দেহের অস্থি চর্ব্বণ করে, তখন সে সুধাপানে ফিরিয়া চায় না। মনুষ্যগণও সেইরূপ নিকৃষ্ট বিষয় ভোগে রত থাকিয়া আত্ম-তত্ত্ব অনুসন্ধানে রত হয় না।

৫৬

ধৈর্য্য যাঁহার পিতা, ক্ষমা যাহার জননী, শান্তি যাহার চির সঙ্গিনী, সত্য যাহার পুত্র, দয়া যাহার ভগিনী, মনঃসংযম যাহার ভ্রাতা, ভূমিতল যাহার শয্যা, দশদিকই যাহার বস্ত্র, তাহার কোন্ বিষয়ের অভাব?

৫৭

যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও বিষয়ের মায়া ত্যাগ করিতে পারে নাই, সে বনে গেলেও গৃহী। আর যে গৃহে থাকিয়াও অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করে, সে গৃহবাসী হইয়াও বনবাসী সন্ন্যাসী।

৫৮

স্বর্ণকে বারংবার অগ্নিদগ্ধ করিলেও তাহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয় না; ইক্ষুকে শত খণ্ড করিলেও সে তাহার মিষ্টত্ব হারায়

না; চকমকী প্রস্তরকে শতযুগ জলমধ্যে রাখিলেও তাহার অন্তরস্থ অগ্নির লোপ হয় না; চন্দন কাষ্ঠকে ছেদন করতঃ প্রখর রৌদ্র তাপে শুষ্ক করিয়া কঠিন শীলা পৃষ্ঠে ঘর্ষণ করিলেও তাহার সৌগন্ধ পরিত্যাগ করে না; সেইরূপ সাধু ব্যক্তিরা অশেষ যন্ত্রণা পাইলেও আপনার স্বভাব পরিত্যাগ করেন না।

৫৯

সত্যই যাঁহার ব্রত, সর্ব্বদা দীনেতে যাহার দয়া, কাম ক্রোধাদি যাহার বশীভূত, যিনি পরস্ত্রীতে বিরত, পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, ও দম্ভ মাৎসর্য্য হীন, স্তবকারী ও নিন্দাকারীকে যিনি তুল্যরূপে দর্শন করেন, তিনিই ত্রিলোক জয়ী।

৬০

জলের সহিত অগ্নির চিরবৈরিতা। কিন্তু কোন পাত্রকে তাহাদের মধ্যস্থ করিলে তাহার সাহায্যে ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত উভয় পদার্থ হইতে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রবল শত্রুদ্বয়ের মধ্যে যদি সৎ ব্যক্তি মধ্যস্থ হয়েন, তাহা হইলে তাহাদের পূর্ব্ব বৈরিতা নষ্ট হইয়া কল্যাণজনক হইয়া থাকে।

৬১

পতঙ্গ দাহ যন্ত্রণা জানে না বলিয়া অনলে পতিত হইয়া দগ্ধ হয়, মৎস্য লোভ প্রযুক্ত আত্মবিনাশকারী আমিষ সংযুক্ত বড়সী ভক্ষণ করিয়া প্রাণ হারায়। সেইরূপ আমরাও অবিদ্যা বশতঃ বিপদ সঙ্কুল বিষয় বিষে লোভ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হই। তবে আমরা জ্ঞানের গর্ব্ব করি-কেন?

৬২

আশা নামে এই যে প্রবলা নদী; ইহা মনোরথ জলে পরিপূর্ণা, তৃষ্ণাতরঙ্গে সমাকুলা; মোহের আবর্ত্তে সুদুস্তরা এবং অত্যুন্নত চিন্তাতটে নিতান্ত ভীষণা। তথায় বিষয়ানুরাগরূপ জলজন্তুগণ সর্ব্বদা বিহার করিতেছে; বিতর্করূপ বিহগকুল ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং উহার উত্তুঙ্গ তীরে ধৈর্য্যরূপ বৃক্ষ সকল স্রোতের বেগে সর্ব্বদা উৎপাটিত হইয়া পড়িতেছে। যিনি উহার পরপারে যাইতে পারেন তিনিই ধন্য।

৬৩

কুক্কুর হাজার চীৎকার করিলেও হস্তী সে দিকে ফিরিয়া চায় না, নদী অনবরত তরঙ্গাভিঘাত করিলেও এবং বর্ষাকালে মস্তকোপরি অবিরল ধারায় বৃষ্টি পতন হইলেও পর্ব্বত তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অকাতরে সহ্য করিয়া থাকে। সেইরূপ সাধু ব্যক্তিরা দুর্জ্জনের নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে সকলই সহ্য করেন।

৬৪

মৌমাছি যেমন নানাবিধ পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, জ্ঞানীগণও সেইরূপ সকল ধর্ম্ম হইতে সদ্ধর্ম্ম ও সকল শাস্ত্র হইতে সন্নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৬৫

প্রবল বৈকারিক [illegible]র যেমন পাকস্থলিতে [illegible]বিষ্ট [illegible]ারসোপম বিষ বড়িতে বিদূরীত হয়, সেইরূপ স্থিরচিত্তে দ্বি অক্ষর "হরি" নাম গ্রহণ করিলে অসীম পাপরাশি বিধ্বংস হইয়া যায়।

৬৬

দর্ব্বি পাক ক্রিয়া সাধন করিলেও নিরস হেতু উহা পাকরস গ্রহণ করিতে অক্ষম; কিন্তু জিহ্বা স্বয়ং পাক না করিলেও সরস বলিয়া সুস্বাদু পাকরস গ্রহণ করতঃ পরিতৃপ্ত হয়। সেইরূপ দাম্ভিক পণ্ডিত স্বয়ং শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী হইয়াও দাম্ভিকতা হেতু শাস্ত্রীয় পথে বিচরণ করিতে পারে না; কিন্তু বিনীত শ্রোতা স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়াও উক্ত পণ্ডিতের প্রমুখাৎ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শ্রবণ করতঃ ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া সুখী হয়।

৬৭

প্রসূতীর স্তনে জলৌকার মুখ সংলগ্ন হইলে, সে কেবল রুধির শোষণ করিয়া থাকে, কিন্তু শিশু সেই স্তনে প্রচুর দুগ্ধপান করিয়া তৃপ্ত হয়। সেইরূপ নিন্দুক ব্যক্তি যাহার নিন্দা ভিন্ন প্রশংসার বিষয় কিছুই খুঁজিয়া পায় না, সাধু ব্যক্তির মুখে তাহারই যশ ভিন্ন অযশের কথা শুনা যায় না।

৬৮

হাটে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন স্বাভাবিক স্বরে স্ব স্ব ক্রয় বিক্রয়ের কথা বলিলেও ভয়ঙ্কর গোলযোগ হইয়া থাকে। বাহিরের লোক মনে করে, হাটস্থিত ব্যক্তিগণের পরস্পর কলহ হেতু এবম্প্রকার গোলযোগ সমুত্থিত হইতেছে। সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যেও প্রত্যেক সাধু নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতা উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় বাকাবতণ্ডা দ্বারা স্ব স্ব মত সমর্থন করিয়া থাকেন, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের মধ্যে কোন বিরোধ না থাকিলেও বাহিরের লোক অর্থাৎ শাস্ত্রের তত্ত্বানভিজ্ঞগণ বুঝিবার দোষে ভ্রমে পতিত হইয়া অনর্থক শাস্ত্র নিন্দা করিয়া পাপগ্রস্ত হয়।

৬৯

চন্দ্র ষোলকলায় উদিত হইলেও, অসংখ্য তারকারাজি কিরণমালা প্রদান করিলেও, চতুর্দ্দিকে দাবানল প্রজ্বলিত হইলেও যেমন অন্ধকার রাশী সম্যক প্রকারে বিদূরীত হয় না; কিন্তু সূর্য্যের একটী ক্ষীণ রশ্মিতেই সমুদয় অন্ধকার রাশী নষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ বহুতর সাধনা, কঠোর তপস্যা, দানাদি বিবিধ সৎক্রিয়া দ্বারাও সম্যক প্রকারে পাপরাশি বিনষ্ট হয় না; কিন্তু স্থির চিত্তে একটীবার মাত্র মধুর হরিনাম উচ্চারণ করিলেই সমুদায় পাপান্ধকার বিধ্বংশ হইয়া যায়।

৭০

সাগর গর্ভে এবং পর্ব্বত গহ্বরে বহুমূল্য রত্নরাজি লোক চক্ষুর অগোচরে কিরণ মালা বিকীরণ করে, নির্জ্জন মরুভূমে সুগন্ধ কুসুম সমূহ অনাঘ্রাত হইয়াও সৌগন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে। সেইরূপ জগতে অসংখ্য সাধুপুরুষ লোক সমাজে অপরিচিত থাকিয়াও মানব লীলা সম্বরণ করিয়া থাকেন।

৭১

অঙ্গার যতক্ষণ অগ্নি মধ্যে থাকে, ততক্ষণ অগ্নির সহযোগ হেতু লোহিত বর্ণ ধারণ করে, পুনরায় অগ্নি হইতে বহির্গত হইলে স্বাভাবিক কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ অধার্ম্মিকেরাও যতক্ষণ সাধুর নিকট থাকিয়া সদুপদেশ শ্রবণ করে, ততক্ষণ তাহাদের পাপ কলুষিত চিত্ত পবিত্র হয়; যেই তাহারা সাধুসঙ্গ বর্জ্জিত হয়, অমনি পাপ আসিয়া তাহাদের চিত্ত পূর্ব্ববৎ কলুষিত করিয়া ফেলে।

ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয়েরই স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কিছুক্ষণের জন্য দূর হইতে নির্লিপ্তভাবে ভারতবর্ষের প্রতি এক দীর্ঘ বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, বোধ হয় যেন ঈশ্বরের কোন গূঢ় অভিপ্রায় সাধন জন্য অতি অদ্ভুত অমানবী কৌশল সকল চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া নানাভাবে কার্য্য করিতেছে। চক্ষু ফুটার জন্য ভারতবাসীর প্রতি অদূরদর্শী ইংরাজদিগের বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাব, বঙ্গবাসীকে ভারতরাজের চক্ষুশূল স্বরূপ বর্ণনা করিতে চাটুকারদিগের মিথ্যাবাদ, অতি নীচাশয় ফিরিঙ্গীদিগের দারুণ ঔদ্ধত্য ও ভারতবাসীর প্রতি নিষ্ঠুর প্রকৃতি, এংলোইণ্ডিয়ানগণের অতি জঘন্য পাশব অত্যাচার প্রভৃতি হৃদয় ভেদী দৃশ্যমধ্যেও জগদীশ্বরের এই সর্ব্বমঙ্গলময় অভিপ্রায়ের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। সহজ চক্ষে এই সমস্ত ব্যাপার বিরোধ ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইলেও তাহাদিগের সমষ্টি ও শেষ ফল যে অতি শুভ তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না। ভূমণ্ডলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠজাতি ও মনুষ্যত্বের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ নানাবিধ বর্ব্বর অসভ্যদিগের হস্তে অসংখ্যবার বিধ্বস্ত হইলেও যে "আর্য্য" নাম ও হিন্দুধর্ম্ম সংসার হইতে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা পরম সৌভাগ্য ও ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত আর কিসে সম্ভবে? আর এই রক্ষণকার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের পূর্ব্বগৌরব পুনঃ সংস্থাপন ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

অতি হীন দশাপন্ন মনুষ্য ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য কল্পনায় যে সমস্ত অলীক উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে, ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট পন্থা ও কার্য্যসমূহ সেরূপ কাল্পনিক নহে। ক্ষীণচক্ষু মনুষ্যের নিকট সেই সমস্ত উপায় অদৃষ্ট সত্য, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যকারিতার অপ্রতিহত শক্তিই তাহাদিগের সত্তার অতি জলন্ত প্রমাণ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতবর্ষ কত ভিন্নধর্ম্মী ভিন্নদেশীয় শাসনের অধীন হইয়া ক্রমাগত হীন হইতে হীনতর দশায় নিপতিত হইয়াছে। এতাবৎকাল মধ্যে তাহার দগ্ধ অদৃষ্ট কখনও ফিরিবে বলিয়া কাহার একবার কল্পনায়ও আশা হয় নাই। হঠাৎ "সাতসমুদ্র তের নদী পার" হইতে সামান্য কয়জন বণিক আসিয়া দিনকতকের মধ্যে ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া উঠিবে এবং নূতন শিক্ষায় দীক্ষিত করতঃ মুমূর্ষু ভারতদেহে নূতন প্রাণসঞ্চার করিবে, কে ইহা মনে করিয়াছিল? শতসহস্র বৎসরের অশেষ যন্ত্রণার পর ভারতবর্ষ যে ইংরাজশাসনে আসিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ঈশ্বর-অভিপ্রেত। কারণ ইংরাজরাজত্বে ভারতের নানাবিধ সৌভাগ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

কার্য্যপ্রণালীর পারিপাট্য অনুসারে জাতি সকল সংসারে উন্নত বা অবনত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রাচ্য জাতিদিগের কার্য্যপ্রণালী অপেক্ষা পাশ্চাত্যদিগের কার্য্য প্রণালী যে অধিকতর সুশৃঙ্খল ও সুবিধিবদ্ধ

BLEED THROUGH

তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। অভাবের তারতম্যে কার্য্যপ্রণালী পারিপাট্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে সত্য এবং ভারতবাসীর অপেক্ষা ইংলণ্ডীয়গণের অভাব অনেক পরিমাণে অধিকও সত্য; তথাপি যে ভারতবাসীর কার্য্যপ্রণালী, উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, ইংরাজী কার্য্যপ্রণালীর সহিত তুলনায়ও আসিতে পারে না, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। অলসপ্রকৃতি ভারতবাসী, জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র হইলেও, শ্রমশীল ইংরাজজাতির অনুগ্রহে কোন বিষয়েই বড় একটা বিশেষ অভাব বোধ করেন না এবং তজ্জন্য কোন ব্যবহার্য্য দ্রব্য বিষয়েই তাঁহার কিছুমাত্র অভাব নাই। একটী মাত্র টাকা খরচ করিলে তিনি তোফা একযোড়া কাপড় পরিতে পান; ছয় গণ্ডামাত্র পয়সা খরচ করিয়া তিনি বক্ষস্থলে দিব্য একসেট্ মুকুতাময়ী বোতাম্ ঝুলাইতে পারেন। তাঁহার অভাব কি? তাঁহার যাহা কিছু অভাব অর্থের।

কিন্তু একমাত্র অর্থাভাবে কখনও কার্য্যপ্রণালীর বা জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় না। ব্যবহার্য্য বস্তু সমূহের অভাববোধই প্রকৃত উন্নতির একমাত্র লক্ষণ। কারণ তাহাতে সমগ্র জাতিকে নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতে শিক্ষিত করিয়া প্রকৃতপক্ষে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলে। কেবলমাত্র অর্থাভাবে লোকে দাসত্ব প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি সমূহের বশবর্ত্তী হয়। [illegible]তাহাতে পরসাপেক্ষতা আদৌ দূর হয় না; কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুর অভাব হইলে নিজেই তাহা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়; সুতরাং তাহার ফল দ্বিবিধ। বর্ত্তমান অভাবমোচন, ও ভাবী অভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার যোগ্যতা। অর্থাভাবে কার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাভাবে কার্য্য ঠিক বালকদিগের অর্থ পুস্তক ও অভিধানব্যবহারের তুল্য। উভয়েরই অবস্থা ও ফলাফল অনুরূপ। অর্থপুস্তকের মতন অর্থাভাবজনিত কার্য্যে কেবল অধিকতর অলস ও পরসাপেক্ষ করিয়া তুলে। তাহাতে স্বাধীন বৃত্তি সমূহের কিঞ্চিন্মাত্রও বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং এবম্বিধ জাতির স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা বামনদিগের চন্দ্রস্পর্শ করিবার আশার মতন। একখানি কাপড়ের জন্য, একটী দেশালাইয়ের জন্য যে লোক পরমুখাপেক্ষী, সে কখন কি স্বাধীন রাজা হইতে পারে?

সমগ্র জাতি কর্ত্তৃক বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার একেবারে ত্যাগ ভিন্ন কোন দ্রব্যের অভাব বোধ করিতে চেষ্টা করা কেবল জোর করিয়া মাত্র। তাহাতে মুখে ভিন্ন কার্য্যতঃ কোন ফলই হয় না। জোর করিয়া বিদেশ জাত দ্রব্য ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারা যায়; কিন্তু জোর করিয়া অভাব বোধ হয় না। হঠাৎ একেবারে বিদেশীয় দ্রব্য সকল ত্যাগ করিলে কিছু কষ্ট হয় সত্য, কিন্তু এইরূপ কষ্টই প্রকৃত উন্নতির পূর্ব্ব লক্ষণ। কারণ এইরূপ কষ্ট বোধ দ্বারাই লোকের কার্য্যক্ষমতা জন্মায় এবং এই কার্য্যক্ষমতাই জাতীয় উন্নতির মূলাধার।

ব্যবহার্য্য বস্তু বিষয়ে স্বাধীন হইবার আবশ্যকতা ভারতবাসী এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। সুতরাং যাহাতে শীঘ্র স্বয়ং রীতিমত কার্য্যক্ষম হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আমাদিগের পক্ষে এক্ষণে

নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং রীতিমত কার্য্যক্ষম হইতে হইলে কার্য্য প্রণালী শিক্ষা ও বিধিবদ্ধ করা অগ্রে আবশ্যক। ভারতবাসীর মতন পরাধীন ও পরসাপেক্ষ জাতির পক্ষে এরূপ বিধিবদ্ধ কার্য্য নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ বস্তুর অভাব বোধ ও এইরূপ উদ্যম তাঁহাকে জোর করিয়া করিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় কোন কার্য্যক্ষম জাতির কার্য্যপ্রণালী শিক্ষাই একমাত্র উপায়। আধুনিক সময়ে ইংরাজ জাতি কার্য্য শাস্ত্রে যথেষ্ট বুৎপন্ন ও সমধিক কার্য্যতৎপর। সুতরাং ইংরাজদিগের কার্য্যপ্রণালী, শিক্ষা করাই আমাদিগের পক্ষে এক্ষণে হিত, কারণ তাহাতে আমাদিগের সুবিধাও অধিক। আর্য্যদিগের কার্য্যপ্রণালী যে আদৌ কার্য্যকরী নয়, তাহা নহে। বহুদিনের অব্যবহার প্রযুক্ত তাহা আমাদিগের স্মৃতি হইতে একপ্রকার বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে এবং তাহার পুনরুদ্ধার কল্পনা সাহায্য ব্যতীত অন্য উপায়ে সম্ভব নহে; সুতরাং তাহা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট হইলেও কাল্পনিক বলিয়া লোকে তাহার তত আদর করিবে না। অতএব চক্ষের উপর জ্বলন্ত আদর্শ ইংরাজপ্রণালী ত্যাগ করিয়া আর্য্যপ্রণালীর পুনরুদ্ধার আমাদিগের পক্ষে এক্ষণে যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ তাহাতে বিলম্ব হইবে। এখন প্রাণপণে কার্য্য করিবার সময়; বৃথা কালক্ষয়ের সময় নহে। কার্য্যবিষয়ে ইংরাজ আমাদিগের যোগ্যতম শিক্ষক জানিয়াই, বোধ হয়, ঈশ্বর ইংরাজকে ভারতবর্ষের একাধিপতিত্ব প্রদান করিয়াছেন। অন্ততঃ আমাদিগের এইরূপ বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য। কারণ সকল সময়েই যিনি স্বকার্য্যসাধনে সুবিধা করিয়া লইতে পারেন, তিনি যথার্থ বুদ্ধিমান। কার্য্যসাধনের জন্য কালভেদ বশতঃ বিদেশীয়ের কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করায় পাপ বা অপমান নাই। বোধ হয় ইংরাজি ভাষা শিক্ষার আবশ্যকই এইটুকু। ইংরাজী শাস্ত্র পাঠে ত আর আমাদিগের পরমার্থিক কোন লাভ নাই ও আমাদিগের তদ্বিষয়ে কোন আশা, ইচ্ছা বা প্রয়োজনও নাই। বিদ্যার "অর্থকরী" আখ্যা ইংরাজীচর্চ্চা হইতেই হইয়াছে। রাজভাষা বলিয়া সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভই আমাদিগের ইংরাজী শিক্ষার আদি ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

সুতরাং ইংরাজীশিক্ষা আবশ্যক এবং ভারত বাসী ইহা জানেনও। চতুর্দ্দিকে সংখ্যাতীত স্বাধীন বিদ্যালয়গুলি দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। জনৈক সুপ্রসিদ্ধ রাজপুরুষ কোন সময় আমাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য রাজভাণ্ডার হইতে অর্থ ব্যয় করিতে যে একবার অনিচ্ছার আভাস দিয়াছিলেন, একভাবে ধরিলে তাহা নিতান্ত অন্যায় বা আশঙ্কার কারণ নহে। ইংরাজী শিক্ষার উপযোগিতা ও আবশ্যক সম্বন্ধে এক্ষণে আমাদিগের যেরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টসাহায্য বন্ধ হইলেও ইংরাজীশিক্ষা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইবে না। কোন বিষয় প্রথম আরম্ভ করিবার সময়ই [illegible] সাহায্যের আবশ্যক। একবার তাহাতে লোকের মন আশানুরূপ নিবিষ্ট হইলে রাজসাহায্য থাকা আর উচিত নহে। সদৃশবিধান চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন কোন ঔষধের মতন; কার্য্য

BLEED THROUGH

আরম্ভ হইলে রাজসাহায্য উত্তরোত্তর প্রদানে অনেক সময় উপকার না হইয়া অপকার হইয়া থাকে।

তথাপি শিক্ষাসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের একেবারে হাত গুটাইয়া লইলে চলিবে না। বঙ্গদেশ ত এখনও সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যে ভাবে শিক্ষাপ্রদান হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কাল্পনিক পাণ্ডিত্য ব্যতীত শিক্ষার্থীদিগের অন্য কোন লাভ হয় নাই। লোকের সাংসারিক বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইয়া অনবরতঃ কাল্পনিক পুস্তক পাঠে বরঞ্চ তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। যে সমস্ত বিদ্যায় লোকের সাংসারিক বুদ্ধির বিকাশ প্রাপ্ত হয়, গবর্ণমেণ্ট এখন সেইদিকে মনোযোগী হইলে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে। বৃথা গর্ব্ব ও অভিমান বৃদ্ধিকারী উচ্চশিক্ষার আদর এক্ষণে কমাইবার আবশ্যক হইয়াছে। রাজসাহায্য বন্ধ হইলে ক্রমে আপনা হইতেই এইরূপ হইয়া দাঁড়াইবে এবং এইরূপ হওয়াই উচিত। সভ্যতায় সর্ব্বাগ্রণী ও সাংসারিকতার আদর্শ বিচক্ষণ আমেরিকীয়গণ মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত। তথায় উচ্চশিক্ষার জন্য সাধারণ রাজসংসার হইতে কোনরূপ উৎসাহ প্রদত্ত হয় না। যাহার ইচ্ছা হয় নিজেই তাঁহাকে প্রায় সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হয়। কল্পনার লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষে কাল্পনিক ভাবের কিছুমাত্র অভাব নাই; সুতরাং কাল্পনিক শিক্ষা যত এখানে বদ্ধ হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। এখানে কার্য্যেরই সমধিক অভাব। যাহাতে লোকের কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সেই সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন করাইতে পারিলে ভারতরাজ বাস্তবিকই আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

শ্রীমগেন্দ্রনাথ বাকৃচি।

বাল্য বিবাহ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

শ্রাবণ সংখ্যার প্রতিনিধিতে বাল্য বিবাহের কেবল এক অংশ মাত্র আলোচিত হইয়াছিল। ইহার অপরাংশ—বালিকা বিবাহ এখনও অস্পৃষ্ট এবং অনালোচিত। ইহা যে সমধিক লাভাবহ নহে এমত আমরা বিবেচনা করিতে পারিনা। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি এতই বিরোধী যে, তাহাদের সুমীমাংসা করা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং এস্থলে সেই সমস্ত শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য যাহা যুক্তি এবং দেশ কালাদির অনুকূল। আরও, তিন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল বিধি ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনেও যে, সে গুলি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতে হইবে এমত কোন কথা নাই, এবং সেই সকল মহানুভব

শাস্ত্রপ্রণেতাদিগেরও তাহা কখন অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাঁহারা যদি এ শতাব্দীতে বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে বোধহয়, এতদিন শাস্ত্র সকলের পুনঃসংস্কার হইয়া যাইত। যাহাই হউক, আমরা শাস্ত্র এবং যুক্তি এই দুয়ের অনুসরণ করিয়া দুই চারিটি কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সপ্তম হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বালিকার বিবাহ কাল। তন্মধ্যে আট হইতে বার পর্য্যন্ত প্রশস্ত; ইহার অধিক বা অনধিক অপ্রশস্ত। সপ্তম বর্ষের কথা স্পষ্টাক্ষরে কোন স্থানে উল্লিখিত না থাকিলেও মহর্ষি মনুর,

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায়
বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ
কন্যাং দদ্যাদ্যথাবিধি॥

এই শ্লোকের অর্থে কুল্লুক্ ভট্ট বলিয়াছেন যে, সর্ব্বতোভাবে যোগ্য পাত্র পাইলে অষ্টম বর্ষের পূর্ব্বে অর্থাৎ সপ্তম বর্ষেও কন্যা সম্প্রদান করিতে পারা যায়।

আবার পক্ষান্তরে অজাতপুষ্পা ষোড়শ বর্ষীয়াকেও বিবাহ করিবার বিধি শাস্ত্রে পাওয়া যায়। যথা;—

ত্রিংশবর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং
বিন্দেত নগ্নিকাং।

সুধু অজাতপুষ্পা কেন, সঞ্জাতপুষ্পাকেও উপযুক্ত বরাভাবে আমরণ অনূঢ়া রাখিবার বিধি মহর্ষি মনুই প্রদান করিয়াছেন। যথা;—

কামমারণাতিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

এই শ্লোকদ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উপযুক্ত পাত্র না পাইলে রজস্বলা কন্যাকে অবিবাহিতা রাখা আমাদের সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্রকারের অনভিপ্রেত নহে। অর্থাৎ মহর্ষি মনুর নিকট রজোদর্শনের পূর্ব্বে কন্যা সম্প্রদান একটা অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল না। যাহাই হউক এগুলি ভাবতঃ প্রশস্ত বিধি না হইলেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বালিকা বিবাহের প্রতিকূলতা না করিলেও, কোন অংশে পুষ্পিতা রমণীর বিবাহ দ্বেষী নহে; বরং প্রকারান্তরে তাহার প্রশ্রয় দাতা। যথা;—

অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥

অর্থাৎ যদি অনূঢ়াবস্থায় পুষ্পবতী হইয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করিয়া, কোন কন্যা স্বয়ং কাহাকে পতিত্বে বরণ করে, তাহা হইলে কন্যাকেও কোন পাপস্পর্শ করেনা এবং যে ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করে তাহারও কোন দোষ হয় না।

প্রশস্ত অপ্রশস্ত কাল সম্বন্ধে এখানে আর একটী কথা বলিবার আছে। শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মণদিগের উপনয়নের মুখ্য কাল অষ্টম বর্ষ এবং তৎপরে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণ অর্থাৎ অপ্রশস্ত কাল। কিন্তু সচরাচর আমাদের দেশে এই উপনয়ন সংস্কার কত বয়সে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, শতকরা দশজন ব্রাহ্মণও অষ্টম বর্ষে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হয় না। তবে কি এই শতকরা নব্বই বা ততোধিক ব্যক্তি ধর্ম্মে পতিত?

সত্যবটে পরাশর প্রমুখ কয়েকজন শাস্ত্রকার।

"প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে
যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ
পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম॥

ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা দ্বাদশ বর্ষেও কন্যা সম্প্রদানে উদাসীন পিতার পাপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে পাঠক মহাশয়ের স্মরণ করা উচিত যে, এই পরাশরই বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক এবং বিধানদাতা। সর্ব্বজনপরিচিত সেই

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে
ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং
পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

শ্লোকটী পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহারই সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। যখন সেই মহাত্মা তাঁহার অকাট্য যুক্তিবলে, অপরিসীম শাস্ত্র জ্ঞানে, এবং অভ্রান্ত ভাষার দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, পরাশর বিধবা বিবাহের বিধান দাতা তখন আমরা সকলেই সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলাম—বলিলাম পরাশরের কথা অগ্রাহ্য। কেহ বলিল পরাশর আধুনিক, কেহ বলিল পরাশরের বিধি সাধারণের প্রতি প্রযোজ্য নহে, কেহ কেহ আবার শ্লোকের নানারূপ বিকৃত অর্থ ঘটাইয়া ফেলিলেন। যাহাই হউক যখন আমরা সে দিন তাঁহার বিধবা বিবাহের ব্যবস্থাটী পরিত্যাগ করিয়াছি তখন আজ কোন মুখে তাঁহার বালিকা বিবাহের বিধানটী লোক সমক্ষে ধারণ করি? মহানুভব পরাশর বাল্য বিবাহের বিধি সংস্থাপন করিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, ইহার দ্বারা বালবৈধব্যের আধিক্য ঘটিবে এবং সেই জন্যই প্রতিবিধানস্বরূপ বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক এবং পুরাতত্ত্বাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন যে, বাল্য বিবাহ আমাদের চিরপ্রচলিত পদ্ধতি নহে, মুসলমান রাজ্যের প্রারম্ভে ইহার সূত্রপাত। প্রকৃতপক্ষে দময়ন্তী, সাবিত্রী, শকুন্তলা, মালতী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যনারীদিগের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে সকলকেই বলিতে হইবে যে প্রাচীন কালে পূর্ণযৌবনা কুমারীর বিবাহ অশাস্ত্রীয় বা নিন্দার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত না। আরও গৃহ্যসূত্রাদি পাঠে বেশ বুঝা যায় যে, তৎকালে যৌব-বিবাহই প্রচলিত ছিল। তাহা না হইলে আশ্বলায়ণ গৃহ্যসূত্র হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ টুকুর ভাবার্থের কোনও সংগতি হয় না।

সংবৎসরং বৈক ঋষির্জায়তে ইতি॥

ইহার টীকায় গর্গ নারায়ণ বলিতেছেন, বিবাহাদারভ্য এতে নিয়মা ভবন্ত্যভয়োঃ। সংবৎসরং বা নিয়তৌ স্যাতাং এক ঋষি কল্প পুত্রো জায়তে ইতি। অর্থাৎ বিবাহের পর দম্পতি যুগল যদি এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে তবেই ঋষি তুল্য পুত্র লাভ করিতে পারে।

এই নিষেধ বাক্যের দ্বারা বেশ প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে যৌব বিবাহেরই প্রচলন ছিল; কেন না বিবাহের সময় রমণীর সহবাস-যোগ্য অবস্থা না হইলে

এরূপ নিবৃত্তি সূচক বচনের কোনও প্রয়োজন থাকিত না। অতি বাল্যে বিবাহের নিয়ম থাকিলে কে আর ব্রহ্মচর্য্যের বিধি করিত?

এক্ষণে দেখা গেল যে, যৌব বিবাহ কোন অংশে অশাস্ত্রীয় নহে। বাল্য বিবাহ ও যেমন শাস্ত্রসঙ্গত ইহাও তদ্রূপ। ফলতঃ কামধেনুরূপ হিন্দু শাস্ত্রে যাহা অনুসন্ধান করা যায় তাহাই পাওয়া যায়। বাল্য বিবাহের কি স্বপক্ষে কি বিপক্ষে যখন যাহা আবশ্যক অগাধ হিন্দু শাস্ত্র তখন তাহাই প্রদান করিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে যৌব বিবাহের সমর্থন-পক্ষে প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। নয় দশ বৎসরে কন্যা সম্প্রদান যে অবশ্যকর্ত্তব্য নহে, ইহাই প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য। এবং সে উদ্দেশ্য, বোধ হয়, সংসাধিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে বাল্য বিবাহ আধুনিক প্রথা। মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেই এই কুৎসিত প্রথা ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, যবন সম্রাটগণ প্রায়ই ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন; রাজপুত ললনা বা অপর জাতীয় হিন্দুরমণীর সৌন্দর্য্য সৌরভের আঘ্রাণ পাইলে, পাশব শক্তির সাহায্যেই হউক আর অর্থ দ্বারা কন্যার পিতা মাতার সম্মতি ক্রয় করিয়াই হউক, তাহার পাণিগ্রহণ করিত। এই প্রকারে কত শত রাজপুতবংশ চিরকালের জন্য দুরপনেয় কলঙ্ক সাগরে প্রোথিত হইয়াছে! কত শত উচ্চ এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবার পরম্পরাগত বংশমর্য্যাদায় বিচ্যুত হইয়াছে! কত শত অবলা যবন স্পর্শের ভয়ে অকালে চিতাশয্যায় আরোহণ করিয়া পিতৃকুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছে!

এই ভীষণ অত্যাচারে হিন্দুসমাজ ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য স্থানে গতিবিধি একেবারেই বন্ধ হইল, পোষাক পরিচ্ছদের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল এমন কি গৃহের বাহিরে স্ত্রীলোকের নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। রূপবতী কন্যা ভূমিষ্ট হইলেই লোক সশঙ্কিত হইয়া উঠিত; যাহাতে তাহার রূপজ্যোতি জনসমাজে বিকীর্ণ না হয়, যাহাতে সে যবন রাজার মন আকর্ষণ করিবার পূর্ব্বে বিবাহিত হয়, তাহাই লোকের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। কন্যার একবার বিবাহ দিতে পারিলেই এ বিপদের আশঙ্কা কতকপরিমাণে ঘুচিয়া যায়। তাহার স্বামী বা শ্বশুর কুলের উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে। সুতরাং কন্যা বয়স্থা হইবার পূর্ব্বেই লোকে বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইত। এইরূপেই বাল্য-বিবাহের সৃষ্টি এবং এইরূপেই অবরোধ প্রথার প্রথম সূত্রপাত।

বিবাহ মনুষ্য জীবনের একটী প্রধান ঘটনা। ইহার উপর মানব জীবনের সুখ-দুঃখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বালিকারা যে সময়ে ইহার কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ হয় তখন তাহারা বিবাহ কি এবং কোন্ উদ্দেশ্য সংসাধন হেতু ইহার প্রয়োজন তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারে না। আট, নয় কিম্বা দশ বৎসরে বালিকাদের কি কোন জ্ঞান সম্ভবে? কিন্তু এই সময়েই তাহাদিগকে জননীর ক্রোড় হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্বশুরালয়ে অদৃষ্টপূর্ব্ব, অপরিচিত পরিবারের মধ্যে প্রেরণ করা হয়। বালস্বভাব সুলভ চপলতা, ঔদ্ধত্য এবং আবদারাদি বিসর্জ্জন দিয়া অনভ্যস্ত আচার ব্যবহারের বশ্যতা স্বীকার করা কতদূর কষ্টকর তাহা যিনি কোন নবোঢ়া বধূর বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন। সত্য বটে বালবধূ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর অনাদরের সামগ্রী নহে, সত্য বটে তাহার আহার পরিচ্ছদাদির জন্য সকলেই যত্নবান হন তাহাতে কি হয়? বালিকার স্বভাব সংস্কার কি, কোন্ কোন্ খাদ্যে তাহার রুচি, কোন্ রূপ বস্ত্রে তাহার আসক্তি তাহা ত কেহ জানে না। বধূ স্নেহের পুত্তুল হইলেও তাহাকে সামাজিক নিয়ম প্রতি পালন করিতে হইবে। লজ্জাশীলা হইয়া অনবরত আপাদ মস্তক আবৃত রাখিতে হইবে, মৃদু মধুরস্বরে বাক্য স্ফূর্ত্তি করিতে হইবে, দৃষ্টির চঞ্চলতা রোধ করিতে হইবে, এমন কি নড়ন চড়ন পর্য্যন্ত নিয়ম পরিচালিত করিতে হইবে। ফলতঃ যে কয়দিন বালিকা এই অবস্থায় থাকে সে কদিন তাহাকে এক প্রকার কারাগার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

কেহ কেহ আবার বলেন, বাল্য কালে বিবাহ না হইলে রমণী শ্বশুর কুলের পোষ মানে না। এই অসার অপদার্থ কথার উত্তর আশ্বিন সংখ্যার প্রতিনিধিতেই প্রদত্ত হইয়াছে। আর রমণীদিগকে গৃহপালিত পশুপক্ষীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া যিনি বাল্য বিবাহের দ্বারা পোষ মানাইবার বিধি দেন তিনিই প্রকৃত আর্য্য পদবীর উপযুক্ত! প্রাচীন কালে যখন দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রভৃতি পুণ্যশীলা রমণীগণ যৌবনে বিবাহিতা হইয়া স্বামীগৃহে গমন করিতেন তখন কি তাঁহারা তত্রস্থ গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনে ত্রুটী করিতেন? যৎকালে ভারতে স্বয়ম্বর প্রথার প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন কি যুবতীগণ শ্বশুর কুলের পোষ মানিতনা? এখন ত বাল্য বিবাহ! খুব প্রচলিত, তবে কেন শুনিতে পাই বধূগণ শ্বশুর! শ্বাশুড়ীর প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধা ভক্তি করেনা? না পোষ মানার অপবাদটা পূর্ব্বাপেক্ষা বরং আজি কালিকার দিনে বেশী খাটে। ফল কথা শ্বশুর কুলের প্রতি যত্ন আনুগত্য, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, এ সমস্তই শিক্ষা সাপেক্ষ। পুত্র কন্যাকে সুশীল সচ্চরিত্র করিতে চাও, নীতি শিক্ষা দাও। বিবাহ দিয়া পোষ মানাইতে পারিবে না।

বাল্য বিবাহ হইলেই স্বামী সহবাস অন্ততঃ স্বামী সহ এককক্ষে এক শয্যায় শয়ন, একপ্রকার প্রচলিত দেশাচার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে যে সকল অনিষ্ঠ সংঘটিত হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অনেক অবলা বালিকাকে নরাকার পশুর হস্তে পড়িয়া অকালে জীবন গ্রন্থি ছিন্ন করিতে হইয়াছে। কতশত প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুম পশ্বাচারী পতির পশুপ্রবৃত্তির সন্তোষ সাধন করিতে গিয়া আজীবন নানা রোগে প্রপীড়িত হইয়া অবশেষে স্বামীগুরুর পদপ্রান্তে জীবন উৎসর্গ করিতেছে। কেহবা ইতিমধ্যে সসত্বা হইয়া সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই জীবলীলা সাঙ্গ করিতেছে। কাহাকেও বা জীবনাপেক্ষা প্রিয়তর লজ্জা রত্নে জলাঞ্জলি দিয়া ডাক্তারদিগের অস্ত্র চিকিৎসার অধীনত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। এরূপ ঘটনা যে কতশত ঘটিতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

কিন্তু এখন এ সকল বিষয় আলোচনা করা অনাবশ্যক। সম্মতি আইনের দ্বারা এ পশ্বাচার কতক পরিমাণে উপশমিত হইবার সম্ভব হইয়াছে।

এই অবসরে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যাঁহারা কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দেন, তাঁহারা কি এই কুৎসিত দেশাচারে শাস্ত্রের অবমানমা দেখিতে পান না? অপ্রাপ্তপুষ্পা বালিকাভিগমনের পাপস্রোতে দেশ প্লাবিত হইতেছে তাহা কি তাঁহারা একবারও ভাবিয়া থাকেন? ইহা যে গুরুতর পাপ তাহা বোধ হয় অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম নাই। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন;—

রেতঃসেকঃ স্বযোনীযু কুমারীষন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ॥

অর্থ—স্ববংশজাতা স্ত্রী, অজাতপুষ্পা বালিকা, অন্ত্যজাতীয়া স্ত্রী, বন্ধুপত্নী এবং পুত্রবধূর অভিগমনে গুরুপত্নী অভিগমনের সমান পাপ। ইহার আবার প্রায়শ্চিত্ত কি শুনুন;

গুরুতল্প্যভিভাষ্যৈম-
স্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে।
শূর্ম্মীং জ্বলন্তীঞ্চাশ্লিষ্যেৎ
মৃত্যুনা স বিশুধ্যতি॥

স্বয়ং বা শিশ্নবৃষণাবুৎকৃত্যাধায় চাঞ্জলৌ।
নৈঋতিং দিশমাতিষ্ঠেদানিপাতাদজিহ্মগঃ॥
খট্বাঙ্গী চীরবাসা বা শ্মশ্রুলো বিজনে বনে।
প্রাজাপত্যঞ্চরেৎ কৃচ্ছ্রমব্দমেকং সমাহিতঃ॥

[illegible] ১১। ১০৪॥

অর্থাৎ প্রথমে নিম্নমুখে সেই অভিগমনের কথা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে। তার পর লৌহময় তপ্ত শয্যায় শয়ন করিয়া জ্বলন্ত লৌহময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিতে করিতে মরিতে হইবে। অথবা অস্ত্র দ্বারা স্বহস্তে নিজ লিঙ্গ এবং অণ্ডকোষ ছেদন করিয়া তাহা হস্তে লইয়া যতক্ষণ মৃত্যু না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত নৈঋত কোণাভিমুখে গমন করিতে হইবে। আর যদি রেতঃসেক না হইয়া, আলিঙ্গনাদি পর্য্যন্তই শেষ হয়, তাহা হইলে খট্বাঙ্গধারী চীরবাসা এবং শ্মশ্রুলোমাদি যুক্ত হইয়া এক বৎসর কাল বিজন বনে থাকিয়া বহু আয়াস সাধ্য প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিতে হইবে।

অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের ও শাসন বাক্য এইরূপ। অপ্রাপ্তপুষ্পা বালিকা সহবাস সকল শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ এবং ঘৃণিত। কিন্তু তথাপি এই অধঃপতিত হিন্দু সমাজে এই পাপস্রোত প্রতিনিয়তই প্রবাহিত। ইহা যে অশেষ অনিষ্টের মূল, ইহাতে যে হিন্দুসন্তানের ক্রমশঃ অধঃপাত ঘটিতেছে তাহা কয়জনে বিশ্বাস করে? সেই জন্যই আবার নূতন করিয়া ইহার অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিতে হইতেছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বিবাহের যোগ্যাযোগ্য কাল নিরূপণ করিতে গিয়া বালিকাভিগমনের কথা কেন আসিল? ইহার উত্তরে আমি এই বলিব যে, দেশ প্রচলিত সেই কদাচার নিবারণই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। বাল্য বিবাহই এ পাপস্রোতের প্রস্রবণ, সুতরাং বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে উহার অশাস্ত্রীয়তা এবং ঘোর পাতিত্যের উল্লেখ কোন মতেই অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে না। বাল্য বিবাহের দ্বারা

যত প্রকার অনিষ্ট হয়, বালিকাভিগমন তাহাদের শীর্ষস্থানীয়।

যে মরিবার সে মরিবে, বৈধব্য যাহার বিধিলিপি কে তাহার দুঃখ খণ্ডাইবে? এই সকল কথা আমরা বাল্যকালেও শুনিয়াছি এবং এখনও শুনিতেছি। ইহার ভিতর সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিনা। অদৃষ্টবাদীরা ইহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে থাকুন, বিধবারা ইহার দ্বারা মনস্তুষ্টি উপভোগ করিতে পারে করুন এবং উপায়ান্তর বিহীন তাহাদের হতভাগ্য পিতা মাতাগণ এই ভাবিয়া শান্ত হইতে পারেন হউন, আমরা কিন্তু কখন বলিব না যে, ইহার কোন প্রতীকার নাই। বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিলেই বিধবার সংখ্যা কমিয়া যাইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। মনে করুন যদি ভারতবর্ষের সমস্ত লোক একমত হইয়া তের বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না দেয়, তাহা হইলে কি দশ বার বৎসরের বিধবারা দেশ হইতে একে বারে অন্তর্হিত হইবেনা? জগতে বিস্তর হতভাগিনী বার বৎসরের পূর্ব্বে বিধবা হইতেছে এবং বিস্তর বিবাহিত পুরুষও এক বিংশ বর্ষের পূর্ব্বে মানব লীলা সম্বরণ করিতেছে। আর এ কথা সকলেই জানেন যে, বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে মানবের মরণ শীলতা যত বেশী বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বে আর কোন বয়সেই [illegible]ত নহে। সুতরাং এ বয়স উত্তীর্ণ না হইলে কোন বা[illegible]বই বিবাহ দেওয়া বিধেয় নহে।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় লহরের জল ব্যবহার ছিল, যখন রাজপথের পার্শ্বে দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা বিরাজ করিত, এবং প্রত্যেক গলি এবং প্রত্যেক রাস্তা আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ থাকিত, যখন পচা মৎস্যের গন্ধে হাট বাজারে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইত, যখন প্রাতঃকালে বাহির হইলেই নাসিকা রন্ধ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিতে হইত তখনকার স্বাস্থ্যে এবং এখনকার স্বাস্থ্যে একবার তুলনা করুন, বুঝিবেন মনুষ্য চেষ্টার ফল আছে কি না। জল বায়ু এবং খাদ্য এই ত্রিবিধ বস্তুর কদর্য্যতা নিবন্ধন এই কলিকাতাই তখন অস্বাস্থ্যের প্রিয় ভূমি ছিল। বসন্ত বিসূচিকা বারমাসই কলিকাতার ভার লাঘব করিত, জ্বরাসুরের দুর্দ্দান্ত প্রতাপে নিমতলা প্রভৃতি স্থান অহর্নিশি হরি ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত। এখন আর সে দিন নাই; মিউনিসিপালিটীর অনুগ্রহে ছয় লক্ষ লোকের আবাস ভূমি মহানগরী কলিকাতাও স্বাস্থ্যকর স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশ দেশান্তর হইতে রোগীগণ স্বাস্থ্যের জন্য কলিকাতায় ছুটিতেছে। ইহা দেখিয়াও কি "যৎ ভবেৎ তৎ ভবিতব্য" শ্রেণীর লোকে বলিবেন যে, যে মরিবার সে মরিবে, বৈধব্য যাহার বিধিলিপি কে তাহার দুঃখ খণ্ডাইবে?

বংশ পরম্পরার অবনতি বালিকা বিবাহ রূপ বিষ বৃক্ষের অন্যতম ফল। কিন্তু প্রথম প্রস্তাবেই এ বিষয়ের কথঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনর্বিচার দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গালার ব্যবস্থাগুরু রঘুনন্দন শরীর তত্ত্বাভিজ্ঞ প্রাচীন ঋষি সুশ্রুত প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, ষোড়শ বর্ষই গর্ভা-

ধানের প্রশস্ত সময়। ইহার পূর্ব্বে গর্ভসঞ্চার হইলে প্রায়ই ভ্রূণ গর্ভে বিনষ্ট হয়; আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে সন্তান অল্পায়ু, রুগ্ন এবং দুর্ব্বল হয়। তথাপি যে প্রথম ঋতুতেই গর্ভাধারণের ব্যবস্থা কোন কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় লোকাভাবই তাহার প্রধান কারণ। আভ্যন্তরিক বিপ্লব অথবা অন্য কোন দৈব দুর্বিপাকে প্রজাক্ষয় হওয়াতেই এরূপ বিধি শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিবে। মধ্যে মধ্যে সকল দেশে সকল সময়ে সকল জাতির মধ্যেই এরূপ সাময়িক ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ট্রয় যুদ্ধের সময় যখন প্রাচীন সুসভ্য গ্রীষরাজ্য পুরুষ শূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন ইহা অপেক্ষা শত গুণে অনৈতিক কার্য্য রাজাজ্ঞায় সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেবল ভারতেই সাময়িক বিপর্য্যয় চিরস্থায়ী থাকে। এখন প্রজার অভাব নাই, তথাচ প্রজাবৃদ্ধির বিধি সেইরূপই বলবতী।

যাঁহারা বলেন প্রথম পুষ্পোদ্গমেই সহবাস শক্তি প্রাদুর্ভূত হয় এবং গর্ভধারণের ক্ষমতা জন্মে, তাঁহাদিগকে আর একটী কথা শুনিতে অনুরোধ করি। কিন্তু তাহারা যদি "বঙ্গবাসীদলের" লোক হয় এবং অনূঢ়া একাদশ বর্ষীয়া হিন্দু বালাকে অট্টহাসি হাসিয়া রাস্তায় রাস্তায় রতি খাঁ[illegible]ঞা" রূপ অপবাদে কলঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত না হয় তাহা হইলে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। তাহা না হইলে বলিতাম যে, যেমন দন্তোদ্গম হইলেই চর্ব্বনশক্তি হয় না, তেমনি ঋতূদ্গম হইলেই সহবাস-শক্তি জন্মায় না।

বাল্য বিবাহের অনুকূল প্রতিকূল উভয় দিকই প্রদর্শিত হইল। কিন্তু দেখিলাম কি? দেখিলাম যে ইহার দ্বারা উপকার অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনা অধিক। আরও দেখিলাম যে, শাস্ত্র অপেক্ষা দেশাচারেই ইহার ভিত্তি অধিক প্রোথিত। অতএব যদি আমাদের কিছুমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে, যদি আমরা পুত্র কন্যার হিতাকাঙ্ক্ষী হই, যদি বংশ পরম্পরার অবনতি-রোধ আমাদের হৃদয়ের বাসনা হয়, যদি আমরা প্রকৃত আর্য্যনামের গৌরব রক্ষা করিতে চাই, আইস সকলে মিলিয়া এই সমাজ কালিমা অপনোদন করিতে চেষ্টা করি। অবশ্য আমরা বলিনা যে, একেবারে সমাজ বিপ্লব উপস্থিত করিয়া যৌববিবাহের পুনঃপ্রচলন কর। যাহাতে সকল দিক বজায় থাকে, যাহাতে দেশাচারের মস্তকেও পদাঘাত না পড়ে আর শাস্ত্রেরও আদেশ প্রতিপালিত হয় এমত কোন বিধি ব্যবস্থা সংস্থাপিত কর। এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে ত্রয়োদশ বর্ষই কন্যা সম্প্রদানের প্রশস্ত সময় হওয়া উচিত। ইহাতে ইংরাজ রাজের সম্মতি আইনের অনুজ্ঞাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং হিন্দুয়ানীরও ক্ষতি হইবে না।

শ্রীহরিদাস সাঁই

সতরঞ্চ-বিজ্ঞান।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা পূরণ। *

ছ৮ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে যথা—

ভুবন মোহন রূপ পিরীতি তোমার। নানা রূপে নানা পাত্রে করহ বিহার॥
জানে সে মরম তব যে পবিত্র প্রেমিক। স্পর্শ মাত্র নাহি কর দুষ্ট অরসিক॥
প্রণয়ীর সখা তুমি বিদিত ভুবন। অধিকার কর প্রেম মম হৃদাসন॥

পঞ্চম প্রতিজ্ঞা পূরণ। †

১। গজ চ২ হইতে ঘ ৪—   ১। রাজা ঙ৪ হইতে ঘ৪
২। গজ ঙ২ হইতে ঘ৩—   ২। বড়ে গ৫ হইতে গ৪
৩। ঘোড়া ঘ৮ হইতে ঙ৬ কিস্তিমাৎ।

অথবা

১।———   ১। বড়ে গ৫ হইতে ঘ৪
২। ঘোড়া ঘ৮ হইতে ঙ৬—   ২। বড়ে ঘ৪ হইতে ঘ৩
৩। বড়ে গ২ হইতে ঘ৩ কিস্তীমাৎ।

অথবা

১।———   ১। রাজা ঙ৪ হইতে চ৪
২। ঘোড়া ঘ৮ হইতে ঙ৬—   ২। রাজা চ৪ হইতে ঙ৪
৩। বড়ে ঘ২ হইতে ঘ৩ কিস্তীমাৎ

অথবা

১।———   ১। বড়ে গ৫ হইতে গ৪
২। ঘোড়া ঘ৮ হইতে ঙ৬   ২। বড়ে গ৪ হইতে গ৩।
৩। বড়ে ঘ২ হইতে ঘ৩ কিস্তীমাৎ

* একাল পর্য্যন্ত কাহার নিকট হইতে বিশুদ্ধ পূরণ না পাওয়ায় আমরা নিজেই এই পূরণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। মুরশীদাবাদ চক্ নিবাসী শ্রীব্রজনাথ দত্ত মহাশয় এই প্রতিজ্ঞা পূরণের বহু আয়াস করিয়াছিলেন; আর কিঞ্চিৎ সাবধান হইলেই বিশুদ্ধ হইত। সুতরাং তিনি যে পূরণ পাঠাইয়াছেন তাহাতে ভুল আছে বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

† মোং [illegible] লিপুর শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সান্যাল মহাশয়ের নিকট হইতে প্রথম এই প্রতিজ্ঞার বিশুদ্ধ পূরণ পাই। আমরা আহ্লাদের সহিত আরও প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহাশয়গণের নিকট হইতে এই প্রতিজ্ঞার যথার্থ পূরণ পাইয়াছি। যথা—
শ্রীকালিদাস তা, কাইতি ও শ্রীগোষ্ঠবিহারী হাজরা, [illegible]গ্রাম, বর্দ্ধমান।
শ্রীমনীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, নং ২১ ডিক্সনস লেন, কলিকাতা।

ষষ্ঠ প্রতিজ্ঞা।

(জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে প্রাপ্ত)

কালর দিক।

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	
৮	কাল রাজা		সাদা ঘোড়া						৮
৭	কাল বড়ে	কাল বড়ে	সাদা বড়ে						৭
৬									৬
৫									৫
৪		কাল বড়ে				সাদা মন্ত্রী			৪
৩									৩
২									২
১	সাদা রাজা							কাল গজ	১
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	

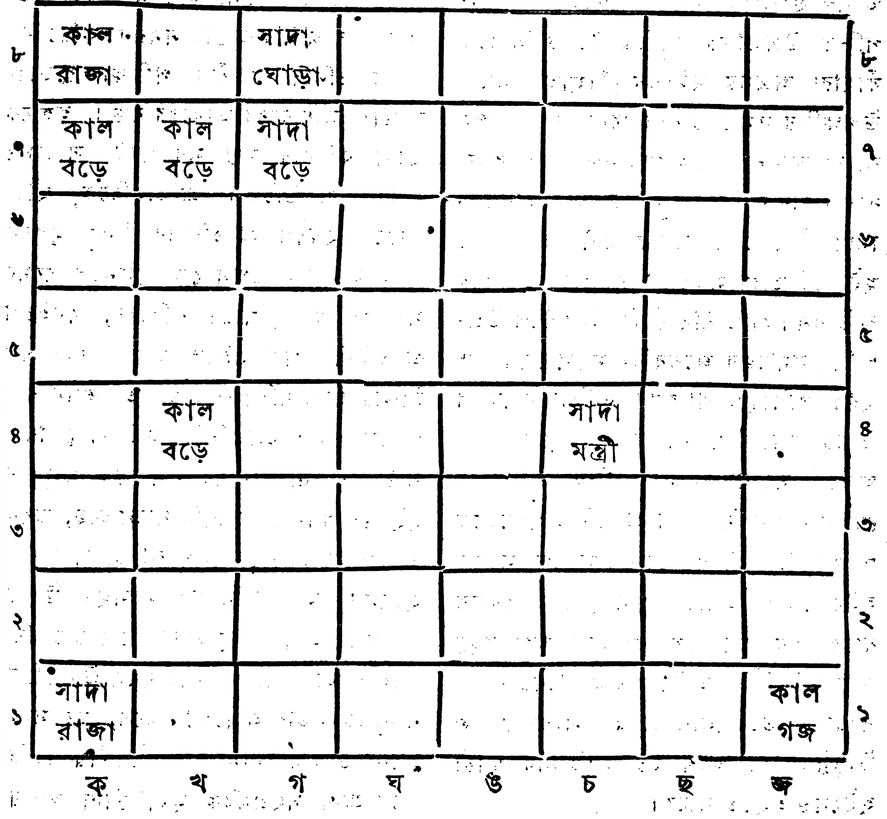

সাদার দিক।

সাদা প্রথম চালিয়া কালকে তিন চালে মাত করিবে।

শ্রীকুমুদবিহারী সামন্ত।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

আপনারা জাতীয় হিতকল্পে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহাতে মনে বড় আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছে। অধঃপতিত উগ্রক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি সাধনে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন তাঁহারা সমগ্র উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। আপনাদিগকে সেইজন্য অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" উগ্রক্ষত্রিয় জাতির গৌরবের পদার্থ হইয়াছে তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। প্রতিনিধি দীর্ঘজীবী হইলে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের অশেষবিধ মঙ্গল সংসাধিত হইবে বলিয়া আশা হয়। প্রতিনিধি যেরূপ উদার ভাবে সম্পাদিত হইতেছে তাহা অতীব সন্তোষজনক। কিন্তু প্রতিনিধি যেরূপ অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে প্রতিনিধির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে। অমাদের স্থূল বুদ্ধিতে যেরূপ ধারণা হয়, তাহাতে একমাত্র অর্থ কৃচ্ছ্র তাই প্রতিনিধির অনিয়মিত প্রকাশের প্রধান কারণ। তবে আপনাদের অধ্যবসায় ও উদ্যম দেখিয়া আশা হয় প্রতিনিধি স্থায়ী হইলেও হইতে পারে।

আপনারা [illegible]তিনিধিকে স্থায়ী করণাভিপ্রায়ে এবং জাতীয় উন্নতি মা[illegible]এ বটে যে "প্রেস কোম্পানী" স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন তাহা অতীব উত্তম। প্রেস কোম্পানী রেজেষ্ট্রি করিয়া বিজ্ঞাপন দিলে বোধ হয় দুই হাজার টাকা উঠিতে বিলম্ব হইবে না। কারণ সমাজ মধ্যে এমন অনেক ধনী এবং সমাজ হিতৈষী আছেন যাঁহারা একলাই ৪০।৫০ টা করিয়া অংশ ক্রয় করিতে সক্ষম। আমি এই সময়ে একটী প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি। ভরসা করি মাননীয় উগ্রক্ষত্রিয়গণ আমার প্রস্তাব সমর্থন করিবেন।

প্রতিনিধি জাতীয় পত্রিকা সুতরাং জাতীয় সাধারণের আদরের বস্তু। ইহাকে স্থায়ী করিবার জন্য সকলেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। প্রতিনিধিকে স্থায়ী করিতে হইলে প্রতিনিধির কিছু মূলধন থাকা কর্ত্তব্য। প্রেস কোম্পানিতে যেমন সকলেই অংশ খরিদ করিবেন, সেইরূপ প্রতিনিধির পক্ষ হইতে অন্যূন ৫০০ শত টাকার অংশ খরিদ করা উচিত। এখন কথা হইতে পারে প্রতিনিধি এ টাকা কোথায় পাইবে? প্রতিনিধির নিজ ব্যয় সঙ্কুলান হইতেই যখন টানা টানি পড়িতেছে, তখন এ অতিরিক্ত টাকা কি করিয়া সংগৃহীত হইবে! আমি বলি ইহার সহজ উপায় আছে। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই,ই মহোদয়ের বাটীতে যখন উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন বসে, সেই সময় অনেকগুলি গণ্যমান্য ব্যক্তি জাতীয় উন্নতি কল্পে প্রায় সহস্রাধিক মুদ্রা চাঁদা স্বাক্ষর করেন। আমার বোধহয় জাতীয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদ বিহারী সা[illegible] মহাশয় যদি স্বাক্ষরিত সহস্র মুদ্রার মধ্যে ৫০০[illegible] টাকা আদায় করিয়া "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনি[illegible]" সাহায্যার্থ প্রেস

কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিয়া দেন, তাহা হইলে কেহই কুমুদবাবুকে স্বাক্ষরিত টাকার অর্দ্ধেকাংশ প্রদান করিতে আপত্তি করিবেন না। শুনিতে পাই ইতিপূর্ব্বে কুমুদবাবু চাঁদাদাতৃ মহোদয়গণের কাহার কাহার নিকট হইতে কতকগুলি টাকা আদায় করিয়াছেন। তখন যখন বিনা কারণে তাঁহার স্বাক্ষরিত পত্রের উপর নির্ভর করিয়াই অনেকে টাকা দিয়াছেন, এখন তিনি কারণ দর্শাইয়া চাহিলে সকলেই তাঁহার হস্তে টাকা প্রদান করিবেন। কারণ তিনি যেরূপ সচ্চরিত্র বিশ্বাসী ও লোকপ্রিয় তাহাতে তাঁহার প্রস্তাবে কেহই অসম্মতি জানাইবেন না। কিন্তু পুনর্ব্বার টাকা চাহিবার পূর্ব্বে তিনি পূর্ব্বে যে টাকা আদায় করিয়াছেন, সে টাকা তিনি কি করিলেন সাধারণের অবগতির জন্য তাহা তাঁহার প্রতিনিধিতে পত্রদ্বারা কৈফিয়ত প্রদান করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। সম্ভবত সে টাকা তাঁহার নিকট মৌজুত আছে। তিনি জাতীয় সমিতির সম্পাদক। তাঁহার নিকট আমরা অনেক আশা ভরসা করি। প্রতিনিধিও জাতীয় পত্রিকা। তিনি প্রতিনিধির উন্নতি কল্পে যে আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন এরূপ আশা করিতে পারি।

কুমুদবাবু এখন কোথায়? জাতীয় সমিতির সম্পাদকরূপে তিনি এখন কি কি হিতকার্য্যে ব্রতী আছেন, আমরা মফঃস্বলে থাকিয়া কিছুই অবগত নহি। প্রতিনিধিতে জাতীয় সমিতির কার্য্যাবলী প্রকাশিত হইবার কথা। কৈ আর ত কোন কথাই [illegible]। সেই "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি" প্রবন্ধ লেখার পর হইতে কুমুদ[illegible] আর দেখা নাই। বোধহয় বড়ের চাল টিপায় তিনি অন্যমনস্ক আছেন। বড়ের চাল ছাড়িয়া যদি তিনি সমাজের উন্নতি কল্পে কোনরূপ চাল চালেন তাহা হইলে বোধ হয় তিনি কিস্তিমাৎ করিতে পারেন। এইবার বুঝিব তাঁহার চালের দৌড় কতদূর। পরিশেষে নিবেদন আমাদের এখানকার যাঁহারা, চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করিয়া ছিলেন তাঁহারা সকলেই প্রতিনিধির উন্নতিকল্পে স্বাক্ষরিত চাঁদা প্রদান করিতে সম্মত আছেন। আমি যদিও চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করি নাই কিন্তু আমি সাধ্যমত চাঁদা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। ভরসা করি আগামী বারের প্রতিনিধিতে কুমুদবাবু আমার পত্রের উত্তর প্রকাশ করিয়া বাধিত করিকরিবেন নিবেদন ইতি।

খলিসাকুণ্ডী, নদীয়া।
৯ই অগ্রহায়ণ ১২৯৮। } শ্রীহরিশচন্দ্র হাজরা।

শ্রীযুক্ত উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

কালে কালে কতই হইবে, আর কতই দেখিব। অ্যাঙ্ যায় ব্যাঙ্ যায় খল্‌সে বলে আমিও একপা যাই। দুধের ছেলে "প্রকৃতি" এখনও গলা টিপিলে দুধ বেরোয়, ইনি আবার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা বিবৃত করিতে চাহেন! করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, "অ[illegible]ভাষিতং" ভাবিলেই [illegible]া যায়। এখন যে ৫ বৎসরের ছেলেরাও রাস্তায় রাস্তায় চুরোট মুখে দিয়া বিজ্ঞ সাজিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে কার আসে যায়, তবে বালস্বভাব সুলভ চপলতা

যশতঃ যখন কোন গমনশীল পথিকের পশ্চাৎ ভাগে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে তখন আর তাহাকে বালক বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া যথোচিত শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। কএক মাস হইল দেখিতেছি 'প্রকৃতি' নামক এক পয়সা মুল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহার পরিচালক দিগের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় যত থাকুক বা নাই থাকুক, বিজ্ঞতা প্রদর্শনে তাঁহারা খুব মজবুত। বিগত ১০ মাঘের পত্রিকায় দেখিলাম "বঙ্গীয় রাজপুত" শীর্ষক একটী আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে। এই গল্পে অপরাপর কপোলকল্পিত ঘটনার মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা উপলক্ষে এক রাজপুত বীর চারি পাঁচ জন "আগুরী" সমভিব্যাহারে একশত অস্ত্রধারী পাঠান এবং বহু সংখ্যক অসিধারী ব্রজবাসীকে কেবল লাঠির সাহায্যে পরাস্ত করিয়াছিল। লেখক আবার এইখানে নিজের অভিজ্ঞতারও একটু পরিচয় দিয়াছেন! তিনি বলেন "এই আগুরিরা উগ্রক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে, যুদ্ধে মৃত্যু হইলে মহা গৌরব মনে করে, আবার পাপ ভার হইতে মুক্তি পাইয়া স্বর্গ লাভের আশা রাখে। লাল বিহারী বাবু তাঁহার "গোবিন্দ সামন্তে" ইহাদের পরাক্রমের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন।"

লেখক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি "আগুরিরা উগ্রক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে" ইহার অর্থ কি? তিনি কি জানেন না যে বামন যেমন ব্রাহ্মণের, কায়েত যেমন কায়স্থের অপভ্রংশ 'আগুরি'ও তেমন উগ্রক্ষত্রিয়ের অপভ্রংশ মাত্র। যে ব্যক্তি তাহাও অবগত নহেন তিনি কোন সাহসে [illegible] জাতির আখ্যায়িকা লিখিতে অগ্রসর হন! লাল বিহারী বাবুর "গোবিন্দ সামন্ত" যাঁহার শাস্ত্র, এবং তাঁহার কাল্পনিক বর্ণনার উপরে যাঁহার বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত তাঁহাকে কিছু বলা না বলা সমান। আরও বোধ হয় "গোবিন্দ সামন্ত"ও তিনি কখন পড়েন নাই; কেননা সে পুস্তকে উগ্রক্ষত্রিয়ের বীরত্বের কোন কথাই দেখিতে পাওয়া যায় না। দে মহাশয়ের কল্পনাপ্রসূত কালমাণিকের চরিত্রেই বোধ হয় বীরত্বের ছায়া দেখিয়া থাকিবেন। লেখক বাবুর সমস্ত কথা গুলিই এইরূপ উপকথা মূলক। সেই জন্যই বলি এরূপ অসত্য অসঙ্গত কথা লিখিবার পূর্ব্বে একবার বিষয়টা ভাল করিয়া শিক্ষা করা উচিত ছিল। উগ্রক্ষত্রিয়দিগের যখন ক্ষত্রিয় ঔরসে জন্ম তখন যে তাহারা বীরত্বের জন্য সুপরিচিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? তবে অসঙ্গত এবং অযশস্কর কথা শুনিলেই বড় রাগ হয় এবং প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করে। আগুরিরা উগ্রক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে একথা অত্যন্ত অসহ্য। প্রত্যেক উগ্রক্ষত্রিয়েরই এবিষয়ের প্রতিবিধানে যত্নবান হওয়া উচিত। পূর্ব্বে আমাদের প্রতিবিধানের উপায় ছিল না সুতরাং যে যাহা বলিত অবনত মস্তকে সহ্য করিতে হইত। এখন আমরা জাতীয় পত্রিকা পাইয়াছি, ইহার সাহায্যে এই সকল ভ্রমাত্মক এবং অসঙ্গত বিবরণের যথাযথ প্রতিবাদ করিতে পারি এবং আশা করি সকলেই এ বিষয়ে অগ্রসর হইবেন।

কলিকাতা
১৫ই মাঘ ১২৯৮। * } কেনচিৎ উগ্রক্ষত্রিয়েণ

* গত সপ্তাহে এই পত্রখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু অগ্রহায়ণের প্রতিনিধি" কারণ বশত মাঘ মাসে প্রকাশিত হইতে চলিয়াছে। তজ্জন্য এই পত্র অসাময়িক হইলেও অগ্রহায়ণের সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইল।

উ, প্র, স।

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

প্রথম ভাগ।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কৃত জাতিমালা এবং উগ্রক্ষত্রিয়।

এতদিন পরে বঙ্গদেশস্থ জাতি নিচয়ের বিবরণমালা বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন এই গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য সমালোচনার্থ সাধারণ সমক্ষে প্রেরিত হয়, তখন আমরা মুহূর্ত্তমাত্র অপব্যয় না করিয়া সংগৃহীত বিবরণের ভ্রমাত্মকতা প্রদর্শন করি। এতদুপলক্ষে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে যে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল তাহা, বোধ হয়, অদ্যাপি অনেকের স্মৃতিপট হইতে একেবারে বিলীন হয় নাই। এই আন্দোলনই উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির উৎপত্তি কারণ, এবং ইহাই নিদ্রিত নিরুদ্যম উগ্রক্ষত্রিয়দিগকে প্রকৃত আত্মমর্য্যাদায় জাগরুক করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিতে যত্নবান করে। সে যাহাই হউক, এখন দেখিতেছি আমাদের প্রদত্ত প্রতিবাদ সকলের মধ্যে একটীও গৃহীত না হইয়া ভ্রম সমেত সেই [illegible] তিবৃত্তটী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি [illegible] আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। কিন্তু আমাদের দুঃখ এই যে, রিজ্‌লী সাহেবের ন্যায় বিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিও যথাসময়ে সঙ্কলিত বিবরণের ভ্রমপূর্ণতা জানিতে পারিয়াও, তাহা সংশোধন করিলেন না। সাহেব বাহাদুর এ বারেও ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ এখনও সম্পুর্ণ নহে, যদি কেহ দেড় বৎসর মধ্যে সংগৃহীত বিবরণের সমালোচনা করিয়া তাহার নিকট প্রেরণ করেন, তাহা হইলে তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন, এবং মনোনীত হইলে, তদনুসারে দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ত্তনও করিবেন। একটু আশার কথা বটে; কিন্তু আশারশ্মি এতই ক্ষীণপ্রভ যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আর কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তথাপি নিরস্ত হওয়া উচিত নহে। আসুন আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তৎতৎ স্থানের প্রতিনিধিস্বরূপ সাহেব মহোদয়ের ভুল দেখাইয়া,সংশোধন প্রার্থনা করি। অবশ্যই তিনি নির্ব্বন্ধাতিশয্যে প্রপীড়িত হইয়া আমাদের কথিত বিষয়ের

সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত হইবেন, এবং পুনঃ সংস্কারে আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সন্নিবেশিত করিবেন। সেই আশাতেই অদ্য তাঁহার লিখিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা উগ্রক্ষত্রিয় সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদের প্রথম আপত্তি নামকরণে। গ্রন্থকর্ত্তা প্রকৃত নাম পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে "আগুরি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সাহেব বোধ হয় জানেন না যে, বামুন যেমন ব্রাহ্মণের, কায়েত যেমন কায়স্থের অপভ্রংশ, আগুরিও তেমনি উগ্রক্ষত্রিয়ের অপভ্রংশ মাত্র। চলিত ভাষা ব্যতীত কোনও সদ্‌গ্রন্থে এ সকল অপভ্রংশের ব্যবহার হয় না। ঘৃণা বা তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতে হইলে অন্যান্য জাতির দ্বারা এই সকল অবজ্ঞাসূচক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং উগ্রক্ষত্রিয়ের পরিবর্ত্তে আগুরি কথাটীর ব্যবহার আপত্তিজনক। বিশেষ,যখন ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে বামুন এবং কায়স্থের পরিবর্ত্তে কায়েত ব্যবহৃত হয় নাই তখন অবশ্যই সংশোধনীয়।

দ্বিতীয় আপত্তি Cultivating কথা লইয়া। Cultivating caste বলিলে কেবল সেই জাতি বুঝায় যে জাতি স্বহস্তে হলচালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হলাকর্ষণ প্রশস্ত বৃত্তি কি না তাহা এস্থানে বিচার্য্য নহে; কি[illegible] উল্লিখিত বিশেষণটী যে সাধারণ উগ্রক্ষত্রিয়দিগের [illegible] খাটে না, তাহাই প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য। উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে দুই চারিজন হলাকর্ষক থাকিতে পারে এবং অবশ্যই আছে। কিন্তু তা বলিয়া সমগ্র জাতিকে Cultivating caste বলিয়া সিদ্ধান্তকরা সর্ব্বতোভাবে অযৌক্তিক। বস্তুত; উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কর্ষক অপেক্ষা কৃষিব্যবসায়ীর সংখ্যা এতবেশী যে Cultivating কথাটী উহাদের সম্বন্ধে কখনও প্রযুজ্য হইতে পারে না। এস্থলে Agricultural কথাটী ব্যবহার করিলে ঠিক হইত; কেন না, তদ্দ্বারা কৃষক, কৃষিজীবী, এবং কৃষিব্যবসায়ী এ সমস্তই বুঝাইতে পারেঃ—

A farmer is always a practitioner, the agriculturist may be a mere theorist.

Crabb.

আমাদের তৃতীয় প্রতিবাদ বৃত্তিনির্দ্দেশ মূলক। সাহেব বলেন মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, বিলবাসী জন্তুদিগের বধবন্ধনই উগ্রক্ষত্রিয়দিগের শাস্ত্রোক্তবৃত্তি। বিলে নানা প্রকার জন্তুই বাস করিয়া থাকে, তন্মধ্যে কোনগুলী উগ্রক্ষত্রিয়দিগের বধ্য, তাহা সাহেব না বলিলেও, মনুসংহিতার পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। কেন না মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন;—

"ক্ষত্রাদীনাং বিলবাসিগোধাদিবধবন্ধনং।"

গোধাপ্রভৃতি কএকটী জন্তুর বধবন্ধন শাস্ত্রমতে ক্ষত্রিয়েরই কার্য্য; সুতরাং গোধাদির বধবন্ধন নির্দ্দেশে উগ্রক্ষত্রিয়ের কো[illegible] লাঘব নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে সুধু বি[illegible] [illegible] জন্তুর সংহারক বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া[illegible] [illegible]রও অবহুদর্শিতা প্রকা[illegible] [illegible]াছেন এবং [illegible]ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি [illegible]ায় করিয়াছেন। অ[illegible] উ[illegible]

দিগের যে সকল বৃত্তির নির্দ্দেশ আছে সাহেব তাহার একটীও উল্লেখ করেন নাই। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য তাহার দুই একটী নিম্নে উদ্ধৃত করিব।

১ম। "দ্বিজাতিশুশ্রূষা, ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্রকরণানাম্।"

কুল্লূকভট্টধৃত উশনঃসংহিতা।

দ্বিজশুশ্রূষা, ধনধান্যের অধ্যক্ষতা, রাজসেবা, দুর্গরক্ষা এবং অন্তঃপুররক্ষা— পারশব, উগ্রক্ষত্রিয় এবং করণজাতির এই কয়টী বৃত্তি।

২য়। "উগ্রোযুদ্ধক্রিয়াবৃত্তিঃ।"

হলায়ুধ।

অর্থাৎ যুদ্ধই উগ্রক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তি।

৩য়। "ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং
ক্রূরাচার বিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জ্জন্তু
রুগ্রো নাম প্রজায়তে॥"

মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়।

অর্থাৎ পরিণীতা শূদ্রকন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের যে পুত্র উৎপন্ন হয় সেই উগ্রক্ষত্রিয়; তাহার স্বভাব আধশূদ্র এবং আধ ক্ষত্রিয় এবং সে ক্রূরাচার সম্পন্ন।

এই শ্লোকের দ্বারা কি উগ্রক্ষত্রিয়ের কার্য্য বা বৃত্তি অনুমিত হয় না? ক্রূরকর্ম্মাধুক্তি এবং হিংসারতি যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণ, যুদ্ধ এবং মৃগয়া ব্যতীত তাহাদের আর কি ব্যবসায় সম্ভবে?

"হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে
ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্‌যস্য সোঽদধাৎ স[illegible]
তত্তস্য স্বয়মাবিশ[illegible]

[illegible] ১ম অধ্যায়।

ইহার টীকায় কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন ক্রূরংক্ষত্রিয়াদেঃকর্ম্ম। সুতরাং প্রাগুক্ত শ্লোকের "ক্রূরাচার বিহারবান্" কথার দ্বারা উগ্রক্ষত্রিয়দিগের ক্ষত্রিয়ের সহিত সমবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ক্রূরকর্ম্ম এবং হিংসা অন্যের পক্ষে নিন্দনীয় হইলেও ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে, অবশ্য সকল সময়ে নহে, প্রশস্ত বৃত্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ মিঃ রিজ্‌লী এই ক্রূরাচার বিহারবান্ শব্দের কদর্থ ঘটাইয়া আধুনিক উগ্রক্ষত্রিয়দিগের প্রতিও একটু তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বলেন যদি জনশ্রুতি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে আধুনিক উগ্রক্ষত্রিয়েরাও, প্রাচীন কালের ন্যায় অসভ্য নিষ্ঠুর আচরণে তৃপ্তিলাভ করে। পূর্ব্বে যে কদর্থের কথা বলিয়াছি তাহা অবশ্য সাহেবের নিজের নহে, জোন্‌স সাহেব কৃত মনুসংহিতার ইংরাজি অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত। উক্ত শব্দের অনুবাদে জোন্‌স সাহেব লিখিয়াছেন Finds pleasure in savage conduct সুতরাং আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের সঙ্কলনকারী তাহাই ধ্রুবসত্য জ্ঞান করিলেন! সুধু তাহাই নহে, কোন এক ব্যক্তি বিশেষের মুখে উগ্রক্ষত্রিয়দিগের নিষ্ঠুরাচরণের কথা শুনিয়া, তাহাই জনশ্রুতি ভাবিয়া উহাদের চরিত্রের উপর অযথা দোষারোপ করিলেন! দুর্ভাগ্য আমাদের, নহিলে আর এ সকল কথার প্রতিবাদ করিতে হয়।

[illegible]। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশস্থ উগ্রক্ষত্রিয়দিগের যে সমস্ত উপাধি শুনিতে পাওয়া যায় তদ্দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, ইহাঁরা এক সময়ে যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন।

অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে উগ্রক্ষত্রিয়দিগের কি কি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা শাস্ত্রব্যবসায়ী নহি, সুতরাং সকল শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা সকল শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু সাহেব মহোদয় যখন জাতীয় ইতিবৃত্ত লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন তখন অন্যান্য শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লেখাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। ভরসা করি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার উশনঃসংহিতা, হলায়ুধ প্রভৃতির মত অনুসরণ করতঃ উপর্যুক্ত অযথা অপবাদ অপনোদন করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন এবং তাঁহার মহামূল্য গ্রন্থকে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য করিয়া সকলের নিকট প্রশংসার্হ হইবেন।

চতুর্থ এবং বিষম বিভ্রাট শ্রেণী বিভাগ লইয়া। সকলেই জানেন জানা এবং সুত এই দুই শ্রেণীতে উগ্রক্ষত্রিয় বিভক্ত। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা (১) বর্দ্ধমানীয়, (২) কাশীপুরীয়, (৩) বাঘা, (৪) সাতশৈকে, (৫) চাগ্রামী, (৬) জানা, এবং (৭) সুত। সঙ্কলনকারীকে আমাদের জানান কর্ত্তব্য যে, বর্দ্ধমানীয়, কাশীপুরীয়, বাঘা প্রভৃতি শব্দ গুলি উগ্রক্ষত্রিয়ের বিভিন্ন শ্রেণী নহে; এ গুলি সুতশ্রেণীর থাকবিশেষ মাত্র।

এরূপ বিভাগকে ইংরাজীতে Cross-division বলে; ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ... ন্যায়বিরুদ্ধ। পৃথিবীকে মহাদেশে বিভক্ত করিতে বলিলে যদি কেহ এসিয়া, আফ্রিকা, ইয়ুরোপ, আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া এবং পলিনেশীয়ায় বিভক্ত না করিয়া তদন্তর্গত আর দুই চারিটি দেশ যথা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ভারত, তুরস্ক প্রভৃতিকেও মহাদেশ শ্রেণীভুক্ত করিয়া বিভাগ কার্য্য সম্পন্ন করেন; অথবা সমগ্র মানবজাতিকে দ্রাভিদিয়ান্, মঙ্গলীয়ান্ এবং টারটার এই তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত না করিয়া, দ্রাভিদিয়ান্ শাখার কোন এক প্রশাখাকে উক্ত শ্রেণী ত্রিতয়ের অন্যতম বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বিভাগ ক্রিয়া যেরূপ অসঙ্গত এবং ন্যায়বিরুদ্ধ হয়, উগ্রক্ষত্রিয়দিগকে জানা, সুত, বর্দ্ধমেনে, চাগেঞে প্রভৃতিতে শ্রেণীবদ্ধ করাও তদ্রূপ অশুদ্ধ এবং অন্যায়।

প্রকৃত পক্ষে উগ্রক্ষত্রিয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; জানা এবং সুত। কিন্তু এই সুত শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট আর চারিটি থাক আছে; যথা, (১) চাগ্রামী, (২) পশ্চিমতরফী (৩) কাশীপুরী (৪) বারগ্রামী। এই শ্রেণী চতুষ্টয় কেবল বাসস্থানের নামানুসারে উপরোক্ত নাম প্রাপ্ত হইলেও সাধারণ সুত শ্রেণীর সহিত ইহাঁদের সংশ্রব খুব কম। দূরত্ব নিবন্ধনই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক পরস্পরের মধ্যে ভক্ষ্য ভোজ্য, আদান প্রদান বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কালক্রমে যে এ সমস্ত সামান্য সামান্য বাধা বিঘ্ন উঠিয়া গিয়া সমগ্র সুতশ্রেণী একীকৃত হইবে এরূপ সম্ভাবনা। পরন্তু জানা সুতের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক। ... উভয় সম্প্রদায় মধ্যে আহার ব্যবহার, করণ ...ণ, কিছুই প্রচলিত নাই, এবং ভবিষ্যতে ...শার পক্ষেও

...ট অন্তরায় আছে। কিন্ত তা বলিয়া যে ...পরের মধ্যে কোনরূপ বিদ্বেষভাব ...হিত আছে এমত নহে। সাহেব যে ...য়াছেন যে, জানা সুতে পরস্পরকে ...পুত্র বলিয়া বিদ্রূপ করে এ কথা ত ...হব সঙ্কলিত জাতিমালা পাঠের পূর্ব্বে ...নও আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। ... অবশ্যই কোন সংবাদদাতার কপোল...ত কল্পনা হইবে!

আমাদের পঞ্চম আপত্তির কারণ একটু ...স্যাদ্দীপক। সাহেব বলেন এ জাতির ...লোকেরা অসতী হইলে সমাজচ্যুত ... এবং বৈরাগী বৈষ্ণব অথবা তদ্বৎ ... কোন সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ ...। এ কথা আংশিক সত্য হইলেও ...াদের জিজ্ঞাস্য এই, যে এ প্রথাটী ... কেবল এই জাতীয় অসতী স্ত্রীলোক...র মধ্যে প্রচলিত না সকল জাতিরই ...কলঙ্কিনীগণ গৃহবহিষ্কৃতা হইয়া এব... কোন না কোন সম্প্রদায়ের আশ্রয় ...হণ করে? জাতি হারা'লেই বৈষ্ণব— ...প্রচলিত কথা। অগতির গতি, ...মতারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় পতিত নর...র আশ্রয়। বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল ...ভাগ্য এবং হতভাগিনীর পক্ষেই ইহার ... উন্মুক্ত! কিন্ত তথাপি যে গ্রন্থকার ...দায় বিশেষে এ প্রথাটী বিশেষিত করি...ন কেন, তাহা আমরা জানি। রেভা... লালবিহারী দের "গোবিন্দ সামন্ত'ই ...ভ্রমের মূল। উপন্যাস বা কাল্পনিক ...খ্যায়িকায় সকল কথাই শোভা ... জাতীয় ইতিবৃত্তরূপ মহ...ন্থে কোন ...ার অসার অসংলগ্ন ...বিষয় সন্নিবেশিত দেখিলেই লেখকের সত্যানুসন্ধানের উপর সন্দেহ আইসে। কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি উগ্রক্ষত্রিয় সকল জাতিরই কুলটাগণ পরিত্যক্তা হইলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কলেবর পুষ্টি করে এ কথা জানিলে কখনই গ্রন্থকার উপরোক্ত ভুলের দ্বারা তাঁহার গ্রন্থ কলঙ্কিত করিতেন না। যাহা হউক আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে আর আমাদিগকে এ অনাবশ্যকীয় কথাগুলি দেখিতে হইবে না।

ষষ্ঠভ্রম মৃতাশৌচ সম্বন্ধীয়। পুস্তকে আছে যে, উগ্রক্ষত্রিয়েরা মৃত্যুর পর ত্রিংশৎ দিবসে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে। কিন্তু সুতশ্রেণী এ নিয়মের বশীভূত হইয়া পড়িলেও জানাদিগের আচার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পিতৃধর্ম্মানুসারে এখনও একাদশ দিবসেই তাঁহাদের অশৌচান্ত হয়। এ সকল অনায়াসলভ্য সর্ব্বজনবিদিত সামান্য সামান্য বিষয়েও কেন যে গণ্ডগোল বাধিল বুঝিতে পারি না। সাহেবের সংবাদদাতা অবশ্যই কোন গণ্ডমূর্খ হইবে সন্দেহ নাই।

সপ্তম এবং শেষ সমালোচনার বিষয় উগ্রক্ষত্রিয়দিগের সামাজিক অবস্থা আমরা অবশ্য, সাহেব মহোদয়ের সহিত একবাক্যে, স্বীকার করিব যে, বঙ্গের সকল স্থানে ইহাঁদের সামাজিক অবস্থা সমান নহে এবং তাহা হইতেও পারে না। যে স্থানে যে জাতি বহুসংখ্যক একত্রিত হইয়া বাস করে তথায় তাহাদের পদমর্য্যাদা অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে ইহা স্থির নিশ্চয়। বঙ্গের অন্যান্য স্থানে উগ্রক্ষত্রিয়দিগের সামাজিক অবস্থা কিঞ্চিন্ন্যূন হইলেও বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা যে

কায়স্থের সমকক্ষ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রক্ষিপ্ত উগ্রক্ষত্রিয়গণ নবশাকের সহিত তুল্য সম্মানে আপনাদিগকে অপমানিত না ভাবিতে পারেন কিন্তু সমাজবদ্ধ উগ্রক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে এরূপ সম্মান অপমানের নামান্তর মাত্র। বাস্তবপক্ষে, বর্দ্ধমান এবং বাঁকুড়া বীরভূমের কতকাংশের কায়স্থ এবং উগ্রক্ষত্রিয়ের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে কোনই পার্থক্য লক্ষিত হয় না; বরং স্থানে স্থানে উগ্রক্ষত্রিয়দিগের আর্থিক অবস্থা উন্নত থাকায় তাঁহারা সমাজে কায়স্থ অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করেন। বর্দ্ধমানই বঙ্গীয় উগ্রক্ষত্রিয়দিগের প্রধান বাসস্থান; তথায় তাঁহারা সমাজে যে স্থান অধিকার করেন তাহাই ধর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে, সামাজিকতায় তাঁহাদিগকে কায়স্থের সমতুল না বলিয়া নবশাকের সমতুল বলা সম্পূর্ণ ভুল এবং তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ অপমানও আছে।

আর এক কথা, গ্রন্থকার যে পূর্ব্ববঙ্গের একদল মৎস্যধারী "আগুরীর" কথা উল্লেখ করিয়াছেন আমরা তাহাদের অস্তিত্ব ব। স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কিছুই অবগ নহি। উগ্রক্ষত্রিয়ের কোনও সম্প্রদায় তথায় বাস করে, তাহা আমরা বিশ্বা করিতে পারি না। উহারা অঘোরী অঘোরপন্থী নামক দুরাচার জাতির বংশ হইবে। উপযুক্ত অনুসন্ধান ব্যতীত, কো এক ব্যক্তি বিশেষের কথায়, উহাদিগ উগ্রক্ষত্রিয়ভ্রমে পুনরুল্লেখ না করেন ইহা আমাদের প্রার্থনা।

উপসংহারে বক্তব্য যে, আমরা এই সমালোচনায় অন্যান্য জাতির কথা প ত্যাগ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি তবে অনিবার্য্যকারণ বশতঃ কেবল এ স্থানে কায়স্থ এবং নবশাকের কথা উ হইয়াছে। কিন্তু তাহা কোন অসদ প্রায়ে নহে; আশা করি, তাঁহারাও ত সেই ভাবে গ্রহণ করিবেন। আর গ্রন্থক শ্রীযুক্ত এইচ্ এইচ্ রিজ্‌লী মহোদ নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে, তি স্বয়ং আদ্যপ্রান্ত এই সমালোচনাটী প করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন।

শ্রীহরিদাস সাঁই।

রাজা ও প্রজা (২)।

পরিবর্ত্তনই জগতের একমাত্র ধ্রুব-বিধি। ইহার বিরাম নাই। কালচক্রের গতি যেমন নিরবধি, ... আশা যেমন অসীম, এ পরিবর্ত্তনও সেইরূপ অনন্ত ও নিরবধি। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই এবং বিরামও নাই। কি স্থূল কি সূক্ষ্ম কি লঘু কি গুরু, কি দ্রব কি কঠিন, সজীব কি নির্জীব সকলেই এই মার্থ কথার সনাতন প্রমাণরূপে বিদ্যমান

সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্র
সং...গা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিত

১১। ৬২। উত্তরকাণ্ড

যেখানেই নেত্রপাত কর, দেখিবে সকরেই ক্ষয় আছে, উন্নতিরও পতন আছে, সংযোগ সংযুক্তও বিয়োগানুবিদ্ধ, জীবিতও মরণের সহিত সুদৃঢ়ভাবে জড়িত। তাহাই এই পরিবর্ত্তনশীল ধরণীর স্বাভাবিকী নীতি। দেব দানব, স্থাবর, মানব জড় জঙ্গম, কেহই এ একপদী মার্গ অতিক্রম করিতে সমর্থ নয়। অতিক্রম করিবার উপযুক্ত সামর্থ্যও কাহারও নাই। ...স্তত রাজপদও অনন্ত প্রস্থত সেই শাশ্বতী বিধির বন্ধন শ্লথ করিতে অসমর্থ। সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী।

এইরূপে বহুযত্নে উপ্ত ও উৎপন্ন—সংসার-নন্দনে অচিরপ্ররূঢ়—রাজকল্পপাদপ কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বিবিধ কর্ম্ম শাখা বিস্তার পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ দৃঢ়মূল ও সসার হইতে থাকে। দেবপ্রকৃতি সেই ...চ্ছায় ফলপুষ্পপরিশোভিত মনোমুগ্ধকর ...মর তরু পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক শান্তি সুখে অবস্থান করেন। কখন বা তাহার ফলপুষ্পের রসাস্বাদ করিয়া পরমানন্দ মনে ও নির্ব্বিঘ্নে স্বকীয় কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকেন। বহু উপভোগেও ক্লান্ত না হইয়া বরং সুখাধিক্যের অনুভব করেন, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হয় না। কালক্রমে সেই পুণ্য ক্ষেত্রেরও ভাবান্তর ঘটে। তখন প্রাপ্তচ্ছিদ্র ও নিয়তি বলে লব্ধপ্রসর আসুরিক শক্তি সেই দেববলকে কবলিত করিয়া ফেলে। সেই পরম পরিশুদ্ধ স্বহস্তরোপিত সুরতরুর উপাদেয় ফলের রসাস্বাদন অমর্ত্ত্য প্রজাবৃন্দের অসুলভ হয়। তখন ছায়া প্রধান কল্পশাখী পূর্ব্ব দেবগণ কর্ত্তৃক অলক্ষিতভাবে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। আর সেই রমণীয় কুসুম, সেই শরত সারদ শস্য, সেই অযত্ন সুলভ অনাতপ অসুরেরই সেব্য রূপে সঙ্কল্পিত ও রক্ষিত হয়।

প্রভুশক্তি বিষম শক্তি। উহার ... অতি অপূর্ব্ব বস্তু। ঐ শ... অনুপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হইলে সুফ... সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। ... মানবও স্বার্থের দাস, যখন তাহাদের ইপ্সিত স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়, তখন সেই মানব ধর্ম্মাধর্ম্ম, লঘুগুরু হিতাহিত বিবেচনায় মোহান্ধের ন্যায়, ব্যবহার করে। যখন তাহারা ভাবে যে, এই সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপিনী রাজশক্তি আমাদেরই প্রদত্ত শক্তি মাত্র, উহা আমাদেরই রক্ষণ ও পরিপালন জন্য সরলভাবে রাজকরে অর্পিত, রাজধন আমাদেরই যথা শক্তি প্রদত্ত ধন, উহা আমাদেরই অভাব নিরাকরণ ও সুখসাধনার্থই ব্যয়িত হওয়া উচিত, আমরাই রাজার ও রাজ্যের একমাত্র বল, আমাদের বিনাশের জন্যই আমরাই অগ্রসর হইতেছি, রাজ নিয়ম আমাদেরই অভাব ও অসুখ নিরাকরণ জন্য, ইহা আমাদের সংরক্ষক না হইয়া ভক্ষক রূপে বিরাজ করিতেছে—প্রাকৃত শক্তি অপ্রাকৃত পথে পরিচালিত হইতেছে, তখন সেই রাজশক্তি অবসানের নিমিত্ত রহস্য চেষ্টা অনুষ্ঠিত হয়। সেই অমর আরাধ্য রাজার ও রাজপদের বিকৃতি সম্পাদিত হয়। বস্তুতঃও তাহাই ঘটে। বংশানুক্রমে প্রচলিত, প্রবৃদ্ধগৌরব, ও বিবিধ আয়াস সৃষ্ট রাজপদ ধীরে ২ অলক্ষিতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব শক্তি সঞ্চয় করিয় পুষ্টকায় হয়। অধিকার যত বিস্তৃত হয় তখন উহা স্থির বারিজ বর্দ্ধমান আবর্ত্তের ন্যায় আয়তন প্রসার করে এবং যতই দূর হইতে দূরতর প্রদেশে উহার পরিধি প্রসারিত হয়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও ততই উহার আভ্যন্তরিক সমিত শক্তির বহু বিস্তার হেতু অজ্ঞাতভাবে হ্রাস হয়। সেই আভ্যুদয়িক তেজ ও উৎসাহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় যখন উহা নিরঙ্কুশ প্রভুতাপরায়ণ, স্বার্থান্ধ ও আ...কৃতি প্রভুর করতলগত হয় ... তাহা ভগ্নশাখ ও আশ্রিতগণের সুখসেব্য না হইয়া অসুখেরই হেতুভূত হয়। প্রকৃতিপুঞ্জও যথাসাধ্য যত্ন করিয়া ফলপ্রাপ্তির আশায় ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতে থাকে। বর্ষবর্ষান্তে যখন তাহারা ফললাভ

আশা হইতে সম্পূর্ণরূপ নিরাশ হয়, তখন সেই রাজতরুর শাখা প্রশাখা ছিন্ন করিয়া তাহার বৈরূপ্য সম্পাদন করে। ইতিহাসাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে,রক্তপাত, ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা প্রভৃতি ঐছেদন কার্য্যে অস্ত্রের কার্য্য সম্পাদন করে এবং উহাই তত্তৎকালেও দেশে প্রশস্ত উপায় বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে।

এইরূপে ছিন্নাগ্র রাজপাদপ পঞ্চদেবতরুর ন্যায় নিম্নলিখিত দেহপঞ্চকে বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন দেশে যেরূপ রাজ্যাঙ্গ, যেরূপ বিধি নিচয়, যেরূপ সামদানাদি উপায়, যেরূপ গিরিজনাদি দুর্গ ও যেরূপ কোষাদির প্রয়োজন, তৎ সমুদায় যথোপযুক্ত পরিমাণেই বিদ্যমান আছে, কিন্তু নৃপতি সেই সমস্ত বন্ধন উন্মোচন করিয়া স্বকীয় বাসনা অনুযায়ী পথেই অগ্রসর। ক্ষমা ও দণ্ড তাঁহার প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অধীন। এরূপ রাজাকে স্বেচ্ছাচার রাজা এবং শাসন প্রণালীকে স্বেচ্ছাচারিতা বলা যায়।

কোন কোন দেশে বাহ্যতঃ রাজাই সকল বিষয়ের পরিচালক ও পরিপালক। কিন্তু কোষ, দণ্ড, রীতি প্রভৃতি তাঁহার ইচ্ছামাত্রে ব্যবহৃত হয় না। তাঁহাকে কতিপয় বিধির বাধ্য হইয়া আপন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সেইপ্রাকার উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। অসংযত ইচ্ছাকে নিয়মকারাগারের সংযত কোষ্টেই নিরোধ রাখিতে হয়। এরূপ শাসন নিয়মতন্ত্রতা নামেই অভিহিত।

দেশ বিশেষে রাজাও আছেন। অনন্ত বিধিরও অভাব নাই। কিন্তু রাজা সমস্ত বিধির প্রণয়ন প্রচলন বা নিয়া কর্ত্তা নন। তিনি ঐ সমস্ত বিধির .বিধ বিধির অন্তর্গত। প্রকৃতি পুঞ্জের সম জ্ঞানের উপর তাঁহার রাজশক্তি নি করে। বস্তুতঃ প্রজাই পরম্পরা স রাজ্যের কর্ত্তা। এরূপ রাজকার্য্য প্র তন্ত্রতা বলিয়া বিদিত।

আবার দেশান্তরে দেখা যায় রাজ আদৌ নাই। ব্যক্তি বিশেষ কতিপয় স বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া কাষ্ঠপু লিকাবৎ শাসনরজ্জুতে বদ্ধ থাকেন। সা রণ জনগণের রুচির উপর নির্ভর ক শিল্পযন্ত্র পরিচালনের ন্যায় রাজক সম্পাদন করেন। এরূপ কার্য্যপ্রণা নিয়ম সাধারণতন্ত্রতা নামে বিশ্রুত।

কোন কোন দেশ স্ব স্ব প্রধান সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক রাজ্যে এক বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া গোষ্ঠী সংগঠন করেন। সামন্তগণ সমিতির প্রদর্শিত পথে রাজকার্য্য পরিচা করেন। এরূপ প্রথা সম্মিলিত চক্র না অভিহিত।

দেশের অবস্থা ভেদে, জনগণের রু বিভিন্নতায় ও সময়ের গতি অনুসারে রা পদ এইরূপ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। যদি রাজপদের এইরূপ অবান্তর ভেদ লক্ষিত হ তথাপি রাজপদ মহৎপদ, রাজশক্তি প্রব শক্তি, রাজসম্মান অতুল সম্মান ও রাজনী পরাক্রান্ত নীতি। জনসমাজে তথা ক বিষয় ভিন্ন, উহার সহিত অন্য বস্তুর তু হয় না। বস্তুতঃ রাজ সংস্পৃষ্ট বিষয় রা সংস্পৃষ্ট বিষয়েরই তুল্য।

শ্রীরামশঙ্কর রায়।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী (৫)।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ মধ্যে মানসিংহ নামে একটি বিভাগ আছে। উহাতেও মানসিংহের যশোহর যাত্রাদি সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের আদিপুরুষ ভ[...] সমাদ্দারের নাম এস্থলে উল্লেখের যোগ্য।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যপুত্রকে হত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে সে কচুবনে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করে, তাহাতে তাহার কচু রায় নাম হয়। কচুরায় সম্রাটের শরণাপন্ন হইয়া তৎসমীপে প্রতাপের অত্যাচারের কথা বর্ণন করিলে, তিনি তাহার দমনের নিমিত্ত মানসিংহকে পাঠাইয়াছিলেন। মানসিংহ প্রথমে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া তথায় বীরসিংহপুত্র ধীরসিংহের আতিথ্যগ্রহণ করেন। পরে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অগ্রদ্বীপে গোপীনাথজী দর্শন-পূর্ব্বক নবদ্বীপে উপস্থিত হন। তৎপরে বল্লভপুরে ভবানন্দের বাটীতে সবিশেষ সমাদরের সহিত কয়েক দিবস বাস করিয়া ভবানন্দসহ যশোহরে উপনীত হইয়া প্রতাপকে গ্রেপ্তার করত দিল্লী প্রেরণ করেন। প্রত্যাগমনকালে তিনি ভবানন্দকে চতুর্দ্দশ পরগণার জমীদারী প্রদান করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের সময়ে বাদশাহ ব্যতীত দেওয়ান, দারোগা, কাজী, মুফতী, মহতসিব, ফৌজদার, কানুনগু, কোতয়াল প্রভৃতি নানা লোকের উপর রাজ্যের নানা কার্য্যের ভার থাকিত। রাজস্ববিভাগে নায়েব, [...]শকার, খাজানচী, গোমস্তা, মহাফেজ, [...]াহরের, তহশীলদার প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ [...]র্ম্ম করিত। আদল শব্দের অর্থ বিচার। আদালত শব্দের অর্থ বিচারের স্থান। রবিবারকে রোজ আদালত কহিত। ঐ দিবস সম্রাট স্বয়ং গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতেন। কাজির হস্তে উত্তরাধিকার-বিচার, [...] পৌরহিত্য-কার্য্যের ভার ন্যস্ত [...]কত। [...]তীগণ শাস্ত্রার্থ-ব্যাখ্যাতা [...]লেন। কিন্তু হুইলার সাহেব (Talboys Wheeler) বলেন—"The Cazis were judges, and decided law cases; the Muftis were officers appointed to enforce the observance of religious duties."

আমরা হুইলার সাহেবের এ ধারণার অনুমোদন করিতে পারিলাম না। মহতসিব মাতাল বা নেশাখোরদিগের শাসন এবং ব্যবসায়ীদিগের পরিমাণ দ্রব্যসকল পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। কানুনগু ভূসম্পত্তির রেজেষ্টরী ও কোতোয়াল রাত্রিতে নগর-রক্ষা করিতেন। অধ্যাপনাকার্য্যে মুন্সী, মৌলবীরা নিযুক্ত থাকিতেন। সাতখানি কোরাণ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ থাকিলেই, তিনি হাফেজ নামে অভিহিত হইতেন। হাফেজগণ মুসলমানসমাজে বড়ই সম্মান পাইয়া থাকেন।

এইবার আমরা ইংরাজাধিকারে বঙ্গের বিবরণ প্রকাশ করিব। ইংরাজাধিকারে বঙ্গের উত্তরদিকের সীমা নেপাল, ভূটান ও সিকিম, পূর্ব্বসীমা আসাম দেশ। দক্ষিণ সীমা ভারতীয় আখাত। দক্ষিণ পশ্চিম উড়িষ্যা ও গণ্ডআনা; এবং পশ্চিম সীমা বেহার। ইহার পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩৫০ মাইল বিস্তৃতি। উত্তর দক্ষিণে ৩০০ মাইল। ইহাতে যশোহর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের, কটক, বালেশ্বর, মেদিনীপুর, মুরশিদাবাদ, রঙ্গপুর, ঢাকা, শ্রীহট্ট, পাটনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি কয়েকটি জিলা আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে আসামও [...]দেশ মধ্যে পরিগণিত ছিল। এক্ষণে স্বতন্ত্র। সম্প্রতি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সকল নিম্নলিখিত আটটী

প্রেসিডেন্সীতে বিভক্ত হইয়াছে। যথা; (১) বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী (বেঙ্গল, বেহার ও উড়িষ্যা সহিত); (২) উত্তরপশ্চিম প্রদেশ (ইহার মধ্যে করদ এবং মিত্ররাজ্যসকলও পরিগণিত); (৩) পাঞ্জাবপ্রদেশ; (৪) মধ্যপ্রদেশসকল (ইহাতেও কয়েকটী করদ রাজ্য আছে); (৫) ব্রিটিস্ ব্রহ্ম (পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ ভারতের অন্তর্ভূক্ত ছিল না, কিন্ত এক্ষণে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন বলিয়া উহাকেও ভারতবর্ষ মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে); (৬) আসাম (এই রাজ্য এক্ষণে চীফ্ কমিসনরের অধীনে রক্ষিত হয়; (৭) বম্বে প্রেসিডেন্সী; (৮) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী।

পারস্যভাষায় একটী প্রবাদ আছে—'না বোরদা রনুজ গনজ্ ময়চ্ছর ন মীশোদ' অর্থাৎ, দুঃখ না সহিলে সম্পত্তি লাভ হয় না। আরবীয় ভাষায় বলে—'ইনুনামা আল আছরে ইয়েছরা কায়েনু নামা আল আছরে ইয়েছরা' অর্থাৎ দুঃখের পর সুখ হয়। সংস্কৃতে বলে—'নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে'। দুঃখ ব্যতীত সুখলাভ হয় না। লাটীন ভাষায় আছে—'Fel latet in melle'. দুঃখব্যতীত সুখ কোথায়?

ইংরাজগণই উক্ত প্রবাদগুলির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুবা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া অকূল পাথারে অনাহারে এবং ঝটিকাদিবি[illegible]পাতে সহস্র সহস্র লোকের [illegible] করিয়া পূর্ব্বদেশে[illegible] বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা তাহাদের চিত্তে বলবতী হইবে কেন? অষ্টম হেন্‌রির রাজ্যকালে রবর্ট থরননায়ক এক বণিক্ চীন[illegible] সহিত বাণিজ্যের কথা তুলেন। তা[illegible] ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুন তিনি খানি [illegible] পোতে সর হগ উইলুবীর অধীনে গ্রীন[illegible] হইতে যাত্রা করে; পথিমধ্যে দুই [illegible] লোকজনসহ বিনষ্ট হয়; এক খানি [illegible] ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়াছিল। ১৫৭৭ খৃষ্টা[illegible] ১৩ই ডিসেম্বর ফ্রান্সিস্ ড্রেক পাঁচ [illegible] জাহাজ লইয়া ভারতাভিমুখে যাত্রা করে[illegible] কিন্তু আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর[illegible]ক্ষিণ করিয়াই প্রত্যাগত হন, ভারত তাঁ[illegible] নেত্রপথে পতিত হয়নাই। এই অভিযানে[illegible] বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হই[illegible]ছিল। ১৫৮২ সালের ১লা মে অগস্ত্য-যা[illegible] এডওয়ার্ড ফেণ্টন চারি খানা জাহাজ ল[illegible] বহির্গত হন; কিন্ত একখানিমাত্র [illegible] লইয়া স্বদেশবাসীকে কালামুখ দেখাই[illegible]ছিলেন। ১৫৯১ অব্দে এক বণিকব্যূহ [illegible] খানি অর্ণবযান লইয়া যাত্রা করিল। কি[illegible] দূর আসিলে সমুদ্রের বিসদৃশ বায়ু লাগি[illegible] অনেক লোক গলগণ্ড-রোগে প্রাণত্যা[illegible] করিল। অবশিষ্ট সকলেই প্রায় জীবন্মৃ[illegible] হইল। তজ্জন্য "রএল এডওয়ার্ড" [illegible] অগ্রসর না হইয়া রোগীদিগকে লই[illegible] প্রত্যাগমন করিল। দুই খানি ভারতাভিমু[illegible] আসিতেছিল। তন্মধ্যে 'পেনিলোপ' [illegible] পর্য্যটন-ক্লেশে আক্রান্ত হইয়াই সমুদ্রগ[illegible] বিশ্রাম করিতে গেল। এখন কেবলম[illegible] 'এডওয়ার্ড'ই কর্ত্তব্যসাধনে উন্মুখ হই[illegible] পূর্ব্ব মুখে চলিতে চলিতে ব্রেজিলের উ[illegible] কূলে পৌছিল। আরোহীরা প্রায় অনেক[illegible] [illegible] অবতরণ করিয়াছে, এমন সম[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]হাজ বায়ুবেগে যে কোথায় চলিয়া গেল, [illegible]দুই ঠিকানা হইল না। পোতাধ্যক্ষ [illegible]কেষ্টার সাহেব অপর চয়জন লোকের [illegible]হিত একখানি ফরাসী পোতে উঠিয়া স্ব[illegible]জাতিমুখে চলিলেন; আসিতে আসিতে [illegible] জনই মানবলীলা সম্বরণ করিল; অন[illegible]রে তিনি একাকী ১৫৯৪ অব্দের ২৪শে তারিখে ইংলণ্ডে পৌছিলেন।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে এলিজিবেথের রাজ্য[illegible]লে ত্রিশ সহস্র পাউণ্ড মূল ধনে ইষ্ট [illegible]ণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়। পঞ্চদশ [illegible]তাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই পর্ত্তুগীজরা ভার[illegible]তের সহিত বাণিজ্যের উদ্যোগে ছিল। [illegible] শতাব্দীর শেষ ভাগে ভাস কো ডিগামা [illegible] ক্ষুদ্র তিন খানি তরি লইয়া ভারতাভি[illegible] প্রস্থান করিলেন। ১৪৯৮ সালের ২০ [illegible] মে কালিকাটে পৌছিয়া তত্রত্য মুর[illegible]তীয় জমরিন (বাদশাহ) সমীপে পর্ট্[illegible]লের রাজার দত্ত উপহার গুলি প্রদান [illegible]রিলেন। পাঠক! ইয়ুরোপীয় ঐশ্বর্য্য [illegible]খিতে চানত একবার আমার সঙ্গে [illegible]সিয়া উপহার গুলি স্বচক্ষে দেখিয়া নয়ন [illegible]ক করুন। ঐ দেখুন চারি খানি সালুর [illegible]ড় উপর্য্যুপরি রাখা হইয়াছে। এই [illegible]ড় আমাদের দেশের জমিদারেরা পূজা [illegible]অন্যান্য পার্ব্বণের সময় আপনাদের বাটীর [illegible]ইকদিগকে দিয়া থাকেন। তার পর ঐ [illegible]নে ছয়টি সোলার টুপি। ঐ সোলার [illegible]দশীয়ের কি কার্য্য হইবে? প্রকৃত অব[illegible]থাকিলেও একদিন উহারা চকমকির [illegible]কর্ষণ হইত। তৎপরে দেখুন চারি[illegible] [illegible]লশাখা, ছয়টি almasar এবং [illegible]কতক [illegible] পিত্তল-নির্ম্মিত [illegible]। এদিকে দেখুন এক বাক্স শর্করা, দুই পিপা তৈল এবং এক পিপা মধু। আমমাংসভোজী ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট শর্করা উপাদেয় এবং দুষ্প্রাপ্য বটে, কিন্ত ভারতে যে বর্ষে বর্ষে কোটি কোটি মন শর্করা প্রস্তুত হয়, তাহা তাহারা স্বপ্নেও জানিত না। যাহারা তৈলাভাবে চর্ব্বি মাখে, তাহাদের কাছে তৈল অবশ্যই বহুমত হইবে; তাই অদ্য ভারতীয় সম্রাট সমীপে তৈলোপহার প্রদত্ত হইয়াছে। মধুপাঠানর কারণ বলি শুনুন। বোধ করি আমাদের বেদোক্ত—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধিঃ মধু নক্তো মুতোষসো। মধুমান্ নঃ বনস্পতিঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমানু অস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ'

এই শ্লোকটি কোন গতিকে ইয়ুরোপীয়দিগের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। তাই তাহাদের ধারণা হইল—যখন ইহারা বায়ু দ্বারা মধু বিক্ষিপ্ত হউক; সমুদ্র মধুক্ষরণ করুক; ঔষধি সকল মধুময় হউক; প্রাতঃসন্ধ্যাও মধুব্যাপ্ত থাকুক; আমাদের বৃক্ষ মধুময় হউক; পৃথিবীর ধূলাও মধুময় থাকুক। আমাদের পিতা মধু দিন; সূর্য্য মধুমান হউন; এবং গাভীরাও মধু প্রদান করুক; ইত্যাদি [illegible] বলে লোকের [illegible] মধু চাহিতেছে, তখন মধু অবশ্যই ইহাদের ঈপ্সিততম হইবে, এইরূপ ভাবিয়াই পর্ট্গালের রাজা মধু পাঠাইয়া থাকিবেন।

TIGHT BINDING

এই সমস্ত অদ্ভুত উপহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জমরিন হাস্য-সম্বরণ করিতে পারেন নাই। পাঠকগণও বোধ হয় পারিবেন না। ইহার একশত বৎসর বিশ পরে সার টমাস রো ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম জেমস প্রদত্ত কতকগুলি উপহার লইয়া জাহান্‌গীরের রাজসভায় আসিয়াছিলেন। চলুন না, একশত বিশ বৎসরে, ইহারা কি উন্নতি করিয়াছে দেখিয়া আসি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সংস্থাপিত হয়। উক্ত কোম্পানি সুরাটে কারখানা করিয়া বাণিজ্য করিতে ছিল। দূত রোসাহেব তথায় পৌছিবামাত্র তাঁহার সম্মান প্রদর্শনার্থ আটচল্লিশটী তোপ হয় এবং অর্ণব পোত সকল পতাকা-শোভিত থাকে। কিন্তু ইনিই জাহানগীরের দ্বিতীয় পুত্র পারবেজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে-গিয়া রাজদরবারে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায় জানাইলে পারবেজ বলিয়াছিলেন—

নহ সাহে ফারস নহ বুজুরগ সুলতানে তুর্কস্থান বরায় দর আমিদনে আঁ মজলিস এজাজত য়াফ্‌তে।

'Neither the Shah of Persia nor the Grand Turk would have been permitted to enter the gallery'.

সেই জন্য আমরাও বলি 'আপনে ঘর কা [illegible] বাদশা হৈ' (pr হ্যায়) অর্থাৎ আপনার ঘরে সকলেই [illegible]। রো সাহেব জাহানগীরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপহারগুলি প্রদান করিলেন। উপহার [illegible] একটী ছোটখাট প্রিয়ানো (বাদ্য-বিশেষ); একখানি তলবার; একখানি কারুকার্য্যময় ওড়না; কতকগুলি ছুরি ও একখানি কোচ। সম্রাট উপহারগুলির অকিঞ্চিৎকরত্বে বিক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছেন—

[illegible] গর শ্বাহে ফেরেঙ্গ সুলতানে বুজুরগ বুদে লারয়েব আঁ চন্দ জওআহেরাত বেশ কিম্মত ব(Pre)[illegible] তুরহায় বেবহারা ফিরিস্তাদে।

'If the King of England had been a great sovereign, he would at least have sent some precious stones and pearls.

অহো ঐশ্বর্য্যদৃপ্ত প্রভু জহাঁপনা! তুমি স্বর্ণভূমির অধিপতি! তোমার তুল্য ঐশ্বর্য্য পৃথিবীতে কার আছে? তাহাদের আবাসভূমিত তোমার আবাসভূমির ন্যায় রত্নগর্ভা নয়! তাহারা মাণিক মুক্তা জহরৎ কোথায় পাইবে? তোমরা অঙ্গরক্ষিণীর উপর মণিমুক্তা দিয়া খচিত কর, তাহারা উভার কোটে লাকলাইন দড়ি আঁকা বাঁকা করিয়া বসাইয়া আপনাদের শখ মিটায়। তোমাদের মুকুটে হীরা মাণিক মুক্তা ঝলমল করে, তাহাদের টুপির উপর বগের পালক মন্দপবনে দুলিয়া দুলিয়া আপন লঘুত্বের পরিচয় দেয়। অয়স্কান্ত, সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, মরকত, পদ্মরাগাদি কত কত মহামূল্য প্রস্তরে তোমাদের প্রাসাদ কেমন উদ্ভাসমান, আর রঙ্গ বরঙ্গের কাচপাত্রে তাহাদের গৃহ ও টেবিল কেমন সুসজ্জিত। তোমাদের রাঙ্কব ও ক্ষৌম ব[illegible] তা[illegible]র বাঞ্ছনীয় বলিয়াইত, তাহারা তা[illegible]তের সমস্ত [illegible]ট তুলা টানিয়া লইতেছে।

তোমরা জন্মতিথিতে তুলা করিয়া আপনাদের সমভারের রজত কাঞ্চন দরিদ্রসাৎ কর, তাহাদের জন্মতিথিতে নিমন্ত্রিতগণ এক এক গ্লাস মদ লইয়া 'I drink such and such's health' বলিয়া কার্য্যশেষ করে। তোমাদের দেবালয় বা মসজিদ সকল স্বর্ণমণ্ডিত ও বহুমূল্য-প্রস্তর-খচিত এবং উৎসবাদিতে তাহারা নবনব সজ্জায় সমুজ্জ্বল হয়, আর তাহাদের উৎসবে উপাসনাগার গুলি দেবদারু পত্র ও গেঁদাফুলেই ভূষিত হইয়া থাকে। তোমরা সুগন্ধি সুসংস্কৃত পলান্ন-ভোজনে আপনাদের রসনাতৃপ্তি কর; তাহারা অর্দ্ধপক্ক মাংস রাই সরিসার গুঁড়া ও লবণ দিয়া খাইতে পাইলেই চরিতার্থ হয়। তোমাদের সাচ্চা, তাদের গিলটী; তোমাদের চাঁদী, তাদের জার্ম্মাণ সিলভার; তোমাদের স্ফটিক, তাদের কাচ। জুলিয়স এগ্রিকোলা ব্রিটনদেশ আক্রমণ করিয়া সমুদ্রকূল হইতে কতকগুলি কড়ি লইয়াই প্রত্যগত হয়; কিন্তু সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া মামুদ গাড়ি গাড়ি সোণা, হীরা, মাণিক, মুক্তা ও প্রবাল লইয়া গিয়াছিলেন। ভাস কো ডিগামা কালিকাটের পাদশাহার সভাকুট্টিমের অনুপম সৌন্দর্য্য-দর্শনে স্বীয় নিমেষকেও বঞ্চনা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সার টমাস রো পারবেজের দরবার দেখিয়া হতজ্ঞান হন; এবং জাহানগীরের দরবারে প্রবেশ করিয়া মনে করেন, আমাদের দেশের কৈ কিছুইত এরূপ সৌন্দর্য্যশালী নহে। তবে লণ্ডনের কোন কোন সমৃদ্ধ রঙ্গালয় এইরূপ দেখায় বটে। ভারতবর্ষের এই ঐশ্বর্য্যলোভে আকৃষ্ট হইয়াই ত ইয়ুরোপীয়েরা ভারতে আসিতে উন্মুখ হইয়াছিল; এবং এই লোভেই ইংরাজ দুই শতাব্দী ধরিয়া কত ক্লেশ, কত বিপদ, কত অবমাননা সহ্য করিয়া আজ ভারতের একচ্ছত্রী হইয়াছে। ভারতীয় সন্তানগণ! যে দিন রো সাহেব পারবেজের দরবারে প্রবেশাধিকার না পাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, সেই এক দিন; আর আজ বজোরে মণিপুরের রাজভবনে প্রবেশ করতঃ কত বিসদৃশ কাণ্ডই না করিল, এই এক দিন, একবার ভাবিয়া দেখুন। যে দিন একটু স্থানের জন্য ইংরাজ আবেদন-পত্র-হস্তে ভারতীয় সম্রাট বা রাজাদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলেন, তাদের সেই এক দিন; আজ আবার সেই সকল দেশীয় রাজাই ইংরাজের কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে, রেসিডেন্টের ক্রীড়াপুত্তুল, মূকবৎ নির্ব্বাক, পঙ্গুবৎ পরাপেক্ষ, তাদের এই একদিন। যে দিন চার্ণক সাহেব সম্রাট আরেঙ্গজেবের আক্রমণে ভীত হইয়া সুতানুটী পরিত্যাগ করত সুন্দর বনের জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিলেন(১) ইংরাজ বণিকের সেই এক দিন; আর যখন কন্সেণ্ট বিলের নামেই ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় বিশ কোটী হিন্দু 'প্রভু রক্ষা কর, প্রভু রক্ষা কর' বলিয়া কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিলেও সার্থক রাজপুঙ্গব লান্সডাউন [illegible]

(১) কোন কোন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, হুগলি হইতে সুতানুটীতে পলাইয়া আইসেন। এপর্য্যন্ত কি ইংরাজি কি [illegible] যত ইতিহাস বাহির হইয়াছে, সকলেরই মত প্রায় ভিন্ন ভিন্ন। আমরা ইতিহাসসমালোচন কালে সে সমস্ত বিবৃত করিব।

TIGHT BINDING

তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না—ইংরাজ রাজ্যের এই এক দিন। যে দিন পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া এবং ভবিষ্যতে সম্রাটের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কোম্পানি পূর্ব্ববৎ বাণিজ্যের ফারমাণ প্রাপ্ত হয়, ইংরাজের সেই এক দিন; আর যে দিন বিনা বা অত্যল্প অপরাধেই জিঘাংসী ইংরাজ আপনার ও শত্রুর বলাবল ভাবিয়া রাজনীতিবিরুদ্ধ চতুর্থ উপায়ে ব্রহ্মরাজকে বন্দী করিল, জিগীষু ইংরাজের এই এক দিন। যে দিন রাজবিদ্রোহাপরাধে জহানগীরের আদেশানুযায়ী অম্বোয়নানগরে বার জন শ্বেতচর্ম্মের ফাঁসী হয়, এবং এই নিদারুণ সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া জেমসের কর্ণ-প্রবিষ্ট হইলেও তিনি প্রতীকারবিমুখ ছিলেন—সময়জ্ঞ ইংরাজের সেই এক দিন; আর যে দিন সেই রাজদ্রোহিতার আরোপ করিয়া যুবরাজ টিকেন্দ্র ও বৃদ্ধ টাঙ্গালকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেশীয়-হত্যার প্রতিশোধ লইল. নীতিমান বিদেশীয়ের এই এক দিন। শতাব্দীদ্বয়মধ্যেই আমরা এইরূপ বিরুদ্ধ দিনের যে কত শত সমাবেশ দেখিতে পাই, তাহা লিখিতে গেলে অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য আমরা আরও অধিক লিখিতে অগ্রসর হইলাম না। কিন্তু পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ, যেন তাঁহারা ইহাদের কার্য্যের উপর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। কেবলই 'ইংরাজের রাজ্যে আমাদের সুখের একশেষ হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের যুগান্তর উপস্থিত; আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি' বলিয়া গুণগান করিবেন না।

ইংরাজেরা ভারতে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া শেষে ফাল হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমে বসিবার জায়গা লইয়া শেষে চৌদ্দপোয়া হইয়াছেন। আদৌ সুরাটে কারখানা খুলিয়া বসিলেন। ক্রমে মান্দ্রাজ বোম্বাই পাইয়া একটু কান্ত হইলেন। পরে পাটনা কাশিম বাজার পাইয়া দুইপা ছড়াইলেন। শেষে হুগলি কলিকাতা পাইয়া চিৎপাত হইয়া শুইলেন। ইহাদের কারখানায় এখন বেশ লাভ হইতেছে, সুতরাং তাহারা স্থানে স্থানে বিক্রম-প্রকাশেও পরাঙ্মুখ নহে। উর্দ্দুতে একটী প্রবাদ আছে—'বন্ আই পর অহমক দানা হোতা হৈ।' অর্থাৎ, ভাগ্যপ্রসন্ন হইলে নির্ব্বোধও বুদ্ধিমান হয়। তাই ইংরাজ আজ আত্মরক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছে বিলাতবাসীরা এখন এদেশে আসিতে হইলে বলে – We are going to make a fortune'. বিলাতবাসী শুনিয়াছে—'There is money every-where in India; on the trees, under the ground, and sometimes scattered over it.' তাই পঙ্গপালের ন্যায় ইংরাজ আজ ভারতে প্রবেশ করিতেছে। যে millionaire শব্দ ইংলণ্ডের রাজার নিকটেও তিষ্ঠিতে পারে না, ভারতের ঘরে ঘরে সেই শব্দ বিরাজমান। সাত্ত্বিক হিন্দুর শিক্ষা—

> অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
> নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।

> পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
> সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥

রাজসিক ম্লেচ্ছের কাছে—

> 'Money is all, money is all,
> Without money you must full.'

অর্থপিশাচ ইংরাজ এই মহামন্ত্রই শিরোধার্য্যকরতঃ তীব্রবেগে ভারতাভিমুখে ছুটিয়াছে। ফরাসী গবর্ণর ডিউপ্লে ভারতের কার্য্যে স্বীয় বেতন ব্যতীত ত্রিশ লক্ষ টাকা pocket expense করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন কোম্পানির ধনাগার হইতেও ঋণস্বরূপ প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করেন। পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজদিগের যে ক্ষতি হয়, উহার পূরণার্থ মীরজাফর দুই কোটী বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করে। তদ্ভিন্ন সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজের খরচার স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হয়। কলিকাতা কমিটীর প্রত্যেক সভ্য দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ক্লাইব স্বয়ং দুই লক্ষ আশী হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বাবেও তিনি ষোল লক্ষ মুদ্রা হস্তগত করেন। তিনি স্বমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে তাঁহার তেইশ লক্ষের কম লভ্য হয় নাই। প্রথম কিস্তীর আশী লক্ষ টাকা নৌকা বোঝাই হইয়া মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আইসে। যক্ষ্মারোগে মীরণের মৃত্যু হইলে তদীয় ভগিনীপতি মীরকাশিম মীরজাফরের বিনাশার্থ মিষ্টার হলওয়েলকে তিন লক্ষ এবং মিষ্টার বান্সিটার্টকে প্রায় ছয় লক্ষ মুদ্রা প্রদান করে। [illegible], বাঙ্গালার সিংহাসনের জন্য মীরকাশিম ইংরাজদিগকে উৎকোচ দিয়াই বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিল। বকসারের যুদ্ধে জয়ী হইয়া মেজর মনরো জহরত ও নগদ মুদ্রায় তিন কোটি টাকা হস্তগত করে। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তদীয় দ্বিতীয় পুত্র নজম-উদ-দৌলা পিতার উত্তরাধিকারী হইবার বাসনা জানাইয়া কলিকাতা কৌন্সিলের Senior Officer দিগকে তের লক্ষ তিরাশী হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা প্রদান করে। মিল সাহেব তদীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ইংরাজদিগের উৎকোচাদি এবং কোম্পানির ক্ষতিপূরণাদিতে মুরশিদাবাদের ধনাগার হইতে পাঁচ কোটি চুরাশী লক্ষ চারি হাজার নয় শত আশী টাকা বহির্গত হইয়াছিল। অযোধ্যার উজীর রোহিলখণ্ডের স্বত্ব পাইবার জন্য হেষ্টিংস সাহেবকে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস ইংরাজ সৈন্যদিগের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলাকে মাসিক দুইলক্ষ, ছয়ষট্টি হাজার টাকা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অমিতব্যয়ী সুজার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল। তাহার খোর্দ্দমহলের ব্যয় মাসিক বিংশতি সহস্র তঙ্কা। তৎকালে অযোধ্যার রাজস্ব বার্ষিক বিশ লক্ষের অধিক ছিল না। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যের ব্যয়ই বৎসরে ত্রিশ বত্রিশ লক্ষ। সুজা প্রতি মাসেই ঋণী হইতে লাগিল। কোম্পানির কাছে ক্রমে ক্রমে এ বৎসরের বাকী পড়িল। হেষ্টিংস টাকা আদায়ের জন বেগম দিগের স্ত্রীধন-লুণ্ঠনের পরামর্শ দিলেন। নিষ্ঠুর সুজা তাহাতেই সম্মত হইল এই কার্য্যে হেষ্টিংসের বিলক্ষণ লাভ হয়। বেনারসের রাজার নিকটেও বাকি তিনি দশ লক্ষ টাকা লইয়াছিলেন। তদীয়

সুপ্রসিদ্ধ কবি William Cowper তদুদ্দেশে কয়েকটী পংক্তি আবৃত্তি করিয়াছিলেন, আমরা এ স্থলে তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না —

Hastings! I knew thee young, and of a mind.
While young, humane, conversable and kind,
Nor can I well believe thee gentle then,
Now grown a villain and the worst of men.

চৈৎসিংহকে আক্রমণ করিবার জন্য বিজয়গড় অবরুদ্ধ হইলে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কর্ণাল পোপহামের হস্তগত হয়। এরূপ শুনা যায়, গবর্ণর জেনারেলের আদেশমতে উহার অধিকাংশই সৈন্যমধ্যে পুরস্কারস্বরূপ বিতরিত হইয়াছিল। গবর্ণর রামবণ্ড মাদ্রাজে থাকিয়া নানা অসদুপায়ে জমিদারদিগের নিকট হইতে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা হস্তগত করেন। কার্ণাটিকের নবাবের নিকট পল বেনফিল্ড বজোরে চত্বারিংশৎ লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, যে তিনি ষষ্ট লক্ষ মুদ্রার জন্য নবাবকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে পূর্ব্বোক্ত সংখ্যক মুদ্রাই গ্রহণ করিতে সম্মত হন। পাঠক! একবার ধীরচিত্তে ভাবুন দেখি, ভারতের কত টাকাই শ্বেতপুরুষের উদরসাৎ হইয়াছে। বিকল নরের [illegible] পড়িয়া সোণার লঙ্কার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তদ্বংশজাত ইংরাজের হস্তে আজ সোণার ভারতেরও সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ভারতের ধনাপহরণে শ্বেতদ্বীপ দিন দিনই সুসমৃদ্ধ হইতেছে, আর যাহাদের ধন, তাহারা এখন পথের কাঙ্গালি! মুষ্টিমেয় উদরান্নের জন্য শ্বেত পুরুষের পদানত। ভারতমাতা জরতী হইলেও এখনও প্রচুর 'দুগ্ধ' প্রদান করে। সেই দুগ্ধ খাইয়া এখনও কোটি কোটি ভারতসন্তান হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু শোষক ইংরাজ সেই সব মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া দিন দিন ভারত সন্তানকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। অহো দুর্দ্দৈব! ভারতের ভাগ্যে কি এই ছিল? ভাবিতেও যে হৃৎকম্প হয়, তবে লিখিব কিরূপে; ভারতে ইংরাজাধিকার লিখিতে গেলেই যেন আমাদের হস্ত অবশ হইয়া যায়; মুখ হইতে আর শব্দ বহির্গত হয়না; কি এক অভূতপূর্ব্ব অনুশোচনা আসিয়া যেন আমাদের অন্তর দগ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গে কণ্টকবিদ্ধ করিতে থাকে। যেন মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ছটফট করিতে থাকি। কিছুতেই বাষ্প-বারি সম্বরণ করিতে পারিনা। তজ্জন্য আমরা আর অধিক ইংরাজ-কাহিনী লিখিতে পারিলাম না। পাঠক মহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন। যদি কখন ভারতের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া আপনাদের সেই ক্ষোভ মিটাইতে পারি, তজ্জন্য সময়ান্তরে চেষ্টা করিব।

এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমরা একটী বিষয়ের অবতারণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজকাল দেখিতেছি, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিশিষ্টতা-লাভেচ্ছায় অনেকেই বিব্রত। তজ্জন্য অনধিকারচর্চ্চার পরাকাষ্ঠা দেখা যাইতেছে। যাঁহার চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কাহারও কর্ণে বৈদিকমন্ত্র প্রবিষ্ট হয় নাই, তিনি এখন

বেদের সংকর্ত্তা বা সর্ব্বময়কর্ত্তা। যাঁহাদের বংশের আদিকাল হইতে ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত কেহ কখনও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলাপ করেন নাই, তাঁহারা এখন ধর্ম্মশাস্ত্রের জন্মদাতা এবং পোষয়িতা। যুগযুগান্তরে যাঁহারা কখনও উপনিষদ আরণ্যকের নামও জানিতেন না, তাঁহারা এখন উহাদের নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার করতঃ কোন দিনে উহাদের জন্ম, তাহাও স্থির করিয়া দিতেছেন। এতাদৃশ অনধিকারচর্চ্চীদিগের দ্বারা দেশের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। আমরা এইস্থলে দুই একটীর নামোল্লেখ করত, তাঁহাদের অনধিকারিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইব।

মিষ্টার আর, সি, দত্ত ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইঁহার Literature of Bengalএ ইঁহার সাহিত্যজ্ঞতার পরিচয়; আর ইঁহার ঋগ্বেদসংহিতা ইঁহার বৈদিকপীরিয়ডজ্ঞতার পরিচায়ক। ইনি নাটকনবেল লিখিয়া Novelist হইয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া Text Book Committeeর লিষ্টে বিরাজ করিতেছেন; History of India লিখিয়া ইউনিভারসিটিতে ঢুকিয়াছেন। এই সমস্তই ইঁহার অনধিকারচর্চ্চা। তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস। যদ্যপি আপনার অধিগত বিষয়ের পঙ্কোদ্ধারে সচেষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারও মঙ্গল, এবং দেশেরও মঙ্গল হইত। মৎপ্রণীত কাব্যকুসুমের ভূমিকায় তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়া, তাঁহার লেখার ভাবভঙ্গির কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। তদীয় [illegible] নিচয়ের বিস্তৃত সমালোচনা [illegible] আমাদের এই সমালোচনীর যথা[illegible] স্থলে বিবৃত হইবে। এক্ষণে তদ্বিষয়ক অন্যান্য দুই চারিটী কথা এ স্থলে প্রকাশিত করা যাইতেছে। দত্তজ লিখিয়াছেন—'My esteemed friend Pandit Satya Vrata Sama Sramin has published an excellent edition of Samaveda'.

অহো বৈদগ্ধী! সামশ্রমিন্ কর্ত্তৃকারক! কেননা, উহা publishedএর Nominative. দত্তজ মহাশয় উপক্রমণিকার 'গুণিন' শব্দের প্রথমার এক বচনের পদ জানেন না; অথচ ঋগ্বেদের এডিসেন করিয়া ফেলিলেন। অধিকন্তু তিনি Sraminও স্বতন্ত্র পদ করিয়া উহাতে Capital Letter দিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পয়সা রাখিবার স্থান ছিলনা, তাই ইঁহাকে ঋগ্বেদের এডিডার করিয়া অনর্থক অজস্র অর্থ রাশি বরবাদ করিয়াছেন। এ দেশে কি আর লোক ছিল না!!!

রমেশ বাবু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতানুসরণে বড়ই মজবুত। অবশ্য তাঁহার এই ব্যাধি পূর্ব্বাবধি প্রবল না থাকিলে, বোধ হয়, তিনি বেদব্যাসের আসনাধিকারে লোলুপ হইতেন না। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পল্লবগ্রাহী বিদ্যার বলে ও আপনাদের অবিমৃষ্যকারিতার দোষে প্রায়ই শঙ্করে শাখামৃগত্ব বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকেই আজ কাল এক হুজুগ তুলিয়াছেন, যে কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এতৎপ্রতিপাদনার্থ তাঁহারা যে সকল [illegible] প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহাদের অকিঞ্চিৎকরত্ব দর্শাইয়া তন্মুখেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের স্থূলদর্শিতার পরিচয় দিব।

কিছু দিবস পূর্ব্বে Royal Asiatic Societyর জার্ণেলে (Vol. X X. Pt. I) 'Kalidas in Ceylon' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিষয়টির স্থূল তাৎপর্য্য আমরা এস্থলে বিবৃত করিতেছি।

পাঁচশত বাইশ খৃষ্টাব্দে সিংহলে কুমারদাস নামে এক নৃপতি ছিলেন। একদা তিনি কালিদাসকে তাঁহার সভায় আমন্ত্রণ করেন। রাজ কুমার এবং কালিদাস উভয়েই এক বরাঙ্গনাতে প্রেমাসক্ত হইলে, সিংহলেশ্বর তাহার গৃহভিত্তিতে একটী সমস্যা লিখিয়া উহার প্রত্যুত্তরদাতাকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। সমস্যা যথা—

বন তম্বরা মল বো তলা রেঁানট বাঁবি।
মল দেদারা পণ গলবা গিঁর সেবানি।

ইহার অর্থ এই,—বন্য মক্ষিকা পদ্মিনীর কোন হানি না করিয়া তাঁহার মধুপান করে ;—কিন্তু রাত্রিতে মুদিত পদ্মে আবদ্ধ হইলে, প্রাতঃকালে উহার বিকাশমাত্রেই প্রাণ লইয়া সত্বর স্বস্থানে প্রস্থান করে।

যথাকালে কালিদাস তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্যাবলোকনে তৎপাঠান্তে জানিলেন, যে তদুদ্দেশেই উহা লিখিত। তদনুসারে তিনিও উহার নিম্নে প্রত্যুত্তর লিখিয়া রাখিলেন। প্রত্যুত্তর যথা—

সিয়ত অম্বরা লিয় তম্বরা সিয়
সিয়ংস পুরা নিদি নো লবা উ[illegible]
সেবেনি।

ইহার অর্থ এই—সূর্য্য (সূর্য্যবংশী[illegible] রাজা) পদ্মিনীর (স্ত্রীর) সহবাসে ছু হই[illegible] তাহার সহবাস লাভ করে বটে, কিন্তু, তৎ[illegible] পরে তাহার (পদ্মিনীর) বিশ্রাম সুখলাভ হয় না।

পূর্ব্বোক্ত রাজার কবিতার ভাবার্থ এই যে, সেই বরাঙ্গনা পদ্মিনীতে কালিদাস ব[illegible] মক্ষিকা। তাহার উচিত যে সময়ে সময়ে পদ্মিনীর মধুপান করিয়া সর্ব্বদাই আপন জঙ্গলে থাকা ; আমি সূর্য্য, আমিই সর্ব্বক্ষণ উহার ভোক্তা। কালিদাসের কবিতার ভাবার্থ এই যে, যাবৎ সূর্য্য, তাবৎ পদ্মিনীর বিশ্রাম সুখ লাভ হয় না ; (অর্থাৎ, রাজা যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ সেই কামিনীর স্থির হইবার জো থাকে না) তজ্জন্য সে ব[illegible] মক্ষিকার (কালিদাসের) সহবাসাকাঙ্ক্ষিণী। কারণ, তৎসহবাসে তাহার বিশ্রাম আছে।

পর দিবস কুমার দাস বরাঙ্গনার গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সমস্যার প্রত্যুত্তর দর্শনে বিস্মিত হইলেন, এবং রচয়িতার নাম জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেও সেই নারী প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে কোন ক্রমেই ব্যক্ত করিল না। পুনর্ব্বার কালিদাস তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাহাকে হত্যা করিয়া গৃহমধ্যে প্রোথিত করত, স্বয়ং উহার রচয়িত্রী এইরূপ ভাবে রাজার নিকট পুরস্কারের প্রার্থনা করিল। তদ্বাক্যে নৃপতির প্রত্যয় জন্মিল না। তিনি কোটপালদিগকে আহ্বান করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার গৃহের আদ্যন্ত অনুসন্ধান করাইয়া কালি[illegible]

[illegible]দাসের মৃতদেহ প্রাপ্ত হইলেন। এই বিস্ময়াবহ-ব্যাপার-দর্শনে ভূভুক্ সংপরো[illegible]প্তি সংযুক্ত ও সুহৃৎশোকে একান্ত অধীর হইয়া অনন্ত চিতায় আত্মত্যাগ করিলেন।

বিষয়টীর স্থূল তাৎপর্য্য এই। তৎপরে লেখক মহাশয় Rhys Davids সাহেব লিতেছেন যে, উল্লিখিত আখ্যানটী আমি দুষ্প্রাপ্য Alwisএর 'সিদত সংগরব' নামক পুস্তকের ৬১পৃষ্ঠায়, এবং Knighton সাহেবের সিংহলেতিহাসের ১০৬ পৃষ্ঠায় দেখিয়াছি। কিন্ত, উক্ত দুই মহাত্মা যে কোথা হইতে এ সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা তাহারা আপনাদের পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। তজ্জন্য উহার সময়-নির্দ্ধারণও হয় নাই। ফলতঃ, সিংহলের কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকের ধারণা, যে, কালিদাস খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক।

পাঠকবর্গ! ব্যাপারটা ত আগাগোড়া [illegible]নিলেন। এক্ষণে আমাদের মন্তব্য [illegible]কাশ করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। [illegible]র্ব্বোক্ত উভয় কবিতারই রস-ভাব প্রণি[illegible]নে সহজেই আমাদের এরূপ উপলব্ধি [illegible]ইতেছে, যে উহাদের রচয়িতার দুই জনই [illegible]লিদাস। নতুবা, এইরূপ শ্লেষ ও ব্যঙ্গো[illegible]ক্তির রচনা তদিতর সম্ভব হয় না। যাহা [illegible]উক, Davids সাহেব যখন নিজেই স্বীকার [illegible]রিতেছেন, যে, তদধিগত পুস্তকদ্বয়ে কুমার[illegible]দাসের সময় নির্দ্ধারণ নাই, তখন তিনি কি[illegible]রূপে ৫২২ খৃষ্টাব্দ কুমার-দাসের রাজত্ব[illegible]কাল বলিয়া স্থির করিলেন। ইহারই নাম [illegible]বিছমোল্লায় গলদ'। প্রত্নতত্ত্বের অনেক [illegible]লই এইরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের [illegible]লাসয় হইয়াছে। 'কাকে [illegible]ড়ীর পাশে, কি গাছের পাতা বেটে খেলে, কি ব্যামো আরাম হয়' পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় নির্ব্বোধেরা এই প্রকারে রহস্য করিত, এক্ষণে চতুর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, হউক বা নাই হউক, Et de Potasheদের বাড়ীর পাশে Asania Maria গাছের পাতা বেটে খেলে Hopchites আরাম হয় বলিয়া, লোকের নিকট সমস্ত কিন্ত ধাতুজশব্দের পরিচয় দিয়া থাকেন। সেই পাশ্চাত্য প্রকৃতি বশতই Davids সাহেব ৫২২ খৃষ্টাব্দ কুমার দাসের রাজ্য কাল বলিয়াছেন। লীলাময় শ্বেতাঙ্গের লীলা বুঝা ভার—

ত্বয়া বাঙ্গালীশ ! পুরাতত্ত্বজ্ঞেন
যথা শ্রাবিতোঽস্মি তথা শৃণোমি !

এইবার তৎপরবর্ত্তী বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত আখ্যানটী সিংহল দেশে প্রচলিত আছে কি না, তাহাই জানিবার নিমিত্ত ত্রিনকমলিনিবাস কলিকাতাস্থ কেন্দ্রভদ্র নামক জনৈক প্রগাঢ় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আমি তিন চারি খানি সিংহলী ভাষার পুস্তক পাঠ করিলেও উক্ত ভাষায় তাঁহার সহিত আলাপ করিতে বা তন্মুখ-বিনির্গত সিংহলী ভাষা বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। এবং আমি অত্যল্প ইংরাজি বুঝিলেও তিনি তাহা বুঝেন না। তজ্জন্য, সংস্কৃত ভাষাতেই তৎসমীপে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে বলিলেন,—

"ন [illegible]তং, ন বা কদাপি শ্রুতম্" ॥

তদীয় বয়ঃক্রম অনুমিত পঞ্চাশৎ বৎসর

হইবে। যখন তিনি এই প্রবাদের বিন্দু বিসর্গও জানেন না বা শুনেন নাই; তখন ইহার মূল যে কতদূর দৃঢ় তাহা আমাদের অনুমানেও আইসে না। যাহা হউক, উক্ত প্রবাদ সিংহলের সর্ব্বব্যাদী সম্মত নহে। সুতরাং, কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক নহেন। এস্থলে আরও এক বিসম্বাদের সূচনা দাঁড়াইয়াছে। কালিদাস যে সিংহলী ভাষা জানিতেন, তাহা আমরা তদীয় জীবনচরিতে জ্ঞাত বা লোকপ্রবাদেও শ্রুত নহি। সিংহলী ভাষায় তাঁহার জ্ঞান থাকিলে তিনি অবশ্যই কোন না কোন গ্রন্থে, তাহার আভাস প্রদান করিতেন। অধিকন্তু, ইহা সকলেই জানেন, যে কালিদাস উজ্জয়িনী স্থিতা লক্ষহীরার গৃহে হত হইয়াছিলেন। একজন মনুষ্য কখনই দুই স্থানে মরিতে পারে না। অবশ্য এক স্থানের ঘটনা অলীক বলিতেই হইবে। তবে সিংহল-মৃত্যু অলীক, কি উজ্জয়িনী-মৃত্যু অলীক? এক্ষণে Majority লইয়াই এ বিষয়ের মীমাংসা হউক। পাঠকবর্গ! আপনারা কালিদাসের কোথায় মৃত্যু স্বীকার করিবেন, সিংহলে না উজ্জয়িনীতে? আমরা কিন্তু উজ্জয়িনী ভিন্ন অন্যত্র তাঁহার মৃত্যু স্বীকার করিতেই পারি না।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীর যদি কণামাত্রও সত্য হয়, তবে উহার মূল সিংহলে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল, তাহাই আলোচ্য হইতে পারে। আমাদের বোধ হয়, সিংহলে সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার [illegible] কোবিদবর কালিদাসের গ্রন্থনিচয় বা তদীয় জীবনচরিত কিছু অনধীত থাকে নাই। তদ্দ্বারা কালিদাসের বারাঙ্গনাগৃহে মৃত্যু সিংহলবাসীদের বিদিত ছিল। তন্নিবন্ধন তাহারা আপনাদের জন্মভূমি কালিদাসের পদরজে পূত ও তদীয় নামে অমরত্ব পাইবে এই আশায় উক্তরূপ সদৃশ ঘটনার অবতারণা করিয়া থাকিবে। দুইটি বিষয়ই প্রকৃত প্রস্তাবে সদৃশ। উজ্জয়িনীতেও রাজা এবং কালিদাস উভয়েই এক লক্ষহীরার প্রেমাসক্ত। সিংহলেও রাজা ও কালিদাস একই যোষিদ্বরায় অনুরক্ত। সিংহলেও অসদুপায়ে তাঁহার বধ, উজ্জয়িনীতেও কুটিল চক্রে পড়িয়া তাঁহার বিনাশ ঘটে। সিংহলেও কবিরাজের কবিতা দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ-পরপক্ষ। উজ্জয়িনীতেও বিক্রমাদিত্য-কালিদাসের শ্লোকদ্বয় উত্তর-প্রত্যুত্তর। সিংহলেও কুমারদাস এবং অষ্টম চিরঞ্জীবির এককালে বরাঙ্গনার গৃহে সাক্ষাৎকার ঘটিত না। উজ্জয়িনীতেও বিক্রমার্ক আর সরস্বতীর বরপুত্রের একই সময়ে লক্ষহীরার গৃহে বাস হইত না। 'আসমুদ্র করগ্রাহী ভবান্ যত্র করপ্রদঃ' এই শ্লোকার্দ্ধই তাহার প্রমাণ।

প্রতীচ্য সূরিগণের মধ্যে অনেকেই কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তদর্থে শুদ্ধ রমেশ বাবুরই উপরে দোষারোপ বিধেয় নহে। আমরা তাঁহার Ancient India বা শ্বেতকায় বিদ্বন্মণ্ডলীর মতামত পাঠ করিয়াও ইহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনি নাই; কারণ, সান্নিবেশ চিন্তা করিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, যে, তত্তদ্গ্রন্থপাঠক অনুপাতে অনেক কম; সুতরাং, উহাতে বিশিষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে নাই। সম্প্রতি রমেশ বাবুর বিদ্যালয়পাঠ্য ইউনিভার্সিটীর ষ্টাণ্ডার্ড কোর্স

মতি বালকবৃন্দের সহচর 'গ্রিক হিষ্টি অব ইণ্ডিয়া, এন্সাক্ট এণ্ড মডার্ণ' এতন্নামক পুস্তকেও সেই বিসদৃশ ঘটনার সমাবেশদর্শনে আমরা অতীব ক্ষুব্ধ হইয়াই তৎপ্রতিবাদে অগ্রসর হইতেছি। কেন না, যাহা প্রাচীন বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস, তাহাকে নব্যত্ব-প্রতিপাদন দ্বারা অহম্মুখতা-প্রকাশ করা অতীব গর্হিত। হিন্দুদিগের প্রাচীনতম বেদাদি শাস্ত্রনিচয় আজকাল ইংলণ্ডজ মনীষিগণের নিকট সার্দ্ধ-ত্রি-সহস্রিক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। 'অপৌরুষেয়-বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর তাহা সর্ব্বতোভাবেই অমর্ষণীয়। রমেশবাবু হিন্দু হইলে কখনই হিন্দুর গুহ্য প্রকাশে বদ্ধপরিকর হইতেন না। তজ্জন্য তাঁহার পুস্তক পড়িতে হিন্দুমাত্রেই নারাজ। উহাতে হিন্দুমতের বিরুদ্ধ অনেক কথার সমাবেশ রহিয়াছে। তাহার দিঙ্মাত্র নিদর্শন এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। ১ম, পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মধ্যে কবরপ্রথা প্রচলিত ছিল। ২য়, বিধবাবিবাহ তাহাদের আদৌ প্রতিহত ছিল না। ৩য়, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার ষোলকলাই তাহাদের ভোগে আসিত। ৪র্থ, জাতিভেদের নামও তাহারা শুনে নাই। ৫ম, অনুলোমপ্রতিলোমাখ্য দ্বিবিধ অসবর্ণ-বিবাহই তাৎকালিক আচারবিরুদ্ধ বলিয়া কেহই জ্ঞান করিত না। ৬ষ্ঠ, নরনারীর প্রবুদ্ধ দশাতেই বিবাহকার্য্য সমাহিত হইত, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। সহৃদয় পাঠকবর্গ বলুন দেখি, ইহার কোন্ কথাটিতে হিন্দুর আস্থা হইতে পারে? এমনিই ত ইংরাজি শিক্ষার তীব্রতায় বিকৃতমস্তিষ্ক বঙ্গীয় ছাত্রমণ্ডলী বৈদেশিক আচার-ব্যবহার-দর্শনে অস্মদীয় আচারব্যবহারের উপর নাসিকাকুঞ্চন করতঃ উহাদের মূলোৎপাটনে উদ্যত, তাহাতে আবার যদি তাহারা ঐ সকল আচারব্যবহার বেদাদিশাস্ত্রসম্মত বলিয়া বেদগুরু রমেশবাবুর নিকট শিক্ষা পায়, তাহা হইতেইত একেবারে সর্ব্বনাশ! হিন্দুদের ঐ সকল প্রথা পূর্ব্বে ছিল কিনা, তাহা আমাদের এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি, যদি কথামালা বা বোধোদয়ের ছাত্রদিগকে ডারউইনের মতানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া যায়, যে, 'তোমরা পূর্ব্ব জন্মে বাঁদর ছিলে; বাঁদর হইতে মনুষ্য হইয়াছ; কেন না, মনুষ্যত্বে ও বাঁদরত্বে সাম্য গুণ অনেক', তাহা হইলে যেমন শিক্ষাদাতার বাতুলত্ব প্রকাশ পায়, পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণ গুলিতেও তদ্রূপ রমেশ বাবুর সেই—ত্ব ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। কারণ, ডারউইনের থিওরী শিখিবার সময় আট বা দশ বৎসর নয়। আর বেদমর্ম্মগ্রহণের কালও কিছু পনর ষোল বৎসরে হইতে পারে না। যাহারা ঐ ঐ বিষয় জানিবে, তাহারা যথাসময়ে উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে, তজ্জন্য নানা উপায় আছে। পাঠ্য পুস্তকে উহাদের সমাবেশ মঙ্গলজনক নহে। এতাদৃশ বিরুদ্ধ ও বিগর্হিত পুস্তককে পাঠ্য-মধ্যে পরিগণিত করিতে ইউনিভার্সিটী আদৌ ইতঃস্তত করিলেন না। করিবেন কেন, 'মহত্তর মহতের উপরই নজর পড়ে', এ নীতি ত চিরন্তন। নবগ্রহময় বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল গ্রহই যে কালধর্ম্মে কুজগ্রহের গুণলাভ করিয়াছে, ইহাই বিস্ময় ও

আক্ষেপের বিষয়ীভূত। শ(টি) নির দৃষ্টি যার উপরে পড়ে, সে রাতারাতি রাজাও হয়; আবার কেহবা ফকির হইয়া যায়। রা (রো) হুর প্রকোপ সর্ব্বত্রই সমান। এপর্য্যন্ত কাহারও ভাল করে নাই। ঐ কৃষ্ণকায় ভোগী ক্রূর গ্রহত কেবল লোকের অনিষ্টতেই আছেন। বুধ (থ) গ্রহের নিকট সকলেরই মঙ্গলাশা থাকে বটে, কিন্তু শনি বা রাহু কেন্দ্র গত হইলে সে আশা একবারে ভস্মীভূত হয়। একমাত্র গুরুর কাছেই সর্ব্বসাধারণের ঈপ্সিতাপ্তি হইয়া থাকে; তাহাতে তাঁহার উচ্চস্থান হইলে আরও ভাল। ইউনিবার্সিটীর গুরুরও উচ্চস্থান বটে, কিন্তু অন্যান্য পাপগ্রহের প্রাবল্যহেতু তিনি স্বাভীষ্টসম্পাদনে সমর্থ হইতেছেন না।

কালিদাস যে বিক্রমাদিত্যের সমকালিক, তদ্বিষয়ে আর কাহারও মতদ্বৈধ নাই। তিনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম ছিলেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত-রচনান্তে কবিকেশরী জ্যোতির্ব্বিদাভরণ রচনা করেন, তাহা তদীয় বাক্যেই পরবর্ত্তী শ্লোকে নিরূপিত হইতেছে। যথা;—

শঙ্ক্বাদিপণ্ডিতবরাঃ কবয়স্ত্বনেকে
জ্যোতির্বিদঃ সমভবংশ্চ বরাহপূর্ব্বাঃ॥
শ্রীবিক্রমস্য বুধসংসদি প্রাজ্যবুদ্ধে-
স্তৈরপ্যহং নয়সখঃ কিল কালিদাসঃ॥ (১)
কাব্যত্রয়ং সুমতিকৃদ্রঘুবংশপূর্ব্বং
জাতং যতো ননু কিয়চ্ছ্রুতিকর্ম্মবাদঃ।
জ্যোতির্বিদাভরণকালবিধানশাস্ত্রং
শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো বভূব॥ (২)

ইহাতেই জানা যাইতেছে, যে, কালিদাস জ্যোতির্ব্বিদাভরণনামক জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গ্রন্থের রচয়িতা। অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। না করিবার কারণও আমরা বুঝিতে পারি না। জাজ্বল্যমান কালিদাসের নামেও যদি স্বীকার না করেন; তবে রঘুবংশ কুমারসম্ভবও কালিদাসের নয় বলিলেই হয়। তাহা হইলে ভাগবত বা মহাভারতেও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায়; বা রামায়ণেও বাল্মীকির নাম না দিলেও চলিতে পারে। অনেকের অনুমান যে অন্য কেহ রচনা করিয়া উহা কালিদাসের নামাঙ্কিত করিয়াছে। আমাদের বিবেচনা, এখন যেমন এক জনের কৃতিত্বে অন্যের নাম হয়, পূর্ব্বে তদ্রূপ কার্য্য কখনই হইত না। আমরা জানি, দত্ত ধনের খাতিরে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কৃতিত্বে স্বীয় নামের সংস্রব রাখেন নাই। কবিরত্নের কৃতিত্বেও আর একজন সর্ব্বাধিকারী আছেন, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু ওরূপ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। অপর, জ্যোতিষশাস্ত্রে কালিদাসের খ্যাতি থাকিলেও, তাঁহার নামে গ্রন্থের আদরাতিশয্যের সম্ভাবনায় কেহ কালিদাসের নাম দিতেও পারিত, কিন্তু মোটেই কালিদাস সেবিধ লোক নহেন, সুতরাং, অন্যের গ্রন্থে তাঁহার নামের সমাবেশ কখনই সম্ভব নয়। অতএব জ্যোতির্ব্বিদাভরণ কালিদাসেরই গ্রন্থ, তাহাতে আদৌ দ্বৈধী নাই। উল্লিখিত জ্যোতির্ব্বিদাভরণের সময় নিরূপণ তিনি স্বয়ংই করিয়াছেন—

বর্ষে সিন্ধু[illegible]নাম্বরগুণৈর্য্যাতে কলেঃ সংমিতে মাসে মাধবসংজ্ঞিতেঽত্র বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যে, কলির ৩০৬৭ বৎসর গত হইলে মধু মাসে তিনি জ্যোতির্ব্বিদাভরণনামক-গ্রন্থক্রিয়ার উপক্রম করিয়াছিলেন। এক্ষণে কলির ৪৯৯২ অতীতাব্দ। উহা হইতে ৩০৬৭ অন্তর করিলেই ১৯২৫ বৎসর হয়। অতএব এক্ষণকার ১৯২৫ বৎসর পূর্ব্বে কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান ছিলেন। বাচস্পতি মহাশয় বাচস্পত্যাভিধানে লিখিয়াছেন—

'ইতঃপূর্ব্বং সংবৎসর-নামকশাকপ্রবর্ত্তকো ভারতবর্ষে মালবদেশে উজ্জয়িনীনামরাজধান্যাং অসীমগুণধামবিক্রমাদিত্যনামা নৃপতিরাসীৎ॥

এক্ষণে সংবতের ১৯৬৮।৬৯ চলিতেছে। তাহাতে তিনিই যে উহার প্রবর্ত্তক, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভ খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্বে বটে; তবে কোন বৎসর তাহা নির্দ্ধারিত হয় না। কেহ বলেন, ৫৬; কেহ বলেন ৫৮; আবার কেহ বলেন ৬৮। Taylor সাহেব তদীয় Ancient History নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'He ruled with such extraordinary success, that his reign forms an important era in history commencing in 58 B. C. according to one account, or in ten years latter according to another. মার্স মান সাহেব তদীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন—

Fifty six years after the accession of Vikramaditya, Jesus Christ the promised Messiah, became incarnate in the land of Judea.

Professor Dowson এবং General Cunningham (J. R. A. S. Vol. XII. P. 261.) কোনরূপ দ্বৈধীভাব না রাখিয়াই স্বীকার করেন, যে বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ ৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। Mr. Thomas স্পষ্টরূপে এই কথার অনুমোদন না করিলেও তিনি বলেন যে, উহা শকাব্দার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নিঃসন্দেহ।

রাজা শিবপ্রসাদ C. S. I. তদীয় ইতিহাস তিমিরনাশকে লিখিয়াছেন—

ইসাপ্রমরবংশমে সন ইসবী সে সত্তাবন বরস পহিলে রাজা বিক্রম উজ্জৈন কা রাজ গদ্দি পর বৈঠা, ইস সে বীর বিক্রমাদিত্য ভি কহতে হৈং ওঁর সব লোগোংকো জো তাতার কি ওঁর সে চড় আয়ে থে শিকস্ত দেনে কারণ শকারি ভি পুকারতে হৈং। যদ্যপি বহ ঐসা পরাক্রমী ওঁর ইতনে বড়ে মুলুক কা মালিক মহারাজাধিরাজ থা কি আজ তক উসকা সম্বৎ চলা জাতা হৈ।

রাজা শিবপ্রসাদের মত যে সাতান্ন পূঃ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারোহণ।

রাজাবলী হইতেও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল নির্ণয় করিতেছি।

'এই কলির আরম্ভ অবধি ৪২৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত ১১৯ জন নানাজাতীয় হিন্দু দিল্লীর সম্রাট হন। ইহার বিবরণ, রাজা যুধিষ্ঠির

অবধি ক্ষেমক পর্য্যন্ত ২৮ জন ক্ষত্রিয় জাতি পুরুষেতে ১৮১২ বৎসর। এই পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় জাতীর বিরাম হইল। তাহার পর মহানন্দি নামে ক্ষত্রিয়ের ঔরসেতে শূদ্রাগর্ভজাত নন্দের বংশজ বিশারদ অবধি বোধমল্ল পর্য্যন্ত ১৪ জনেতে ৫০০ বৎসর। এই নন্দ অবধি রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়। তাহার পর গোতম বংশজাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত নাস্তিক মতাবলম্বী ১৫ জনেতে ৪০০ বৎসর। এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল। তাহার পর ময়ূর বংশীয় ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ জনেতে ৩১৮ বৎসর। তাহার পর শকাদিত্য নামে পার্ব্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ বৎসর। এইরূপে কলির প্রথম অবধি ৩০৪৪ বৎসর গত হইল এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের শকেরও নিবৃত্তি ঘটিল। তাহার পর বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ হইল। এই সম্বতের আরম্ভ অবধি বিক্রমাদিত্যেরা পিতাপুত্রে দুই জনেতে ৯৩ বৎসর।

রাজাবলীস্থ পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটুকু হইতে আমরা জানিতেছে, যে কলির ৩০৪৪ বৎসর গত হইলে বিক্রমাদিত্য সিংহাসনাধিরোহন করেন; এবং ঐ সময় হইতেই সম্বতের প্রবর্ত্তনা হয়। এক্ষণে কলির ৪৯৯২অতীতাব্দ। উহা হইতে ৩০৪৪ অন্তর করিলে ১৯৪৮ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবৎসরও সম্বতের ১৯৪৮।৪৯ বর্ত্তমান। অতএব ইহাই বিক্রমাদিত্যের প্রকৃত সময়। [illegible] স্থানান্তরে বিক্রমাদিত্যের জীবনচরিত প্রকটিত করিয়া দেখাইব, যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী রাজার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে তাঁহাকে কখনই ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলা যায় না ইংরাজেরা ৫৬ কি ৫৮ বা ৬৮ যাহাই বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভ বলুন, এক সম্বৎ হইতেই আমরা নিশ্চয় করিতেছি, যে তাঁহার রাজ্যকাল ৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দ বটে। এতদানুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও যথাযথ প্রকটিত হইতেছে, তদ্দর্শনে পাঠকবর্গ যুক্তি যুক্তই গ্রহণ করিবেন।

বররুচি নবরত্নের অন্যতম। তৎকৃত প্রাকৃত প্রকাশ নামক গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। E. B. Cowell সাহেব তদীয় প্রাকৃত প্রকাশের সংস্করণে লিখিয়াছেন—'Vararuchi appears to have been the first grammarian, who reduced the popular dialects to a system. He flourished in 56. B. C.

মাননীয় H. H. Wilson সাহেব বিষ্ণুপুরাণের বৃহৎ ভূমিকার একদেশে ব্যক্ত করিয়াছেন—'Such were the constituent and characteristic portions of a purana in the days of Amarasinha, 56 years before the Christain era. অমর সিংহ কালিদাসের সমসাময়িক; সুতরাং, তিনি পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং তাহাই বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল।

ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র আজীবন ইংরাজদিগের সহিত ঘনিষ্টতা রাখিলেও এই বিষয়ে শ্বেতকায়দিগের জাতি তাঁহাতে সংক্রমিত হয় নাই। তদীয় Indo Arian নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায়, হয়, তিনি বিক্রমা[illegible]কে পূঃ খৃষ্টাব্দেই স্থান দিয়াছেন। পরব[illegible] কালে আনেন নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যা[illegible]দ।

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

প্রথম ভাগ।

হিন্দু-পত্নী।

[illegible]হিন্দু সমাজের গৌরব স্বরূপ—পরিণামদর্শী [illegible]র্য্যঋষিদিগের গভীর চিন্তাপ্রসূত শাস্ত্র-[illegible]র্শিত নিয়মাবলীর ফলস্বরূপ—নিষ্কাম [illegible]র্ম্মের আদর্শ স্বরূপ—হিন্দুর বিধবা ও [illegible]ন্দুর পত্নী আজিও হিন্দুর গৃহ আলোকিত [illegible]তেছে। এ অধঃপতিত হিন্দু সমাজে [illegible], দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শৌর্য্য, বীর্য্য, যুগ-[illegible]বশে ক্রমশই অন্তঃর্হিত হইতেছে, কিন্তু [illegible]নও হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচারিত্বে ও হিন্দুবধূর [illegible]ধর্ম্মে যে সকল গুণের সদ্ভাব দেখিতে [illegible]ওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কোন জাতি [illegible]অন্য কোন সমাজের নারী-চরিত্রে তাহার [illegible]াংশের একাংশও দেখিতে পাই না। [illegible]দুসমাজের প্রায় সকল অংশেই অবনতির [illegible] পরিলক্ষিত হইলেও হিন্দুর বিধবায় ও [illegible]দুপত্নীতে এখনও আশা করিবার অনেক [illegible]য় আছে।

[illegible] মানব জগতের শীর্ষস্থানীয় আর্য্য ঋষি-[illegible]গের সূক্ষ্ম চিন্তা, গভীর-গবেষণা ও পরি-[illegible]দর্শিতা কতক পরিমাণে [illegible] [illegible]তে পারিয়া শিক্ষিত পা[illegible]ত্য সমাজ চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষক স্থানীয় বিবেচনা করিতে আর কুণ্ঠিত হয় না। আর সেই সকল দেবতুল্য মহর্ষিদিগের বংশধরেরা আজ আপন আপন শাস্ত্রাদির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পিতৃপুরুষদিগের প্রদর্শিত পথ অবমাননা করিয়া, জ্ঞান পিপাসু হওতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের পদপ্রান্তে উপবেশন পূর্ব্বক আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন। যে ক্ষত্রিয়বীরগণের শৌর্য্য বীর্য্য কীর্ত্তিকলাপের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এখনও ধমনীতে ধমনীতে শোণিতপ্রবাহ প্রবল বেগে প্রধাবিত হয়, যে ক্ষত্রিয় বীর পুরুরাজের অসাধারণ ওজস্বিতায় ও অমিত সাহসে জগজ্জয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডারও চমকিত হইয়াছিলেন, আজ সেই বীর বংশের বংশধরেরা সামান্য শৃগাল কুক্কুর ভয়ে ভীত—সিংহ শিশু শৃগালের পদপ্রান্তে লু[illegible]। হিন্দুসমাজের কি অভূতপূর্ব্ব অধঃপতন। নন্দনকানন আজ মহাশ্মশান, দেবতার লীলাক্ষেত্র আজ পিশাচগণের লীলাভূমি! এহেন অধঃ-

পতনেও আজ আমাদের গৌরব করিবার সামগ্রী আছে। এখনও আমরা অপর সমাজের নিকট সদর্পে বলিতে পারি, আমাদের যাহা আছে তাহা তোমাদের নাই; আজ আমাদের সামান্য পর্ণ কুঠীরও নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী হিন্দুবিধবার পবিত্র ব্রতে আলোকিত; এঘোর অমানিশায় আজিও আমরা মূর্ত্তিমান সৎকর্ম্ম স্বরূপ হিন্দু-বধূর গুণে একটু একটু আলোক পাইতেছি।

হিন্দু, বৃথা তুমি আপনাকে "আর্য্য" "আর্য্য" বলিয়া পরিচয় দিয়া উচ্চৈস্বরে আকাশ পাতাল ফাটাইয়া ফেলিতেছ, বৃথা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, তুমি জান না যে, তোমার "আর্য্যামী" অন্তর্হিত হইতেছে, ক্রমশ তুমি একটী ভোগবিলাসের ক্রীতদাস হইতেছ, তোমার দয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম সব লোপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দেখ, তোমার বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিবার সময় উপস্থিত। এমন সময় যদি তোমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার স্ত্রীবিয়োগ হইল, তুমি পুত্রপৌত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়াও সংসার তমোময় দেখিলে, তোমার "গৃহশূন্য" বা "সংসারশূন্য" হইল। তুমি পুত্রাদির মুখ তাকাইলে না, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলে কেবল ভোগবিলাস প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিব বলিয়া। আর ঐ দেখ, তোমার ত্রয়োদশবর্ষীয়া নির্ম্মল কুসুম কলিকা সদৃশ প্রিয়তমা দুহিতা অকালে স্বামীধনে বঞ্চিতা হইয়া সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া ই…গতের ভোগেচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক সংসারের কঠোর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে—নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তোমার গৃহ আলো-কিত করিয়াছে—তোমার গৃহধর্ম্ম, তো… "হিন্দুয়ানী" বজায় রাখিয়াছে। … দেখিতে পাইতেছ কি তোমার … পুত্রবধূটী দিবারাত্র অবগুণ্ঠনাবৃতা হই… দাসীর ন্যায় গৃহ কর্ম্মে নিযুক্ত, শ্বাশুড়ী ন… দিনী প্রভৃতি সকলের সমভাবে কথা শুনি… সকলকে সমভাবে সন্তুষ্ট করিবার চে… করিতেছে; ভাদ্রের ভরা নদীর ন্যায় আপন… ভাবে; আপন সোহাগে আপনি মত্ত র… য়াছে; হৃদয়াবেগ হৃদয় মধ্যেই আবদ্ধ আ… কখন তার অতিক্রম করিতেছে না। যথা… হিন্দুপত্নী নিষ্কাম কর্ম্মের জীবন্ত উদাহর… আর তুমি কি হইয়াছ একবার ভাবি… দেখিয়াছ কি? পূর্ব্বপুরুষের নাম বজা… রাখিতে পারিয়াছ কি? হে অহঙ্কারী… আর্য্যসন্তান, তোমার আর্য্যত্ব কোথায়… তুমি সংসারের একটী অসার জীবরূ… পরিণত হইতে চলিয়াছ, তুমি তোমার … কর্ম্ম তপ জপ সব সাগরের অতল জ… ডুবাইয়া দিয়াছ; মুখে কেবল শাস্ত্র শা… শাস্ত্র, কাজে কিন্তু সবই অশাস্ত্রিয়তা।

যাহাহউক উপস্থিত প্রবন্ধে আম… হিন্দু বিধবার কথা ছাড়িয়া দিয়া হিন্… পত্নীর সম্বন্ধে দুই চারি কথা উল্লেখ করিব… সমাজের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের চি… দ্বারা সাহিত্য কাব্যাদির সৃষ্টি আবার এ… চিন্তা তাৎকালিক আচার ব্যবহার, … কর্ম্মের ফলস্বরূপ। কোন কোন স্থলে এ নি… মের ব্যত্যয় হয় বটে কিন্তু সাধারণ নিয়ম… এইরূপ। আরও এই সকল কাব্য সাহি… ত্যাদি পরবর্ত্তী চিন্তার ও সমাজের পরি… চালক [illegible] অতএব এই সকল সাহিত্যাদি… পরিচালনায়, …ব্য জগতের সৃষ্টি ও স্থি… …রণভূত চিন্তা অনেক পরিমাণে বুঝিতে …ারা যায়। এক্ষণে হিন্দুর প্রাচীন সংস্কৃত …াহিত্যে ও আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে ও বিদেশীয় কাব্যাদিতে পত্নী চরিত্র কিরূপ …াবে প্রকটিত হইয়াছে, তাহাই দেখা …াউক।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণাদিতে উপদেশ দিয়া থাকে "পত্নী এক মনে …তিকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবেন, পতির সহস্র অপরাধ সত্ত্বেও পত্নী তাঁহার অনুরক্তা থাকিবেন, ও তাঁহার তুষ্টি সাধন করিবেন, পতিতে পত্নী সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিবেন।" কবি-গুরু বাল্মীকি অসাধারণ প্রতিভাবলে তাঁহার অতুল্য কাব্যে ঐরূপ ভাবেই সীতা চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্র আজ পর্য্যন্ত জগতে অতুল্য। তাঁহার অলৌকিক প্রতি-ভার অনুপম সামগ্রী সীতাচরিত্র অন্য কোন সাহিত্যে খুজিয়া পাওয়া যায় না। গ্রীস দেশের আদি কবি হোমারের "ইলি-য়ডে" প্রধানা নায়িকা "হেলেনের" আদর পাশ্চাত্য সাহিত্য করিয়া থাকে, কিন্তু যদি উহা সীতাচরিত্রের নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে দেদীপ্যমান সূর্য্যালোকে স্তিমিত দীপালোকের ন্যায় ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে। ইংরেজী সাহিত্যে মহাকবি সেকস্-পীয়রের কোন কোন নায়িকাতে হিন্দুপত্নী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল নায়িকাতে হৃদয়ের সহিষ্ণুতা (Fortitude of heart) আছে, প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন আছে, কিন্তু উহা হিন্দুপত্নীর কর্ত্তব্য জ্ঞানের ন্যায়—ধর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় নহে। তদ্বিষয়ে পশ্চাতে কিছু বলা যাইবে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের পত্নী চরি-ত্রের আভাস বর্ত্তমান বঙ্গকাব্যে এখন অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও হিন্দুর গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমতী পতিভক্তি, অকপট প্রেম, সরলতা, পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু প্রতিকূল স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, বুঝিবা আর বেশী দিন থাকে না। কবিগুরু বাল্মীকির মধুর স্বরলহরী বাগ্‌দেবীর বরপুত্র কালিদাসের বীণায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তাই কালিদাসের হস্তেও সীতা চরিত্র অতুলনীয়। যে সীতা দুরন্ত রাবণ দ্বারা হৃতা হইয়া বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করতঃ স্বামী মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া অবশেষে পতি সমক্ষে তাঁহার প্রত্যয় জন্য সতীত্বের পরীক্ষা দিতে কুণ্ঠিতা হন নাই, প্রত্যুতঃ সর্ব্ব সমক্ষে অগ্নি পরীক্ষা দিয়া নির্ম্মল সুবর্ণ খণ্ডের ন্যায় অধিকতর উজ্জ্বল ভাবে অগ্নি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তিনিই আবার যখন সামান্য লোকাপবাদে ভীত শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা বিনাদোষে গর্ভাবস্থায় নির্ব্বাসিতা হন, তখন সহোদরপ্রতিম লক্ষ্মণকে কি বলিতেছেন শুনুনঃ—

"বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা,
বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষং।
"মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ
শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য ॥
"কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং,
ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
"মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং,
বিপাক…কুর্জ্জধুরপ্রসহঃ ॥
"নিশাচরোপপ্লুতভর্ত্তৃকাণাং,
তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ।
"ভূত্বা শরণ্যা শরণার্থমন্যং,

কথং প্রপৎস্যে ত্বয়ি দীপ্যমানে ॥
"কিংবা ভবাত্যন্তবিয়োগমোঘে,
কুর্য্যামুপেক্ষাং হত জীবিতেঽস্মিন্।
স্যাদ্রক্ষণীয়ং যদি মে ন তেজঃ
ত্বদীয়মন্তর্গতমন্তরায়ঃ ॥
সাহং তপঃ সূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টিঃ
ঊর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে ॥
"ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি,
ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ ॥"
রঘুবংশ ১৪ সর্গ।

ভাবার্থ—আর তুমি আমার কথানুসারে সেই রাজাকে বলিবে যে, আমি তাঁহার সমক্ষে অগ্নিমধ্যে প্রবেশিয়া আত্মশুদ্ধি প্রদর্শন করিলাম তথাপি তিনি লোকাপবাদ শ্রবণে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কি তাঁহার প্রসিদ্ধ বংশের উচিত হইল? আপনি সুবিবেচক হইয়া যে স্বেচ্ছাচারের বশীভূত হইয়া আমায় পরিত্যাগ করিলেন, আমার এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নয়, তবে আমার অদৃষ্টে এই নিদারুণ বজ্রাঘাত আমার জন্মান্তরীণ পাতকেরই ফল। যাঁহাদের পতি রাক্ষসদৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, আমি যে আপনার প্রসাদে সেই তপস্বিনীগণের আশ্রয়দাত্রী হইয়াছিলাম। আজি আপনি বর্ত্তমান থাকিতে আমি আশ্রয়ের নিমিত্ত কেমন করিয়া অন্যের নিকট উপস্থিত হই। অথবা আপনার চিরবিচ্ছেদ হেতু নিষ্ফল আমার এই হতজীবনে আমি উপেক্ষা করিতাম যদি আমার গর্ভেরক্ষণীয় তেজ তাহার অন্তরায় না হইত। আমি প্রসবান্তর সূর্য্যে দৃষ্টি-নিরুদ্ধ রাখিয়া এরূপ তপস্যা করিতে যত্ন করিব, যাহাতে জন্মান্তরেও আপনিই আমার পতি হন ও বিরহ না ঘটে। কি অপূ
পতিভক্তি! কি অপকট প্রেম! এ প্রেমে
মত্ততা নাই, চাঞ্চল্য নাই, ইহার ভিত্তি
ধর্ম্মে। ইহা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেমে
ন্যায় অজ্ঞেয় প্রবৃত্তির উপর স্থাপিত নয়—
ইহাই আর্য্য কবির গৌরব। আবার যখ
শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপণ করিয়া রাজ
সভায় সীতাদেবীকে আনয়ন করিলেন
তখনও লোকাপবাদ ভীত দাশরথি, মূর্ত্তিমতী
পতিভক্তিরূপিণী সীতাদেবীকে সতীত্বে
পরীক্ষা দিতে বলিলেন। সীতাদেবী নিতান্ত
মর্ম্মাহত হইয়াও নিজ ভাগ্যের উপর সকল
দোষারোপ করিয়া বলিলেন ;—

বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচার যথা ন মে
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি মামন্তর্ধাতুমর্হসি ॥

অর্থাৎ যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতি
হইতে বিচলিত না হইয়া থাকি তবে দেবি
বিশ্বম্ভরে আমাকে অন্তর্হিত কর। অমনি
তখন মূর্ত্তিমতী বসুন্ধরা দেবী সীতাকে
ক্রোড়ে লইলেন।

সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্ত্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম।
মামেতিব্যাহরত্যেবতস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ

তখনও সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত। রাম 'না' 'না' বলিতে বলিতেই সীতাকে লইয়া বসুন্ধরা রসাতল প্রবেশ করিলেন। এতদূর স্বামী কর্ত্তৃক বিনা দোষে লাঞ্ছিতা ও অবমানিতা হইয়াও এরূপ পতি প্রতি অচলাভক্তি, এরূপ নিস্বার্থপ্রেম, এরূপ প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন অন্যদেশের সাহিত্যে অতি বিরল। এস্থলে আমরা হোমারের একখানা নায়িকা হেলেনের চিত্রের একটু আভাস দিব। হেলেনের পূর্ব্ব স্বামী মানিলাসের নিকট হইতে দস্যুর ন্যায় বিশ্বাস

হন্তা পারিস তাহাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিল। যখন হেলেন সেই বিশ্বাসহন্তা পারিসের নিকট সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন দিয়া পত্নীভাবে তাহার গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তখন তাহার পূর্ব্বস্বামীর সহিত বর্ত্তমান স্বামীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বর্ত্তমান স্বামী পারিস যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে হেলেন ভৎর্সনা করিতে লাগিল। * জানি না প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে এ দৃশ্য কতদূর হৃদয়গ্রাহী; কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ ইহাতেই মুগ্ধ হয়। পতি থাকিতে পত্যন্তর গ্রহণই হিন্দুর চক্ষে বিসদৃশ, অন্য বিষয়ের উল্লেখ বৃথা।

মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা তাহার অতুল সৃষ্টি, অলৌকিক সৌন্দর্য্য। এখানেও হিন্দুপত্নীর আদর্শচিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। শকুন্তলাও সেই বাল্মীকির ছাচে ঢালা নারী-চরিত্র। এখানেও আমরা হিন্দুর অন্ধকার গৃহের আলোক হিন্দুবধূ চরিত্রের আদর্শ দেখিতে পাই। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমপালিতা শকুন্তলা পতিবিরহে বিহ্বলা। কণ্ব দুহিতার ক্লেশ দেখিয়া ও এখন পতিগৃহে থাকা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া শকুন্তলাকে শিষ্য সমভিব্যাহারে মহারাজ দুষ্মন্তের গৃহে প্রেরণ করিলেন। বিদায় সময়ে মহর্ষি দুহিতাকে উপদেশ দিতেছেন, "ভর্ত্তুবিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্বপ্রতীপংগম" বাছা, পতি কোনরূপে রুষ্ট হইলে দেখ যেন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। শকুন্তলা সাশ্রুলোচনে পিতার নিকট হইতে—প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা সঙ্গিনীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বামী সন্নিধানে গমন করিলেন। মনে মনে বড় আশা করিয়াছিলেন পতিসোহাগে সোহাগিনী হইব, কিন্তু রাজ সভায় আনীতা হইলে তাহার সকল আশা ফুরাইল। শাপগ্রস্ত দুষ্মন্ত তখন শকুন্তলাকে—যে শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র দুষ্মন্ত একদিন বলিয়া ছিলেন, "দুরাকৃতা খলুউদ্যানলতা বনলতাভিঃ" সেই প্রিয়তমা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন মহারাজ দুষ্মন্ত, শকুন্তলা স্বামী নিদর্শন দেখাইতে পারিল না বলিয়া সামান্যা নারী বিবেচনা করিয়া নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শকুন্তলার তখনও স্বামীর উপর অচলাভক্তি—পতিকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি—কারণ শকুন্তলা হিন্দুপত্নী। আপনার ভাগ্যেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন;—

"সানিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা
বাহূৎক্ষেপং রোদিতুমুপ্রবৃত্তা।
"স্ত্রীসংস্থরূপসরস্তীর্থমারাদুৎক্ষিপ্যাঙ্কে
জ্যোতিরেনাং তিরোঽভূৎ ॥"

ভাবার্থ—শকুন্তলা নিজ ভাগ্যের নিন্দা করিতে করিতে বালার ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন অপ্সরজ্যোতি তাহাকে স্বর্গে লইয়া গেল। ঠিক এই অবস্থাতে আমরা মহাভারতের শকুন্তলার ও কালিদাসের শকুন্তলার কিছু প্রভেদ দেখিতে পাই। মহাভারতে শকুন্তলা এই অবস্থায় যে ভাবে মহারাজকে উত্তর দিলেন, তাহা একমাত্র ঋষি-কন্যাদিগকেই সম্ভবে। বলিলেন—

* Back from the battle?
Would there hadst died,
Beneath a warrior's arm
whom I once call
My husband, &c &c"—
Derby's Translation.

"স্বয়ং প্রাপ্তেতি মামেবং
মাবমংস্থা পতিব্রতাং।
অর্চ্চার্হাং নার্চ্চয়সি মাং
স্বয়ং ভার্য্যামুপস্থিতাং॥
কিমর্থং মাং প্রাকৃতবৎ
উপপ্রেক্ষসি সংসদি।
ন খল্বহমিদং শূন্যে
রৌমি কিং ন শৃণোষিমে॥
যদি মে যাচমানায়া
বচনং ন করিষ্যসি।
দুষ্মন্ত শতধা মূর্দ্ধা
ততস্তেঽদ্য স্ফুটিষ্যতি॥"
মহাভারত আদিপর্ব্ব।

ভাবার্থ—হে দুষ্মন্ত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমার অবমাননা করিও না, আমি অর্চ্চনাযোগ্য, আমায় আদর করিতেছ না কেন? কি জন্য সভামধ্যে আমাকে নীচের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ, দৈববাণী শুনিতে পাইতেছ না? যদি তুমি উপযাচিকা আমার কথা না শুন তাহা হইলে তোমার মস্তক শতধা ফুটিয়া যাইবে। আবার বলিতেছেন—

"অত্র তে হৃদয়ং বেদ সত্যস্যৈবানৃতস্য চ।
কল্যাণং বদ সাক্ষেণ মাত্মানমবমন্যথা॥

সত্যাসত্য বিচার তোমার হৃদয় জানে, কেন তোমার আত্মাকে পাপে নিমজ্জিত কর? আরও অনেক বিষয়ের উপদেশ ঋষিকন্যা শকুন্তলা দুষ্মন্তকে প্রদান করিল। এখানেও স্বামী ভক্তির কিছু ত্রুটী দেখিতে পাই না, কিন্তু একটু ভিন্ন ভাবের। আমাদের পক্ষে কালিদাসের মানস কথা বেশী আদরের জিনিস। একজন স্বামীর দোষ দেখিয়াও দেখিল না, আর একজন স্বামীর দোষে অধীরা রুষ্টা হইলেন ও স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদানও করিলেন। কালিদাসের শকুন্তলাতে হিন্দুত্ব পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাই, ইহাই হিন্দুপত্নীর আদর্শ চরিত্র এবং সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ ভাবের চরিত্রের প্রশংসা অধিক। সেই জন্যই কালিদাসের আদর্শ চিত্র বঙ্গসাহিত্যে অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত ও বঙ্গসমাজও ইহার বেশী পক্ষপাতী।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে, লেখক শ্রেষ্ঠ বঙ্কিম বাবু দুইটী অতুলনীয় হিন্দুপত্নী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। দুইটীতেই হিন্দুপত্নীর ভাব পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই চিত্রের সংক্ষেপ আভাস দিব। একটী বিষবৃক্ষের "সূর্য্যমুখী" অপরটী কৃষ্ণকান্ত উইলের "ভ্রমর"। দুইটী চরিত্রেই পতিভক্তি প্রগাঢ়, আত্মবিসর্জ্জন অতুলনীয়। কিন্তু একটু বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। সূর্য্যমুখী বলেন "পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে ত সে স্বামী, পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে তবে সে স্বামী, পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী।" প্রথমে তাঁহার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে নারীজাতি সুলভ সংশয় উপস্থিত হইল, তিনি মনের কথা স্বামীকে ব্যক্ত করিতে পারিলেন না, কমলাকে পত্র লিখিলেন। হিন্দুরমণী কমলমণি তাহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন—"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয়ের প্রতি অবিশ্বাসী হইবে কেন! স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে

পার, তবে দিঘীর জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত উপদেশ দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না, তাহার মরাই মঙ্গল।" তদুপরে সূর্য্যমুখী পতিকে বিপথগামী দেখিয়াও তাঁহার প্রতি ভক্তিমতী—তিনি কেবল পতিপ্রেমে মুগ্ধ নন, পতিকে দেবতা ভাবিয়া তাহার প্রতি ভক্তিমতী। সূর্য্যমুখী স্বামীকে বলিতেছেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল, তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য গৃহত্যাগ করিবে? তুমি বড় না আমি বড়?"

সূর্য্যমুখী স্বামীকে সুখী করিতে আত্মোৎসর্গ করিলেন, নিজ সুখাশা সবই ত্যাগ করিলেন, পতির সত্বাতেই নিজ সত্বা নিমর্জ্জিত করিলেন—এইখানেই প্রেমের চরমোৎকর্ষ। তিনি বলিতেছেন "আমি কে? যদি কখন স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনি মনে হইয়াছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন। স্বামী আমার বুকের উপর পা দিয়া যাইতেন"। যে আত্মবিসর্জ্জন ও পতি প্রতি দেবভক্তি আমরা সীতাচরিত্রে ও কালিদাসের শকুন্তলায় দেখিতে পাই, তাহাই কি সূর্য্যমুখীতে পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হয় না? কিন্তু ভ্রমরের চরিত্র একটু ভিন্ন প্রকারের। ভ্রমর বলেন "(স্বামিন্), আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎ সংসারে আর কিছু জানি না, আট বৎসরের সময় বিবাহ হইয়াছে, আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি, আমি এ নয় বৎসর কিছুই জানি না কেবল তোমাকে জানি।" "আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা ও প্রতিপালিতা।" কিন্তু ভ্রমর যখন দেখিলেন তাঁহার স্বামী পাপাসক্ত ও তাহার পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য তাহার নিকট এক রকম চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি রাগে এবং অভিমানে আত্মহারা হইলেন ও স্বামীকে বলিতে লাগিলেন—"তবে যাও, পরে আসিও না। বিনা অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও করিও; কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন, মনে রাখিও একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে—মনে রাখিও একদিন তুমি খুঁজিবে এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়? দেবতা সাক্ষী! আমি যদি সতী হই, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। * * * * যদি একথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও আমার দুঃখ নাই, তুমি আমারই—রোহিণীর নও।" এই বলিয়া ভ্রমর ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেন্দ্র-গমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। এ বিষম রাগেও ভ্রমরের পতিভক্তির একটু ত্রুটী হয় নাই। মহাভারতে শকুন্তলা যখন দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক অবমানিতা তখন কি ঠিক এই ভাবে দুষ্মন্তকে উত্তর দেন নাই? কোন কোন হিন্দুপত্নী স্বামীর পাপাচরণে অতিশয় ক্রুদ্ধা, কেহ বা পাপাসক্ত স্বামীকে সুখী করিতে যত্নবতী হন, এই জন্যই কালিদাসের শকুন্তলায় ও মহাভারতের শকুন্তলায় প্রভেদ, এই জন্যই বঙ্কিম বাবুর সূর্য্যমুখীতে ও ভ্রমরে প্রভেদ। সূর্য্যমুখীর সহিষ্ণুতায় (Fortitude

of heart) নগেন্দ্রনাথ রক্ষা পাইলেন ও তিনিও আবার পতি সুখে সুখিনী হইলেন। আর ভ্রমরের বিষম রাগে ও অভিমানে গোবিন্দলাল নষ্ট হইলেন,ভ্রমর নষ্ট হইলেন, সংসার ছারখার হইল, এই জন্যই সংস্কৃত সাহিত্যে সূর্য্যমুখী জাতিয়া পত্নীদিগের, প্রশংসা অধিক—রাগ অভিমান অপেক্ষা সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়। আমরা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সীতা শকুন্তলা, সূর্য্যমুখী ভ্রমর চরিত্রের আভাস দিলাম মাত্র। সাহিত্যানুরাগী পাঠক মহাশয়কে মূলগ্রন্থে তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিতে অনুরোধ করি

পরিশেষে বক্তব্য যে, ইংরেজ জাতির সাহিত্যে ঐরূপ ছাঁছের দুই একটী নারী চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু ইংরেজ সমাজে ঐরূপ হিন্দুপত্নী ভাব নর-নারী হৃদয়ে বেশ প্রতিফলিত হয় নাই। কারণ সমাজ মধ্যে স্বাধীনতা সাম্যের ধূয়াটা কিছু বেশী। নরনারীর সমান অধিকার, স্ত্রীস্বামী উভয়ে উভয়ের সখামাত্র, ভালবাসা প্রবৃত্তি বিশেষ মাত্র, প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন নাই ; যদিও কোথায় থাকে তবে তাহাও প্রবৃত্তি বিশেষের প্রবলতায় ও উচ্ছ্বাসে হইয়াছে। প্রেমের ভিত্তি ধর্ম্মে নয়, প্রেম কর্ত্তব্যজ্ঞানের অধীন নয়। কিন্তু উহাদের প্রাচীন গ্রন্থে সংস্কৃত নরনারী চিত্রের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মিল্টন তাহার ইভের চরিত্র গঠন করিতে গিয়া বলিয়াছেন "স্ত্রীপুরুষ ভেদে মানুষ সমান নয়। পুরুষ চিন্তা ও সাহসের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; নারী মনোহারী সৌন্দর্য্য ও কোমলতার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে জগদীশ্বর পুরুষের অভীষ্টদেব; পুরুষ নারীর আরাধ্য দেবতা। * উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজ সমাজ এরূপ আদর্শ হৃদয়ে স্থান দেয় না। কবিশ্রেষ্ঠ সেক্স-পিয়র এক স্থানে নারী চরিত্র সৃজন করিতে গিয়া,হিন্দু নারী চরিত্রের ন্যায় প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন,প্রগাঢ় পতিভক্তি ও হৃদয়ের সহিষ্ণুতা (fortitude of heart) সৃজন করিয়াছেন। সেক্সপিয়ারের পরিণত মস্তিষ্কের সৃষ্টি "উইণ্টরস্ টেল"। তাঁহার 'হারমিয়নের' চরিত্রে হিন্দুপত্নী ভাব অনেকটা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার স্বামী লিয়ণ্টস যখন তাঁহার সতীত্বে সন্দিহান হইয়া বিচার করিতে গিয়া বিনা দোষে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হন, সভাসদের সহস্র বাধাও যখন তাহার কর্ণে গেল না, তখন পতিব্রতা সাধ্বী হারমিয়ন জনক দুহিতার ন্যায় নিজ ভাগ্যেই দোষারোপ করিলেন, পতির প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ রহিল। সৌভাগ্যের প্রতীক্ষায় হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিলেন। এমনি তাঁহার সহিষ্ণুতা যে, তিনি সামান্য স্ত্রীর ন্যায় ক্রন্দন করিলেন না ও পতিকে অভিমানে কোন রকম মন্দ কথা

"Though both
Not equal, as their sex
not equal seem'd :
For contemplation he
and valour form'd,
For softness she
and sweet attractive grace ;
He for God only,
she for God in him".
Paradise Lost, Book IV.

কহিলেন না। * পাশ্চাত্য সমাজ ইংরেজ কবির এ পত্নীভাব গ্রহণে কুণ্ঠিত ও এ চিত্রও সমাজে প্রতিফলিত হয় নাই। হিন্দুর সাহিত্য ও ধর্ম্ম একরূপ অঙ্গাঙ্গি ভাব। যে সমাজে সাহিত্য ধর্ম্মের ধার ধারে না, সেইখানেই সমাজ বিশৃঙ্খল। হিন্দুধর্ম্ম আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম, সেই জন্যই হিন্দুর হৃদয়ে দেবদেবীর ছায়া পড়িয়াছে ও সেই জন্যই সংস্কৃত সাহিত্যের চিত্র আমাদের বঙ্গ কাব্যে ও আমাদের গৃহধর্ম্মে এতদূর স্থানাধিকার করিয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজ ঠিক সে ভাবের নয় বলিয়া, ঐ জীবন্ত নারী চরিত্রের অভাব দেখিতে পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দুর ধর্ম্মে ও সাহিত্যে এবং হিন্দুর গৃহস্থালীতও পাশ্চাত্য চরিত্র প্রবলবেগে প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছে—কবি প্রতিভার মত্ততা,উৎশৃঙ্খলতা,সাহিত্যের শোভার বস্তু হইতেছে—শস্য-শ্যামল নয়নাভিরাম বঙ্গসমাজক্ষেত্রে লবণাক্ত বারি-প্রবাহ প্রধাবিত হইতেছে। যে হিন্দুর সামান্য পর্ণকুটীরে "সূর্য্যমুখী" ফুল প্রতিনিয়ত ফুটিত ও 'ভ্রমর'ও প্রায় গুন্ গুন্ করিয়া বেড়াইত, সেই হিন্দুর গৃহ প্রাঙ্গণে দুই একটা "কুন্দ" পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে ; মল্লিকা মালতীর স্থান "ক্রোটনে" অধিকার করিতেছে। আমাদের বড় কপালের জোর যে, এত প্রতিকূল বাত্যায় এখনও আমাদের গৃহ হইতে হিন্দুপত্নীর পবিত্র সরলতাপূর্ণ মূর্ত্তি অন্তর্হিত হয় নাই, এখনও হিন্দু-বিধবার পবিত্রতায় ও ব্রহ্মচর্য্যে ব্রাহ্মণধর্ম্ম লক্ষিত হয়। কিন্তু অতি বড় কপালও ভাঙ্গিয়া থাকে !

শ্রীনিবারণচন্দ্র দুই।

* "Her. "There's some ill
planet reigns
I must be patient till
the heavens look,
With an aspect more
favorable Good my lord,
I am not prone
to weeping as our sex
Commonly are ; * * *
but I have
That honorable grief
loged here which burns
Worse than tears drown"
The winter's Tale. Act II.

বর্ত্তমান সমাজ ও নীতিশিক্ষা।

প্রগাঢ়-নৈশ-তমসাবৃত হর্ম্ম্য-প্রাকার বিবিধ বিলাস-দ্রব্যে সুসজ্জিত, নানাবর্ণে রঞ্জিত, নেতাম্বরে মণ্ডিত, দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত-হৈমময়-দ্বার-বিশিষ্ট ও নয়নানন্দদায়ক মর্ম্মর প্রস্তরে বিনির্ম্মিত হইয়াও যেমন দীপালোক ব্যতীত নবদর্শকের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়,সেইরূপ বর্ত্তমান যুগে মানবসমাজে বহুবিধ সভ্যতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট এবং বিজ্ঞানালোকে সমুদয় সভ্যজগত উদ্ভাষিত হইলেও একমাত্র নীতিহীনতা বশতঃ সমাজ এরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত হইয়া পড়িয়াছে যে, একবার স্থির চিত্তে

সমাজের আভ্যন্তরীণ বিষয় নিচয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন পশু সমাজের সহিত বর্ত্তমান যুগের মানব সমাজ তুলিত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। হে জ্ঞান-গর্ব্বিত মানব! তুমি তোমার প্রকাণ্ড মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা যতই তোমার সুখের পথ সুগম কর না কেন, তোমা কর্ত্তৃক দেশ মধ্যে শত শত বিদ্যালয়, সহস্র সহস্র বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-মন্দির, অসংখ্য অসংখ্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হউক না কেন, বাক্‌পটুতা গুণে প্রাণ-মনমুগ্ধকরী গগনভেদী বক্তৃতামালা এবং লিপিকুশলতা গুণে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পরিপূরিত শত শত সংবাদ পত্র ও যুক্তিতর্ক-মীমাংসিত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ-নিচয় সৃষ্টি করিয়া জগতে যুগান্তর উপস্থিত কর না কেন, যত দিন তুমি কায়মনোবাক্যে দ্বেষ-হিংসা-অহমিকা ও প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া তোমার বুভুক্ষাক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ দীনহীন প্রতিবেশী ভ্রাতা ভগ্নির দুঃখে দরবিগলিত ধারায় বক্ষ প্লাবিত করিতে না পারিবে, যতদিন অন্তর্ব্বাহ্য চরিত্র এক করিয়া পরনারীকে স্বীয় গর্ভধারিণী জননীর চক্ষে দর্শন করিতে সক্ষম না হইবে, যতদিন তুমি আপনা ভুলিয়া পরোপকারার্থ এবং স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে না শিখিবে, যতদিন তুমি দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রেম-প্রীতি, বিনয় সারল্য প্রভৃতি অমূল্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া দিব্য শ্রী ধারণ করিতে না পারিবে, ততদিন তোমাকে আহার-ভয়-নিদ্রা-মৈথুনশীল পশু হইতে উচ্চাসনে স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হইব। আহার, বিহার, ভয়, নিদ্রা, গমন, উপবেশন ইত্যাদি বিষয়ে পশুরাও যেমন তুমিও তেমনি। তুমি না হয় বুদ্ধি বলে ঐ সকল বিষয়ে অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছ। কিন্তু ঐ সকল প্রাকৃতিক বিষয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ তুলনায় তোমাকে পশু হইতে উচ্চ বলা যায় না যদি তোমার একটী গুণের অভাব হয়। যে গুণের সদ্ভাবে মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্য এবং যাহার অভাবে আকারগত বৈষম্য লাভ করিয়াও মানুষ পশু, তাহার নাম মনুষ্যত্ব। ইহারই নামান্তর ধর্ম্ম। যে মার্গ অবলম্বন করিলে এই মনুষ্যত্ব লব্ধ হইয়া থাকে, তাহার নাম নীতি।

যে শিক্ষা দ্বারা লোক সন্মার্গপ্রস্থিত হইয়া সদাচার সম্পন্ন হওত ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হয়, সর্ব্বদেশীয় মনীষিগণই তাহাকে নীতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যে দেশের শিক্ষায় এই নীতির ভাগ যত অধিক, সে দেশের শিক্ষা তত পরিমাণে সুফলপ্রসূ, তথাকার সমাজ-বন্ধন তত দৃঢ় এবং তথায় শান্তি সুখ তত অধিক পরিমাণে বিরাজিত। চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ রসনা তৃপ্তিকর খাদ্য তুমি যতই ভোজন কর না কেন, সুশীতল জলপান না করিলে যেমন কিছুতেই তোমার তৃপ্তি জন্মিবেনা, সেইরূপ তুমি দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য অলংকার গণিত ইতিহাস প্রভৃতি বিদ্যায় যতই পণ্ডিত হওনা কেন, নীতিশাস্ত্র না পড়িলে কিছুতেই তোমার শিক্ষা পূর্ণ হইবে না—কিছুতেই তোমার মনুষ্যত্ব জন্মিবে না।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে নীতিই শিক্ষার অঙ্গ ছিল বলিয়া প্রাচীন সমাজ সভ্যতা ও

মনুষ্যত্বে জগতের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছিল। কালক্রমে শিক্ষার অঙ্গ হইতে নীতির ভাগ যতই অপসারিত হইতে লাগিল, সমাজ মধ্যে দুর্নীতিও যেই পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে ছারখার করিয়া ফেলিল। নীতিহীনতাই বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অধঃপতনের প্রধানতম কারণ।

বর্ত্তমান কালে ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও তদনুকরণে ভারতবর্ষে যে শিক্ষা প্রচলিত তাহা প্রকৃতপক্ষে অর্থকরী। উহাতে নীতির ভাগ বড়ই কম। এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে কি ইয়ুরোপীয় কি আমেরিকেয় কি ভারতীয় সকল সমাজেই দুর্নীতি সমধিক পরিমাণে প্রশ্রয় পাইয়াছে। এই দুর্নীতির ফলেই অকালমৃত্যু, দারিদ্র, ব্যভিচার, নরহত্যা, চৌর্য্য, শুক্রবিক্রয়, বহুবিবাহ, মাদকসেবন, অগম্যাগমন, পরপীড়ন প্রভৃতি দুরাচার সমাজ মধ্যে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে। মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও দ্বেষ হিংসা সমাজের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে; স্বার্থপরায়ণতারূপ কালকূট সমাজ শরীরকে জর্জ্জরীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। নীতিদেবীর প্রিয় সহচরী শান্তিদেবীর প্রিয় নিকেতনে দুর্নীতি রাক্ষসীর অনুগামিনী অশান্তি পিশাচীর একাধিপত্য হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা কিংশুক কুসুমের অনুরূপ হইয়াছে। কিংশুকের রূপ আছে বাস নাই সমাজেরও বাহ্যসৌন্দর্য্য যথেষ্ট আছে কিন্তু অভ্যন্তরে চরিত্রের সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে। আইন কানুনের বহুলতা ও বিচারালয়ের আধিক্য দেখিয়া দুর্নীতির ভীষণতা উপলব্ধ হইতেছে। সমাজ সংস্কারের নবোদ্যম ও ব্যগ্রতা দৃষ্টেও বুঝা যাইতেছে সমাজের অভ্যন্তরে যথেষ্ট আবর্জ্জনা জমিয়াছে।

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে যেরূপ রোগের উৎপত্তি হয়, নৈতিক শিক্ষার অভাবে সেইরূপ সমাজ মধ্যে দুর্নীতি স্থান পাইয়া থাকে। সুনিয়ম প্রতিপালন ব্যতীত যেমন সহস্র ঔষধেও রোগের প্রতীকার হয় না, সেইরূপ নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত সহস্র সমাজশাসন ও রাজদণ্ড দ্বারা সামাজিক দুর্নীতি কখনই সম্যকপ্রকারে দূরীভূত হয় না। সুনিয়ম পালন না করিয়া কেবল মাত্র ঔষধ সেবন করিলে যেমন নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইয়া রোগ বৃদ্ধির কারণ হয়, সেইরূপ নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া রাজদণ্ড ও সমাজশাসন দ্বারা সমাজ কলঙ্ক দূর করিতে গেলে অনেক স্থলে অন্যবিধ অত্যাচারের দ্বার প্রশস্ত হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, ঔষধ রোগের এবং সমাজ শাসন ও রাজদণ্ড সামাজিক অত্যাচার নিবারণের পক্ষে কোন কার্য্যের নয়। কার্য্যের ইহা শতবার স্বীকার করি কিন্তু সম্যক প্রতিকারক নহে ইহা নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমান সমাজই আমাদের বাক্যের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রারম্ভ হইতে একাল পর্য্যন্ত যাঁহারা উক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, কার্য্যতঃ তাঁহাদের দ্বারা সমাজকালিমা দূরীভূত না হইয়া স্থল বিশেষে নববিধ দুর্নীতির আবির্ভাব হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর গুণে দেশীয় আচার ব্যবহার পরিবর্জ্জন, বৈদেশিক আচারের অনু-

করণ এবং স্বার্থপরতা ও রিপুপরতন্ত্রতা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে। এই সকল কারণে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কিঞ্চিদধিক অশ্রদ্ধার ভাব দেখা যাইতেছে।

এক্ষণে বিদ্যালয়সমূহে সহস্র সহস্র তরলমতি বালক ও যুবকগণ শিক্ষালাভ করিতেছে। বলিতে গেলে ইহারাই ভবিষ্য সমাজের আশা ভরসার স্থল। এই সকল বালক ও যুবকগণের শিক্ষার উপরই ভবিষ্য সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। সংসার প্রবিষ্ট শিক্ষিতগণের আচরণ বিশেষতঃ এই সকল অনুকরণপ্রিয় তরলমতি বালক ও যুবকবৃন্দের মধ্যে দুর্নীতির লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া ভাবী সমাজের অমঙ্গলের আশঙ্কা মনোমধ্যে জাগরুক হওয়ায় উচ্চতন রাজপুরুষগণ ও চিন্তাশীল মহোদয়বৃন্দ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমান শিক্ষার নীতিহীনতাই যে এরূপ দুর্নীতির কারণ, তাহা ইহাঁরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যুবকদিগের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রচলন করিতে প্রয়াসী হইয়াএকটী "উচ্চশিক্ষা বিধায়িনী সভা" সংস্থাপন করিয়াছেন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউন, বঙ্গেশ্বর সার চার্লস ইলিয়ট, হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রাহ্ম প্রচারক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্বনাম খ্যাত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণকে এই সাধু অনুষ্ঠানে মনোযোগী হইতে দেখিয়া আশা হয়, বর্ত্তমান শিক্ষার স্রোত অবনতির দিক্ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উন্নতিমুখী হইলেও হইতে পারে।

এক্ষণে কথা হইতেছে, এই নীতিশিক্ষা কিরূপ ভাবে প্রদত্ত হইবে। যতদূর আভাস পাওয়া গিয়াছে এবং আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা যতদূর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, এই নীতিশিক্ষার জন্য দ্বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইবে। প্রথম উপায়, বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল পাঠ্যপুস্তক প্রচলিত আছে তন্মধ্য হইতে কতকগুলি পরিবর্জ্জন করিয়া তৎতৎ স্থলে সুনীতি পরিপোষক গ্রন্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করণ এবং বিদ্যার্থীদিগের অবকাশ মত পাঠের জন্য বিদ্যালয়ের সংশ্রবে নীতিগ্রন্থপূর্ণ পুস্তকালয় সংস্থাপন। দ্বিতীয় উপায় সভাসমিতি করিয়া সদ্বক্তা ও নীতিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা নীতি উপদেশ প্রদান। মোট কথা ছাত্রগণকে নীতিপূর্ণগ্রন্থ পাঠনা ও বক্তৃতা দ্বারা নীতি উপদেশ প্রদান এই দ্বিবিধ উপায়েই নীতি-শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত আর কোনরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রবৃন্দ পরিপূরিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষার বিধান একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। বোধ করি, নীতিশিক্ষা বিধায়িনী সভা এই গুরুভার লইতে সক্ষম হইবেন না। যাহা সাধারণ নীতি, যাহা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এক বাক্যে সুনীতি বলিয়া স্বীকার করে, যথা—দয়া, পরোপকার, বিনয়, অহিংসা ইত্যাদি প্রতিপোষণী নীতিই বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ছাত্রবৃন্দের শিক্ষনীয় হওয়া কর্ত্তব্য। নীতিসভা এইরূপ নীতি-শিক্ষা দিবার জন্যই উদ্যোগী হইয়াছেন। উদ্দেশ্য

অতি সাধু! ভগবান উদ্যোক্তাদিগের মনোভীষ্ট পূর্ণ করুন!

এখন কথা হইতেছে, কেবলমাত্র নীতিপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ ও নৈতিক উপদেশ শ্রবণ করিলেই কি ছাত্রগণের নীতিশিক্ষা হইবে? পুস্তক পাঠ ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া লোকের নীতিজ্ঞান জন্মিতে পারে, কিন্তু নীতিশিক্ষার ফল যে চরিত্র সংগঠন তাহা কেবলমাত্র উপদেশে ও গ্রন্থপাঠে হয় না। নীতিজ্ঞ ও চরিত্রবান একই কথা নহে। ফুলে ও ফলে যত প্রভেদ, নীতিজ্ঞ ও চরিত্রবানে তত অন্তর।

উপদেশ ও অনুষ্ঠান ভেদে শিক্ষা দ্বিবিধ। আমাদের বিশ্বাস কেবলমাত্র উপদেশে কার্য্য হইবে না, অনুষ্ঠান চাই। মুখে যাহা শিখিব, কার্য্যে তাহাই করিব, এইরূপ হইলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। নচেৎ তোতা পাখীর মত কতকগুলি লম্বা চৌড়া কথা আওড়াইয়া গেলেই তাহাকে শিক্ষা বলা যায় না। যদি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়, তবেই নীতিশিক্ষা সুফল প্রসূ হইবে, নচেৎ কেবলমাত্র গ্রন্থপাঠ ও উপদেশে কোন ফল হইবে না। আমাদের কথার প্রমাণ এই, একাল পর্য্যন্ত যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা কি কিছুই নীতিশিক্ষা করেন নাই?—এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আউট' অসংখ্য অসংখ্য শিক্ষক, অধ্যাপক, হাকিম, উকিল, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কৃত-বিদ্যগণ যাঁহারা দেশের অলঙ্কার বলিয়া আজি-কালি গণ্য, তাঁহারা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষা করেন নাই? না করিলে ইহাঁদের মুখে প্রাণমনমুগ্ধকর নীতিবাক্য শ্রবণ করিব কেন? আমাদের বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত মাত্রেই নীতিজ্ঞ, মুখে কেহই নীতিহন্তা নহেন, আমরা একথা জোর করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু সত্যানুরোধে অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই সমুদয় শিক্ষিতবর্গের প্রায় পৌণে ষোল আনাই নীতির উপদেশ মানিয়া কার্য্য করেন না। ইহাঁদের মধ্যে চরিত্রহীনতার প্রাবল্য দেখিয়া সমাজের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করতঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। আজকাল সমাজ মধ্যে উকিল ও সম্পাদকের পদ অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। আমরা এই উভয় সম্প্রদায় হইতে দেখাইব নীতিজ্ঞ ও নীতিবান এই উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য। নিম্নশ্রেণীর উকিল মোক্তারের কথা ছাড়িয়া দিলেও উচ্চ আদালতের উকিলদিগের মধ্যে সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী। এবং ইহাঁরা যে নীতিজ্ঞ নহেন এ কথা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। কিন্তু এই সকল উকিল মহাত্মাদিগের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে উহাঁদিগকে কি প্রকৃত চরিত্রবান বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে হয় না? ইহাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন, "সত্যের সমান ধন নাই" "দয়ার ন্যায় ধর্ম্ম নাই" অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" স্বদেশ ও "স্বদেশবাসীগণের উপকারার্থে জীবন বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।" "প্রাণ গেলেও মিথ্যা ব্যবহার অকর্ত্তব্য।" ইত্যাদি নানাবিধ সন্নীতি শিক্ষা করিয়া কি সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন নাই? অবশ্যই হইয়াছেন। কিন্তু যখন চোগা-চাপকান গায়ে দিয়া মাথায় সামলা

আঁটিয়া বিচার-মন্দির শোভিত করেন, তখন কয়জন উকিল এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া চলেন? পশার বৃদ্ধির জন্য কয়জন সত্যধনে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হয়েন? কয়জন গরীব দুঃখী প্রতিবেশী ও স্বদেশীয়ের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বিনা ফিজে" বায়নানামায় দস্তখত করেন? নিজ মক্কেলের মোকর্দ্দমা জিতাইয়া দিবার জন্য সাক্ষীকে শিখাইতে ও অকারণ কূটপ্রশ্নদ্বারা সত্যকে নষ্ট করিবার জন্য কয়জন মিথ্যার আশ্রয় না লয়েন? আর এই যে সম্পাদক মণ্ডলী যাঁহারা আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই নীতিশিক্ষক, যাঁহাদের কৌস্তভোপম লেখনী হইতে অজস্র নীতিরত্নমালা প্রসূত হইয়া জনসাধারণের কণ্ঠদেশ সুশোভিত হইতেছে; যাঁহারা উপদেশে ব্যাস, সত্যে যুধিষ্ঠির, প্রতীজ্ঞায় ভীষ্ম, প্রেমে চৈতন্য, আত্মত্যাগে ঈশা, পরোপকারে দধিচি, অহিংসায় বুদ্ধদেবের আসন পাইবার দাবী করেন, ইহাঁদেরও চরিত্রের বিষয় ভাবিলে কি হতাশ হইতে হয় না? সময়ে সময়ে ইঁহারাও অর্থ লোভে বা স্ব সম্পাদিত পত্রিকার কাটতির অনুরোধে স্বকুলে কলঙ্ক আরোপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। আর এই উভয় সম্প্রদায়ের অনেকেই এতদূর ঋণপরতন্ত্র ও স্বার্থপরায়ণ যে, ভাবিলে মনে বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়। অথচ সমাজে ইহাঁরাই শিক্ষিত ও নীতিজ্ঞ বলিয়া সম্মান ও গৌরব প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

কেন এরূপ ঘটে; এরূপ নীতিজ্ঞ ব্যক্তি কেন এরূপ চরিত্রহীন হয়। আমরা বলিব কেবলমাত্র শিক্ষার দোষে! গ্রন্থ পাঠ ও উপদেশে ইহাঁদেরও নীতিশিক্ষা পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ইঁহারাও যে নীতি মুখে মুখে শিখিয়াছিলেন, মুখে মুখে তাহা এখনও বিরাজ করিতেছে। কার্য্যদ্বারা কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, কাজেই, কার্য্যতঃ কিছু দেখাইতেও পারেন না। ইহাঁদের দোষ কি? যত দোষ শিক্ষা প্রণালীর। আমরা না হয় স্বীকার করিলাম পূর্ব্বে যে সকল নীতিগ্রন্থ পড়ান হইত, যে সকল নীতি উপদেশ প্রদান করা যাইত, তদপেক্ষা এখন বিশুদ্ধ গ্রন্থ পাঠনা ও বিশুদ্ধ উপদেশ প্রদান করা হইবে। তাহার ফল হইবে, বালকেরা বিশুদ্ধ নীতিই শিক্ষা করিবে। কিন্তু অনুষ্ঠান দ্বারা সেই নীতি কার্য্যে পরিণত না হইলে নীতি-শিক্ষার ফল হইবে কিসে?

আমরা বলি যদি নীতি শিক্ষা দিতে হয় তবে ছাত্রগণ যাহাতে অনুষ্ঠান পরায়ণ হয় তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণকে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবে তাঁহারা তদনুসারে কার্য্য করিতেছে কি না ইহা দেখিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে বালক নীতি অনুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছে তখনই বুঝিব তাহার যথার্থ শিক্ষা হইয়াছে। কিরূপে নীতি শিক্ষা করিতে হয় এইখানে একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যান দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব। কোন শিক্ষক তাঁহার শ্রেণীস্থ বালকগণকে প্রথম দিনের পাঠ গ্রহণ করিয়া বলিয়া দিলেন "তোমরা কল্য "ক্রোধ কিরূপে" নামক এই প্রবন্ধটী ভাল করিয়া পড়িয়া আসিও।" বালকগণ পর দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে যথা সময়ে শিক্ষক মহাশয় পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন হে তোমাদের সকলের এটী ভালরূপ পড়া হইয়াছে?" সকলেই বলিল হইয়াছে এবং ফলেও তাহাই দাঁড়াইল। কেবল গোপাল নামে একটী বালক বলিল "মহাশয়! আমি অনেক যত্ন করিয়া কল্য হইতে এই পাঠটী অভ্যাস করিতেছি কিন্তু উহা আমার এখনও আয়ত্ত হয় নাই।" গোপাল ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য। সুতরাং গোপালের কথা শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "সব বোকা ছেলের পড়া হলো আর তোমার হলো না। আর এ পাঠটীই বা এমন শক্ত কি? যাহাহউক কল্য হওয়া চাই।" পরদিনও গোপালের পড়া হইল না। এইরূপ ৪।৫ দিন কাটিয়া গেল তবুও গোপালের ঐ পড়াটী ভাল করিয়া সাঙ্গ হইল না। তদ্দর্শনে শিক্ষক মহাশয় অতিশয় বিরক্ত হইয়া গোপালকে প্রহার করতঃ যথোচিত ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন "বাপু! তুমি কত কঠিন বিষয় এক দিনে আয়ত্ত কর আর এই সামান্য বিষয়টী ৪।৫ দিনেও আয়ত্ত করিতে পারিলে না, তোমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি সকল লোপ পাইয়াছে? আজ তোমাকে বলিতে হইবে কি জন্য তোমার পড়া হয় নাই?" গোপাল কান্দিতে কান্দিতে বলিল "মহাশয় পড়া হইবে কিসে? আমি অনেক চেষ্টা করিয়া ক্রোধ জয় করিতে পারিতেছি না, আজিও আমার ভৃত্যের প্রতি ক্রোধ হইয়াছিল। যে কাল পর্য্যন্ত আমি ক্রোধ জয় করিতে না পারিব সে কাল পর্য্যন্ত আমার উহা পড়া হইবে কিরূপে?" তখন শিক্ষক মহাশয় বুঝিতে পারিলেন গোপাল কিরূপে "ক্রোধ বিজয়"

পড়িতেছে। শিক্ষক মহাশয় বোধ হয় কখনও স্বপ্নেও ওরূপ কোন বিষয় পড়েন নাই। যাহা হউক এই গোপালের মত পড়িতে পারিলে তবে নীতিশিক্ষা হইবে। নচেৎ সকলই পণ্ডশ্রম মাত্র।

বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইলে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া সংযমী হইতে হইবে। শিক্ষক মহাশয় বা উপদেষ্টা অপূর্ব্ব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করত উপদেশ দিলেন "প্রিয় বালকগণ পাঠ্যাবস্থায় বিলাসী হইও না" "Plain living and high thinking" এই নীতির উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া চরিত্র সংগঠন করিও।" কেলিকুঞ্জের নাগরের ন্যায় বেশধারী ছাত্রগণ উত্তর করিল "মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন বিলাসিতাতেই ভারত মাটি হইল।" উপদেষ্টা মহাশয় অমনি বলিলেন "বিলাসিতার অপকারিতা তোমরা ঠিক বুঝিয়াছ এবং আমি অতীব সন্তুষ্ট হইলাম যে, তোমরা উহাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছ।" এইরূপে নীতিশিক্ষা করিয়া ছাত্রবৃন্দ বাটী আসিয়া রীতিমত জলযোগের পর পুনশ্চ অপরূপ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া রঙ্গালয়ে অথবা ইডেনগার্ডেনের শোভা বৃদ্ধি করিতে গমন করিলেন এবং রঙ্গালয়ে বারবিলাসিনীগণের ও ইডেনগার্ডেনে শ্বেত নাগরনাগরীর হাবভাব লাসবেশ দর্শন করিয়া তদ্বিষয় মনে মনে আন্দোলন করতঃ Plain living and high thinking নীতিশিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। এইরূপেই আজকাল নীতিশিক্ষা দান ও শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে! আমরা এরূপ নীতিশিক্ষার পক্ষপাতী নহি।

বর্ত্তমান সময়ে নীতিশিক্ষা প্রদান করিতে হইলে প্রাচীন আর্য্যসমাজের শিক্ষা প্রণালীর অনুকরণ করিতে হইবে। প্রাচীনকালে শিক্ষার্থীকে দীক্ষার পর হইতেই গুরুগৃহে অবস্থান করতঃ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। আর্য্য ঋষিগণ বুঝিতেন বিদ্যা-

লাভ অতীব কঠিন ব্যাপার এবং বিদ্যার ফল যে চরিত্র তল্লাভ আরও কঠিন। কঠোর সাধনা ব্যতীত বিদ্যা ও তৎফল চরিত্র লব্ধ হয় না। সাধনা করিতে হইলে সংযমের প্রয়োজন; সংযম শিক্ষা করিতে হইলে বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। সেইজন্য আর্য্য বালক প্রলোভন-পূর্ণ সমাজ পরিত্যাগ করিয়া গুরুগৃহে অবস্থান করতঃ গৈরিক বসন পরিধান, নগ্নপদে গমনাগমন, এক সন্ধ্যা নিরামিষ আহার, কম্বলাসনে শয়ন ইত্যাদি কঠোরাবলম্বন করিয়া বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইতেন। যতদিন শিক্ষা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, ততদিন এক-ক্ষণের জন্যও বিলাসিতাকে মনে স্থান দিতেন না বা দিবার অবসর প্রাপ্ত হইতেন না। এইরূপে পাঠ সমাপন করিয়া গুরু গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বগৃহে গমন করতঃ দার পরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন। এইরূপ শিক্ষা-প্রণালীর গুণে এক এক আচার্য্যের চতুষ্পাঠী হইতে বিদ্যা ও চরিত্রের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি সকল বহির্গত হইয়া সংসারক্ষেত্র উজ্জ্বল করিতেন। এখন ইহার ঠিক বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। পল্লীগ্রাম হইতে সঙ্গতি-পন্ন পিতা পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ সহরে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে আসিল একজন পরিচারক ও জনৈক রসুয়ে। মাস মাস রীতিমত টাকা আসিতে লাগিল। ছাত্র বাবু সুবিধা মত কোন দ্বিতল অথবা ত্রিতল গৃহে বাসা লইলেন এবং একটী নামজাদা কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করিলেন। অচিরে নানাবিধ বিলাসদ্রব্যে ছাত্রবাবুর পাঠাগার সুসজ্জিত হইল। মজুমদার কোম্পানী, ডসন্ সাহেব ইউসুফ মাংসবিক্রেতা নূতন খদ্দের লাভ করি-লেন। ফুলেল তৈল, আটোডি রোজ ল্যাভেণ্ডার ও পমেটমের শিশি রাশি রাশি আসিয়া Reading tableএর পার্শ্বদেশ অধিকার করিল। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য অব-লম্বনে পাঠ কার্য্য চলিতে চলিতে ছাত্র বাবুর মনে স্ফূর্ত্তির উদয় হইল। তখন রঙ্গালয়ে ও বারাঙ্গনার মন্দিরে ছাত্র বাবুর অবিকল অনুরূপ একটী প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে বাবুর শিক্ষা-কার্য্য চলিতে চলিতে F. A. পরীক্ষার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। যা হ'ক কতক-গুলি লেখা কাগজও বাবুর হস্ত হইতে পরীক্ষকের হস্তে গেল। এদিকে বাবু এলে (?) দিয়াছেন, ব্যাপার সহজ নহে; মেরিটে অবশ্যই পাশ হইবেন। দালাল যুটিল, বিবাহের সম্বন্ধ চলিতে লাগিল। কোন দুর্ভাগ্য দম সামলাইতে না পারিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব সহ কন্যারত্নটী ছাত্র বাবুর গলদেশে ঝুলাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, পরীক্ষক উত্তরের ছটা দেখিয়া ঈর্ষায় বাবুকে ফেল করিয়া দিলেন। ছাত্র বাবু বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষককুলকে গালি দিতে দিতে সহর ত্যাগ করিয়া পাড়াগাঁয়ে গিয়া সাহেব বাবু হইয়া বসিলেন। কলি-কাতা হইতে মদ ও বেশ্যা চলাচলের দরুণ রেলওয়ে কোম্পানী কিছু লাভবান হইলেন। পাড়াগাঁয়ে গিয়া বাবু স্বীয় চরিত্র সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া বসিলেন। সে চরিত্র-সৌন্দর্য্যে কত কুলনারী ডুবিয়া গেল, কত সুঁড়ি সঞ্চয় করিয়া লইল, কত নিরীহ ভদ্র-লোকের সম্পত্তি বাবুর সম্পত্তিতে লীন হইয়া গেল। আজকাল এইরূপেই নীতি শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে ও তাহার ফলস্বরূপ এইরূপ চরিত্রবান লোকই উৎপন্ন হইয়াছে!

ছোটলাট বলিয়াছেন, প্রত্যেক ছাত্রের মাসিক ২৲ টাকা ব্যয় হওয়া উচিত। তিনিও পাঠ্যাবস্থায় ছাত্রগণকে বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া সংযমী হইতে বলিয়াছেন। আমরাও এই নীতির পক্ষপাতী। যদি বালকগণকে নীতিশিক্ষা দিয়া চরিত্রবান করিবার বাসনা থাকে, তবে যাহাতে তাহারা বিলাসিতার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য; যাহাতে ছাত্রগণ কেবলমাত্র নীতিজ্ঞ না হইয়া নীতিবান হইতে পারে, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

প্রথম ভাগ।

বাল্যবিবাহ-প্রতিবাদ।

অগ্রহায়ণের 'প্রতিনিধিতে' বাল্যবিবাহ-বিষয়ক প্রবন্ধপাঠে ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর মনে কোনরূপ বিসদৃশ ভাবের আবির্ভূতি হই-বার পূর্ব্বেই আমরা তৎ-প্রতিবাদে উদ্যুক্ত হইতেছি। কিন্তু প্রতিবাদের সূচনাতেই অগ্রে আমাদিগের দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। সম্প্রতি এই কলিযুগের অন্তিম দশায় আহার-বিহার-দেশাচারাদি সামা-জিক সকল বিষয়েই যে হিন্দুধর্ম্ম ষোলকলায় বিরাজ করিতেছে, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। অবশ্য নানা স্থানেই ধর্ম্মের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। মনে করুন, শাস্ত্র বলিতেছে—'ব্রাহ্মণ ষট্-কর্ম্ম নিরত হইবেন, তদিতর অন্য কার্য্য করিবেন না'। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বোধ করি, শাস্ত্রীয় এই বচন, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নিকটেই পরাহত। এরূপ শাস্ত্রাব-মাননায় সমাজ-সংস্কারক ভায়ারা একেবারে উদাসীন। সুরাপান, অনৃত-কথন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ ও অগম্যাগমন ইত্যাদি স্থলেও হিন্দুশাস্ত্র ভুয়ো ভুয়ো নিষেধ বিধি বিধান করিয়াছেন; পরন্তু শাস্ত্রের সে সকল নিষেধ-বাক্য প্রতিপালিত হইতেছে না, দেখিয়া যদি ইদানীন্তন সুশিক্ষিত উপাধি-ভূষিত মহোদয়গণ উহাদের প্রবর্ত্তনের জন্য প্রাণ-পণে প্রয়াস পান, তাহা হইলে উভয়তই শুভাবহ হয়। ফলতঃ এবম্বিধ বহুবিধ স্থলে শাস্ত্রাতিক্রমে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপই নাই। শাস্ত্রাতিক্রম জন্য তাঁহাদের যত দুঃখ, যত মর্ম্মবেদনা কেবল বাল্যবিবাহে ও বিধবাবিবাহে (আমরা এস্থলে না হয় তর্কের খাতিরে বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্বীকার করিলাম)। যদি তাঁহারা নানাস্থলেই শাস্ত্রাতিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারেন, তবে এই দুইটির বেলা-তেই বা পারেন না কেন? অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। অভিসন্ধি আর কিছুই নয়, যাহা আমরা বুঝিয়াছি, তাহা এই—তাঁহারা শাস্ত্র মানেনও না, মানিবেন-ও না। তবে পূর্ব্বোক্ত দুটি বিষয় নাকি ইংরাজদিগের উচ্ছিষ্ট, তাই আজ প্রসাদা-কাঙ্ক্ষী নব্য যুবক তৎপ্রবর্ত্তনে এত ব্যগ্র! যদি ইংরেজি-শিক্ষার হলাহল তাড়িত বেগে বঙ্গীয় যুবকের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত

না হইত, তাহা হইলে শতযুগেও উহাদের বৈধতা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইত না। শাস্ত্রাতিক্রম হউক বা নাই হউক, তাহাতে তাঁহাদের তত ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, ইংরেজদের মত যুবতী-বিবাহ করিতে পারিতেছেন না; বা এখানে দুইদিন ওখানে পাঁচদিন কোর্টশিপ দ্বারা মজা মারিতে পারিতেছেন না, এই দুঃখই তাঁহাদের অসহ্য। সংস্কারপ্রিয় নেতৃগণের নিকট সবিনয় অনুরোধ, যদি তাঁহারা প্রকৃতই শাস্ত্রের অমর্য্যাদাজন্য দুঃখিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, বিধবাবিবাহ ও বাল্যবিবাহ ব্যতীত আর যেখানে যেখানে শাস্ত্রের লঙ্ঘন হইতেছে, অগ্রে তাহারই প্রতিবিধানে যত্নবান্ হউন,তাহাতে ইষ্টাপত্তি আছে। আর যদি রাজপুরুষদিগের অনুচিকীর্ষাবশতই এত আড়ম্বর করিয়া থাকেন, তবে আর ওসব কথা আমাদের সমক্ষে পাড়িবেন না। হিন্দুদিগের জর্জ্জরিত কলেবরে আর লবণ প্রক্ষেপ করিবেন না। Free will চালিত করিবার ইচ্ছা থাকিলে, Free will-ওলাদের দলে মিসুন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

অশাস্ত্রীয় কার্য্য সমাজে আদৌ চলিতে পারে না। তাই বলিয়া প্রত্যেক শাস্ত্রীয় নিদেশই যে সর্ব্বাংশে সুসম্পন্ন হইবে এরূপও নহে। যেস্থলে কোন বিরোধ উপস্থিত হয়, তথায় একটা প্রতিপ্রসব ঘটাইয়া মীমাংসা না করিলে চলে না। শাস্ত্র বলিতেছে—

ঋতৌ স্নাতাস্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি। ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

ইহার অর্থ এই, যে ব্যক্তি ঋতুস্নাতা ভার্য্যাতে উপগত না হয়, সে ঘোর ভ্রূণহত্যার পাপে পতিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

দেশকালপাত্র লইয়া শাস্ত্রীয় বচন রচিত হইয়া থাকে। সেকারণ, যাৎকালিক শাস্ত্র, তাৎকালিক লোকের সর্ব্বতোভাবেই সুসঙ্গত কিন্তু, অধস্তন লোকের তাহাতে অসঙ্গতি ঘটিলেও ঘটিতে পারে। সেইজন্য উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বচন পূর্ব্বে প্রতিপালিত হইলেও ইদানীং দেশকালপাত্রের অন্যথাত্ব হেতু উহার অমর্য্যাদা ঘটিতেছে। ঋতুকালে ভার্য্যায় উপগত হওয়া সকল সময়ে সকলের ঘটিয়া উঠে না। তাই বলিয়া যে ঋতুমতীর পরপুরুষসঙ্গতি বা তৎপতির পরভার্য্যাগমনাদি অশাস্ত্রীয় কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, এরূপও নহে।

আর একটী শাস্ত্রীয় নিদেশ শুনুন—

শূদ্রাণাং দ্বিজশুশ্রূষা পরোধর্ম্মো প্রকীর্ত্তিতঃ। অন্যথা কুরুতে কিঞ্চিদ্ভবেত্তস্য নিষ্ফলম্॥

ইহার অর্থ এই, যে, শূদ্রজাতির দ্বিজসেবাই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। তাহারা অন্য যাহা করিবে, তাহাই নিষ্ফল হয়।

দেশকালপাত্রের অন্যথাত্ব হেতু ঐ বচনও প্রায় পরিত্যক্ত। পূর্ব্বে পারত্রিক সুখাশাই মুখ্য এবং ঐহিক সুখাশা তদানুসঙ্গিক ছিল। এক্ষণে ঐহিক সুখাশাই মুখ্য; পারত্রিক সুখাশা তদানুষঙ্গিক হইয়াছে। এই ঐহিক সুখাশার জন্যই শূদ্রগণ বিপ্রসেবায় বিরত। তাই বলিয়া তাহারা ব্রাহ্মণ-হত্যাদি অশাস্ত্রীয় কার্য্য করে না; এবং যতদূর সাধ্য

বিপ্রসেবাতেও পরাঙ্মুখ নহে। দেশকালপাত্রানুসারে যেমন শাস্ত্রীয় বচনের কোন কোন অংশের অমর্য্যাদা ঘটে, সেই দেশকাল ও পাত্রের জন্যই আজ শাস্ত্রের ষোড়শবর্ষে কন্যার বিবাহবিধির অমর্য্যাদা ঘটিতেছে। (আমরা পূর্ব্বেই তর্কের খাতিরে যুবতীর বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছি; এস্থলেও আমাদের সেই স্বীকার বাহাল)। ষোড়শবর্ষে বিবাহ রহিত হইয়াছে বলিয়া, যে, হিন্দুরা উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবলম্বন করত শাস্ত্রে পদাঘাত করিতেছে, তাহা নহে। তাহারা সুবিধা মত বালিকার বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া যথাসাধ্য শাস্ত্রনিদেশ শিরোধার্য্য করিতেছে। অতএব, দেশকালপাত্রের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত প্রতিপ্রসূত শাস্ত্রের অমর্য্যাদা দূষণীয় নহে।

আমাদের পূর্ব্বের কথার শেষ হইল। হিন্দুশাস্ত্রে যে যুবতীর বিবাহ অনুমোদিত নহে, তৎপ্রতিপাদনই এইবার আমাদের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধ লেখক যে—

'কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি। ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ'।

এই শ্লোকদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন, যে, উহা পুষ্পিতা রমণীর বিবাহের প্রশস্য-দাতা, তাহা কখনই সম্ভব নহে। এতন্মীমাংসার জন্য প্রথমেই আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, উহার প্রযোজ্য কে?—গুণহীন পাত্র। গুণহীনপাত্রে 'সম্প্রদান-নিষেধের দার্ঢ্যের জন্যই বলা হইল,—'কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ গৃহে থাকিবে, তথাপি তাহাকে গুণহীন পাত্রে দান করিবে না'। ইহাতে রজস্বলা কন্যাদানের বিধি কিরূপে সূচিত হইবে? তাহা হইলে ত ঐ শ্লোক দ্বারা শাস্ত্রকার অবিবাহিতা কন্যাকেও আমরণ গৃহে রাখিবার বিধি দিয়াছেন, এরূপ ভাবার্থও গ্রহণ করা যায়? অতএব, উহা বিধির দার্ঢ্যতাব্যঞ্জকমাত্র, ঋতুমতীর বিবাহসূচক নহে। মনে করুন, যদি কেহ বলে, 'তুমি মরে গেলেই এস্থান ছাড়িবে না'; তাহা হইলে কি 'তুমি মরিবে' এইরূপ ভাবগ্রহণ করা যায়? কখনই না। তাহাতে কেবল স্থান না ছাড়ার দৃঢ়তা জ্ঞাপন করিতেছে, তদ্ভিন্ন কিছুই নহে। ফলতঃ,যেখানে যাহা অভিধেয়, তৎপরিহারে ইতরার্থ গ্রহণে কেবল সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে, তজ্জন্য বিজ্ঞমাত্রেই তাহাতে বিমুখ হইবেন।

প্রবন্ধলেখকের অন্যশ্লোক—

ত্রিংশবর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্।

প্রবন্ধলেখক যে এই শ্লোকটি কোথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। শাস্ত্রে যে এরূপ কোন বচন আছে, তাহা আমাদের অন্তশ্চক্ষুরও অগোচর। বাহ্যচক্ষে আমরা কয়েকখানি সংহিতা আদ্যন্ত বিলোড়িত করিয়াও উহার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলাম না। তবে আমরা সামান্য জীব, কোন শাস্ত্রই বা পড়িয়াছি; কোন শাস্ত্রই বা জানি; হিন্দুশাস্ত্র অগাধ সমুদ্রবিশেষ; অবশ্যই কোথাও না কোথাও উহার সত্তা হইতেই পারে, তাই ভাবিয়াই উহার উদ্দেশ্য প্রকটিত করা করা যাইতেছে-

'ত্রিংশবর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং' ইত্যাদি শ্লোকটীও যুবতীর বিবাহের পোষয়িতা নহে।

যেহেতু এস্থলেও প্রযোজ্য দম্পতীর বয়ঃপার্থক্য। জায়াপতীর বয়সের কত অন্তর বিধেয়, তাহাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। তজ্জন্য মনু বলিয়াছেন—

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্। ত্র্যষ্টবর্ষো২ষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

অর্থ। ত্রিংশবর্ষীয় পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়ার, অথবা, চতুর্ব্বিংশবর্ষ-বয়স্ক যুবা অষ্টবর্ষীয়ার পাণিগ্রহণ করিবে। অন্যথা ধর্ম্মহানি হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

বর্ষৈরেকগুণাং কন্যামুদ্বহেৎ ত্রিগুণঃ স্বয়ম্।

অর্থাৎ, ত্রিগুণবয়া পুরুষ একগুণাকে বিবাহ করিবে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি যেমন স্ত্রীপুরুষের বয়ঃপ্রভেদ জ্ঞাপক; প্রবন্ধ লেখকের 'ত্রিংশবর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং' ইত্যাদি শ্লোকও তেমনি প্রভেদ-জ্ঞাপক ভিন্ন আর কিছুই নয়। অর্থাৎ, কোন কোন শাস্ত্রকারের মত ত্রিশ বৎসরের পুরুষ বার বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে। কাহারও মত একগুণবয়স্কার সহিত ত্রিগুণবয়স্কের বিবাহ বিহিত। আবার কাহারও মত ষোড়শী ত্রিংশতিকের পরিণাম্য। অর্থাৎ, দম্পতীর বয়োনির্দ্ধারণের কোন একটা আনুপাতিক নিয়ম নাই, তবে বয়ঃক্রমানুগতিক কোথাও এক তৃতীয়াংশ, কোথাও পাঁচের দুই, কোথাও বা প্রায় অর্দ্ধেক। আবার ত্রিশবৎসরের অধিক হইলে অর্দ্ধেকেরও অধিকবয়স্কার সহিত বিবাহ যুক্তিযুক্ত। যেমন চত্বারিংশদ্বর্ষীয় পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়ার পতি হইবে। কিন্তু, ইহা আর বলিবার আবশ্যক হয় নাই; কারণ, হিন্দুসমাজে এতাদৃশ অনূঢ়ানারীর সত্তা একেবারেই অসম্ভব। তবে মন্বাদি শাস্ত্রকারদিগের সময়ে অপরিণীতার ঊর্দ্ধতম বয়ঃক্রম ষোড়শ বটে, যদি সে নগ্নিকা থাকে। অধুনা ষোড়শবর্ষীয়া নগ্নিকার কথা একরূপ বিস্ময়করী। যদি নগ্নিকাই না হইল, তাহা হইলে ষোড়শবর্ষীয়ার পরিণয় কিরূপে শাস্ত্রসম্মত হইবে? কারণ, শাস্ত্র সজ্ঞাতপুষ্পার বিবাহে বিধি দেয় না। অবিবাহিত কন্যার ঋতু দর্শন শাস্ত্রানুসারে ঘোরতর পাপজনক।

কাশ্যপ কহিয়াছেন—

পিতুর্গৃহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা। ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা।

অর্থ। অবিবাহিতা কন্যা পিত্রালয়ে ঋতুমতী হইলে তাহার পিতা ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হন। সেই কন্যাকে বৃষলী কহে।

যম কহিয়াছেন—

মাতাচৈব পিতাচৈব জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈব চ। ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্যাকে রজস্বলা দেখিলে পিতা মাতা ভ্রাতা তিন জনেই নরকগামী হয়।

পৈঠিনসি কহিয়াছেন—

যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া। অথ ঋতুমতী ভবতি দাতা প্রতিগৃহীতা চ নরকমাপ্নোতি।

পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে। তস্মাৎ নগ্নিকা দাতব্যা।

অর্থ। স্তনোদ্ভেদের পূর্ব্বেই কন্যাদান বিধেয়। যদি ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে দাতা ও গ্রহিতা নরকগামী হয়, এবং পিতাপিতামহ ও প্রপিতামহ বিষ্ঠায় জন্ম গ্রহণ করে। অতএব রজোদর্শনের পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবে।

বশিষ্ঠ সংহিতায় লিখিত আছে—

যাবচ্চ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাম্। ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ।

অর্থ। যাচ্যমানা কন্যা যতবার রজঃস্পৃষ্ট হয়, তৎপিতামাতা ততগুলি ভ্রূণহত্যা করে, ইহাই ধর্ম্মবাদ।

নারদ লিখিয়াছেন—

প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যাং ঋতুকালভয়াৎ পিতা।

অর্থ। পিতা ঋতু কালের ভয়ে অপুষ্পিতা কন্যা সম্প্রদান করিবে।

সংবর্ত্ত লিখিয়াছেন—

তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ। বিবাহোষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে।

অর্থ। অতএব, ঋতুমতী না হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিবে। অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহই প্রশংসনীয়।

ব্যাস কহিয়াছেন—

যদি সা দাতুর্বৈকল্যাদ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা। ভ্রূণহত্যাশ্চ তাবত্যঃ পতিতঃ স্যাত্তদপ্রদঃ॥

অর্থ। দাতার দোষে কুমারী যতবার রজোদর্শন করিবে, সে ততবার ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত ও পতিত হইবে।

এতাদৃক শাস্ত্রনিদেশদ্বারাই ইদানীং ষোড়শীর বিবাহ রহিত হইয়াছে। কারণ, বর্ত্তমান কালে অনার্ত্তবা ষোড়শী কোথায়? দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহার সত্তা নিতান্ত বিরল ছিল না। তন্নিবন্ধন—

'ত্রিংশবর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং' এই শ্লোক পূর্ব্বকালে দুই এক স্থানে প্রযোজ্য হইতে পারিত, এক্ষণে দেশকালপাত্রের অন্যথাত্বহেতু উহার একেবারেই লোপ পাইয়াছে; আর হিন্দু সন্তানগণ এখন সুধিমত

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্। ত্র্যষ্টবর্ষো২ষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

অথবা,—বর্ষৈরেকগুণাং কন্যামুদ্বহেৎ ত্রিগুণঃ স্বয়ম্।

ইত্যাদি শাস্ত্রীয়বচন পালনদ্বারাই আপনাদের আর্য্যত্বরক্ষা করিতেছেন।

প্রবন্ধ-লেখক তদীয় প্রবন্ধের স্থানান্তরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে 'অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী' ইত্যাদি পারাশরীয় বচন বর্ষীয়সীর বিবাহের প্রতিকূল হইলেও উক্ত বচন শূন্যক্ষেপণ-যোগ্য। 'কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ' জানিয়াও যখন আমরা তদীয় 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি নিদেশ গ্রাহ্য করি

নাই, তখন বাল্যবিবাহেই বা তদীয় বচন গ্রাহ্য করিব কেন?

এতদ্বিষয়ে আমাদের প্রত্যুত্তর এই যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় পারাশরীয় বচন পরিহারের যেরূপ হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আতিদেশিকতাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে হয়। পরাশরের 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি শ্লোকপরিহারের নানা নিমিত্ত আছে। তৎসমুদয়ের যথাযথ বিবৃতি এস্থলে অনুপপত্তিকর। যাহা হউক, পরাশরের বচন অগ্রাহ্য হইলেও আরও কত কত ধর্ম্মশাস্ত্রকার বালিকার বিবাহে বিধি দিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে। মুহূর্ত্ত চিন্তামণিকার লিখিয়াছেন—

রবিশুদ্ধিবশেন কন্যকানাং সমবর্ষেষু ষড়ব্দকোপরিষ্টাৎ। ষড়ব্দমধ্যে নোদ্বাহ্যা কন্যা বর্ষদ্বয়ং যতঃ সোমো ভুঙ্‌ক্তেঽথ গন্ধর্ব্বস্ততঃ পশ্চাদ্ধুতাশনঃ। অতঃ ষড়ব্দানন্তরং সপ্তমে বর্ষে বিবাহঃ শুভঃ।

অর্থ। ছয় বৎসরের পর কন্যাগণের যুগ্মবর্ষে রবিশুদ্ধিতে বিবাহ বিহিত। ছয় বৎসরের মধ্যে কন্যাকে বিবাহ করিবে না। কারণ, সে প্রথম দুই বৎসর সোমের ভোগ্যা, তৎপরে দুই বৎসর গন্ধর্ব্বের; শেষে দুই বৎসর হুতাশনের, তৎপরে সপ্তম বর্ষ হইতে মানবভোগ্যা। অতএব ষড়বর্ষান্তর সপ্তম বর্ষে বিবাহ শুভকর।

ব্যাস লিখিয়াছেন—

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী। দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা দ্বাদশে বৃষলী স্মৃতা॥

অর্থ। কন্যা অষ্টমবর্ষে গৌরী; নবম বর্ষে রোহিণী, দশমবর্ষে কন্যা; দ্বাদশে বৃষলী।

গৌরী বা রোহিণীদানের ফলশ্রুতি বাৎস্য বলিয়াছেন—

গৌরীং দদৎ ব্রহ্মলোকং সাবিত্রং রোহিণীং দদৎ। কন্যাং দদৎ স্বর্গলোকমতঃ পরমসদ্গতিম্॥

দাতা গৌরীদানে ব্রহ্মলোক, রোহিণীদানে সাবিত্রলোক, কন্যাদানে স্বর্গলোক, তৎপরে অসদ্গতি প্রাপ্ত হয়।

দেখুন দেখি, ষোড়শ কি অষ্টাদশ বা বিংশতি বর্ষে কন্যাদান করিয়া কে অসদ্গতি লাভে ইচ্ছুক হইবে?

তিনি আরও বলিয়াছেন—

গৌরী বিবাহিতা সৌখ্যসম্পন্না স্যাৎ পতিব্রতা। রোহিণী ধনধান্যাদি-পুত্রাঢ্যা সুভগা ভবেৎ। কন্যা বিবাহিতা সম্পৎসমৃদ্ধা স্বামিপূজিতা॥

অর্থ। বিবাহিতা গৌরী সৌখ্যসম্পন্না ও পতিব্রতা হয়। রোহিণী ধনধান্যপুত্রবতী ও সুভগা হইয়া থাকে। কন্যা সমৃদ্ধিশালিনী ও স্বামীপূজিতা হয়।

অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে, শাস্ত্রের মতে দশবৎসরের ঊর্দ্ধে বিবাহে ঐহিক পারত্রিক কোনরূপ সুখাশাই নাই।

গৃহ্যপরিশিষ্টে লিখিত আছে—

'ধর্ম্ম্যেষ্বেব বিবাহেষু কালস্য পরীক্ষণম্। নাধর্ম্ম্যেষু বিবাহেষু।

অর্থাৎ, ধর্ম্মযুক্ত বিবাহেই কালাকালদর্শন, ধর্ম্মশূন্য বিবাহে নহে।

তবেই, যাঁহারা ধর্ম্মদার গ্রহণেচ্ছু, তাঁহারাই সাত, আট, নয়, দশ বিচার করিবেন; ইন্দ্রিয়পরবশ ব্যক্তি তাহাতে কর্ণপাত করিবে কেন! যত উপযুক্ত হইবে, তাহার পক্ষে ততই সুবিধা।

শাস্ত্রকারগণ দশবর্ষব্যতিক্রান্তা কন্যার বিবাহে কত সত্বর, তাহা পরবর্ত্তী ব্যাসবাক্যেই অনুমিত হইবে, যথা—

'দশবর্ষব্যতিক্রান্তা কন্যা শুদ্ধিবিবর্জ্জিতা। তস্যাস্তারেন্দুলগ্নানাং শুদ্ধৌ পাণিগ্রহো মতঃ॥ গ্রহশুদ্ধিমব্দশুদ্ধিং শুদ্ধিং মাসায়নর্ত্তুদিবসানাং অর্বাক্ দশবর্ষেভ্যো মুনয়ঃ কথয়ন্তি কন্যকানাম্'॥

অর্থ। দশবর্ষ অতীত হইলেই কন্যা শুদ্ধিবর্জ্জিত হয়। চন্দ্র তারা ও লগ্নশুদ্ধি দেখিয়াই তাহার বিবাহ দিবে। গ্রহশুদ্ধি, অব্দশুদ্ধি অথবা মাস, অয়ন, ঋতু, দিবস ইত্যাদির শুদ্ধি কেবল দশবর্ষের ঊনবয়স্কার জন্যই মুনিরা বলিয়াছেন।

দেখুন, সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি দেখিয়া বিবাহে যদি কালবিলম্ব হয়, তজ্জন্য দশবর্ষীয়ার বিবাহ যেন তেন প্রকারেণ সম্পন্ন হইলেই হইল, ইহাই ধর্ম্মপ্রয়োজকদিগের মত। অতএব দশ বার বৎসরের পর বিবাহ হিন্দুর নহে। অন্য জাতির হইতে পারে। যাহারা হিন্দু, শাস্ত্রনির্দ্দেশ যাহাদের শিরোধার্য্য, তাহারা কি শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আপাতমধুর পরিণামবিরস ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারে? আপনার সুবিধা মত সমাজ সংগঠন নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর নহে, ভাক্ত হিন্দুর বটে। তাওত বয়স্থার বিবাহে সুবিধা কিছুই দেখা যায় না। আপাতমাত্র যতটুকু চর্ম্মচক্ষে পরিলক্ষিত হয়, তাহা কেবল আমাদিগের স্থূলদর্শিতানিমিত্তক। তাহা ত সূক্ষ্মদৃষ্টিমান লোকের চক্ষুগোচরই হয় না। বয়স্থার বিবাহ বা স্বেচ্ছাবিবাহ যে যে সমাজে চলিত আছে, তাহার ফলাফলত আমরা দেখিতেছি, বুঝিতেছি, জানিতেছি, তথাপি উহারই অনুকরণ করিব! কেন না উহা যে রাজপুরুষদের উচ্ছিষ্ট! জানিয়া শুনিয়াও যাহারা উৎপৎস্যমান বিপদে আপনাকে নিমজ্জিত করে; স্বচক্ষে দেখিয়াও যাহারা উদ্যমান অসিধারার নিম্নে স্বীয় গলদেশ পাতিত করে; তাহাদের তত্ত্বনিষ্ঠমতিপরিবর্ত্তন যাঁহার আয়ত্ত, সেই সর্ব্বময় অনাদি অনন্ত বিরাটপুরুষব্যতীত আর ইহাদের গত্যন্তর নাই। তিনিই সকলকে সুমতিমান করুন। শিবমস্তু।

বাল্যবিবাহনিরাকরণেচ্ছায় প্রবন্ধলেখক মহাশয় আশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করত যেরূপ প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের বোধ হয়, তিনি কোন অজ্ঞ বা চতুর লোকের মতানুসরণ করিতে গিয়াই এরূপ বিপন্ন হইয়া থাকিবেন। সূত্রাংশের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট চাতুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে এরূপ চাতুর্য্য বিস্তার করিয়া স্বমতের পরিপুষ্টি বিধান করিবেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস্য নহে। যাহা

হউক, উহার ব্যাখ্যা আমরা বিশদরূপে বিবৃত করিতেছি।

আশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্র ১।৮।১০

'অক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণাবলংকুর্ব্বাণাবধঃশায়িনৌ স্যাতাম্'॥

তৎপরে আশ্বালায়নগৃহ্যসূত্র ১।৮।১১

অতঃঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রম্।

উভয় সূত্রের ভাষ্য যথা।

অতো গৃহপ্রবেশনীয়হোমাদূর্দ্ধং ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রং বা নিয়তৌ স্যাতাম্।

অর্থ। গৃহপ্রবেশনীয় হোমের পর দম্পতী ক্ষারলবণাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় ত্রিরাত্র বা দ্বাদশ রাত্রি নিয়ত থাকিবে।

ইহার পরই আশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্র ১।৮।১২

'সম্বৎসরংবৈক ঋষির্জায়তে ইতি'

ভাষ্য। সংবৎসরং বা নিয়তৌ স্যাতাম্। এক ঋষিকল্পঃ পুত্রো জায়তে ইতিকৃত্বা। অন্যেত্বাহুঃ ব্রতান্তে একঋষিঃসম্পদ্যতে পিতৃগোত্রং বিহায় পতিগোত্রং ভজতে ইত্যর্থঃ।

এক্ষণে আমরা সমগ্র ভাষ্যের অর্থ করিব না। আবশ্যকীয় অংশটুকুরই ব্যাখ্যা করিলাম। অর্থ যথা। অথবা সম্বৎসর নিয়ত থাকিবে। এরূপ করিয়া এক ঋষিকল্প পুত্র হয়।

এইবার তিনটী সূত্রের একেবারে অর্থ করিলেই সব গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

তিনটীর অর্থ যথা—

গৃহপ্রবেশনীয় হোমের পর দম্পতী ক্ষারলবণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় তিন রাত্রি দ্বাদশ রাত্রি অথবা সম্বৎসর ধরিয়া নিয়ত থাকিবে। এরূপ করিয়া এক ঋষি হয়।

পাঠকবর্গ দেখুন, 'সম্বৎসরং' ইহার পূর্ব্ব সূত্রের সহিত সম্বন্ধ। তাহাতে 'ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রং সম্বৎসরং বা নিয়তৌ স্যাতাম্' এইরূপ হইল। 'এক ঋষির্জায়তে'র সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। এক্ষণে 'এক ঋষির্জায়তে' ইহার অর্থ হইলেই সব গোলযোগ মিটিয়া যায়। কিন্তু, এই অংশের অর্থে নানারূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কয়েকটী শব্দানুসারে অর্থ করিলেত 'একটী ঋষি হয়', এইরূপ অর্থপণ্ডিই ঘটিতে পারে। এবং তাহাই বাস্তব অর্থ। তাহা হইলেই সমস্ত অংশের অর্থ এইরূপ দাঁড়াইল।

'গৃহপ্রবেশনীয় হোমের পর দম্পতী ক্ষারলবণ পরিহার করত তিন রাত্রি, দ্বাদশ রাত্রি, অথবা সম্বৎসর নিয়ত থাকিবে। তাহা হইলে (পতি) একটী ঋষি তুল্য হয়'।

ভাষ্যানুযায়ী অর্থ করিলেও,'পতি ঋষিকল্প পুত্র হয়' এইরূপ অভিধেয়ই বুঝিতে হইবে; নতুবা 'কৃত্বা' এই ক্ত্বান্ত ক্রিয়ার সহিত 'জায়াতে' ক্রিয়ার এককর্ত্তৃত্ব থাকে না। সুতরাং 'জায়তে' ক্রিয়ার কর্ত্তা পতি; তজ্জাত পুত্র নহে। এতদ্ব্যতীত ভাষ্যে উহার অর্থান্তরও আছে। যথা—

'অন্যেত্বাহুঃ ব্রতান্তে এক ঋষিঃ সম্পদ্যতে পিতৃগোত্রং বিহায় পতিগোত্রং ভজতে ইত্যর্থঃ'।

সংস্কৃত ঋধাতুর অর্থ গমন করা; অতএব ঋষি শব্দের অর্থ 'যে গমন করে'। তজ্জন্য 'একঋষিঃ সম্পদ্যতে' ইহার অর্থ—'একজন গমনকারী হইল'। অর্থাৎ, ব্রতান্তে পত্নী পিতৃগোত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বামীগোত্রে গমন করিল, এইরূপ অর্থও অনেকে করিয়া থাকেন। প্রবন্ধলেখক মহাশয় স্বমত পরিপোষণার্থ ভাষ্যের অর্থান্তরটুকু বাদ দিয়াছেন; এবং কৃত্বা পদটীও ছাড়িয়া চাতুরীপ্রকাশে কসুর করেন নাই। অতএব, তিনি যে উহাদ্বারা সহবাসসমর্থার বিবাহ অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা একেবারেই অসম্ভব।

প্রবন্ধের আর একটী কথা এই যে পুরাকালে দময়ন্তী, সাবিত্রী, শকুন্তলা, মালতী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যনারীদিগের পূর্ণ যৌবনেই বিবাহ হইয়াছিল, অতএব উহা অশাস্ত্রীয় নহে।

এই কথায় আমাদের দুইটী উত্তর আছে। ১ম, দ্বাপরের শেষে লোকসংখ্যা কত ছিল, তাহা আমাদিগের অবিদিত। তবে এই মাত্র জানি, যে কুরুপাণ্ডবদিগের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য থাকিত। বর্ত্তমানকালে ভারতীয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সৈন্য সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ও ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় তেইশ কোটি।

ইদানীং অধিবাসীর সংখ্যা সৈন্যের তেইশ শত গুণ হইলে তৎকালেও তদনুগতিতে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ কোটি অধিবাসী ছিল, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয়। এদিকে নানাস্থানের লোক-সমষ্টিব্যাপারে জানা যাইতেছে যে, সর্ব্বত্রই স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা প্রায়ই সমান। তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত অধিবাসীসংখ্যার অর্দ্ধেক পুরুষ ও অর্দ্ধেক স্ত্রী। প্রত্যেকের সংখ্যাও পঁচিশ কোটি।

যাহা হউক, পঁচিশ কোটি নারীর মধ্যে সাত আটটীর যৌবনবিবাহিত সমুদ্রে শিশির-বিন্দুবৎ। তাহা হইতে যূনী-বিবাহপ্রবর্ত্তনা বা শূন্যে ভিত্তিস্থাপনা একই কথা। উহা সর্ব্বাপেক্ষান্যায়ে'(১) অনাদরণীয় বলিয়াই সমর্থিত হইবে।

২য়। আমাদের শাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহ নির্দ্দিষ্ট আছে। উহাদেরই একতম গান্ধর্ব্ব। গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইতেই স্বয়ম্বরপ্রথার প্রচলন হইয়াছিল। স্বয়ম্বরা সিমন্তিনীরাই প্রবুদ্ধদশায় স্বামিগ্রহণ করিত; শকুন্তলা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, সাবিত্রী, সুভদ্রা প্রভৃতি নারীগণও স্বয়ম্বরা বা গান্ধর্ব্ব পরিণীতা; তজ্জন্যই তাঁহাদের অধিক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল; এবং উহা অশাস্ত্রীয়ও ছিল না। এক্ষণে গান্ধর্ব্ব বিবাহ ও স্বয়ম্বর প্রথা নাই। সুতরাং, যূনীর বিবাহও রহিত হইয়াছে। 'নিমিত্তস্যাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায়ঃ' (২) এই ন্যায়-বাক্যেই যুবতীর বিবাহ খণ্ডিত হইয়াছে।

---

(১) সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায় যথা—অনেক নিমন্ত্রিতের মধ্যে যেমন একজন অগ্রে আসিলে, তাহার আদর করিয়া, তাহাকে ভোজনীয় দেওয়া যায় না; সকলের অপেক্ষা করিতে হয়। তদ্রূপ অনেক স্ত্রীর মধ্যে দুই চারিটীর যৌবনবিবাহও আদৃত হইতে পারে না।

(২)। 'অভিষিঞ্চতি' ইত্যাদি স্থলে যেমন ইকারনিমিত্তবশতই 'সিচ' ধাতুর 'স'কার 'ষ'কার হয়; আবার 'অভ্যসিঞ্চৎ'

এক্ষণে অবশিষ্ট আর একটী কথার আলোচনা হইলেই আমাদের কার্য্যের সমাধা হয়। প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন যে, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা ও পুরাতত্ত্বাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন যে, বাল্যবিবাহ আমাদের চিরন্তন প্রথা নহে; মুসলমানদিগের রাজত্বেই উহার সূত্রপাত। *

আমরাত বিষয়ান্তরে রমেশ বাবুর অনধিকারিত্বের পরিচয় দিয়াছি; তজ্জন্য এস্থলে আর অধিক কিছু বলিব না। তিনি সর্ব্বময়; সর্ব্বঘটেই বিরাজ করেন। তদীয় অনুমিতিও প্রশংসার্হ? মুসলমানদিগের রাজত্ব হইতেই যদি বাল্যবিবাহের সূত্রপাত হইয়া থাকে, তবে পরাশরাদিঋষিপ্রণীত সংহিতায় বাল্যবিবাহের বিধি কিরূপে স্থানলাভ করিল। তবে তাঁহার গুণের ত্রাটি নাই! যখন তিনি কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে আনিতে পারিয়াছেন, তখন পরাশরাদিকেও দ্বাদশ শতাব্দীতে আনা তাঁহার অসাধ্য নয়! ফলতঃ, রমেশ বাবুর বাক্যে আস্থাপ্রদর্শনে যাহার অভিরুচি হয়,হউক, আমাদেরত উহা বিষবৎ ত্যজ্য।

কাহারও বাক্যের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিলে যে তাহাতে বিপরীত ফলোৎপাদন করে, এতৎপ্রদর্শনার্থ আমরা একটী ক্ষুদ্র আখ্যানের অবতারণা করিতেছি।

স্থলে যেমন নিমিত্তের অভাব জন্য নৈমিত্তিক 'ষ'কার দাঁড়াইতে পারে না। তদ্রূপ স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব্বরূপনিমিত্তবশতই যুবতী-বিবাহ প্রচলিত হইত, এক্ষণে সেই সেই নিমিত্তের অভাবজন্যই নৈমিত্তিক যুবতী-বিবাহও লোপ পাইয়াছে।

কোন বৃদ্ধ অন্তিম দশায় উপদেশপ্রদানমানসে পুত্রকে সমীপে বসাইয়া বলিলেন, দেখ বাপু! আমিত ইহ সংসার হইতে অপসৃত হইতেছি। আমি যেরূপ উপদেশ দিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করিও, তাহা হইলে তোমায় কোনরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইতে হইবেনা। উপদেশ যথা—

(১) বাটীতেই বাজার বসাইবে।
(২) প্রতিগ্রাসেই মাছের মুড়া খাইবে।
(৩) নদীর মধ্যস্থলের জলপান করিবে।
(৪) পাঁচাল দিয়া মাথা ছাইবে না।
(৫) 'তেমাথা' মনুষ্যের পরামর্শমতে চলিবে।

পুত্র উপদেশগুলি উত্তমরূপে স্মরণ করিয়া রাখিল, এবং পিতার মরণান্তে তদ্রূপ কার্য্য করিতে লাগিল। উপদেশগুলির প্রকৃত মর্ম্ম তাহার হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে সে বাজারের সমস্ত ব্যাপারীদিগকে আপন বাটীতে বসাইয়া তাহাদের দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া লইতে লাগিল। আট দশ আনায় এক একটী মৎস্য কিনিয়া সমস্তই ফেলিয়া তাহার মুণ্ডমাত্র খাইতে আরম্ভ করিল। পানীয় জলের নিমিত্ত এক নৌকা ভাড়া করিয়া রাখিল, তদ্দ্বারা প্রত্যহ মধ্য নদীর জল আসিত। বাটীর চতুর্দ্দিকে মৃণ্ময় প্রাচীর নির্ম্মিত করাইয়া উহার মস্তক অনাবৃত রাখিত। বর্ষাগমে তাহারা ভূমিশায়ী হইলে, পুনরায় নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণ দ্বারা বাটীর আবরুরক্ষা হইত। এইরূপ কার্য্য করিয়া দুইপাঁচ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি শেষপ্রায় হইল, নানাপ্রকারে দুর্গতিগ্রস্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল, আমিত পিতার উপদেশানুসারে কার্য্য করিলাম; তথাপি এবম্বিধ বিপরীত ফল ঘটিল কেন? বোধকরি, তাঁহার কথার প্রকৃত ভাবার্থ আমার হৃদ্গত হয় নাই, তাই আমার এত কষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, একজন 'তেমাথা' মনুষ্য পাইলে তাঁহার পরামর্শমতে কার্য্য করি। কিন্তু, 'তেমাথা' মনুষ্যত কোথাও দেখিনা। দুঃখে ম্রিয়মাণ ও দুর্দ্দশায় বিকলপ্রায় হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিল, এক স্থবির জানুদ্বয়ে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট আছে। তদ্দর্শনে ভাবিল, এই বুঝি বাবার 'তেমাথা' মানুষ হইবে। ইহার পরামর্শ মতে চলিলে হয়ত আমার দুঃখের অবসান হইতে পারে। মনে মনে এইরূপ অনুধাবন করত জরৎ-সমীপে উপসর্পণান্তে বলিল, মহাশয়! মদীয় জনক আমার হিতকামনায় যে কয়েকটী উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশানুসারে চলিলেও আমার ভূতিলাভ হইল না কেন? এই বলিয়া পিতার উপদেশ ও তদনুসারে স্বকীয় কার্য্য তৎসমীপে প্রকাশ করিল।

বৃদ্ধ আদ্যোপান্ত সমস্ত আকর্ণন করত উত্তর করিল, বাপুহে! তোমার পিতার উপদেশগুলি অমূল্য। তদনুযায়ী কার্য্য করিলে কাহাকেও দুর্গতিভাক্ হইতে হয় না। তুমি তাঁহার বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারাতেই এতাদৃশ কষ্টে পতিত হইয়াছ। এক্ষণে তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি, তদ্রূপ কর, অচিরে দুর্গতিমুক্ত হইবে।

তোমার পিতা যে বলিয়াছিলেন, বাটীতেই বাজার বসাইবে; উহার অর্থ এই— শাক ও তরি তরকারীর গাছ বাটীতেই রোপণ করিবে। তাহা হইলে আর প্রত্যহ পয়সা খরচ ঐ সকল কিনিতে হইবে না। আর প্রতিগ্রাসেই মাছের মুড়া খাইবে, ইহার অর্থ এই, চুনাপুটী মাছই প্রত্যহ খাইবে। রোহিতাদি মৎস্য খাইবার কোন প্রয়োজন নাই। নদীর মধ্যভাগের জলপান করিবে, ইহার অর্থ এই, অদ্য জল আনাইয়া কল্য খাইবে। সেই জল নদীর মধ্যভাগের জলের ন্যায় শীতল হইয়া থাকে। সদ্য আনীত জলপানে রোগাদির সংঘটন হয়। পাঁচাল দিয়া মাথা ছাইবেনা, ইহার অর্থ এই, প্রথম কিছু খরচ করিয়া ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর করিবে, তাহাতে প্রতিবৎসর খরচ করিতে হইবে না। দেখ, তোমার পিতার উপদেশের ভাবার্থ এইরূপ, কিন্তু তাহা না বুঝিয়াই বিপজ্জড়িত হইয়াছে। যাহা হউক, এখনও এই বাক্যানুসারে কার্য্য করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। যুবক তদনুসারে কার্য্য করিয়া অচিরে দুর্গতিমুক্ত হইল।

পূর্ব্বোক্ত আখ্যানটীর অবতারণার কারণ এই, যে, আমারও আর্য্যঋষিগণের বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া উল্লিখিত যুবকের ন্যায় দুর্গত হইতেছি। কারণ,

ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্"

ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্যানন্তর সমাবর্ত্তনান্তে গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া সবর্ণা ও সুলক্ষণা কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিবে।

তৎপরেই আবার তাঁহাদের আজ্ঞা—

"অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা"॥

তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মচর্য্যসমাপনা করিতে চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়ঃ

ক্রম হইবে। তৎপরে ৮।৯ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিলে আরও ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যবায় কার্য্য স্থগিত থাকিবে। তাহাতে তজ্জাত সন্তানবর্গ অবশ্যই দীর্ঘজীবী ও বলিষ্ঠ হইবে।

আর্য্যমনীষিগণের বাক্যের এইরূপ ভাবাবগতি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; তাঁহারা আট বৎসরে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন বলিয়া আমরাও আট বৎসরে বিবাহ করিয়া তৎকালাবধি স্ত্রীসহবাস করিতে আরম্ভ করি। ইহার ফলও বিপরীত ঘটিতেছে। আমরা রোগে শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হইতেছি। যাহা হউক যদি কোন 'তেমাথা' লোকের পরামর্শে ঋষিবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম আমাদের হৃদ্গত হইয়া, আমাদের এই কুৎসিত মতিগতি ফিরিয়া যায়; এবং আমরা তাঁহাদের বাক্যের মর্ম্মানুসারে আট বৎসরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আরও ৭।৮ বৎসর ব্যবায় স্থগিত রাখিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মঙ্গল ঘটিবে। অঙ্গুলিমেয় হিন্দু আবার কালক্রমে পরার্দ্ধ অতিক্রম করিবে। হিন্দুগণ! 'তেমাথা' লোকের অনুসন্ধান কর! মিলিবেই মিলিবে!

আজ কাল দেখিতেছি, অনেকেরই ধারণা, যে,বিবাহ শব্দের অর্থই স্ত্রীসহবাস। ইউরোপীয়গণ উক্ত শব্দের ঐরূপ অর্থ করেন বলিয়াই, অস্মদাদির মধ্যেও উহা লব্ধপ্রসর হইতেছে। তজ্জন্য আট দশ বৎসরে বিবাহের নাম শুনিলেই আমাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠে; আর অনায়ত্তভাবে আমরা শাস্ত্রের উপর কটূক্তি করিতে থাকি। বাস্তবিক, হিন্দুশাস্ত্র এত নৃশংস নয়, যে, এতাদৃশ ব্যবহারে অনুমোদন করিতে বিধি দেয়। হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহ দশবিধ সংস্কারের একতম। কবে গর্ভ হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, অথচ হিন্দুশাস্ত্রে পূর্ব্বেই গর্ভাধান সংস্কারের বিধি। আট মাস কি দশ মাস পরে সন্তান হইবে, কর্ম্মকাণ্ডে আজ তাহার পুংসবন। দুই বৎসর পরে শিশু অন্নাহার করিবে, এক্ষণে তাহার অন্নাশন; কবে ব্রহ্মচারী স্বাধ্যায়নিরত হইবে, এখন তাহার উপনয়ন; কবে স্ত্রীসহবাস করিবে, অদ্য তাহার বিবাহ। ছয় মাসে অন্নপ্রাশন হয় বলিয়া যে তখন হইতেই শিশুকে ভাত খাওয়ান যায়, একথাত দেশের কোন লোকই বলিতে পারে না। তেমনি আট দশ বৎসরে বিবাহ হয় বলিয়া যে তৎকাল হইতে ভার্য্যায় উপগমন অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথারও ত কিছুই সারবত্তা নাই। হিন্দুর শিক্ষা, অন্নাশন ব্যতীত অন্নাহার নিষিদ্ধ। পরিণয়সংস্কার-ব্যতীত সঙ্গমকার্য্য অতীব গর্হিত। তাই তাহারা পূর্ব্ব হইতে সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাখে। যাহাদের অগ্রে সহবাস, তৎপরে বিবাহ, তাহারা জোর করিয়া আর্য্য হইতে পারে, হউক, হিন্দু হইতে পারিবে না। অতএব, যখন ভার্য্যোপগতি বিবাহ শব্দের প্রতিপাদ্যই নহে, তখন বাল্যবিবাহ বাল্যবিবাহ বলিয়া চীৎকার করিবার কোনই আবশ্যক নাই; উহা পাঁচ সাত, আট, দশ যে বয়সেই হউক, একই কথা। তবে অন্যান্য দুই একটী কারণ উহাতে সংশ্লিষ্ট থাকায় ৮।১০ বৎসরই উহার মুখ্যকাল রূপে পরিগণিত হইয়াছে।

বিবাহ শব্দে স্ত্রীসহবাস না বুঝাইলেও বিবাহান্তেই উহার সংঘটন হয় কেন? এতাদৃক্ পূর্ব্ব পক্ষ উত্থাপিত হইলে, আমরা বলিব, যে সম্প্রতি ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার অভাবই এইরূপ ঘটনার মূল। কলির প্রারম্ভেও 'ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ' হইত; ইদানীং ধর্ম্মহীন লোকগুলিকে তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিলে চলে; কারণ, মৈথুনকার্য্যে পশ্বাদি তির্য্যগ্‌জাতিরও পাত্রাপাত্র বা কালাকাল বিচার আছে, এ হতভাগাদিগের তাহাও নাই। এই হতভাগ্যদিগের জন্যই বাল্যবিবাহ কলঙ্কিত হইতেছে; নতুবা বাল্যবিবাহ অতীব নির্ম্মল ও প্রজাবর্দ্ধক। দুশ্চরিত্র লোকের জন্য বাল্যবিবাহের উন্মূলন অদূরদর্শীর কথা। অন্নাহার প্রজাবর্দ্ধক হইলেও রোগকালে নিষিদ্ধ। যদি কেহ জিহ্বালৌল্যবশতঃ তৎকালে অন্নাহারদ্বারা কালগ্রাসে পতিত হয়, তদ্দর্শনে কি অন্নাহার ব্যবস্থার উপর দোষারোপ করিয়া অন্নাহার রীতি একেবারে পরিহর্ত্তব্য? কদাপি নহে! অন্নাহার ব্যবস্থার দোষ কি? ব্যক্তিবিশেষেরই দোষ! তদ্রূপ বালস্ত্রীগামীদের দ্বারা সমাজের ক্ষতি হইলেও, তাহাতে বাল্যবিবাহের দোষ নহে, সেই নৃশংসদেরই দোষ। সেই নরপিশাচদের শাসন না করিয়া বাল্যবিবাহের উন্মূলন ও তস্করের উপর ক্রোধ প্রদর্শন করত ভূমিতে ভোজন একই কথা।

শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা ও অদ্যকার ঘটনা এত বিসদৃশ, যে ভাবিলে বোধ হয়, যেন উহারা যুগান্তরব্যবহিত। অল্পাধিক শতাব্দ অতীত হইল, পুণ্যশ্লোক, দেবসত্ত্ব মদীয় পিতামহ ঠাকুর ৺ নরহরি ন্যায়বাগীশ মহাশয় নবমবর্ষে উপনীত হইয়াই "নেড়া মাথায়" পঞ্চমবর্ষীয়া পিতামহী ঠাকুরাণীকে

প্রথম ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি ষোড়শ বৎসরকাল ব্রহ্মচারীর ন্যায় অবস্থান করিলে পর এক পুত্র সন্তান জন্মে। বালার্কসন্নিভ সেই জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তৈলামিষ পরিহার করত আজীবন ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকিয়া সপ্তাশীতিবর্ষে পরলোক গত হন। আর আমরাও তদ্বংশজাত হইয়া ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সেই চারি পাঁচটী কন্যার জন্মদাতা হইয়াছি, ইহা কি বিস্ময় ও ক্ষোভের একাধার নহে? যাহা হউক, ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানের অভাবই আমাদের সমস্ত অবনতির মূল, ইহা জানিয়াও আমরা তত্তদ্বিষয়ে একেবারে উদাসীন, এই ব্যাধির ঔষধদাতা যদি কেহ থাকেন, তিনিই ভারতমাতার কৃতিমান্ পুত্র। তাঁহাকে পাইলে আমরা চরিতার্থ হই! কিন্তু পাই কোথায়?

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, যে, শাস্ত্রানুমোদিত যে যে আচার ব্যবহার হিন্দু সমাজে প্রচরদ্রূপ আছে, তাহা অতীব নির্ম্মল ও পবিত্র। ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ, স্বাধ্যায়নিরত, ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্ট বিষয় সকলও করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা যাহা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে সর্ব্বাঙ্গপুষ্কল ও সর্ব্বতোভদ্র হইবে, ইহাতে কিছুই বৈচিত্র নাই। যাঁহাদের ভবিষ্যবাণী অক্ষরে অক্ষরে তাঁহাদের বাক্‌সিদ্ধির পরিচয় দেয়, সেই আজন্মশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রযোজকদিগের বাক্যে অনাস্থাকারীরা যে ঘোর নারকী, তাহাত সম্যক পরিস্ফুট। স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিত্বে বিসর্জ্জন দিয়া, সমাজের সঙ্গে কোনরূপ ঘনিষ্টতা না রাখিয়া, রাজপ্রসাদলাভ বা অহম্মুখম্মন্যবৃত্তিতে পরিচালিত না হইয়া, নিবিড়

অরণ্যে বাস করত, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানবলে যাঁহারা সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আমরাত কোন ছার, স্বয়ং ব্রহ্মাও যাঁহাদের বাক্যের দাস, সাক্ষাৎ ভগবান্ রামচন্দ্রও যাঁহাদের আদেশের সম্মান করিতেন, সত্য-নিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরও যাঁহাদের নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য ভাবিতেন, সেই নিখিলপাবন ঋষি-বাক্যে হেয়ভাব যেন আমাদের চিত্তেও স্থান না পায়। ভগবান রক্ষা করুন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ।

রত্ন-খনি।

৭২

পদ্মবনে একরূপ ভেক আছে, তাহারা পদ্মমধু পরিত্যাগ করিয়া দুর্গন্ধ পঙ্কিল জলাশয়ে গমন করতঃ কীট ভক্ষণ করে। সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যেও একরূপ অকাল কুষ্মাণ্ড আছে, যাহারা সনাতন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম আশ্রয় করতঃ বিড়ম্বিত হয়।

৭৩

যখন তোমার মনে ঐশ্বর্য্য হেতু গর্ব্ব উপস্থিত হইবে, তখন তোমাপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিও। তাহা হইলে তোমার ঐ ঐশ্বর্য্যকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে, সুতরাং গর্ব্বও পলায়ন করিবে। আর যখন তোমার অন্তঃকরণে দরিদ্রতা নিবন্ধন দুঃখের উদয় হইবে, তখন তোমার অপেক্ষা দরিদ্রের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিও, তাহা হইলে তোমার অবস্থা তাহা হইতে উত্তম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; সুতরাং, তোমার মনে দুঃখও থাকিবে না। এই দুইটী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা চলিতে পারেন, তাঁহারা অহংকার ও দুঃখের দুরন্ত গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়েন।

৭৪

রত্ন বিক্রেতা যদি অসচ্চরিত্র ও দরিদ্রও হয়, তবুও তুমি রত্ন ক্রয় করিবার সময় তাহার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া রত্নের গুণাগুণ পরীক্ষা করতঃ গ্রহণ করিয়া থাক। সেইরূপ উপদেষ্টা যদি চরিত্র হীন ও মূর্খ হয়, তবে তাহার নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিতে বাধা কি?

৭৫

যেরূপ নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত পক্ষীগণ কোন বৃক্ষে রজনী যাপন করতঃ প্রভাতে দশ দিকে গমন করে; যেমন দূরপথগামী পথশ্রান্ত পথিকগণ নানা দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক কোন বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্ভাষণাদি করতঃ পথশ্রম দূর করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যায়; যে প্রকার নদীগর্ভে ভাসমান দুইটী তৃণ নদী বেগে দৈব ক্রমে মিলিত হইয়া পুনরায় তরঙ্গাভিঘাতে পৃথক হইয়া পড়ে, আর কদাচ তাহাদের পুনর্ম্মিলনের সম্ভাবনা থাকে না; সেইরূপ

কর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া জীব সকল এই ধরাধামে আগমন করতঃ মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগ্নি, স্ত্রী পুত্র, শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রভৃতি সম্বন্ধ সংস্থাপন পূর্ব্বক কিয়ৎকাল বসবাস করিয়া পুনরায় নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া থাকে। পূর্ব্বপূর্ব্ব ঘটনায় যদি কোন পরিবেদনা উপস্থিত না হয়, তবে শেষোক্ত ঘটনায় শোক করিবার কারণ কি?

৭৬

যশ ও পরকালের হিতরূপস্বার্থ পরবশ হইয়া যদি কেহ পৈতৃক অতুল সম্পত্তির কিয়দংশ দান করে, তাহা হইলে সে সবাকার ভক্তির পাত্র হয় এবং সকলের মুখেই তাহার নাম অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু করুণাময় ঈশ্বর সর্ব্ব সুখের আকর স্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ং সৃজন করিয়া জীবগণকে ভোগ করিবার জন্য নিস্বার্থ ভাবে দান করিয়াছেন; তখন তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিবে না কেন? এবং দিবানিশি তাঁহার নামই বা জপ না করিবে না কেন?

৭৭

ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া জন সমাজে চিরকাল বাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। একদল বলে ঈশ্বর নিরাকার, অপর দল বলে সাকার। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার তাহা কেহই চক্ষে দেখে নাই, কিন্তু স্ব স্ব আনুমানিক যুক্তি বলে আপন আপন মত দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য সকলেই মহা বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকে। কিন্তু এটা কেহ ভাবে না যে বাঞ্ছাকল্পতরু ঈশ্বর তাঁহার এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভোগার্থী জীবগণকে দান করিয়া অন্যাধিকারে বাস অন্যায় বিবেচনায় একমাত্র ভক্তের হৃদয় আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই ত সকল গোল মিটিয়া যায়।

৭৮

সমুদ্রগর্ভে রত্ন আছে সত্য কিন্তু সুদক্ষ ডুবুরী ব্যতীত কেহই সে রত্ন উদ্ধার করিতে সক্ষম হয় না। শাস্ত্রেও তত্ত্বজ্ঞান নিহিত আছে বটে কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত সুবোধ ব্যক্তিরেকে অন্য কেহ সে জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে পারে না।

৭৯

পাথরকে জলে নিক্ষেপ করিবামাত্র তল স্পর্শ করে, কিন্তু সোলাকে ডুবাইয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে। সেইরূপ যাহারা জ্ঞানী, তাহারাই ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া উহাতে মজিয়া যায়, আর বাগ্‌বিতণ্ডা করে না। আর যাহারা অসার তাহাদিগকে সহস্র প্রকারে বুঝাইলেও সন্দেহ বশতঃ ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া তর্ক করিয়া মরে।

৮০

সুন্দর শরীরে ময়লা পড়িলে সাবান ব্যবহারে ময়লা কাটিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়; কিন্তু কাল শরীরে সাবান মাখিলে তাহা আর সুন্দর হয় না। সেইরূপ সরল-হৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণ যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়, তবে সদুপদেশে সে অজ্ঞান কাটিয়া ঈশ্বরে ভক্তি হইতে পারে। কিন্তু যাহার হৃদয়মূলে অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ, সহস্র উপদেশেও তাহার নাস্তিকতা দূরীভূত হয় না।

৮১

কোন একটী দেশের সম্রাট পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া বহির্দ্দেশে পরিভ্রমণ করিতে

ছিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক ভদ্রসন্তান সম্রাটের সম্মুখীন হইয়া মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করিল। সম্রাটও তৎক্ষণাৎতদপেক্ষা অধিকতর শিরবনমন করিয়া অভিবাদন করিলেন। পার্শ্বচর পারিষদগণ তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিল "সে কি মহারাজ। আপনি এ দেশের সম্রাট, যাহাকে আপনি নত হইয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন, সে ব্যক্তি আপনার একটী সামান্য প্রজা এবং উহা অপেক্ষা আপনি সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, ঐ ব্যক্তির সহিত আপনার এবম্প্রকার ব্যবহার অযোগ্য।" তদুত্তরে সম্রাট বলিলেন। "তোমরা যাহা বলিলে তাহা সত্য, কিন্তু আমি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়া মানবের শ্রেষ্ঠতম গুণ 'বিনয়ে' নীচ হইব কেন?"

৮২

ঈশ্বরের বন্ধন ও মনুষ্যের বন্ধন উভয়ের মধ্যে বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্য যদি কাহাকে সামান্যরূপেও বন্ধন করে, তবে সে নড়িতে চড়িতে না পারিয়া স্থির হইয়া থাকে। আবার তাহার বন্ধন মোচন করিবামাত্র সবেগে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বর মায়াপাশ দ্বারা যে জীবকে যত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছেন, সে তত বেগে চারি দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। আবার যাহাকে দয়া করিয়া বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, সে আর নড়িতে-চড়িতে দৃষ্ট হয় না; তাহাকে ধীর গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়।

৮৩

অগ্নিতে যতই ইন্ধন দিবে ততই তৃপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর উহা গ্রাস করিয়া সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সেইরূপ আশারও অন্ত নাই, যতই বাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাসনা ক্রমশ ততই বলবতী হইয়া বিনাশের পথে লইয়া যায়। অতএব নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়া, সন্তোষ ধনে ধনী হইতে চেষ্টা কর। সন্তোষ ধন প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রত্বপদ তুচ্ছ হইবে।

৮৪

তোমার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে মহোৎসাহে আত্মীয়-স্বজনকে ভোজন করাইয়া থাক। কিন্তু ঐ সময়ে তোমার সন্তানটী মরিয়া গেলে তোমার উৎসবটী যেমন বৃথা হয়, সেইরূপ যে আত্মার অস্তিত্বে তুমি তোমার ইন্দ্রিয়াদি স্বজনগণের সেবা করিতেছ, তাহাকেই অগ্রে আদর কর। নচেৎ সে তোমার অনাদর হেতু চলিয়া গেলে তোমার সকলই অসার হইবে।

৮৫

স্থূলদর্শীরা অসন্তোষের বীজ ধনকে সুখ দুঃখের কারণ নির্দ্দেশ করে। সূক্ষ্মদর্শীরা ধনকে কেবলমাত্র দুঃখের কারণ বলিয়াই মনে করেন। তাঁহারা স্বর্গের অধিপতি মহেন্দ্র ও পশুজাতি শূকরের মধ্যে সুখ দুঃখে কোন বিভিন্নতা দেখেন না। কারণ, ইন্দ্রের নিকট সুধা সেরূপ উপাদেয়, শূকরের নিকট বিষ্ঠাও সেইরূপ সুখাদ্য। ইন্দ্রের শচীতে যেমন অনুরাগ, শূকরের শূকরীতেও সেইরূপ প্রীতি। ইন্দ্রেরও মৃত্যু ভয় আছে, শূকরেরও মৃত্যু ভয় আছে। তবে আর বিভিন্নতা কিসে?

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।

প্রথম ভাগ।

হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্তন ও পুনর্গঠন। (১)

পরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা কিছু প্রাকৃতিক তাহা এই নিয়মের বশীভূত। শতাব্দী পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন তাহা নাই। আজ যাহা আছে কল্য তাহা থাকিবে না। সংক্ষেপতঃ এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণু এই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন থাকিয়া নিয়ত আমাদিগের সম্মুখে বৈষম্যের সৃষ্টি করিতেছে। এই প্রাকৃতিক বৈষম্যের নামান্তর জগৎ।

মানব জগতের অংশ, সুতরাং পরিবর্ত্তনের দাস। সংসারে যাহা কিছু মানব সম্বন্ধীয় তাহাতেই প্রতিমুহূর্ত্তে এই নিয়ম কার্য্যকারী হইতেছে। মানবের আচার ব্যবহার রীতি নীতি পদ্ধতি সমুদয়ই এই নিয়মের বশবর্ত্তী—কাহারও সাধ্য নাই যে, প্রকৃতির এই নিয়ম লঙ্ঘন করে। পরিবর্ত্তন জগদীশ্বরের আদেশ। যিনি পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন তিনি প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম-প্রয়াসী-ঈশ্বরদ্রোহী হইবেন সন্দেহ নাই।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্ত্তনের প্রকারভেদ হয়। পাশ্চাত্য জগতে মানবের যে প্রকার পরিবর্ত্তন যে পরিমাণ সময়ে যে ভাবে হইয়াছে, সেই প্রকার পরিবর্ত্তন সেই পরিমাণ সময়ে ও সেই ভাবে প্রাচ্য জগতে অসম্ভব। ইংরাজ আজ পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া যে প্রকার উন্নতি ও সভ্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছে সে প্রকার উন্নতি ও সভ্যতা মানবের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতবাসীর পক্ষে অসম্ভব। ইংরাজী সভ্যতা ও উন্নতি সর্ব্বাংশে ভারতে প্রচলিত হইতে পারে না। যাঁহারা বলপূর্ব্বক এই পাশ্চাত্য সভ্যতা অধিকৃত ভাবে আমাদের এই প্রাচ্যদেশে প্রচলিত করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগের উদ্যম কিছুকালের জন্য সফল হইতে পারে কিন্তু তাহা কখন স্থায়ী হইবে না। এই পাশ্চাত্য সভ্যতা যত টুকু আমাদিগের প্রাচ্য প্রকৃতির উপর ভিত্তি পাইবে ততটুকু স্থায়ী ভাবে ভারতে প্রচলিত হইবে; অবশিষ্টাংশ কালের অতল তলে বিলীন হইবে। ফলতঃ প্রকৃতি যেমন পরিবর্ত্তনের অধীন, পরিবর্ত্তন আবার তেমনি দেশ-কাল-পাত্রের বশবর্ত্তী।

পুনর্গঠন পরিবর্ত্তনের অনুচর। যেখানে আমরা পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, সেইখানে অমনি পুনর্গঠন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মতভেদ রূপ পরিবর্ত্তনের অধীন হইবা মাত্র হিন্দুধর্ম্মে মহামুনি শাক্যসিংহ এক বিরাট পুনর্গঠনের সূচনা করিলেন। পৌত্তলিকতা প্রথা হিন্দুধর্ম্মে যুগান্তর উপস্থিত করিবা মাত্র পঞ্জাবে মহাগুরু নানকের হস্তে শিখধর্ম্মরূপ পুনর্গঠন আরম্ভ হইল। তান্ত্রিক মতের ঘোর প্রচলনে হিন্দুধর্ম্মে ভাবান্তর উপস্থিত হইবা মাত্র মহাভক্ত চৈতন্য উহার পুনর্গঠনের অবতারণা করেন। এইরূপে পাশ্চাত্য জগতেও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায় যদ্দ্বারা নিঃশংসয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, পুনর্গঠন পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী সহচর। ইহা ঐতিহাসিকের কঠোর সত্য—কবির কল্পনা নহে।

এখন দেখা গেল পরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা কিছু মানব সম্বন্ধীয় তাহাই পরিবর্ত্তনের অধীন এবং এই পরিবর্ত্তন দেশ-কাল ভেদে ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়; আর পুনর্গঠন পরিবর্ত্তনের অনুচর। আমরা এই প্রবন্ধে হিন্দুসমাজের উপর এই পরিবর্ত্তন কি প্রকার কার্য্যকারী হইয়াছে ও হিন্দুসমাজের কিরূপ পুনর্গঠন সম্ভব তাহাই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

কতকগুলি মানবের নিয়মাবদ্ধভাবে একত্র সমবায়কে সমাজ কহে। সাধারণতঃ একই রীতি নীতি আচার পদ্ধতি অনুযায়ী যাঁহারা চলেন তাঁহাদিগকে এক সমাজভুক্ত বলা যায়। সমাজ মানবের সৃষ্টি, সুতরাং সমাজ দেশ-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্ত্তন বিশেষের অধীন। এই নিয়মে জগতের যাবতীয় সমাজ চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবে। আমাদের হিন্দুসমাজ সভ্য জগতের অতি আদিমকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, হিন্দুসমাজে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় নাই। প্রত্যুত ইহার বক্ষের উপর দিয়া শত শত বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে—শত শত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে এবং ইহা কালানুযায়ী নানাবিধ ভাবে গঠিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজ হিন্দুরাজত্বে যে ভাবে চলিয়াছিল, বৌদ্ধরাজার অধীনে সে ভাবে চলে নাই; আবার মুসলমানের ভীষণ তরবাধির অধীনে আর এক নূতন পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়াছিল। পরিশেষে অধুনা ভারতে ইংরাজের অভ্যুদয় কালে যে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। হিন্দুসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা ভাব ও কার্য্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন প্রবেশ করিয়াছে। সকলেই স্বীয় সুবিধানুযায়ী আচার ব্যবহারের অনুগত হইতেছেন। যিনি যাহা বলিয়াই চীৎকার করুন না কেন, এই যে পরিবর্ত্তনের প্রবাহ ছুটিয়াছে ইহা মানবের আজ্ঞার অধীন নহে, ইহা প্রকৃতির আদেশে চলিতেছে ও চলিবে। ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করা বাতুলের প্রয়াস মাত্র।

এই প্রকার পরিবর্ত্তন যখন চলিয়াছে তখন পুনর্গঠন অবশ্যম্ভাবী, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমান অবস্থা স্থায়ী হওয়া অনুচিত তাহা আধুনিক 'সংস্কারক সম্প্রদায়' ও 'সংরক্ষণকারী সম্প্রদায়' উভয়েই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু কি

প্রকারে ও কি উপায়ে এই পুনর্গঠন সংঘটিত হওয়া উচিত, এই বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয় এবং ইহাই আজকালকার সমাজনৈতিকদিগের আলোচনা ও মতবৈষম্যের স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক সম্প্রদায় হিন্দু সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটী নূতন প্রকারের সমাজের সৃষ্টি করিতে চাহেন, অপর পক্ষ প্রাচীন হিন্দু সমাজের পুনরবতারণা করিতে দৃঢ়সংকল্প। আমরা বারান্তরে এই বিপরীতমুখী মত দ্বয়ের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি।

মহাশয়,

সাধারণের বিশ্বাস যে "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি" আর নাই—মৃত। আমাদেরও ধারণা তাই। অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিলাম, সমিতির কার্য্য-ফল কি দাঁড়ায়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম হইলেও নিজে বহু আয়াস—শেষে 'হা হুতাশ' পর্য্যন্ত করিলাম। রোদন অরণ্যে হইল। সমাজ টলিল না।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কেন টলিল না? যাঁহাদের সমক্ষে কান্দিলাম সে সমাজে কি হৃদয় নাই? আছে। তবে সংখ্যায় অতি বিরল। এই বিরলসংখ্যক স্বজাতিপ্রেমিক না বুঝিয়া বহুলোকের উপর নির্ভর করিয়া আপন লক্ষ্য পথ হারাইয়াছেন। কাজেই সমিতির মৃত্যু উপস্থিত। সভাপতি আসন ছাড়িলেন, সভ্যগণ সরিলেন, সেবক আমি আর একা কি করি। তাই আজ বৎসরের শেষ দিনে (৩০শে চৈত্র ১২৯৮ সাল) সাধরণের নিকট সম্পাদকের দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম। এক্ষণে যদি কেহ সমাজহিতৈষী এই "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির" পুনর্জীবন বাসনা করেন, আসুন, আমি আপনাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া সম্পাদকের আসন ছাড়িয়া দিই এবং এতৎসম্বন্ধীয় যাহা কিছু কাগজ পত্র আমার নিকট আছে আপনাকে অর্পণ করি। বস্তুতঃ অদ্য আমি সাশ্রুনয়নে, অতি বিনীত ভাবে স্বসমাজচরণে নমস্কার করিয়া আমার অপরাধ-মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি।

যাইবার সময় "প্রতিনিধির" পাঠকবর্গকে সমিতির অকাল মৃত্যুর কারণটা বলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। সমিতির শুভ দিন ১২৯৫ সালের ১৫ই আশ্বিন হইতে চতুর্থ অধিবেশনের দিন ১২৯৭ সালের ২৬শে ভাদ্র পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস সাঁই মহাশয় "প্রতিনিধির" প্রথম খণ্ডে ২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তদ্বিবরণ এস্থলে পুনরুক্তি হইবে মাত্র। তবে সমিতি যেরূপে অঙ্কুরিত ও তীব্রবেগে বৃহদাকার ধারণ করিয়াছিল সে ইতিহাসটা হরিদাস বাবু দেন নাই।

বলা কর্ত্তব্য যে, সমিতির প্রথম গঠন কয়েকটী শিক্ষিত উগ্রক্ষত্রিয়ের যত্নে ও সমষ্টিতে। ইহাঁরা ভাবিতে সাহস করিয়াছিলেন না যে,

তাঁহাদের আঘাতে সমাজতন্ত্র একবারে বাজিয়া উঠিবে—অন্ততঃ ছিঁড়িবার জন্য। অন্যান্য সভাসমিতির ন্যায় তাঁহারা স্বাক্ষরিত বার্ষিক ১৲ টাকা চাঁদায় ও ২৲ টাকা প্রবেশ মুদ্রায় সভ্য স্বদল ভুক্ত করিতেছিলেন। নিম্নলিখিত অঙ্গীকার পত্র অনুসারেই সভ্য গৃহীত হইত। যথা—

"আমি শ্রীযুক্ত—নিবাস—আনন্দের সহিত অদ্য হইতে বর্ত্তমান উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির সভ্য হইলাম। ইহার কার্য্য কলাপ যাহা যাহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত থাকিবে। ১৮৮৯ সালের এক টাকা চাঁদা এই আবেদন পত্রের সহিত প্রেরণ করিলাম।"

এইরূপ কার্য্য মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে চলিতেছে এমন সময় শ্রীযুক্ত রামেশ্বর যশ নামক জনৈক স্বজাতি আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। বলিলেন "হৃদয়ের দ্বার খুলিলাম, অদ্য হইতে এই সমিতির মঙ্গল বিধানই জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য করিব"। তাঁহার নিজের গুরুত্ব দেখাইবার জন্য উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রধান প্রধান লোকের নামের সহিত আত্মপরিচয় মিশ্রিত করিতে লাগিলেন। নির্ব্বোধ আমরা কুহকে পড়িলাম। উপরে প্রকাশিত প্রতিজ্ঞাপত্রের আবশ্যকতা অগ্রাহ্য করিয়া যশ মহাশয়ের উপর অনেক নির্ভর করিলাম। তিনি সভ্য সংগ্রহে ধাববান হইলেন। স্থির হইল ব্যক্তি বিশেষ এ সমিতির সভ্য হইলে কার্য্য ফলে পরিণত হইবে না; সমস্ত উগ্রক্ষত্রিয়ই সমিতির সভ্যস্বরূপ বিবেচিত হওয়া উচিত। তবে সকলে এক সময়ে অধিবেশন স্থলে উপস্থিত হইবেন এটা একরূপ অসম্ভব। এই মর্ম্মে পত্রাদি চলিতে লাগিল; দুই একবার স্বজাতিবর্গের একত্র সম্মিলনও হইল। কিন্তু কোন ব্যক্তি দায়িত্বে স্বাক্ষর করেন নাই বলিয়া মন্তব্য কার্য্যে পরিণত হইল না। অনেকে কেবল "হুজুকে" পড়িয়া দৌড়িয়া আসিলেন সভাস্থলে হুড় ও গোল দেখিবার জন্য। প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীরা ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন। উদ্যোগী সভ্যগণ একবারে নিরাশ হইলেন না। পুনর্ম্মিলনের চেষ্টা হইতে লাগিল, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইল না। এবার যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, তিনিই বলেন 'আমার কোন দায়িত্ব নাই—সুতরাং আগামী অধিবেশনে উপস্থিত হইব কি না এখন বলিতে পারি না। অথচ লজ্জায় বা ভয়ে, উগ্রক্ষত্রিয় হইয়া উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতির সভ্য নন, একথাও বলিতে সাহস করিলেন না। এ দিকে পাগল আমরা সমাজ জাগরিত হইয়াছে—আত্মাভিমান জাগিয়াছে ভাবিয়া পুলকে পূর্ণ হইলাম।

অঙ্গীকারপত্রের কথা আর মনে আসিল না; সুতরাং এক্ষণে কাহাকেও ধরিতে ছুঁইতে পাইলাম না।' এরূপ দায়িত্ব-বিহীন সভ্যগণের দ্বারা কোন সমিতির কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলা অসম্ভব মনে করিয়া অদ্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া স্বসমাজের হিতকামনা আমাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। ভগবান আমাদের সমাজের মঙ্গল করুন!

আর এক কথা, বিগত অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রতিনিধিতে খলিসাকুণ্ডী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র হাজরা মহাশয় লিখিয়াছেন যে, আমার স্বাক্ষরিত রসিদ দ্বারা উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বাক্ষরিত টাকার কিয়দংশ সংগৃহীত হইয়াছে এবং সেই টাকা কিরূপে ব্যয়িত হইল তাহার একরূপ কৈফিয়তও চাহিয়াছেন। তাঁহার এবং সাধারণের অবগতির জন্য এবং আমার চরিত্রকেও অযথা দোষারোপ হইতে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক বোধে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কতকগুলি ভিতরের কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির সমুদয় কাগজপত্র ও মোহরাদি সমিতির অন্যতর সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন তা মহাশয়ের অধীনে থাকিত এবং এখনও আছে। তা মহাশয়ের অধীনে সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর যশ মহাশয় সমিতি সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ রক্ষা ও চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আমি যৎকালে মুর্শিদাবাদে অবস্থান করি, সেই সময় আমিও স্বাক্ষরিত চাঁদা দিবার জন্য আমার ও শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহ মুরারি পাঁজা মহাশয়ের নাম সম্বলিত ও সমিতির মোহরাঙ্কিত পত্র প্রাপ্ত হই। সমিতির মন্ত্রণা ক্রমে চাঁদা আদায়ের সময় হইয়াছে ভাবিয়া, আমি বিনা সন্দেহে আমার স্বাক্ষরিত চাঁদার কিয়দংশ প্রদান করি। পরে কলিকাতা আসিয়া জানিতে পারি, আমার বন্ধুদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ঐরূপ পত্র পাইয়া চাঁদা প্রদান করিয়াছেন। অপরে কেহ দিয়াছেন কি না বলিতে পারি না, সম্ভবত দিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। বিগত আশ্বিন মাসে আমরা সমিতির একটী সভা আহ্বান করি। ঐ সভায় শ্রীযুক্ত তা মহাশয় উপস্থিত হন। নানা কথার পর তাঁহাকে ঐ টাকা আদায় ও উহার খরচ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ও সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন এইরূপ বলেন। এবং আরও বলেন, শ্রীযুক্ত যশ মহাশয়ই ঐ টাকা আদায় করিয়াছেন এবং সম্ভবত টাকা তাঁহার নিকটেই আছে। পরে আমি হরিশচন্দ্র বাবুর পত্র পাঠান্তে যশ ও তা মহাশয়কে ঐ টাকা সম্বন্ধে যথাযথ হিসাব সাধারণে প্রকাশ করিবার জন্য ক্রমান্বয়ে তিনখানি পত্র লিখিয়াও দুর্ভাগ্যক্রমে কোন উত্তর প্রাপ্ত হই নাই। ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমার পত্রের উত্তর না দিতে পারেন কিন্তু ভরসা করি, যশ ও তা মহাশয় আপন আপন সুনাম রক্ষার জন্য প্রতিনিধিতেই ইহার যথার্থ উত্তর প্রদান করিবেন। পরিশেষে বক্তব্য আমি যখন উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিলাম, তখন ঐ টাকা আদায়ের আর আমার কোন ক্ষমতা রহিল না—আর ঐ টাকা আদায় হইয়া প্রতিনিধির সাহায্যার্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত কি না, সে সম্বন্ধে আমার স্বাধীন মত প্রদান করাও আবশ্যক বোধ করি না।

আলিপুর লকহাঁসপাতাল
৩০শে চৈত্র, ১২৯৯

আপনার
শ্রীকুমুদবিহারী সামন্ত
সম্পাদক, উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি প্রথম খণ্ড হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি কিন্তু সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ সহ নিজের মতামত প্রকাশ করিতে পারি নাই; ক্ষমা করিবেন।

প্রতিনিধির ন্যায় মাসিক পত্রিকার আবশ্যকতা আগ্রহ সহকারে স্বীকার করি এবং ইহার মহদুদ্দেশ্য সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই।

কার্ত্তিক মাসের প্রতিনিধিতে "আমাদের উদ্দেশ্য কি" শীর্ষক প্রবন্ধে মহাশয় বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য তিনটী—

(ক) জাতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহ।

(খ) সমাজ সংস্করণ।

(গ) শিক্ষার্থ নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ। (ক) ইতিবৃত্ত সংগ্রহ কার্য্যে মহাশয় এ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহা উক্ত প্রবন্ধেই প্রকাশ আছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে মতামত কি?

(খ) সমাজসংস্কার বা জাতীয় উন্নতি সাধন। কোন শ্রেণীস্থ জন সাধারণের উন্নতি কল্পে পুস্তকাদি লিখিতে গেলে, উক্ত সমাজান্তর্গত ব্যক্তিগণের অবস্থা প্রকটন, ইহ সংসারের মেরুদণ্ড স্বরূপ অর্থাগমের সুলভ, সহজ ও সদুপায় কল্পনা এবং সমাজস্থ ব্যক্তি সকলকে এক বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ করার চেষ্টা করা আবশ্যক। তৎপরে সমাজ মধ্যে যে সকল দোষ ক্রমে ক্রমে স্থান পাইয়াছে তাহা অন্তর করিবার চেষ্টা করা। ইহা হইলেই উদ্দেশ্য অল্প সময়ে সাধন হইতে পারে। দুঃখের বিষয় কাগজ খানি প্রকাশ হইবার সময় হইতেই কোন কোন লেখক পরস্পর পরস্পরের উপর শ্লেষ উক্তি ও বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। যদিও বিষয় বিশেষ লইয়া আপন আপন মত স্থাপন চেষ্টা ও আবশ্যক যুক্তি তর্ক প্রদর্শন দোষের বিষয় নহে, কিন্তু ঐ সকল লেখকগণের প্রবন্ধ গুলিন পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তাঁহারা পরস্পর ঈর্ষ্যাপূর্ণ হইয়া (সাবেক কালের কবির ন্যায়) উত্তর প্রত্যুত্তর আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ কার্য্য ততদূর অনুমোদনীয় বা বাঞ্ছনীয় নহে; পরস্পরের বিদ্বেষ ভাব সমাজোন্নতির কণ্টক স্বরূপ এবং অন্য শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইবার হেতুমাত্র।

(গ) শিক্ষার্থ নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ।

মহাশয় বহুযত্নে অনেক গুলিন প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য মহাশয় ও আপনার লেখকগণ আমাদিগের সাধারণের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু নিবেদন একবার স্থির চিত্তে দেখুন দেখি, সেই গুলিন উদ্দেশ্য বিষয়ে কতদূর সাহায্য করিয়াছে? এ প্রকার যে কোন একটী বিষয় লইয়া কতকগুলিন ইংরাজী এবং সংস্কৃতের বুকুনি দিয়া প্রবন্ধ লিখিলে লেখক মহাশয় যে উক্ত দুই বিদ্যায় পারগ অভাবত ঐ দুই বিদ্যার অনেক গুলিন পুস্তকে তাঁহার দৃষ্টি আছে এই কথাই জানা যায়, কিন্তু উদ্দেশ্য কতদূর সংসাধিত হয় তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। উদ্দেশ্য বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া যতদূর প্রয়োজন সংস্কৃত বা ইংরাজীর তুলনা (দোহাই) দিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই।

(১) জাতি মধ্যে বিবাদ মীমাংসা অর্থাৎ মোকদ্দমার সংখ্যা কম করিবার চেষ্টা।

(২) চাষের উন্নতি সাধন ও নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা।

(৩) বাণিজ্য ও শিল্প ইত্যাদির উন্নতি সাধন।

(৪) উপস্থিত ব্যবহারের দোষগুণ বিশদরূপে বিচার (ঈর্ষ্যা শূন্য হইয়া)

(৫) বিবাহ প্রথার সংস্কার প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে যদি এক এক জন কৃতবিদ্য চিন্তাশীল মহোদয় কষ্ট স্বীকার করতঃ লিখিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এই পত্রিকাখানি অতি আবশ্যকীয় ও মূল্যবান হইয়া উঠিবে এবং অন্যান্য সমাজের গুণগ্রাহী মহোদয়গণও যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন। বারান্তে আর আর কথা লিখিবার বাসনা রহিল ইতি।

গিরিডি। বশম্বদ
১২ই চৈত্র, ১২৯৮। শ্রীগোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি"
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের "প্রতিনিধিতে" খলিসাকুণ্ডী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র হাজরা মহাশয় যে এক পত্র লিখিয়া প্রতিনিধির দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। যাহাতে "প্রতিনিধি" উদারভাবে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের উপর লক্ষ্য রাখিয়া চিরস্থায়ী হইতে পারে, তাহাই আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা। ইহাকে স্থায়ী করণোদ্দেশে যে প্রেস কোম্পানি স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা অতি উত্তম কল্প সন্দেহ নাই। প্রস্তাবিত বিষয় যাহাতে শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয়, তৎপক্ষে মনোযোগী হওয়া প্রত্যেক উগ্রক্ষত্রিয়েরই নিতান্ত আবশ্যক। বোধ হয়, রেজিষ্টারি কার্য্য সত্বর সম্পন্ন হইলে, সাধ্যমত অংশ ক্রয় করিতে কেহই ত্রুটি বা বিলম্ব করিবেন না। হাজরা মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় সি, আই, ই, মহোদয়ের বাটীতে "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির" দ্বিতীয় অধিবেশন কালে, সমিতির সদুদ্দেশ্য সাধনার্থে স্বজাতীয় মহোদয়গণ যে সহস্রাধিক টাকা স্বাক্ষর করেন, এক্ষণে প্রতিনিধিকে স্থায়ী করণের জন্য উহার মধ্যে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা আদায় করিয়া প্রতিনিধির নামে ঐ টাকায় প্রেস কোম্পানির অংশ ক্রয় করিয়া দিবার জন্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমুদ বিহারী সামন্ত মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রস্তাব সমর্থন করা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। কারণ ইহার কার্য্য হইলে তাহার উপস্বত্ব যখন এক মাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র তা মহাশয়েরই প্রাপ্য, তখন ইহার অভাব পূর্ণ করাও তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। যদি ইহার স্বত্বাধিকারী সমিতিকে করা হইত, অর্থাৎ লাভের অংশ সমিতির প্রাপ্য হইত, তাহা হইলে বোধ হয় ঐ পূর্ব্বোক্ত টাকা হইতে প্রতিনিধিকে সাহায্য করিতে কাহারও আপত্তি থাকিতনা এবং মান্যবর শ্রীযুক্ত কুমুদ বিহারী সামন্ত মহাশয়কে কার্য্যকরী সভা আহ্বান না করিয়া, সভার সভ্যগণের মতামত না লইয়া, একাএক টাকা আদায় করতঃ প্রতিনিধিকে সাহায্য করিতে পরামর্শ দিতে সক্ষম হইতাম। আমাদিগের বিবেচনায় কুমুদ বাবু যেরূপ বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক, তাহাতে তিনি সভ্যগণের মতামত না লইয়া যে এ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন বা হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এক্ষণে শ্রীশ বাবু যদি সমিতিকে স্বত্বাধিকারী করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন তাহা হইলে সভ্যগণের নিকটে উদারভাবে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। সভ্যগণ এ বিষয়ে সম্মতিদান করিলে স্বাক্ষরিত টাকা প্রদানে আর কাহারও আপত্তি থাকিবেনা। টাকা আদায়ের জন্য যে সকল পত্র লেখা হইবে, তাহা কার্য্যকরী সভার অনুমোদিত এইকথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া সম্পাদকের স্বাক্ষর করা আবশ্যক। আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ উপলব্ধি হয়, যদি পূর্ব্বে সমিতিকে ইহার স্বত্বাধিকারী নির্ণয় করা হইত, তাহা হইলে আজ প্রতিনিধির এরূপ অর্থের অনাটন ও কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইত না। যাহাহউক, কুমুদ বাবু পূর্ব্বে কিছু টাকা আদায় করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি তাহা প্রকৃত হয়, তাহা হইলে তিনি যেরূপ সদাশয় ও স্বজাতির "হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাতে ঐ টাকার হিসার দিতে

তিনি কখনই অবহেলা করিবেন না। আমাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী লোক আছেন সত্য, কিন্তু কুমুদ বাবু ব্যতীত জাতীয় হিতার্থে যত্নবান আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। একমাত্র তাঁহারই অধ্যবসায় ও যত্নে যে সমিতির সৃষ্টি, একথা মুক্তকণ্ঠে কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি বর্দ্ধমানের তৃতীয় অধিবেশনের পর হইতে এককালে সমিতির উপর মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রিত আছেন। কেবল সেইজন্যই ইহার উন্নতি সম্বন্ধে আর কোন কার্য্যই হইতেছে না। নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ও স্বজাতিমণ্ডলীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া পুনরায় সমাজের হিতানুষ্ঠানে ব্রতী হয়েন, ইহাই তাঁহার নিকটে আমাদিগের সানুনয় নিবেদন।

পাল্‌সিট।
২৯শে ফাল্গুন ১২৯৮। } শ্রী র, স, গ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "উগ্রক্ষত্রিয় সম্পাদক"
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

দয়া করিয়া আমাদের আদরের ধন প্রতিনিধির কলেবরে নিম্নের কয়েক ছত্র স্থান দিলে গরীব মুষলরামের অনেকটা গাত্রজ্বালা নিবারিত হয়। ভরসা করি আপনি উপেক্ষা করিয়া মুষলরামের হৃদয়ে ব্যথা দিবেন না।

থামনা ভাই।

তোমাদের জ্বালা যে বড় বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল, তোমরা থামনা ভাই! তোমরা কোন কার্য্য করিবে না, করিতে দিবেও না। তোমরা সুকে কু করিবে, সৎলোকের কাণে কুপরামর্শ দিবে, তোমাদের উৎপাত বড়ই অসহ্য। তোমরা সমাজের কুপুত্র, সৎকার্য্যের বাধা, বংশের কলঙ্ক, মানব নামের অপভ্রংশ। তোমরা ফুলের পোকা, গৃহের উই, মাথার উকুন, তোমাদের ক্ষুদ্র দংশন বড়ই তীব্র। ভাল জিনিষ তোমাদের চক্ষে ভাল লাগে না, যাহা ভাল তাহা নষ্ট করিতে চেষ্টা, নষ্ট করাই তোমাদের ধর্ম্ম, স্বার্থ না থাকিলেও তোমরা নষ্ট করিতে উদ্যত হইবে। কিন্তু তোমাদের জ্বালা বড় বাড়াবাড়ি, তোমরা একটুকু থামনা ভাই!

তোমরা সমাজের কুপুত্র। কারণ, তোমাদের জন্যই সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। তোমাদের আচার নাই, বিচার নাই, তোমরা ধর্ম্মের ধার ধার না, রীতি মান না, নীতি জান না, তোমরা ধরাখানা সরা ভাবিয়াছ, কথায় কথায় দিগ্বিজয় করিতে চাও, তোমরা আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ। তোমরা ভাবিয়াছ যে আমাদের মত কৃতি নাই; জগতের কোন কার্য্য আমরা ভিন্ন অন্য কেহ করিতে পারে না, করিতে পারিবেও না। তোমাদের গুণের সীমা নাই, তোমরা মনুকে বৈতরণী পার করিয়াছ, তথাপি তোমরা হিন্দু; তোমরা কখন্ কোন দিন পাঠশালা গিয়া দূর হইতে গুরুমশায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া আসিয়াছ, তথাপি তোমরা বিদ্বান, তোমরা যে ডালে বসিবে, সেই ডাল ছেদন করিবে, তথাপি তোমরা বুদ্ধিমান; তাহাতেই বলি অকাল কুষ্মাণ্ডগণ, তোমরা একটু থামনা ভাই!

তোমরা সৎকার্য্যের বাধা। যদি কোথাও সৎকার্য্যের বীজ রোপিত হয়, তোমরা অমনি দল বাঁধিবে, ঘুর্টলা করিবে, ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া যাহাতে সেই বীজ নষ্ট হয় তাহাতে যত্নশীল হইবে। তাহাতেই বলি শুভযাত্রায় হাঁচি টিক্‌টিকিগণ, তোমরা একটুকু থামনা ভাই!

তোমরা বংশের কলঙ্ক। তোমরা মধুমক্ষিকা-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মাছির স্বভাব পাইয়াছ। যেখানে ফুল ফুটিবে, সৌরভ ছুটিবে, সেখানে তোমরা ঘেঁসিবে না, যেখানে আবর্জ্জনা পুতিগন্ধ, সেইখানে তোমাদের যাতায়াত। কাহারও কোথাও যদি ক্ষত স্থান পাইলে, তাহা হইলে তোমাদের আনন্দের আর সীমা নাই; অমনি তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া দংশনের জ্বালায় অস্থির করিয়া তুলিবে। তাহাতেই বলি ভাই মাছিগণ! তোমাদের ভন্‌ভনানিতে বড় ভয়ের সঞ্চার হয়; তোমরা একটুকু থামনা ভাই!

তোমরা মানব নামের অপভ্রংশ। কারণ, তোমাদের সারত্ব কিছুই নাই। তোমরা দুর্ব্বলের বাঘ, সবলের "দোহাই মোশায়।" তোমরা চারি যুগেই বর্ত্তমান আছ। সত্যেতেও তোমরা ছিলে, ত্রেতাতে তোমরাই পতিব্রতা সীতাকে নির্ব্বাসিতা করিয়াছিলে, দ্বাপরে তোমাদের মতই দামুঘোষের পুত্র শিশুপালের রাজসূয় সভায় শিরশ্ছেদন হইয়াছিল, আর এই কলিকালে তোমরা নানা রূপধারী। কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞ মূর্ত্তিটি বড়ই অনিষ্টকারিণী; দুষ্টা সরস্বতী তোমাদের স্কন্ধে আবির্ভূতা হইলে আর রক্ষা নাই। তখন নিরীহকে শঠ সাজাইবে, শঠকে ধর্ম্মাবতার করিয়া তুলিবে। তাহাতেই বলি কুপোষ্যগণ, তোমরা একটুকু থামনা ভাই।

তোমাদের অবস্থা বড় শোচনীয়। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত, কিন্তু পাছে লোকে দেখিতে পায় সেই ভয়ে ক্ষত স্থান ঢাকিয়া রাখিয়াছ। দুর্গন্ধ পাইয়া কেহ যদি ঔষধের ব্যবস্থা করিতে যায়, অমনি তোমরা চীৎকার করিয়া উঠিবে, শত্রুকে মিত্র ভাবিয়া কতই আস্ফালন করিবে; কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ না যে, তোমাদের অন্তিম কাল উপস্থিত। সেই জন্যই সুপথ্য তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। তোমাদের দশা দেখিয়া যথার্থই দয়ার উদ্রেক হয়।

তোমরা "হাম্ মস্ত"—আপনা আপনি বড় হইয়া উঠিয়াছ। তোমরা অপরকে সামান্য ভাব, ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা কর। তোমরা কহ যে, সামান্য লোকের দ্বারায় মহৎকার্য্য সাধিত হয় না। ভেলার সাহায্যে কখন সমুদ্রের পারে যাওয়া যায় না। যদি কখন কেহ ভেলারোহণে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করে, তোমরা অমনি তীরে বসিয়া টিট্‌কারি দিবে; যখন দেখিবে যে, যথার্থই সমুদ্র পার হইয়া চলিয়া গেল, তখন আর তোমাদের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না,—শুভ্র দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া-গাত্র কণ্ডূয়ন করিতে করিতে ডারুউইনের বিবর্ত্তনবাদ প্রতিপন্ন করিতে বসিবে। ভাই সমাজ বৃক্ষের শাখামৃগগণ, একটু সরিয়া দাঁড়াও, নতুবা কোন্ দিন ব্যাধের হস্তে পড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিবে।

তোমাদের কি এ জ্ঞান নাই যে, নদী যখন সাগর উদ্দেশে বহির্গত হয়, তখন সে কোন বাধা মানে না; যদি কেহ বাধা দেয় তখন অমনি দুকূল ভাসাইয়া দিয়া সলিল ধারা তীব্রবেগে গন্তব্য স্থানে ধাবিত হয়। তোমরা কি ইহা জান না যে, ক্ষুদ্র হইলেও সেই ক্ষুদ্র দ্বারায় মহৎকার্য্য সম্পাদিত হয়। তোমরা কি ইহাও বুঝ না যে, যাহা হইবার তাহা সময়ে নিশ্চয়ই হইবে; যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে উপায়, যেখানে পথিক সেইখানে পথ, কিছুতেই আটক করিয়া রাখিতে পারে না। তোমরা আপনার মূল্য মনে মনে ত বুঝিতে পারিয়াছ। তাই বলি এখন তোমরা একটুকু থামনা ভাই।

শ্রীমুষলরাম মুদ্গরাচার্য্য।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত।

সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ও শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংশোধিত। কলিকাতা, ২নং নবাবদি ওস্তাগরের লেন, ইংরাজী সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ১৲ এক টাকা। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত আমরা আগ্রহের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। বিদ্যারত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর। অধিকন্তু ইনি সর্ব্ব বিষয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; সুতরাং তদীয় দৈনন্দিন ঘটনায় ইনি যেরূপ অভিজ্ঞ আর কেহই তদ্রূপ নহেন। জীবন-চরিতেও বিদ্যাসাগরের শিশুচরিত হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা সম্বলিত জীবনী অন্য কর্তৃক সঙ্কলিত হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যে উদ্দেশ্যে বিদ্যারত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত লিখিয়াছেন; তদ্বিষয়ে যে তিনি সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ। সাধারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে সকল গুণ অবগত তদপেক্ষা তাঁহার রাশি রাশি গুণাবলী এই জীবনী মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল গুণাবলী ও কীর্ত্তিকাহিনী সাধারণ্যে যতই প্রকাশিত হইবে ততই তাঁহার আসন উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে স্থাপিত হইবে। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকোত্তর অসংখ্য অসংখ্য গুণের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আশাতীত সুখ লাভ করিয়াছি। আমরা সাধারণকেও সেই সুখের অধিকারী হইতে অনুরোধ করি। এই নীতিহীনতার কালে সকলেরই বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠ করিয়া তদনুকরণে চরিত্র সংগঠন করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ সর্ব্বত্র পরিচিত ও সর্ব্বজন পূজিত তাহাতে যে, তাঁহার জীবনচরিতের আশানুরূপ আদর হইতেছে না ইহা দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বিলাত বা মার্কিন হইলে এরূপ লোকের জীবনচরিত লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রয় হইত।

একাল পর্য্যন্ত আমরা জীবনচরিতের অনুকূলেই বলিয়া আসিলাম, এবারে সত্যানুরোধে প্রতিকূল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। প্রথমত পুস্তকের স্থানে স্থানে অনেকগুলি বর্ণাশুদ্ধি দোষ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ উহাতে ভাষারও বড় একটা চাকচিক্য বা লালিত্য নাই। শব্দাদি প্রয়োগে নবীকৃতত্বা গুণের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়; যেন একরূপ শব্দ বা ক্রিয়াতেই সমগ্র পুস্তক পরিপূর্ণ। যেরূপ সুন্দর সুন্দর উপাদানে জীবনচরিত সংগঠিত হইয়াছে, উহাতে সেই পরিমাণে ভাষার পারিপাট্য থাকিলে উহা "সোণায় সোহাগা" হইয়া দাঁড়াইত। যেরূপ তাড়াতাড়িতে এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা এবারে উক্ত উভয় দোষ মার্জ্জনা করিতে পারি। বিশেষতঃ ভাষা শিক্ষার জন্য জীবনচরিত নহে, উহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। জীবনচরিতে সে উদ্দেশ্যের অভাব হয় নাই। ভাষাদোষে এরূপ মূল্যবান গ্রন্থের অনাদর হওয়া উচিত নহে। তৃতীয়তঃ জীবনচরিত লেখকদিগকে পক্ষপাতিত্বে জলাঞ্জলি দিয়া নিরপেক্ষ ভাবে "সু" 'কু' দুই দিকই দেখাইতে হয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ বলিয়া তৎসমীপে বৈতালিকরূপেই বিরাজ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি কোন দোষই ছিল না? মনুষ্য মাত্রেই যখন সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী নহে, তখন তাঁহারও অবশ্য কোন না কোন দোষ ছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহার একটীরও উল্লেখ করেন নাই কেন? কনিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ নিন্দা অতীব পাপজনক এমন কি গুরুভাবে লইলে শাস্ত্রবিরুদ্ধও বটে। এই ভয়েই বোধ হয় বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহাতে বিরত হইয়া থাকিবেন? জীবনচরিত সম্বন্ধে পূর্ব্ব কথিত দোষ ব্যতিরেকে উহাতে আর একটী বিষয়ের অভাব আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্ব পরিচায়ক আরও অনেকানেক ঘটনা শুনা গিয়াছে। সেগুলি জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তদ্দ্বারা গ্রন্থের এক রকম অঙ্গহীনতা ঘটিয়াছে, ইহা বলিতেই হইবে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা উহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখিতে পাইব।

২। প্রণয়ী যুগল।

কলিকাতা ১০।১।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, বাল্মীকি যন্ত্রে বি,এন নন্দী দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীবাসুদেব চক্রবর্ত্তী কর্তৃক গুহগ্রাম হইতে প্রকাশিত।

এই ক্ষুদ্র চটি পুস্তকখানি আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তক সম্বন্ধে মাথামুণ্ড কিছুই বলিবার নাই। এরূপ কুরুচি পরিপূর্ণ পুস্তকের পাণ্ডুলেখ্য মুদ্রা যন্ত্রে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে অগ্নিদেবকে উপহার দিলে গ্রন্থকার ও আমাদের উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইত না কি?

৩। শুভঙ্করী ও মানসাঙ্ক।

প্রথম ভাগ। নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষার্থীদিগের নিমিত্ত রাজমহল স্কুলের বাঙ্গালা শিক্ষক শ্রীরামশঙ্কর রায় কর্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা ২৩।১নং বেচু চাটুজ্যের ষ্ট্রীট, হেয়ার প্রেসে যদুনাথ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে প্রথম শতকিয়া কড়া, গণ্ডা ইত্যাদি, পরে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ; তার পর শুভঙ্করের মণকসা, সেরকসা, কাঠাকালি, বিঘাকালি প্রভৃতি আর্য্যা সঙ্কলিত হইয়াছে। সরল সরল উদাহরণ দ্বারা পুস্তকখানিকে সরলমতি বালকগণের পাঠোপযোগী করা হইয়াছে। পুস্তকখানি যাহাদের জন্য রচিত হইয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ উপকারে আসিবে বলিয়া বোধ হয়।

৪। কবিতা কুসুম।

প্রথম-ভাগ। শ্রীস্বর্গনাথ মণ্ডল কর্ত্তৃক প্রণীত প্রথম সংস্করণ কলিকাতা, পটলডাঙ্গা ৪নং কলেজস্কোয়ার সাম্য যন্ত্রে, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৵০।

আজকাল সাধারণতঃ বালক বালিকাদিগের পাঠের উপযোগী যে সকল কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে কবিতাকুসুমও সেই শ্রেণীর। ইতাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। তবে ৩০ পৃষ্ঠা একখানি কবিতা পুস্তকের মধ্যে একটীও যুক্তাক্ষর নাই ইহাই গ্রন্থকারের বাহাদুরী। চেষ্টা করিলে কবিতা-

দেবী স্বর্ণনাথ বাবুর প্রতি ভবিষ্যতে সুপ্রসন্ন হইতে পারেন।

৫। নব্যভারত। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত। আজকালকার বাজারে যতগুলি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে নব্যভারতই সর্ব্ববিষয়ে প্রশংসার যোগ্য।

৬। চিকিৎসা সম্মিলনী। চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সারবান প্রবন্ধে পরিপূর্ণ চিকিৎসা সম্মিলনীর সবই প্রশংসার; অপ্রশংসার মধ্যে অনিয়মিতরূপে প্রকাশ।

৭। বামাবোধিনী পত্রিকা। এখানিও মাসিক। নিয়মিতরূপে প্রকাশিত। স্ত্রীপাঠ্য অনেক প্রবন্ধ ইহাতে থাকে। রুচি পরিমার্জ্জিত।

৮। ভারতী ও বালক। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ভারতী ও বালক ব্যতীত স্ত্রীসম্পাদিত মাসিকপত্র আর আছে কি না আমরা জানি না। ভারতী বালকের দোষ গুণের কথা আমরা কিছু বলিব না, স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত একখানি মাসিক পত্র আজ ১৫ বৎসর শিক্ষিত সমাজে আদর প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে ইহাই ইহার গৌরবের যথেষ্ট পরিচয়।

৯। ধর্ম্ম প্রচারক। কাশীধাম আর্য্য ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র ধর্ম্ম প্রচারক যথার্থই হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারক। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলিতে ধর্ম্ম প্রচারক পরিপূর্ণ থাকিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। যখন রাজকুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয়ের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে ছিল, তখন ইহার প্রবন্ধ নিচয় পাঠ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত, এখন কিন্তু সে ভাবটী নাই।

১০। অনুসন্ধান। পাক্ষিক পত্র। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অনুসন্ধান প্রথমতঃ যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয় সে উদ্দেশ্যের প্রতি এখন অনুসন্ধানের আর ততটা লক্ষ্য নাই। অনুসন্ধানের উপদেশ সূচক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধসমূহ যথেষ্ট আনন্দপ্রদ ও গল্পগুলি কিছু মজাদার।

১১। তত্ত্বকৌমুদী। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত। কেবল ধর্ম্ম ও নীতিময় প্রবন্ধ দ্বারা ইহার কলেবর পূর্ণ থাকে। ইহার রুচি বড়ই পরিমার্জ্জিত এবং ইহার প্রবন্ধ সমূহ বড়ই শিক্ষাপ্রদ।

১২। হিতবাদী। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল সম্পাদিত। অল্প দিনের মধ্যেই হিতবাদী সাহিত্য সমাজে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। হিতবাদীর ছাপা ভাল, কাগজ ভাল—কেবল ভাল নহে গোলাপী রংয়ের আভা সৌখীন পাঠকের প্রীতিপ্রদ। হিতবাদীর লেখকগণের তালিকার নামজাদা লেখকবৃন্দের নাম দেখিয়া আমরা হিতবাদীর নিকট অনেক উচ্চাশা করিয়াছিলাম। হিতবাদীর লেখা বাজে না হইলেও আমাদের সে আশা পূর্ণ হইতেছে না।

১৩। সঞ্জীবনী। সাহিত্য সমাজে সুপরিচিতা প্রবীণা সহযোগিনীর বিশেষ পরিচয় প্রদান বাহুল্য। সঞ্জীবনী দেশের কাজের কথা লইয়াই ব্যস্ত। সহযোগিনীর প্রবন্ধ নিচয় যেমন সসার ভাষা তদনুরূপ নহে।

১৪। সময়। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম, এ, বি এল সম্পাদিত। যতগুলি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আছে সময় তন্মধ্যে বৃহদায়তন। সময়ের সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রবন্ধ সমূহ অতি উচ্চ ভাবপূর্ণ। কিন্তু ইহাতে সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ সূচক যে সকল পত্র প্রকাশিত হয় তাহা বড়ই বিরক্তিকর।

১৫। হোপ। শ্রীঅমৃতলাল রায় সম্পাদিত। এখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। দেশীয়দিগের সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে হোপের ইংরাজিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হয়। হোপের বিষয় নির্ব্বাচনও মন্দ নহে। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় হোপে Reprint (উদ্ধার) কলম না থাকিলেই ভাল দেখায়।

১৬। ইণ্ডিয়ান মিরার। এই সর্ব্বজন পরিচিত ইংরাজি ভাষায় সম্পাদিত দৈনিক পত্রিকার নূতন পরিচয় দিবার কিছুই নাই। নিয়মিতরূপে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক নরেন্দ্র বাবুর প্রশংসা জ্ঞাপক ও বাঙ্গালির গৌরব ইহা বলাই বাহুল্য।

১৭। প্রকৃতি। শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা পরিচালিত। ভাদ্র হইতে প্রকৃতি প্রকাশিত হইতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির লেখা ভাল। বাজারে যতগুলি সুলভ সাপ্তাহিক পত্র আছে, আকারে গুণে প্রকৃতি তাহাদের কাহার অপেক্ষা হীন নহে অথচ ইহার মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

১৮। এডুকেশন গেজেট। হুগলি হইতে প্রকাশিত। মফঃস্বলে যতগুলি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে এডুকেশন গেজেটকেই সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত বলিয়া মনে হয়। দোষের মধ্যে মূল্য বড় বেশী।

১৯ বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী। বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত। লেখা, কাগজ, ছাপা সবই ভাল। স্থানীয় সংবাদ আরও থাকা দরকার। সঞ্জীবনীর মূল্য বড় অতিরিক্ত বোধ হয় মূল্য কমাইলে সহযোগিনী আরও গ্রাহক লাভ করিতে পারেন।

২০। হিন্দু রঞ্জিকা। রাজসাহী বোয়ালিয়া হইতে প্রকাশিত। হিন্দুরঞ্জিকা অনেক দিনের কাগজ। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার দিকে ইহার যথেষ্ট চেষ্টা। বোয়ালিয়া ধর্ম্ম সভার মুখপত্রিকা হিন্দুরঞ্জিকার আমরা মঙ্গল কামনা করি।

২১। হিতকরী: হিতকরী নদিয়া জেলান্তর্গত কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশিত হইত। এবারে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত হইতেছে। জন্মভূমি হইতে সহানুভূতির অভাবে সহযোগিনী টাঙ্গাইলে আশ্রয় লইয়াছেন। জমিদারপ্রধান স্থান কুষ্টিয়ায় একখানি সংবাদপত্র চলিল না ইহা কুষ্টিয়াবাসীর বড় কলঙ্কের কথা। হিতকরী দুই বৎসরে অনেক কার্য্য করিয়াছে। হিতকরী নিতান্ত নগণ্য কাগজ নহে। এরূপ পত্রিকা সাধারণের সহানুভূতি পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

সিটিথিয়েটার। আজ এক বৎসরও পূর্ণ হয় নাই সিটিথিয়েটরের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই উক্ত নাট্য সম্প্রদায় সরলা, নলিনীবিকাশ,

চৈতন্যলীলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি দৃশ্য কাব্য ও তাজ্জব-ব্যাপার, বিবাহ-বিভ্রাট, গয়জারেপাজি প্রভৃতি প্রহসন অভিনয় করিয়া অভিনয় নৈপুণ্য দ্বারা দর্শকমাত্রকেই সন্তুষ্ট করিয়াছেন। প্রহসনের মধ্যে বিবাহ-বিভ্রাটের অভিনয়ই প্রশংসার যোগ্য। বিবাহবিভ্রাটের ঝিয়ের ন্যায় স্বাভাবিক অভিনেত্রী সাধারণতঃ মেলা ভার। সরলা সম্বন্ধে মতামত ইতিপূর্ব্বে প্রতিনিধিতে প্রকাশিত হইয়াছে। চৈতন্যলীলার অভিনয়ও কম আনন্দপ্রদ নহে। নিত্যানন্দের "প্রেমের ভিখারী" গাবন কার না হৃদয় গলে? সীতার বনবাসের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিপ্রদ। ইহার অভিনয়ে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ সকলেই পারদর্শীতার সহিত স্বীয় স্বীয় অংশের অভিনয় নিপুণতার পরিচয় দিয়া থাকেন। রামচন্দ্রের অভিনয়ে ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, লোকানুরাগপ্রিয়তা প্রভৃতি উচ্চ ভাবসমূহ সুদক্ষ অভিনেতার প্রতি বাক্যে ও ভাবে যেরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ লক্ষ্মণের কার্য্যে সরলতা ও পরদুঃখকাতরতা ও অন্যায় স্বত্বেও যে গুরুজনের আদেশ পালনীয় তাহার সূক্ষ্ম ভাব বিকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু সীতার অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক একাকিনী সেই ভীষণ হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ বনপ্রদেশে পরিত্যক্তা জনকদুহিতার কাতরোক্তি মনে হইলে এখনও আমাদের নয়নবারি মোচন করিতে হয়। প্রকৃতি যেন সেই সময়ে প্রকৃতই সীতার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া কাদম্বিনীনাদ, চপলাবিকাশ ও তরুরাজিস্পন্দন চ্ছলে হতভাগিনী জনকদুহিতার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে থাকে। কবিগুরু বাল্মীকির মধুময় লেখনি-প্রসূত সীতার মধুমাখা কাহিনী সুনিপুণা অভিনেত্রীর অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শক-হৃদয়ে বিশেষরূপ প্রতিফলিত হইয়া বিমল আনন্দ প্রদান করে। আমরা সিটি থিয়েটরের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

এমারেল্ড থিয়েটার। এমারেল্ড থিয়েটারে কিছুদিন হইতে পৌরাণিক আখ্যায়িকা নিত্যলীলা বা উদ্ধব-সংবাদ অতীব দক্ষতার সহিত অভিনীত হইতেছে। এই অভিনয়ের প্রধান নায়ক নন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও উদ্ধব; নায়িকা যশোদা, রাধিকা এবং বৃন্দা। ইহাদিগের অভিনয় অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক। কৃষ্ণ বিরহে ব্রজবালার শোকোচ্ছ্বাস তাহা কি মধুর! উদ্ধবের সাময়িক গীত গুলিন অতি সুমিষ্ট। আদ্যন্ত করুণরসের মধ্যে পতাকাবাহক লম্বোদরের অভিনয় রহস্যজনক। দৃশ্য পটাদিতে এমারেল্ড থিয়েটার যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই দৃশ্যপটে নন্দরাজের অন্তঃপুরস্থ পুষ্পোদ্যান ও রাধাকুঞ্জের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। বিরহবিধুরা বিনোদিনীর সম্মুখে পুনর্মিলন সূচক ভ্রমরের আবির্ভাব দেখিলে কাহার মনে যুগপৎ হাস্য ও প্রীতির উচ্ছ্বাস না হয়! পটপরিবর্ত্তনে নিত্যলীলাসনে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ সম্মুখে প্রকৃত সলিলোৎস ও গোপিনীগণের আনন্দ নৃত্য গীত দৃশ্য কি নয়নানন্দপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক! এমারেল্ড থিয়েটারের নন্দ বিদায়, গোপীগোষ্ঠ নিত্যলীলা প্রভৃতি মধুর হরিলীলাশ্রিত অভিনয় দর্শনে হিন্দু মাত্রেই পরিতৃপ্ত হইবেন। বঙ্গের সার্ ওয়ালটার স্কট সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বিষবৃক্ষ অতীব দক্ষতা ও সমারোহের সহিত অভিনীত হইতেছে। এই অভিনয়ের বিস্তৃত সমালোচনা পর সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সুযোগ্য ম্যানেজার ও তত্ত্বাবধায়কের যত্নে এমারেল্ড থিয়েটার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

তেলেহাটী (হাওড়া) আর্য্যধর্ম প্রচারিণী ও উন্নতি বিধায়িনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন;—

"বিগত ২৩শে ও ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, তেলেহাটী "আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী ও উন্নতি-বিধায়িনী" সভার সার্দ্ধ-পঞ্চম-সাম্বৎসরিক মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর (কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন) ভক্তিপূর্ণ সারগর্ভ, সুললিত বক্তৃতায় প্রত্যেক শ্রোতা স্তম্ভিত ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন! দুঃখের বিষয় অনেক স্ত্রী ও পুরুষ অসময়ে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা বক্তৃতা শ্রবণে বঞ্চিত হইয়া যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মনোকষ্ট নিবারণার্থে স্বামিজী সমীপে আবেদনের ব্যবস্থা হইতেছে। স্বামিজী সম্প্রতি ধর্ম্ম প্রচারার্থ দারজিলিং যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে ঢাকা যাইবেন। অনেকগুলি গণ্যমান্য উচ্চ শিক্ষিত ও পদস্থ মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহাকে কিছু দিন ভবানীপুর (কলিকাতায়) থাকিতে হইবে। সম্ভবত ঐ সময়ে মর্ম্মাহত ব্যক্তিদিগের মর্ম্মপীড়া নিবারিত হইবে। উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন (স্বামিজী রচিত গান) অতীব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া ছিল।"

"হিন্দুর সমুদ্র যাত্রা" এই গুরুতর সামাজিক বিষয় লইয়া আজ কাল বড়ই আন্দোলন চলিতেছে। শোভাবাজারের রাজা শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বিলাত গমনের পক্ষপাতী হইয়া এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। ইংরাজ আমাদের রাজা, তাঁহাদের দেশ বিলাত। ভারতের রাজসংক্রান্ত যা কিছু বৃহৎ ব্যাপার সবই বিলাতে। অগত্যা ভারতবাসীর বিলাত গমন ক্রমশ প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে বিলাত গমনের প্রধান প্রতিবন্ধক সমুদ্র যাত্রা। কুমার বাহাদুর এই সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্র, শাস্ত্র ব্যবসায়ী ও গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গের অনুকূল মত সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এইরূপ মতামতের কোন মূল্য আছে বলিয়া বিবেচনা করি না। শাস্ত্র হিন্দুর প্রাণ হইলেও দেশাচারের আধিপত্য থাকিতে শাস্ত্রবাক্য কোন কার্য্যকারী নহে। আর ব্যবস্থাদাতারা বাক্যের সময় অগ্রণী হইলেও প্রকৃত কার্য্যের সময় যে অদৃশ্য হইয়া পড়েন ইহা সিদ্ধান্তের কথা নহে—পরীক্ষিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ ব্যাপারেই তাহা টের পাওয়া গিয়াছে। কুমার বাহাদুর এই সমুদয় সংগৃহীত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বর্ত্তমান ব্যবস্থা সচিব সার আলেকজণ্ডার মিলরের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়া

---

* চৈত্রের প্রতিনিধি বিলম্বে প্রকাশিত হইল বলিয়া, সাময়িক প্রসঙ্গগুলি অসময়োচিত হইলেও আবশ্যক বোধে পত্রস্থ করা গেল। উ, প্র, স।

ছিলেন। তিনি তদুত্তরে বলিয়াছেন, "হিন্দুসমাজের মত গ্রহণ পূর্ব্বক বিলাত যাইতে পারিলে এ দেশের পক্ষে যথেষ্ট উপকার হয়। কিন্তু আমার মতে সেই মত সর্ব্ববাদী-সম্মত না হইলে কোন কার্য্য হইবে না। বিশেষতঃ পদমর্য্যাদায় যাঁহারা আজকাল বড়লোক তাঁহাদের মত কোন কার্য্যের নহে। যাহারা পদমর্য্যাদা ও জাত্যংশে বড়লোক তাঁহারা সকলে যদি এক মত হইয়া বিলাত গমনের ব্যবস্থা প্রদান করেন তবেই হিন্দুসন্তানের বিলাত যাওয়া বিধেয়। যতদিন এইরূপ ব্যবস্থা না হইবে, ততদিন বিলাতযাত্রা সম্বন্ধে চেষ্টা ফলবতী হইবে বলিয়া বোধ হয় না।" আমরা ব্যবস্থাসচিবের সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।

সম্প্রতি আমাদের ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়ট এক ভীষণ আইন সৃষ্টির উদ্যোগ করিয়া প্রজাকুলকে সন্ত্রাসিত করিয়াছেন। এই ভবিষ্য আইন এখন পাণ্ডুলিপির আকারে, নাম "চৌকিদারী বিল"। চৌকীদারী বিলে দুইটী অতি অনিষ্টকর ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১ম। বঙ্গের কতকগুলি জেলায় প্রজার নিকট হইতে ট্যাক্স আদায় করিয়া গ্রাম্য চৌকিদার দিগের বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। আর কতকগুলি জেলার প্রজাকে চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে হয় না। বহুদিন হইতে ঐ সকল জেলায় চৌকিদারেরা জমি ভোগ করিয়া আসিতেছে। ছোটলাট মনন করিয়াছেন ঐ জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া জমির পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে বেতন দেওয়া হইবে। বাজেয়াপ্ত জমির অর্দ্ধেক উপস্বত্ব জমিদারকে প্রদত্ত হইবে; অপরার্দ্ধ গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং লইয়া সেই উপস্বত্ব হইতে চৌকিদারদিগের বেতন দিবেন, যাহা অকুলান পড়িবে তাহা প্রজার নিকট হইতে আদায় হইবে। ২য়। এখন চৌকিদার অনেক পরিমাণে বেতনদাতা প্রজার বশীভূত আছে। চৌকিদারকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন করিয়া গ্রাম্য পুলিস করিয়া তুলা হইবে। এই দুইটী ধারা যদি প্রকৃতই আইনরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের কোন লাভ হইবে বলিয়া বোধ হয় না, অথচ প্রজাসমূহের অনিষ্ট হইবে। যে সব জেলার চৌকিদারগণ জমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহারা জমিদার এবং সরকার বাহাদুর উভয়েরই কাজ আঞ্জাম করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় সামান্য পুরস্কার দিয়া প্রজারাও চৌকিদার দ্বারা যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হয়। এই নিয়মে রাজা প্রজা ও জমিদার সকলেরই উপকার, অথচ চৌকিদারেরাও এই ভূমি ভোগে সন্তুষ্ট। বেতনে তাহারা তত সন্তুষ্ট হইবে না। এই সুপ্রথা নষ্ট করিলে চৌকিদার দ্বারা সরকারী কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা কখনই বেশী আঞ্জাম হইবে না, অথচ প্রজা ও জমিদারের সমূহ ক্ষতি হইবে। তারপর চৌকিদারকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন করিলে, ক্রমশঃ তাহাদের সহিত প্রজার অকৌশল বাধিয়া যাইবে। এখন তাহারা কতকাংশে প্রজার অধীন আছে বলিয়া রক্ষা, কিন্তু অচিরে যদি বুঝিতে পারে আমরা প্রজার চাকর নহি গভর্ণমেণ্টের চাকর, তাহা হইলে তাহারাও যে পুলিসের ন্যায় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিবে না কে বলিল? দূরস্থিত থানার পুলিষের উৎপীড়নেই প্রজা অস্থির, তারপর যদি গ্রামে গ্রামে পুলিস হয়, তবে কি আর অত্যাচারের বাকী থাকিবে? প্রজার হিতের জন্য এবং রাজকার্য্য সৌকর্য্যার্থ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। কিন্তু এই সর্ব্বনেশে চৌকিদারী আইন করিয়া ছোট লাট যে কি রাজকার্য্যের সুবিধা ও প্রজার মঙ্গল করিতেছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির গম্য নহে। চৌকিদারী বিলের তীব্র প্রতিবাদ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।